136

মন ও শিক্ষা

মন ও শিক্ষা

জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত, পি-এইচ ডি,
অধ্যক্ষ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
সুরমা দাশগুপ্ত, বি এ.
মনঃসমীক্ষক

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট্ লিমিটেড
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট্ লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এষ্টেট্, বোম্বাই-১
ক্যানসন্ হাউস, ১।২৪, আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী
৩৬-এ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ-২
গানফাউণ্ড্রী রোড, হায়দ্রাবাদ
১৭, নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা

লংম্যান্স গ্রীন এণ্ড কোং লিমিটেড
৬-৭ ক্লিফোর্ড ষ্ট্রীট, লণ্ডন ডব্লিউ-১
এবং
নিউ ইয়র্ক, টরোণ্টো, কেপটাউন ও মেলবোর্ণ

প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

টুটুলকে—

স্বীকৃতি

এই বই লিখতে অনেকের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅমিয় সেন বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। আমাদের তরফ থেকে প্রুফ দেখবার গুরু দায়িত্বটি প্রধানতঃ বহন করেছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়। এ সম্পর্কে শ্রীপরিমল হোমকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাণ্ডুলিপি কপি করতে সাহায্য করেছেন শ্রীহরিপদ সামন্ত। ন্যাশনাল লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রী এ, কে, রায়ের নিরলস সহায়তার কথাও উল্লেখ করব।

বইখানির প্রকাশনায় ওরিয়েণ্ট লংম্যান্সের তরফ থেকে শ্রীজ্যোতিষরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সহায়তা আমরা পেয়েছি।

এ ছাড়াও আরো অনেকের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি—আলাদা করে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হোল না বলে মার্জনা চাইছি।

Acknowledgements

For permission to use copyright illustrations the Authors and Publishers are indebted to:

Messrs John Wiley & Son Inc., for the illustration on page 277 from *Foundations of Psychology* by E. G. Boring, H. S. Landfeld & H. P. Weld;

Messrs W. W. Norton & Company Inc., for the illustration on page 317 from *Tide of Life* by R. S. Hoskins;

Messrs Houghton Mifflin Company, for the illustration on page 224 from *Measuring Intelligence* by L. M. Terman & M. A. Merrill;

Messrs Methuen & Co. Ltd., for the illustrations on pages 321, 322 and 325 from *Psychology* by R. S. Woodworth & Donald G. Marquis;

The Bureau of Publications, Teachers' College, Columbia University, for the illustration on page 134 from *Children's Fears* by A. T. Jersild & F. B. Holmes.

ভূমিকা

'মন ও শিক্ষা' বইখানি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একখানা ভূমিকা। বইখানা লিখতে আমরা ইংরেজীতে লেখা কয়েকখানা প্রমাণ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। কোন কোন মূল বই থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছি। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু কাজ করবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। সে কাজের ফলে যে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা লাভ করেছি—তা দ্বারা বইয়ের কয়েকটি অধ্যায় বিশেষরূপে প্রভাবিত হয়েছে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করার অধিকারকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব-পাকিস্তানে ছয় কোটিরও অধিক। ডেনমার্কে মাত্র পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোক। দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছু তারা শিখছে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে সেই সুযোগ পায় সেজন্য বাংলা ভাষায় আজ দর্শন, বিজ্ঞানের বই দরকার। ঐ প্রয়োজনবোধ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলা বই ইংরেজী বই থেকেও কঠিন এমন একটি অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায়। পরিভাষা বোঝবার অসুবিধা তার একটি বড়ো কারণ। এদেশে লেখাপড়া যাঁরা জানেন—ইংরেজী পরিভাষার সঙ্গেই মুখ্যতঃ তাঁদের পরিচয়। বাংলা পরিভাষা বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হয়। এই বোঝা ও না-বোঝা কিছুটা অভ্যাসের ফল। ইংরেজী পড়তে তাঁরা অভ্যস্ত বলেই বাংলাটা তাঁদের অপেক্ষাকৃত কঠিন বোধ হয়। নইলে অক্সিজেন শব্দটি অম্লজান শব্দটির থেকে বেশী সহজ বা শ্রুতিমধুর মনে করবার কোন কারণ নেই। বাংলা পরিভাষার সঙ্গে তাঁরা কিছুটা পরিচিত হলে ঐ পরিভাষা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য বা হাস্যকর বলে মনে হবে না।

স্কুলের দশম শ্রেণীর একটি ছেলে বিজ্ঞানের একখানা বই পড়ছিল। তাকে

জিজ্ঞাসা করলাম "বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা বুঝতে তোমার অসুবিধা হয় না?" প্রশ্ন শুনে সে অবাক হল। সে উত্তর করল "কেন, অসুবিধা কিসের"? আমরা বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষাকে ইংরেজীতে তর্জমা করে বুঝতে চেষ্টা করি। সেজন্যই আমরা অসুবিধা বোধ করি। যারা প্রথম থেকেই বাংলায় বিজ্ঞান পড়েছে তাদের সে অসুবিধা হবার কথা নয়।

তবে একথা সত্য যে, ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতার অভাবের ফলে বাংলায় বিজ্ঞানের বই অনেক সময় দুর্বোধ্য ঠেকে। এই বইখানা লিখতে গিয়ে সর্বদা সে কথাটি আমরা মনে রাখতে চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি সে কথা পাঠক-পাঠিকারাই বলতে পারবেন।

পরিভাষা রচনা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। ইংরেজী পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ স্থির করতে গিয়ে কেবলমাত্র শব্দার্থ নয়, পরিভাষার দ্বারা যে ধারণাটি সূচিত হয়েছে—সেটিও সম্যকরূপে বিবেচনা করবার আমরা চেষ্টা করেছি। **'Conditioned Response'**কে আমরা 'সংযোজিত প্রতিক্রিয়া বা আচরণ' বলেছি। Conditioned-এর সঠিক শব্দার্থ 'সংঘটিত'। বিশেষ কতকগুলি ঘটনার ফলে একটি উদ্দীপকের সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়া সংযোজিত হয়। এটাই 'Conditioned Response'-এর মূল কথা। সে কারণেই বলা যায় 'সংঘটন' থেকে 'সংযোজন' শব্দটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

বিষয়ের একটি স্বকীয় জটিলতা আছে, তার সঙ্গে পরিভাষার দুর্বোধ্যতা যুক্ত হয়ে বইটি যাতে আরো জটিল বোধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিভাষাকে যথাসাধ্য সহজবোধ্য করবার আমরা চেষ্টা করেছি।

কিছু কিছু প্রচলিত শব্দ পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আপত্তি উঠতে পারে, যে সব শব্দ খুশিমত লোকে ব্যবহার করে সে সব শব্দের একটি সঠিক সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। উত্তরে বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞানে শব্দগুলি যদি চলে, তবে সেগুলির একটি সঠিক সুনির্দিষ্ট অর্থ গড়ে উঠবে। ইংরেজীতে বহু শব্দ আছে, যা সাহিত্যেও চলে, মনোবিজ্ঞানেও চলে। মনোবিজ্ঞানে সেগুলির ব্যবহারে কোন বাধা জন্মায় না, মনোবিজ্ঞানে সে সব শব্দের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। অধিকন্তু প্রচলিত বলে সে শব্দগুলি আমাদের চোখে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হবে না। সে সব শব্দকে সহজে আমরা গ্রহণ করতে পারব।

কিছু কিছু ইংরেজী পরিভাষাকে সোজাসুজি বাংলায় আমরা নিয়েছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কমপ্লেক্স, গ্ল্যাণ্ড উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সব শব্দের দ্বারা কতকগুলি বিশিষ্ট ধারণা সূচিত হচ্ছে যা বিশেষ একপ্রকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িত। ঐ শব্দগুলির বেশীর ভাগের সঙ্গেই বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের পরিচয় আছে। ঐ শব্দগুলিকে বাংলাশব্দ বলে গ্রহণ করলে বুঝতে আমাদের পক্ষে সহজ হবে, বাংলা ভাষারও সমৃদ্ধি বাড়বে। পরিভাষার বহু শব্দের জন্য গিরীন্দ্রশেখর বসু ও রাজশেখর বসুর কাছে আমরা ঋণী। তাঁদের কিছু কিছু শব্দ আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। বাংলায় যে সব মনোবিজ্ঞানের বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ব্যবহৃত পরিভাষাও কিছু আমরা কাজে লাগিয়েছি। সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে বাংলা পরিভাষা ও তার ইংরেজী প্রতিশব্দের একটি তালিকা যোগ করা হল।

সংশোধনী ঃ

২০৪ পাতায় যান্ত্রিক সামর্থ্যের চিহ্ন k'র স্থলে m হবে।

২১৬ পাতায় দ্বিতীয় পংক্তির পঞ্চম লাইনে 'বিদ্যাবুদ্ধির' স্থলে হবে—'বিদ্যা'।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১

শিক্ষা ও মনোবিদ্যা

শিক্ষাদান শিক্ষক ও শিক্ষিকার কাজ। রামবাবু সংস্কৃত পড়ান। লতিকা দেবী বাংলা পড়ান। শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে দুজনেরই সুনাম আছে। সংস্কৃত বিষয়ে রামবাবুর ব্যুৎপত্তি আছে, তেমনি বাংলা সম্বন্ধে লতিকা দেবীর যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। ভালো শিক্ষক শিক্ষিকা হতে গেলে বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট অধিকার থাকা দরকার। কিন্তু এইটুকুই কি যথেষ্ট? যাদের নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাজ তাদের বোঝা কি শিক্ষক শিক্ষিকাদের দরকার নয়? বিষয় ভালো জেনেও অনেক সময় শিক্ষায় ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহ আমরা জাগাতে পারি না। কিম্বা হয়ত না বুঝে এমন উচ্চমানে পড়ান আরম্ভ করি যে ছাত্র ছাত্রীরা কিছু বুঝতেই পারে না। অতএব এ কথা বলা চলে, শিক্ষাদান কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে বিষয় সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান থাকা দরকার, তেমনি ছাত্র ছাত্রীর মনের খবর জানা আবশ্যক।

শিক্ষাকাজটিকে বিশ্লেষণ করলে তার তিনটি অংশ আমাদের চোখে পড়ে। শিক্ষক—বিষয়—শিক্ষার্থী। শিক্ষক বিষয়কে জানবেন এবং জানাবেন শিক্ষার্থীকে। শিক্ষাদান সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে কিনা সে বিচারের কষ্টিপাথর হচ্ছে—শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাহায্য ও অনুপ্রেরণার ফলে সত্যি করেই শিখছে কিনা। অনেক সময় এমন দেখা যায় শিক্ষক পড়াচ্ছেন, শিক্ষার্থী শুনছে না। শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ এই দুটি জিনিষ সর্বতোভাবে এক নয়। ঘোড়াকে জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেই সে জল খাবে এমন মানে নেই। দেখতে হবে সে তৃষ্ণার্ত কিনা, জল খাবার প্রয়োজন সে নিজে অনুভব করছে কিনা। শিক্ষা ব্যাপারে তেমনি শিক্ষার্থীর একটি দিক আছে। শিক্ষার সাফল্যের জন্যে শিক্ষার্থীর দিকটির প্রতি সবিশেষ নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীকে জানতে হবে—শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রয়োজনকে, শিক্ষার্থীর আগ্রহকে, শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অক্ষমতাকে।

শিক্ষার্থীর—তথা মানুষের মনের পরিচয়কে মনোবিদ্যা বলা হয়। শিক্ষায় মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। প্রথমতঃ শিক্ষার দুটি দিকের কথা বলা যাক। এক, শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। দুই, শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষার্থীর পূর্ণতম দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধনকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে অনেকে মনে করেন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কি কি বিষয় শিক্ষার্থীর শেখা দরকার সেই বিবেচনা শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। দেহ ও মনের পূর্ণতম বিকাশকে যদি শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলা যায়—পাঠক্রম আয়ত্ত করাকে শিক্ষার নিকটবর্তী লক্ষ্য বলা যেতে পারে। দেহ-মনের পূর্ণ বিকাশের জন্য পাঠক্রম আয়ত্ত করা দরকার। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে পাঠক্রমকে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়ও বলা চলে। কেমন ভাবে, কোন পদ্ধতি অনুসারে শিখলে ঐ পাঠক্রম সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করা ও দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশ লাভ করা সম্ভব—এ প্রশ্নটি শিক্ষাপদ্ধতির আলোচ্য বিষয়।

শিক্ষায় মনোবিদ্যার স্থান।

শিক্ষাপদ্ধতিতে মনোবিদ্যার স্থান অনেকখানি। কি ভাবে এবং কোন সময়ে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিশুমনের কাছে উপস্থাপন করলে শিশু সেটিকে গ্রহণ করতে পারবে এবং গ্রহণে আগ্রহশীল হবে এটা জানতে হলে শিশুমনের স্বরূপকে বোঝা দরকার। কাজের মাধ্যমে শিক্ষার কথা আজকাল খুব শোনা যায়। শিশু কাজ করতে ভালবাসে। কিছু বানাতে, কিছু গড়তে যে কাজের দরকার—সে কাজের প্রতি তার অনেকখানি অনুরাগ। কাজটিকে সম্পূর্ণ করতে হলে জ্ঞানের দরকার। কাজের সঙ্গে জ্ঞানের একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আছে। কাজ সম্পর্কিত জ্ঞানলাভে শিশু সাধারণতঃ আগ্রহশীল হবে। ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর সমস্যা নিয়ে শিক্ষককে বিব্রত হতে হবে না। খেলার প্রতি শিশুর আগ্রহের কথা ধরা যাক। খেলা শৈশব জীবনের সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। খেলার প্রয়োজন শিশুর জীবনে অনেকখানি। খেলার মাধ্যমে শিক্ষার কথা এজন্যই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মুখে শোনা যায়। খেলার শক্তি ও প্রেরণাকে শিক্ষার কাজে লাগালে সোনা ফলান যায়—শিক্ষাবিদ্‌রা এটা দেখতে পেয়েছেন।

শিক্ষাপদ্ধতি ও মনোবিদ্যা।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা।

খেলার মাধ্যমে শিক্ষা

অধিকাংশ সময়ে শিক্ষা ব্যাপারে শিশুর আগ্রহের অভাবের কারণ হচ্ছে—

শিক্ষা তার জীবনকে স্পর্শ করে না। শিশু বুঝতে পারেনা—তার জীবনে আদৌ লেখাপড়ার কোন দরকার আছে। 'ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগবে', 'লেখাপড়া না করলে বড় হয়ে খাবে কি'—এই সব উক্তি বড় ছেলেমেয়েরা হয়তো কিছু বোঝে। ছোটদের ঐ কথা উদ্বিগ্ন করে, কিন্তু লেখাপড়ায় তাদের আগ্রহকে জাগ্রত করতে পারে না। শিশু নিত্য বর্তমানে বাস করে। বর্তমান জীবনের প্রয়োজনই তার কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। শিক্ষাকে কার্যকরী করতে গেলে বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে। যে প্রয়োজনকে শিশু নিজের প্রয়োজন বলে অনুভব করে—সেই প্রয়োজনকে বিস্তৃত করা, ব্যাপকতর করা, সাধ্যমত উন্নীত করাই শিক্ষার লক্ষ্য।

জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা

একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি কিছু স্পষ্ট হবে। ছোট ছোট মেয়েরা পুতুল খেলতে ভালবাসে। জীবনে যা তারা দেখে—পুতুল খেলাতে তাই তারা রূপ দেবার চেষ্টা করে। পুতুল খেলার প্রয়োজনকে সুষ্ঠুভাবে চরিতার্থ করবার জন্য জীবনকে আরও বেশী, আরও সঠিকরূপে দেখতে, জানতে তাদের উৎসাহকে বাড়ানো যেতে পারে। পুতুলের বিয়েতে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করা, খাওয়া দাওয়ার জন্য হিসেব করে খরচ করা প্রভৃতি শিক্ষামূলক কাজে তাদের আগ্রহের অভাব হয় না। শিক্ষিকার অনুপ্রেরণার দ্বারা তাদের খেলার প্রয়োজন বিস্তৃত ও উন্নীত করা আবশ্যক।

শিক্ষার সার্থকতার জন্য যেমন শিশুর ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা জানা দরকার, তেমনি জানা আবশ্যক শিশুর সামর্থ্যের কথা। লেখাপড়া শেখবার জন্য সর্বাগ্রে দরকার বুদ্ধির। পাঠ্য বিষয়ে কোনোটা শিখতে বেশী বুদ্ধি দরকার, কোনোটা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধি হলেও শেখা সম্ভব। বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের চোদ্দ থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। বুদ্ধি ব্যাপারে ব্যক্তিগত পার্থক্যও রয়েছে। সকলের পক্ষে সব কিছু শেখা সম্ভব নয়। একজনের পক্ষে এক বয়সে যা শেখা সম্ভব অন্য বয়সে তা শেখা সম্ভব নয়। বুদ্ধির পরেই আসে স্মৃতিশক্তির কথা, বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য ও প্রতিভার কথা। সঙ্গীতের প্রতিভা যার আছে সঙ্গীত শেখা তার পক্ষেই সম্ভব।

সামর্থ্যানুযায়ী শিক্ষা

শিক্ষার সঙ্গে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের একটি অন্তরঙ্গ যোগ আছে।

স্বাভাবিক বিকাশের দ্বারা শিশুর দেহ ও মন একটি পর্যায়ে না পৌছান পর্যন্ত শিক্ষা সম্ভব হয়না। একে 'শিক্ষার প্রস্তুতি' বলা যেতে পারে।

স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষা

কোন বয়সে শিশু কি শিখতে পারে এটা জানা দরকার। বীজগণিত একটি দরকারী বিষয়। কিন্তু সেই দরকারী বিষয়টি একটি সাত বছরের ছেলেকে শেখাতে চাইলেও সে শিখতে পারবেনা। শেখবার মানসিক প্রস্তুতি তার তখনও হয়নি। শিশুর বড় হবার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য কি—এটা শিক্ষানীতি বা শিক্ষাদর্শনের আলোচ্য বিষয়। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এটা বুঝতে গেলে আমাদের তাকাতে হয় মানুষের জীবন-দর্শনের দিকে, সমসাময়িক সমাজতত্ত্বের দিকে। জীবনের লক্ষ্য ও শিক্ষার লক্ষ্য মূলতঃ এক। ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বড় সত্য। ইংরেজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ পার্সি নান্ সে কারণেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্যস্থল বলেছেন। রাষ্ট্রই ছিল নাৎসি একাধিপত্যের সবচেয়ে বড় কথা। সেই কারণেই সৈনিক-জনোচিত আনুগত্য, সামাজিক সামঞ্জস্য সাধনই ছিল নাৎসি জার্মানীতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিদ্যা।

রস্ (১) মনে করেন শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে এ সম্বন্ধে মনোবিদ্যার বলবার কিছু নেই। এ কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া কঠিন। সুখী হওয়া জীবনের একটি লক্ষ্য। কিন্তু কেন? কারণ আমরা সুখী হতে চাই, অসুখী হতে চাই না। মনের প্রবল ও গভীর প্রেরণাগুলিকে আশ্রয় করে মানুষের জীবনদর্শন গড়ে উঠে। দর্শনের সঙ্গে মনোবিদ্যার যোগ আছে বৈকি।

শিক্ষার 'নিকটবর্তী লক্ষ্য' নিরূপণে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক্রম নির্বাচন ব্যাপারে মনোবিদ্যার স্থান আরও স্পষ্ট। কোন বয়সের ছেলেমেয়েরা কতটুকু শিখতে পারে—তাদের পাঠক্রম স্থির করতে এটা স্মরণ রাখা দরকার। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবার ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। কে কতটুকু শিখতে পারে জানবার পরেই কাকে কতটুকু শিখতে বলব, কার কাছ থেকে কতখানি আশা করব এটা ঠিক করা সম্ভব।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশকে গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করা হয়। মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, শিক্ষায় তারই বিকাশ দরকার।

পরিবেশের অনুকূল প্রভাবের দ্বারাই এ বিকাশ সম্ভব। কিন্তু সম্ভাবনাটি কি—আগে তা আমাদের জানতে হবে। বিভিন্ন মানুষের সম্ভাবনার মধ্যে কিছু ঐক্য আছে, কিছু পার্থক্য আছে। মানুষ হিসাবে রাম ও শ্যামের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও রাম ও শ্যামের মধ্যে গুরুতর ব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে। একই ছাঁচে দুজনকে মানুষ করতে চাইলে ভুল হবে। আমরা চাইব, রাম পরিপূর্ণ রাম হয়ে বড় হয়ে উঠুক, শ্যাম হোক পরিপূর্ণ শ্যাম। সে জন্য রাম ও শ্যামকে, তাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতাকে, তাদের প্রেরণা ও প্রবণতাকে, এককথায় তাদের সম্ভাবনাকে আমাদের জানতে হবে।

শিক্ষা-সাফল্যের পরিমাপ ও মনোবিদ্যা

কে কতটুকু শিখল পরীক্ষার সাহায্যে এটা শিক্ষাবিদ্‌রা পরিমাপ করবার চেষ্টা করেন। পরীক্ষায় কেউ ভাল নম্বর পায়, কেউ পায় না। কেউ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে, কেউ শুধু পাশ করে এবং কেউ কেউ ফেলও করে। পরীক্ষা ব্যাপারেও মনোবিদ্যার কিছু বলবার আছে। একবয়স বা এক শ্রেণীতে পড়ে এমন শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্য একটি নিয়মে বিন্যস্ত হয়।* পরীক্ষা যদি শিশুমনের উপযোগী, হয় তবে পরীক্ষার ফলাফলের বিন্যাসে সেই নিয়মটি আমরা দেখতে পাব। পরীক্ষার সত্যতা বা যাথার্থ্যও বাড়বে। শিশুর শক্তিসামর্থ্য জেনেই শিশুর উপযোগী প্রশ্নপত্র রচনা সম্ভব।

মনোবিদ্যা কি?

শিক্ষায় মনোবিদ্যার স্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। কিন্তু মনোবিদ্যা কি? মনের প্রকৃতি জানবার চেষ্টাকে সহজ ভাষায় মনোবিদ্যা বলা যেতে পারে। মানসিক ঘটনা বা অভিজ্ঞতা মনের একটি বড় অংশ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগৎকে জানি। কিন্তু নিজের মানসিক ঘটনাকে প্রত্যেকে সোজাসুজি জানতে পারে। 'আমার **ক্ষিধে পেয়েছে**', 'আমার **রাগ হয়েছে**', 'আমি গোলাপ ফুলটিকে **দেখছি**'—এটা আমি জানতে পারি আমার অন্তর্দর্শনের সাহায্যে। কেবলমাত্র নিজের মনের ঘটনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগ আছে। অন্যের মনে কি ঘটছে—জানতে হলে আমাকে অনুমিতি বা অনুমানের সাহায্য নিতে হয়। আমার রাগ হলে আমার চোখ লাল হয়ে ওঠে, ভুরু কোঁচকাই, মুখ গম্ভীর হয়। সেদিন

---

* ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বুদ্ধিপরীক্ষা এবং পরিসংখ্যান—এই দুটি অধ্যায় দেখুন।

সমীরের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটির পর দেখলাম তার চোখ লাল হয়ে উঠল, সে ভুরু কোঁচকাল ও তার মুখ গম্ভীর হল। অনুমান করলাম তার রাগ হয়েছে।

মানসিক ক্রিয়া বা ঘটনাকে তিন প্রকারে ভাগ করা চলে। (১) জ্ঞান (২) অনুভূতি ও (৩) ইচ্ছা।

মানসিক ক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা তিনপ্রকারের: জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা।

জ্ঞান—শিশু বল **দেখছে**। আরতি দার্জিলিংএর কথা **ভাবছে**। এসব দেখা, ভাবা হচ্ছে জ্ঞানজাতীয় মানসিক ক্রিয়া।

অনুভূতি—লাল গোলাপটি কবিমনকে **মুগ্ধ করেছে**। ছেলেটি কুকুর দেখে **ভয় পেয়েছে**। অনেকদিন পর ছেলেকে দেখে মা **খুশী হয়েছেন**। মুগ্ধ হওয়া, ভয় পাওয়া, খুশী হওয়া—এসব হচ্ছে ব্যাপক অর্থে অনুভূতি। ব্যাপক অর্থে অনুভূতির আবার দুটি বিভাগ আছে। ১। সঙ্কীর্ণ অর্থে অনুভূতি ২। আবেগ। ভাললাগা ও ভাল না লাগা—এ দুটি হচ্ছে সঙ্কীর্ণ অর্থে অনুভূতি। ভয়, রাগ, ক্ষুধা, লালসা ইত্যাদি হচ্ছে আবেগ।

ইচ্ছা—শিশুটির সন্দেশ খেতে ইচ্ছা করছে। কাঠুরিয়া কাঠ কাটছে। রবীন বাবু পড়াচ্ছেন। এসব অভিজ্ঞতা বা কর্মে ইচ্ছার দিকটি স্পষ্ট। কাঠ কাটতে চাইছে বলেই কাঠুরিয়া কাঠ কাটছে। ইচ্ছা ও কর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কর্ম ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ।

মানসিক ঘটনা বা ক্রিয়াকে অভিজ্ঞতা বলা চলে। অভিজ্ঞতাকেও ওভাবে তিন ভাগ করে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে কোন অভিজ্ঞতাই নিরবচ্ছিন্নরূপে জ্ঞান, অনুভূতি বা ইচ্ছা হতে পারে না। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা—সবই আছে। শিশু একটি বল দেখছে। এই অভিজ্ঞতাটির কথা আলোচনা করা যাক। নিশ্চয়ই বলটি দেখতে তার ভাল লাগছে কিম্বা খারাপ লাগছে। বলটি হয়ত পেতে তার ইচ্ছা করছে। অন্তত বলটি তার দেখতে ইচ্ছা করছে। সেইজন্যই সে বলটিকে দেখছে। সংক্ষেপে, জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা এ সবেরই সমাবেশ ঐ অভিজ্ঞতায় রয়েছে। তবে দেখাটা, অর্থাৎ জ্ঞানের দিকটা প্রধান। অনুভূতি বা ইচ্ছার দিকটা অত প্রবল নয়। সেইজন্য এই

অভিজ্ঞতাকে জ্ঞান জাতীয় অভিজ্ঞতা বলা হচ্ছে। লাল গোলাপটি কবি মনকে মুগ্ধ করছে। কবি ফুলটি দেখছেন এবং দেখতে চাইছেন। কিন্তু অনুভূতির দিকটা এ অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে প্রবল। এজন্যই একে অনুভূতি প্রধান অভিজ্ঞতা বলা হল। কাঠ কাটতে হলে কাঠুরিয়াকে কাঠ দেখতে হবে। কাঠ কাটতে তার নিশ্চয়ই কিছু অনুভূতি হচ্ছে। কাজের মধ্যে ইচ্ছার দিকটা প্রধান হলেও জ্ঞান ও অনুভূতির দিকটাও উপেক্ষার নয়।

মন ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য কি? জড়ের চেতনা নেই, মনের চেতনা আছে। মনের প্রকাশমান দিককে চেতনা বলে অনেকে মনে করেন। চেতনা কি? এটা বাস্তবিকই একটি কঠিন প্রশ্ন। জ্ঞান, ইচ্ছা বা অনুভূতি সবই চেতনার দৃষ্টান্ত একথা বলা যেতে পারে। এগুলিকে মানসিক ক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা বললেও দোষ হয় না।

মনের স্বরূপ

শিশু বল দেখছে। জ্ঞানের বা চেতনার এই দৃষ্টান্তটি নেওয়া যাক। দৃষ্টান্তটি বিশ্লেষণ করলে এর তিনটি অংশ দেখতে পাওয়া যায়—কর্তা অর্থাৎ শিশু, বস্তু বা বিষয়—(ব্যাকরণের ভাষায় কর্ম) অর্থাৎ বল এবং মনস্তাত্ত্বিক সম্বন্ধ (ব্যাকরণের ভাষায় ক্রিয়া) অর্থাৎ দেখছে। ইচ্ছা বা অনুভূতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব। চেতনা কি—এ সম্বন্ধে ড্রিভার (২) লিখেছেন—"একটি জীবের জীবনধারা ও পরিবেশ থেকে উদ্ভূত ভৌত ধারার এক অনন্য জাতীয় সংশ্লেষণ বা সমগ্রীকরণকে চেতনাধারা বলা যেতে পারে।" বল দেখার ভিতর দিয়ে শিশু **বলটি** সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। কিন্তু সে **দেখছে**—বেশীর ভাগ সময়েই এ জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে সে লাভ করে। এ ছাড়া সে **নিজে** দেখছে—সেই অভিজ্ঞতা যে তার হচ্ছে এটাও অনেক সময়ে সে জানে। বলটিকে জানার জন্য পঞ্চেন্দ্রিয় তাকে সাহায্য করে। কিন্তু সে **দেখছে** এবং **নিজে** দেখছে—নিজের মানসিক ঘটনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে এ তথ্য তার গোচরীভূত হয়। একে বলে অন্তর্দর্শন।

অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ

অন্তর্দর্শন

বস্তু বা বিষয়হীন অভিজ্ঞতা বা চেতনা সম্ভব কিনা—এ নিয়ে কিছু মতানৈক্য আছে। দু' এক মাসের শিশুর ভালো লাগছে। শিশু হাসছে। কেউ কেউ একে বস্তু বা বিষয় সম্পর্কহীন বলে মনে করেন। শিশু সুস্পষ্ট-ভাবে সচেতন না হলেও বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক আছে অন্য পক্ষের আবার এই ধারণা। ভোরের আলো ঘরে এসে পড়েছে।

বিষয়হীন অভিজ্ঞতা

শিশুর তাই ভাল লাগছে কিম্বা শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছে—তাই সে খুশী ; সে হাসছে।

কিন্তু কর্তা ছাড়া কোন চেতনা বা অভিজ্ঞতা সম্ভব নয় ; এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। অভিজ্ঞতার কর্তা হচ্ছে ব্যক্তি বা ব্যক্তির অহম্। সে নিজেকে বলছে—'আমি'। সেই আমি জগতকে জানছে, নিজেকে জানছে, চলাফেরা করছে।

অহম্

কিন্তু ব্যক্তির জীবনে এমন অভিজ্ঞতাও ঘটে, যেগুলিকে ব্যক্তির 'আমি' নিজের অভিজ্ঞতা বলে স্বীকার করবে না। তবু সেগুলি যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা হল। সম্মোহিত ব্যক্তিকে যা বলা যায় প্রায় তাই সে করে। সহজেই হাস্যকর রূপে তার বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়—সম্মোহন যারা দেখেছেন—তারাই তা জানেন। সম্মোহিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেবার ঠিক পূর্বে বলা হল,—"এক ঘণ্টা পর তুমি ঘরের দরজটা বন্ধ করে দিও।" সে রাজী হল। জাগাবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—একঘণ্টা পর তার করণীয় কিছু আছে কিনা। সম্মোহন যদি গভীর হয়ে থাকে, সে কিছুই স্মরণ করতে পারবে না। কিন্তু একঘণ্টা বা কাছাকাছি সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কেন বন্ধ করলে, হয়ত সে ভেবে বলবে—"হাওয়া আসছিল, তাই দরজা বন্ধ করলাম।" বন্ধ করবার আসল কারণটি তার সচেতন মন বা ব্যক্তির অহম্ জানে না। কাজের একটি মনগড়া কারণ সে উদ্ভাবন করল। একে মনোবিদ্যায় বলা হয়—যুক্তি উদ্ভাবন।* প্রশ্ন এই—সত্যিকার কারণটি জানে কে ? কেই বা সময়ের হিসেব রাখছিল ? ব্যক্তির অহম্ নয়। মনের অন্য কোন অংশ। ব্যক্তিকে পুনরায় সম্মোহিত করে—সে অংশটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে জানা যায় যে সময়ের হিসেব সে রাখছিল। দরজা বন্ধ করার কারণও সেই জানে। মনের এই অংশকে (একাধিক এমন অংশ থাকতে পারে) ম্যাকডুগাল উপ-অহম্ বলেছেন। ব্যক্তির সচেতন অহম্

যুক্তি উদ্ভাবন

* ইংরেজিতে একে বলে 'rationalisation.' আমাদের কাজে কর্মে যুক্তি উদ্ভাবনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। পীড়নেচ্ছায় শিশুকে বড়োরা অনেক সময় পীড়ন করেন। কিন্তু সে সত্য নিজের কাছে স্বীকার করা কঠিন বলে—মনে করেন—শিশু দুষ্ট বলে শিশুকে তারা পীড়ন করছেন, পীড়নের দ্বারা শিশুর ভালো হবে ইত্যাদি।

এর দিক থেকে বিচার করলে একে নির্জ্ঞান * মন বলা চলে। এদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে অহম্ সচেতন নয়। অহম্ এদের না জানলেও এদের চেতনা নেই এ কথা বলা চলেনা। মানসিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য চেতনা। মানসিক ক্রিয়ারূপে সে চেতনা এদের রয়েছে। বাইরে থেকে তাকিয়ে মনের সবটুকু যদি কেউ দেখতে পেতেন তবে তিনি দেখতেন—অহম্ এর চেতনা-স্রোতের পাশাপাশি উপ-অহম্‌দের চেতনা-স্রোত বয়ে চলেছে। মর্টন প্রিন্সের (৩) ভাষায় এদের 'সহজ্ঞ' বলা চলে। অহম্-এর দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য উপ-অহম্‌দের চেতনা নেই। কারণ অহম্ উপ-অহম্‌দের খবর রাখে না—রাখতে চায় না।

উপ-অহম্

সহজ্ঞ

অহম্ যে মনের কর্তা তাকে প্রধানতঃ সচেতন মন বলা চলে। উপ-অহম্‌দের সঙ্গে যোগ হচ্ছে নির্জ্ঞান মনের। অহমের বহির্ভূত বলে ফ্রয়েড এদের 'ইদম্' বলেছেন। সে মনের ক্রিয়া আছে, কল্পনা আছে, ইচ্ছা আছে। মনের বৃহৎ অংশই নির্জ্ঞান। অনেকের ধারণা মনের নয় দশমাংশ হচ্ছে নির্জ্ঞান, আর এক দশমাংশ হচ্ছে সচেতন মন।

ইদম্

ইদম্‌কে নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছার বাহক বা সমষ্টি বলা যেতে পারে। এইসব ইচ্ছাকে অহম্ জানে না, অহম্ নিজের বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। এমন ইচ্ছা মনে আছে—এ কথা স্মরণ করতে পর্যন্ত ব্যক্তি নিজেকে লজ্জিত ও অপরাধী মনে করে। প্রত্যেক ছেলের মধ্যেই পিতার মৃত্যু ইচ্ছা আছে বলে মনঃসমীক্ষা মনে করে। কিন্তু যে সামাজিক নীতি 'পিতাকে শ্রদ্ধা কর' শেখায় সে নীতিকেও সে গ্রহণ করেছে। পিতাকে সে ভালোও বাসে। অমন দুটি পরস্পর বিরোধী ভাবকে একসঙ্গে

নির্জ্ঞান

* একে অবশ্য নির্জ্ঞান বলা হবে কিনা এটি একটি প্রশ্ন। যে সব মানসিক কার্যাবলী সচেতন নয়—তাদের দুইভাগে ভাগ করা চলে। আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান। মনের সক্রিয় বাধার জন্যই—কোন কোন ইচ্ছা সচেতন হতে পারেনা। তাদের রূপটি নির্জ্ঞান থাকে। অন্যপক্ষে, কোন কোন ইচ্ছা কোন এক সময়ে সচেতন নয়—সেসব ইচ্ছাকে আসংজ্ঞান ইচ্ছা বলা হয়েছে। মনের কোন সক্রিয় শক্তির এদের সচেতন মন থেকে দূরে ঠেলে রাখছে না। অবস্থা বিশেষে এদের সচেতন হতে কোন বাধাও নেই। উপরোক্ত ইচ্ছা সহজভাবে সচেতনে আসতে পারছে না, কোথাও কোন বাধা আছে। এজন্য ঐ ইচ্ছাকে নির্জ্ঞান বলাই সঙ্গত হবে।

সচেতন মনে রাখা ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশজনক। তাই ব্যক্তি একটি ইচ্ছাকে, সাধারণতঃ বৈর ইচ্ছাটিকে অবদমিত করে। নির্জ্ঞান মনের অংশরূপে সেটি বিরাজ করে। অবদমনকে 'সক্রিয় বিস্মৃতি' বলা যেতে পারে। কোন ইচ্ছার কাছ থেকে 'মানসিক পলায়নের' সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে। সে ইচ্ছাটা আমি পোষণ করি এটা ভাবতেও লজ্জা, অপমান ও অপরাধবোধের সীমা থাকে না। তাই সে সব ইচ্ছাকে ভুলে বাঁচবার চেষ্টা করি। এই পদ্ধতিই হচ্ছে অবদমনের পদ্ধতি।

অবদমন

নির্জ্ঞান মন নিষ্ক্রিয় নয়। সক্রিয়তা প্রত্যেকটি ইচ্ছার ধর্ম। সচেতন মন ও কর্মেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে নিজেকে চরিতার্থ করতে নিয়ত সে চেষ্টা করে। ঐ জাতীয় ইচ্ছাকে যে সচেতন মন অবদমিত করেছে—সেই মনই সর্বদা সতর্ক থাকে যাতে সেই ইচ্ছা সচেতন হয়ে নিজেকে পরিতৃপ্ত না করতে পারে। মন একটি ভাবময় 'প্রহরী' খাড়া রাখে; সে প্রত্যেকটি ইচ্ছাকে পরীক্ষা করে সচেতন মনে প্রবেশের অনুমতি দেয়। একে অনেক সময় 'মানসিক বাধাও' বলা হয়।

প্রহরী বা মানসিক বাধা

সংক্ষেপে বলতে হয়—সচেতন মনের বাধা ও বিরোধিতার জন্যই মনের বৃহত্তম অংশটি নির্জ্ঞান রূপে থাকে।

সচেতন মন ও নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া বা কার্যকলাপ আমরা বর্ণনা করলাম। অভিজ্ঞতা বা ক্রিয়া এদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানসিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে মনের স্থায়ী গঠন। ভীরু স্বভাবের লোক সামান্য কারণে ভয় পায়। মায়ের মেজাজটি ভালো নয়। তিনি ছেলেকে প্রায়ই মারধোর করেন। লোকটির 'ভীরু স্বভাব', মায়ের 'খারাপ মেজাজ'—এ সব হচ্ছে মানসিক গঠনের অংশ। ব্যক্তির ভীতি বা মায়ের ক্রুদ্ধ আচরণের মূলে রয়েছে তাদের মানসিক গঠন।

মানসিক ক্রিয়া ও মানসিক গঠন

মানুষের আচরণ থেকে তার মানসিক গঠনের স্বরূপটি আমরা অনুমান করি। কিন্তু মানসিক গঠন অভিজ্ঞতা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করলেও—তা কখনও সচেতন হতে পারে না।*

* ঐ কারণে কিছু কিছু মনোবিদ্ 'নির্জ্ঞান' শব্দটি মানসিক গঠনের বেলাতে প্রয়োগ করেন। এদের মতে যা সচেতন নয় এবং যা কোন প্রকারেই সচেতন হতে পারে না, সেইটাই হচ্ছে নির্জ্ঞান। ফ্রয়েড নির্জ্ঞান বলেছেন এমন কোনো নির্জ্ঞান ইচ্ছার পক্ষে, মানসিকবাধা দূর হলে সচেতন

মনের স্থায়ী গঠনকে দুইভাগে ভাগ করা চলে—সহজাত ও অর্জিত। সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও মানস প্রকৃতি—সহজাত অংশের বিভাগ; ভাবগ্রন্থি, চরিত্র ও ব্যক্তিতা—অর্জিত অংশের বিভাগ। অবশ্য সহজাত মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রেরণা সমূহকে ভিত্তি করেই অর্জিত মানসিক গঠন রূপ নেয়। এ সম্বন্ধে পর পর কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করব।

হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে সচেতন করাই মনঃসমীক্ষার কাজ। প্রথমোক্ত মনোবিদ্‌রা ঐ ধরণের ইচ্ছাকে 'অবচেতন ইচ্ছা' বলার পক্ষপাতী।

অধ্যায় ২

সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেরণা

জীবের সঙ্গে পরিবেশের নিত্য ঘাত প্রতিঘাতই হচ্ছে জীবন। আপন কর্ম দিয়ে জীব পরিবেশকে পরিবর্তন করে এবং পরিবেশ থেকে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

জীব ও পরিবেশ।

একটি লাল বল। বলটি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শিশু দেখল। শিশুর অভিজ্ঞতা লাভ হল। অপর পক্ষে গাছে একটি আম ঝুলছে। আঁকশি দিয়ে একটি ছেলে আমটিকে পাড়ল। গাছের আম মাটিতে এসে পড়ল। পরিবেশে পরিবর্তন সাধিত হল। কর্ম ও অভিজ্ঞতায় এই যে পার্থক্য—এটা কিছুটা স্থূল। শিশু বলটিকে দেখল। এটাও একটি কর্ম। কেবল মাত্র বলা যেতে পারে জ্ঞানের দিকটা এতে বেশী। আঁকশি দিয়ে আম পাড়ার মধ্যেও অভিজ্ঞতা অর্জন রয়েছে—যদিও দৈহিক ও মানসিক কর্মের দিকটা এতে বেশী প্রবল।

কর্ম ও অভিজ্ঞতা অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত। ওই দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানসিক ঘটনা নয়। যে মানসিক ঘটনায় জ্ঞানের দিকটা বড়—তাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলি। যে মানসিক ঘটনায় জীবের সক্রিয় ভাবটা প্রবল—তাকে আমরা কর্ম বলি।

কর্ম ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জীব ও জগতের নিত্য যোগাযোগ ঘটছে। এ যোগাযোগকে একটি সম্বন্ধ বলা চলে—জীব ও পরিবেশের সম্বন্ধ। পরিবেশের কোন একটি অংশ বা ঘটনা মনকে আকৃষ্ট করে বা উদ্দীপ্ত করে। সে কারণে তাকে 'উদ্দীপক' বলা যেতে পারে। পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে জীব 'আচরণ' করে।

উদ্দীপক ও আচরণ বা প্রতিক্রিয়া

পূর্বের দৃষ্টান্তটি আবার নেওয়া যায়। একটি লাল বল শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট করল। লাল বলটি শিশু মনের 'উদ্দীপক'। শিশু বলটি দেখল। হাত বাড়িয়ে বলটি নেবার চেষ্টা করল। শিশুর দেখা, হাত বাড়িয়ে বলটি নেবার

চেষ্টা—শিশুর 'আচরণ'। এ আচরণকে উদ্দীপকের 'প্রতিক্রিয়া'ও বলা যেতে পারে।

শিশু বল দেখলে বল নেবার চেষ্টা করে, বিড়াল ইঁদুর দেখলে তাকে শিকার করে খাবার জন্যে উদ্যোগী হয়, ইঁদুর বিড়াল দেখলে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেন? উত্তর হবে নিজেদের প্রয়োজনেই ওরা অমন আচরণ করে। শিশুর খেলার প্রয়োজন, বিড়ালের আহারের প্রয়োজন ও ইঁদুরের আত্মরক্ষার প্রয়োজন ওদের ওই আচরণের কারণ।

উদ্দীপক—জীব প্রকৃতি—আচরণ।

একটি ইঁদুর বিড়ালের কাছে যা, অন্য একটি ইঁদুরের কাছে তা নয়। বিড়ালের কাছে ইঁদুর নামক উদ্দীপকের অর্থ কি, তার ঐরূপ আবেদন কেন তা বুঝতে হলে তাকাতে হবে বিড়ালের প্রয়োজন ও প্রকৃতির দিকে। কেবলমাত্র উদ্দীপকের স্বরূপ দ্বারা জীবের আচরণের বৈচিত্র্য বোঝা সম্ভব নয়। উদ্দীপক—আচরণ (প্রতিক্রিয়া) সূত্রের দ্বারা সবটুকু প্রকাশ হয় না বলে উডওয়ার্থ উদ্দীপক—জীব—আচরণ (প্রতিক্রিয়া) এ সূত্রটি প্রস্তাব করেছেন। কোনো একটি উদ্দীপকের আবেদনে জীবের আচরণ কি হবে নির্ভর করে—(ক) জীবের স্থায়ী মানসিক প্রকৃতির উপর ও (খ) জীবের তখনকার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর।

সহজাত ও অর্জিত প্রয়োজন।

যে প্রয়োজনের তাগিদে জীব কাজ করে তাকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা চলে : সহজাত ও অর্জিত বা অভিজ্ঞতা লব্ধ। সহজাত অর্থে আমরা মনে করি জন্ম থেকে যা জীবের আছে এবং স্বাভাবিক বিকাশের ফলে (যেসব বিকাশে অভিজ্ঞতার স্থান নেই কিম্বা অল্প আছে) যে সকল প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে। শিশুর স্তন্য পানের প্রয়োজন প্রথম থেকেই দেখা যায়। যৌবনে যৌন ইচ্ছা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই দুইটিই সহজাত প্রেরণা। ছেলেরা ডাক টিকিট সংগ্রহ করতে ভালবাসে। এটিকে একটি অর্জিত বা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রয়োজন বলা যেতে পারে।

ম্যাকডুগাল প্রমুখ একদল মনোবিদ্ জীবের সহজাত প্রেরণা ও প্রয়োজনকে বড় করে দেখেছেন। তাঁদের মতে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রয়োজনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার মূলে রয়েছে এক কিম্বা একাধিক সহজাত প্রয়োজন। ডাকটিকিট সংগ্রহের দৃষ্টান্তই ধরা যাক। ম্যাকডুগালের মতে, সংগ্রহ করার একটি সহজাত প্রেরণা জীব প্রকৃতির একটি দিক। সে প্রেরণা

আছে বলেই কেউ ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, কেউ ঝিনুক কুড়ায়, কেউবা অর্থ সঞ্চয় করে।* ঐ জাতীয় সংগ্রহে পরিবেশের প্রভাব নেই—এ কথা ঠিক নয়। ডাকটিকিটের প্রচলন হয়নি তেমন আদিম সমাজে ডাকটিকিট সংগ্রহের প্রশ্ন ওঠে না।

সহজাত প্রয়োজনে অভিজ্ঞতার স্থান কতটুকু? খাওয়া মানুষের একটি সহজাত প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকের খাওয়ার পদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কেউবা কাঁটা চামচের সাহায্যে চেয়ার টেবিলে বসে খায়, কেউবা কাঠির সাহায্যে খায়, আর কেউবা আসনে বসে হাত দিয়ে খায়। কেউ নিরামিষাশী, কেউ মৎস্যাহারী, কেউ মাংসাশী। কেউ দিনে একবার খায়, কেউ তিনবার খায়, কেউ বা চারবার খায়। পার্থক্যটা প্রধানতঃ বাইরের। মূল কাজ অর্থাৎ খাওয়া—সেটা একই।

'সহজাত প্রবৃত্তি' কিম্বা 'ইনস্টিংট্' এ শব্দটি ম্যাকডুগাল জীবের সহজ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। মানুষ ও মানুষেতর জীবের কর্ম ও অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি।†

সহজাত প্রবৃত্তি

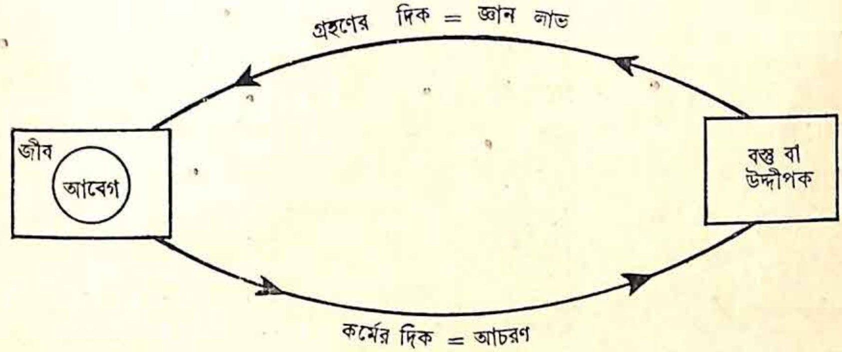
সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ম্যাকডুগাল বলেছেন যে সহজাত কিম্বা বংশগত মানসিক গঠনের বশে জীব কোন একটি বস্তু বা কোন এক জাতীয় বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেয়, সে বস্তুটিকে (কিম্বা সে জাতীয় বস্তু) প্রত্যক্ষ ক'রে এক প্রকার আবেগ ও উত্তেজনা অনুভব করে এবং সে বস্তুর (সে জাতীয় বস্তুর) প্রতি একধরণের কর্মের তাগিদ বা

* অর্থ সঞ্চয়ে সংগ্রহ মনোবৃত্তি ছাড়াও আরো কারণ আছে।

† উনবিংশ শতাব্দীতে একদল মনোবিদ্ মনে করতেন মানুষ কাজ করে বুদ্ধি দ্বারা ও মানুষেতর জীব কাজ করে সহজাত প্রবৃত্তির বশে। পাখী নীড় বাঁধে চিরদিন একই ভাবে। এটা ইনস্টিংট্। মানুষ বাড়ী বানায় নানা ভাবে। এর মূলে রয়েছে মানুষের বুদ্ধি। মানুষের বাড়ী নির্মাণের বৈচিত্র্যই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাড়ী নির্মাণের মূলে মানুষের নিজের ও নিজের সন্তানসন্ততির জন্য যে নিরাপত্তা ও আশ্রয় লিপ্সা রয়েছে সেটুকু তাঁরা দেখেন নি। বংশবৃদ্ধির প্রেরণায়, সন্তানের নিরাপত্তার জন্য পাখী নীড় বাঁধে। মানুষের বাড়ী বহুরকমের, পাখীর নীড় একরকম (যদিও সম্পূর্ণরূপে একথা সত্য নয়)। এটা বাইরের বিচার। আশ্রয় ও নিরাপত্তার তাগিদ মুখ্যতঃ একইরকমের। এইদিক দিয়ে পাখীর ও মানুষের কাজের সহজ প্রেরণার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

প্রেরণা বোধ করে—তাকে ইনস্টিংট্ বা সহজাত প্রবৃত্তি বলা চলে (১)। বাৎসল্য একটি সহজাত প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তিটি আছে বলে একটি অসহায় শিশুর উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাকে দেখলে আমাদের মনে একপ্রকার আবেগ (বাৎসল্য রস কিম্বা স্নেহ বলা যেতে পারে) জন্মায় ও তাকে আমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে ইচ্ছা করে।

সহজাত প্রবৃত্তি একদিকে জীবকে কোন বস্তুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভে প্ররোচিত করে; অপরদিকে সে বস্তুটির প্রতি কর্মের প্রেরণা যোগায়। একটি গ্রহণের দিক—জ্ঞানের দিক, অপরটি কর্মের দিক। কেন্দ্রস্থলে থাকে আবেগ। নীচের রেখাচিত্রে মানসিক পদ্ধতিটি অঙ্কিত হল ঃ



সহজাত প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা, আবেগ ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে অভিজ্ঞতা, কর্ম বা আবেগ বলা চলে না। একটি বিড়াল একটি ইঁদুরকে দেখল। তার মধ্যে একটি আবেগ সৃষ্টি হল। ইঁদুরটিকে শিকার করবার সে চেষ্টা করল। এই যে দেখা, আবেগ অনুভব করা, শিকার করবার চেষ্টা করা—এ সবই মুহূর্তের ঘটনা। এসব ঘটনা জীবের জীবনে ঘটে এবং অতীত হয়। কিন্তু এই সকল ঘটনার মূলে রয়েছে বিড়ালের শিকার প্রবৃত্তি। ঘটনাগুলি অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকার প্রবৃত্তিও অতীত হয় না। বিড়াল যতদিন বেঁচে থাকবে শিকার প্রবৃত্তি তার দেহমনের স্থায়ী অংশরূপে বিরাজ করবে।

প্রবৃত্তি দেহমনের গঠনের স্থায়ী অংশ

মানুষের চোদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে বলে ম্যাকডুগাল মনে করেন। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে একটি আবেগ (সঠিকরূপে বলতে গেলে আবেগের নিত্য সম্ভাবনা) অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত রয়েছে। নীচে তাদের তালিকা দেওয়া হল।

সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ

সহজাত প্রবৃত্তি	আবেগ	মন্তব্য
খাদ্য আকাঙ্ক্ষা	ক্ষুন্নিবৃত্তির আবেগ	সময় মত খাদ্য না পেলে জীব ক্ষুধা বোধ করে।
যৌনপ্রবৃত্তি	লালসা	
বাৎসল্য	স্নেহ	
আত্মপ্রতিষ্ঠা	পজেটিভ আত্ম-অনুভূতি বা আত্মপ্রসাদ	
আত্মনতি	নেগেটিভ আত্ম-অনুভূতি বা আত্মমোচনের আবেগ	
আবেদন	কষ্ট	
হাস্য	আমোদ	
যূথপ্রবৃত্তি	নিঃসঙ্গতা	যূথপ্রবৃত্তি তৃপ্তি না হলেই নিঃসঙ্গতাবোধ হয়। তৃপ্ত হলে একপ্রকার আবেগ ও আনন্দ হয়।
কৌতূহল	বিস্ময়	
গঠনপ্রবৃত্তি	গঠনপ্রবৃত্তির অনুভূতি	
সংগ্রহপ্রবৃত্তি	সংগ্রহপ্রবৃত্তির অনুভূতি	
পলায়ন	ভয়	
যোধন	ক্রোধ	
বিকর্ষণ	ঘৃণা, বিরক্তি	যেমন নোংরা কিছু মুখে পড়লে আমরা তাড়াতাড়ি তাকে বার করে ফেলি।

ঐ কয়টি সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া ম্যাকডুগাল কয়েকটি সহজাত সাধারণ প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। ক্রীড়া, সহানুভূতি, অনুকরণ ও অভিভাব (অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোন লোকের কথায় বিশ্বাসের প্রেরণা)। প্রবৃত্তি ও সাধারণ প্রেরণার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। একটি প্রবৃত্তিকে সক্রিয় করে বিশেষ একটি বস্তু বা একটি অবস্থা।

সহজাত সাধারণ প্রেরণা

যেমন, খাদ্য আকাঙ্ক্ষায় খাদ্য, যৌন-প্রবৃত্তিতে বাধা প্রভৃতি। কিন্তু সাধারণ প্রেরণার উদ্দীপনের কোন বিশেষ বস্তু বা অবস্থা নেই। নানা বস্তু ও নানা অবস্থা ঐ সব প্রেরণাকে জাগ্রত করে। সাধারণ প্রেরণার মধ্য দিয়ে অন্যান্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। খেলার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক খেলা আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে, রূপান্তরিত যোধন প্রবৃত্তিকেও। খেলায় হারকে যারা সহজ ও সুন্দরভাবে নিতে পারে হারের দ্বারা তাদের আত্মনতি প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। ছোটদের পুতুল খেলায় বহু প্রবৃত্তির রসই রয়েছে; যৌন, বাৎসল্য, গঠন, সংগ্রহ, যূথ প্রভৃতি। তেমনি বড়দের অনুকরণ ও বড়দের সঙ্গে একাত্মতার দ্বারা শিশুরা বড়দের অনেক মনো-ভাবকেই উপলব্ধির চেষ্টা করে—যে মনোভাবের শিকড় রয়েছে তাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তিতে। ম্যাকডুগাল পরবর্ত্তী কালে (২) আরও তিনটি সহজ প্রেরণার অস্তিত্বের কথা বলেন। আরামের প্রেরণা, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রেরণা, পরি-ব্রাজনের প্রেরণা। জেমস ড্রিভারের ধারণা (৩) শিকারের প্রেরণা মানুষের আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি।

প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে একটি আবেগ যুক্ত আছে বলে ম্যাকডুগাল উল্লেখ করলেও সবক্ষেত্রে আবেগের সুস্পষ্ট নামকরণ সম্ভব হয়নি। হয়ত এর কারণ—যতখানি আমরা অনুভব করি, ভাষায় ততখানি আমরা প্রকাশ করতে পারিনা। অথবা এমন হতে পারে যে, যে আবেগের কথা ম্যাকডুগাল উল্লেখ করেছেন সে আবেগের রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।*

ড্রিভারের ধারণা

ড্রিভারের ধারণা (৪) যে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পথে বাধা ঘটলেই আবেগের উদয় হয়। প্রবৃত্তি যেখানে সহজেই পরিতৃপ্ত হয় সেখানে কর্ম থাকে, অনুভূতি থাকে (যেমন ভালো লাগা বা না-লাগা) কিন্তু আবেগ থাকে না (যেমন ভয়, রাগ বাৎসল্য ইত্যাদি)। একথা সত্য যে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, আবেগ সম্বন্ধে সেখানে আমরা বেশী করে সচেতন হই। খাদ্যের অভাবে ক্ষুধা বাড়ে, পালাবার পথ না পেলে ভয়ে আমরা অভিভূত হই, বিরহ ও বিচ্ছেদেই প্রেম সম্বন্ধে আমরা অধিক সচেতন হই। তবু প্রবৃত্তির সহজ পরিতৃপ্তিকে আবেগশূন্য বলা চলে না। আবেগের

* আবেগ জীবনের বিশ্লেষণ পাশ্চাত্য মনোবিদ্যায় আজও ততখানি সূক্ষ্ম ও উন্নত ধরণের নয় এ কথা মনে করবার কারণ আছে।

রঙেই পরিতৃপ্তি রঞ্জিত। খাওয়ার সময়েও সে কথা আমরা বুঝি, পলায়নের কালেও, মিলনের মুহূর্তেও।

প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও আবেগের মধ্যে শিক্ষার দিক থেকে যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনতি, কৌতূহল, গঠন প্রবৃত্তি, ক্রীড়া, যৌন শিক্ষা—প্রত্যেকটি বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সহানুভূতি, অনুকরণ ও অভিভাব 'একাত্মতা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভয়, ক্রোধ, স্নেহ-ভালবাসা ও সামাজিকতা— 'শিশুর বিকাশ' অধ্যায়টিতে আলোচিত হল।

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের ধারণা

ফ্রয়েড মানুষের চোদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে বলে মনে করেন না। গোড়াতে তাঁর ধারণা ছিল (৫) মানুষের দুইটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে—অহংপ্রবৃত্তি ও যৌন প্রবৃত্তি। পরে তাঁর ধারণা বদলায়। তিনি অহংপ্রবৃত্তি ও যৌন প্রবৃত্তিকে জীবন প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আর একটি প্রবৃত্তির উল্লেখ করেন। এ প্রবৃত্তিটিকে মরণ প্রবৃত্তি (৬) বলা হয়। এ কথা বলা আবশ্যক, এর প্রত্যেকটিকে বহুস্থানে ফ্রয়েড 'প্রবৃত্তিচয়' বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ একাধিক আবেগ ও প্রেরণা মিলেই ঐ 'প্রবৃত্তিচয়ের' প্রত্যেকটি গঠিত হয়েছ।

জীবন প্রবৃত্তি ও মরণ প্রবৃত্তি

ফ্রয়েড ডাক্তার ছিলেন। রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মানসিক রোগের মূলে তিনি আবিষ্কার করেন অন্তর্দ্বন্দ্ব। ঐ অন্তর্দ্বন্দ্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্জ্ঞান। অন্তর্দ্বন্দ্বে মনের যে দুটি অংশ সাধারণতঃ অংশ গ্রহণ করে সে দুটিকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন। আরেকটি ব্যাপারও তিনি দেখেছিলেন। আমাদের সহজাত প্রেরণাগুলির মধ্যে কয়েকটিকে মূল বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ ঐসব মৌলিক প্রেরণার শাখা প্রশাখা রূপে অন্যান্য প্রেরণাগুলিকে দেখা যায়। শিশু কৌতূহলী, সে জানতে চায়। একটি সাদা ইঁদুরকে একটি অজানা জায়গায় ছেড়ে দিলে সাধারণতঃ জায়গাটিকে সে প্রদক্ষিণ ও পর্যবেক্ষণ করবে। কেন? শিশু বা ইঁদুর নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চায়। বিপদ আপদের আশঙ্কা আছে কিনা—এটা তারা স্বভাবতঃই জানতে চায়। নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, মেটানোর জন্য পরিবেশ থেকে তারা খাদ্য, সঙ্গী ইত্যাদি পেতে পারে কি না এটাও তাদের

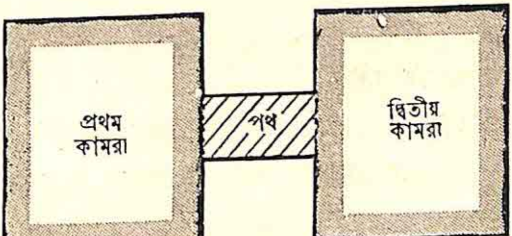
জ্ঞানলাভের লক্ষ্য। শুধু জানবার জন্য জানা সাদা ইঁদুরের স্বভাব নয়, বোধ হয় শিশুরও নয়। বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা (যৌন আকাঙ্ক্ষা বাঁচবার আকাঙ্ক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে ফ্রয়েড মনে করেন) ও মরবার আকাঙ্ক্ষা এই দুইটিই মৌলিক প্রবৃত্তি। অন্যান্য প্রেরণা মৌলিক প্রবৃত্তি দুটির প্রয়োজনেই কাজ করে।

ঐ ধারণা অনেকাংশে সত্য হলেও মনের রসায়নের দিক থেকে বহুসংখ্যক সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে স্বীকার করবার সুবিধা আছে। একটি প্রবৃত্তি অপরটির প্রয়োজনে কাজ হয়ত করে। কিন্তু যতক্ষণ তার বৈশিষ্ট্যটুকু, বিশুদ্ধ রূপটি, আমরা কল্পনা করতে পারছি তাকে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলাতে আপত্তির কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। প্রবৃত্তিগুলিকে যেখানে শিক্ষার কাজে লাগাবার কথা চিন্তার বিষয়—সেখানে জীবনে বহু ও বিভিন্ন প্রবৃত্তি আছে এ তথ্যই আমাদের সাহায্য করবে।

প্রবৃত্তি ও প্রেরণার মধ্যে কোনটি শক্তিশালী এ প্রশ্নটি মনে আসা স্বাভাবিক। সাদা ইঁদুরদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান হয়েছে (৭)।

প্রবৃত্তিদের কোনটি শক্তিশালী ?

একটি কামরা—সেখান থেকে একটি পথ বেরিয়ে গেছে পথের অপর প্রান্তে আরেকটি কামরা। একটি কামরা থেকে অপর কামরাটিতে কি আছে দেখা যায়।



প্রথম কামরাটিতে একটি স্ত্রী-ইঁদুর রাখা হল। দ্বিতীয় কামরাটিতে পর্যায়ক্রমে খাদ্য, জল, ইঁদুরের বাচ্চা, পুরুষ-ইঁদুর ইত্যাদি রাখা হল। প্রথম কামরা থেকে দ্বিতীয় কামরায় যাবার পথ একটি। সে পথ দিয়ে যেতে গেলেই ইলেকট্রিক শক্ লাগবে এমন ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে কোন আকর্ষণ না

থাকলে স্ত্রী-ইঁদুরটি ঐ পথ ব্যবহার করতে আগ্রহ দেখাবে না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পর্যবেক্ষণ, মাতৃত্ব ও যৌন-ইচ্ছা প্রত্যেকটি প্রেরণার প্রবলতম মুহূর্তে ইঁদুরটি কতবার ইলেকট্রিক শক্ খেয়েও ঐ রাস্তাটি অতিক্রম করে তা থেকে ঐ প্রেরণাগুলির শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হল। কোন আকর্ষণ না থাকলে ইঁদুরগুলি ২০ মিনিটের মধ্যে ৩ থেকে ৪ বার ঐ পথটি অতিক্রম করে। ২ থেকে ৪ দিনের উপবাসের পর ক্ষুধার তাগিদে-ও খাদ্যের আকর্ষণে এরা গড়ে ১৮ বার পথটি অতিক্রম করে। উপবাসের দিন আরো বাড়ালে অতিক্রমণের সংখ্যা কমতে দেখা যায়। বাচ্চা হবার কয়েক ঘণ্টা পরে বাচ্চার কাছে যাবার প্রেরণা স্ত্রী-ইঁদুরদের সবচেয়ে বেশী থাকে। বহুসংখ্যক ইঁদুর নিয়ে এ অনুসন্ধানটি করা হয়েছে। বিভিন্ন ইচ্ছার প্রবলতম মুহূর্তে ইচ্ছাসমূহের তাড়নায় ইঁদুরেরা পথটি গড়ে কতবার অতিক্রম করে নীচে তা দেওয়া হল।

সারণী—১

প্রেরণা	**অতিক্রমণের গড় সংখ্যা**
মাতৃত্ব	২২·৪
তৃষ্ণা	২০·৪
ক্ষুধা	১৮·২
যৌন ইচ্ছা	১৩·৮
পর্যটন ও পর্যবেক্ষণ	৬·০
কোন আকর্ষণ নেই	৩·৫

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা গেল, বাচ্চা যখন খুব ছোট, মাতৃত্বের প্রেরণাই তখন থাকে সব চেয়ে প্রবল। তারপর তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, তারপর যৌন আকাঙ্ক্ষা।

মানুষের বেলায় এ কথা কতদূর সত্য সেটা বিচারের বিষয়। প্রবৃত্তি ও প্রেরণার বেলাতে—'জরুরী' ও 'ব্যাপক' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তি একটি জরুরী ব্যাপার। না খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বেশীদিন না খেয়ে থাকা দুঃসাধ্য, অধিকাংশের পক্ষে অসম্ভব। যৌন ইচ্ছার ব্যাপারে ঐ কথা বলা চলে না। কোন একটি মুহূর্তে যৌন মিলনের তাগিদ ক্ষুধার তাগিদের মত নিশ্চয়ই জরুরী নয়। তবে যৌন ইচ্ছার ব্যাপকতা

মানুষের জীবনে অনেকখানি। মানুষের চারু সৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূলে যৌন শক্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী এ কথা স্বীকার করতে হবে। যৌন ইচ্ছা অত্যন্ত নমনীয়। যৌন ইচ্ছার বহুল রূপান্তর ঘটে। খাদ্য ইচ্ছার রূপান্তর গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। জীবনে এই দুটি ইচ্ছার গুরুত্ব সম্পর্কে লুণ্ডের (৮) কয়েকটি লাইন আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

খাদ্য আকাঙ্ক্ষা ও যৌন ইচ্ছা মানুষ ও মানুষেতর জীবের আচরণের প্রধান দুটি উৎস। এই দুইয়ের মধ্যে খাদ্য আকাঙ্ক্ষাই অপেক্ষাকৃত মৌলিক। যৌন ইচ্ছা অবশ্য অনেক সময় খুব মনোরঞ্জক রূপ পরিগ্রহ করে। রোমান্টিকরূপে যৌন-ইচ্ছা মানুষকে যে সিভ্যাল্‌রি ও আত্মত্যাগে প্ররোচিত করে, খাদ্য আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তা কখনও সম্ভব হয়না। জীবনে মহৎ প্রেরণার উৎসরূপে খাদ্য আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব কম। বড় লিরিক বা কাব্যের প্রেরণা কোন দিন খাদ্য থেকে আসেনি। অন্যান্য শিল্প ও কলার মূলেও খাদ্য আছে এমন বলা চলে না। ব্যাপক অর্থে যৌন ইচ্ছাকে প্রেম বলাই সঙ্গত হবে। আমাদের আদর্শ, কল্পনার জগত, আমাদের আর্ট, সাহিত্য ও সঙ্গীতের মূলে রয়েছে সেই প্রেমের প্রেরণা ও শক্তি।

বাৎসল্যকে ম্যাকডুগাল সকল প্রবৃত্তির মধ্যে মহত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। বাৎসল্যের মধ্য দিয়ে জীব নিজেকে অতিক্রম করে, সন্তানের মঙ্গলকর্মে আত্মনিয়োগ করে। বাৎসল্য প্রবৃত্তির বিস্তৃতি ঘটলে অন্য সকলের কল্যাণের জন্যও মানুষ সচেষ্ট হয়। নিজের সুখী হবার জন্যও সম্ভবতঃ এই প্রবৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ ও বিস্তার দরকার। নিজের মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানুষ কখনও সুখী হয় না। মনঃসমীক্ষার ধারণা প্রত্যেকটি ইচ্ছার সঙ্গে একটি অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধভাব যুক্ত থাকে। এই বিরুদ্ধভাব বা এ্যামবিভ্যালেন্স সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্যের মধ্যেই সবচেয়ে কম—ফ্রয়েড (৯) এটি লক্ষ্য করেছেন।

প্রবৃত্তিসমূহের শ্রেণী বিভাগ

প্রবৃত্তিসকলকে কোন কোন মনোবিদ্ শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। জেমস ড্রিভার (১০) মনে করেন—প্রবৃত্তিসমূহকে আমরা প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করতে পারি। আকাঙ্ক্ষা-প্রতিক্রিয়ারূপী ও প্রতিক্রিয়ারূপী। প্রতিক্রিয়ারূপী প্রবৃত্তি কেবলমাত্র 'উদ্দীপকে'র উপস্থিতি (বা উপস্থিতির কল্পনা)-তেই জাগ্রত হয়। যেমন ভয়

কিম্বা ক্রোধ। ভয় কিম্বা ক্রোধের জন্য কোন বস্তু বা অবস্থা আবশ্যক। খাদ্য আকাঙ্ক্ষা একটি আকাঙ্ক্ষা-প্রতিক্রিয়ারূপী প্রবৃত্তি। খাদ্য না থাকলেও ক্ষুধা সম্ভব। খাদ্য দেখলে তা সময় বিশেষে বাড়ে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে এই জাতীয় প্রবৃত্তিকে আমরা ইচ্ছা বা চাওয়া বলতে পারি। যে উদ্দীপক বা বস্তুর দ্বারা মানুষের ইচ্ছা পূরণ হয় মানুষ সে বস্তু খুঁজে বার করে।

শুধু প্রতিক্রিয়ারূপী প্রবৃত্তি আছে কিনা, সে বিষয় মনোবিদ্‌দের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ না থাকলে যোধন প্রবৃত্তি জাগ্রত হবে না এ কথা কি সত্য? শিশুদের খেলা লক্ষ্য করে পিয়ারে বোভে'র (১১) ধারণা হয়েছিল যে যুদ্ধ শিশুরা করবেই। কারণ না থাকলে কারণ তারা বানাবে। ফ্রয়েড যখন মরণ প্রবৃত্তিকে একটি মৌলিক প্রবৃত্তি বলেছেন—তিনিও অমন মনে করেন বলে ভাববার হেতু আছে। তথাপি আমরা বলব—ক্রোধ ভয় মুখ্যতঃ প্রতিক্রিয়ারূপী। এ সব আবেগকে জাগ্রত করার ব্যাপারে বাস্তব অবস্থা অনেকখানি দায়ী। অবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ক্রোধ ও ভয়কে বেশ কিছু পরিমাণে এড়ান সম্ভব।

প্রবৃত্তি ও প্রেরণার শক্তি বা এনার্জি

প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে হর্মিক ও মনঃসমীক্ষা মতবাদীরা শক্তি বা এনার্জিরূপে কল্পনা করেছেন ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন ধরণের শক্তির (যেমন যান্ত্রিকশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি প্রভৃতি) কথা বলা হয়েছে—বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও প্রেরণা তেমনি বিভিন্ন ধরণের মানসিক শক্তি। মানসিক শক্তির রূপটি ভৌতিক শক্তির রূপ থেকে স্বভাবতঃই অন্যধরণের। মানসিক শক্তির রূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ম্যাকডুগাল বলেছেন—চাওয়া, সচেষ্ট হওয়া প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এর রূপটি বোঝা যায়। ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা শব্দের দ্বারা শক্তির সক্রিয়তাটি স্পষ্ট হয়। গর্ট (১২) সম্ভবতঃ মানসিক শক্তির কথা সর্বপ্রথম বলেন। তিনি মানসিক শক্তি সম্পর্কে তিনটি নিয়ম উল্লেখ করেন:

(১) ভৌতিক শক্তির ন্যায় মানসিক শক্তিরও পরিমাণ আছে।

(২) এক ধরণের মানসিক শক্তি বা সম্ভাবনাকে অন্যধরণের মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

(৩) মানসিক শক্তিকে দেহতাত্ত্বিক উপায়ে ভৌতিক শক্তিতে পরিবর্তিত করা চলে।

প্রথম নিয়মটি সম্বন্ধে বলা চলে যে মানসিক শক্তির পরিমাণ বোঝাতে গিয়ে বর্তমানে আমরা বলি যে কোন একটি ইচ্ছা প্রবল বা দুর্বল, কোন একটি আবেগ কম বা বেশী। মানসিক সামর্থ্যকে আমরা আজকাল রাশির সাহায্যে প্রকাশ করি। একদিন হয়ত বিভিন্ন মানসিক শক্তির পরিমাণও রাশির সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

মানসিক শক্তির রূপান্তর-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে বহু পরিচয় জীবনে পাওয়া যায়। আক্রমণাত্মক

ইচ্ছা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রীড়ায় রূপান্তরিত হয়। অপরিতৃপ্ত যৌন ইচ্ছার স্থান অধিকার করে রোমান্টিক প্রেম, কাব্য ও কবিতা ইত্যাদি। মানসিক ব্যাধির মূলে রয়েছে অবদমিত ইচ্ছার শক্তি।

শক্তির রূপান্তর-পরিগ্রহণ

একধরণের মানসিক শক্তি (অর্থাৎ একধরণের ইচ্ছা বা আবেগ) যে কোন অন্য এক ধরণের মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে কিনা এটি একটি প্রশ্ন। গোড়াতে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল—ভালবাসা কখনও ঘৃণায় পরিণত হয়, আবার কখনও উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী আবেগের একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হওয়াতে কোন বাধা নেই। শেষের দিকে ফ্রয়েডের এ ধারণা বদলেছিল। তিনি বললেন, মানসিক ক্ষেত্রে একটি আবেগের স্থল আর একটি আবেগ অধিকার করে এ কথা সত্য। কিন্তু একটি আবেগ আরেকটি আবেগে পরিণত হয় একথা মনে না করলেও চলে। গিরীন্দ্রশেখর বসুর ধারণা, ফ্রয়েডের গোড়াকার ধারণাই ঠিক। মানসিক শক্তির অবাধ রূপান্তর ঘটে বলে তার বিশ্বাস।

বাস্তবিক ঐ জাতীয় রূপান্তর ঘটে কিনা এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের না জানা থাকলেও এটুকু আমরা বলতে পারি যে ঘৃণা ও ভয়ের মূলে অনেক সময় থাকে অতৃপ্ত ভালবাসা। ভালবাসার গতি জীবনে স্বচ্ছন্দ হলে 'অহৈতুকী' ভয় ও ঘৃণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শক্তির রূপান্তরন্ন ঃ ঊর্ধ্বায়ন ও নিম্নায়ন

প্রবৃত্তির বহুল রূপান্তর ঘটে। রূপান্তর-ক্রিয়াকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—ঊর্ধ্বায়ন ও নিম্নায়ন।

কোন একটি ইচ্ছার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির তুলনায় রূপান্তরিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তির সামাজিক মূল্য বেশী হলে সে ইচ্ছাকে জৈবিক ইচ্ছার ঊর্ধ্বায়ন বলা হয়। যৌন ইচ্ছার দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। যৌন ইচ্ছা জৈবিক। সুন্দর সনেট লিখে রূপান্তরিত যৌন ইচ্ছার পরিতৃপ্তিকে ঊর্ধ্বায়ন বলা যায়। কারণ স্বাভাবিক যৌন পরিতৃপ্তির থেকে সনেট লেখার সামাজিক মূল্য বেশী। অন্যপক্ষে, যৌন ইচ্ছা রূপান্তরিত হয়ে যদি মানসিক রোগের লক্ষণরূপে দেখা দেয়, তবে সে রোগের সামাজিক মূল্য যৌন ইচ্ছার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি থেকে কম মনে করা যেতে পারে। একে বলা যায়—ইচ্ছার নিম্নায়ন। নিম্নায়িত ইচ্ছা দুই প্রকারের হতে পারে ঃ (ক) সমাজ বিরোধী (খ) আত্মবিরোধী *।

মানুষের জীবনে প্রবৃত্তিসমূহের বহুল রূপান্তর ঘটে। স্বাভাবিক ও জৈবিক পরিতৃপ্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয় না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাজে ঐ রূপান্তরিত শক্তিকে লাগান হয় বলেই এই বিচিত্র সভ্যতা

* 'অস্বাভাবিক শিশু' অধ্যায়ে নিম্নায়িত ইচ্ছা ও আচরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

গড়ে উঠেছে। যৌন শক্তিকে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লাগান যেতে পারে। যোধন প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বায়নের ফলে মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে সার্জন (ডাক্তার) হয়, লেখকও হয়। ভিক্টর হুগো তার দৃষ্টান্ত। সমাজের দুর্নীতি ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লেখনী চালানো ঐ যোদ্ধ লেখকের কাজ ছিল। "কবি না হলে আমি একজন সৈনিক হতাম" ভিক্টর হুগো (১৩) লিখেছিলেন। হুগোর শিল্প-প্রচেষ্টায় ঊর্ধ্বায়িত যোধনপ্রবৃত্তি ও নিপীড়িতের প্রতি ভালবাসা—এ দুইয়েরই শক্তি ছিল। নীটসে (১৪) অধ্যাত্মীকৃত নিষ্ঠুরতাকে সংস্কৃতি বলেছেন।*

কৌতূহলকে উন্নীত ও বিস্তৃত করাই মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা। আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি সময় সময় মানুষের মহৎ কর্মের প্রেরণা যোগায়।

ঊর্ধ্বায়ন জীবনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হলেও মানুষের ইচ্ছানুসারে প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বায়ন ঘটানো সম্ভব নয়। জৈবিক ইচ্ছা অপরিতৃপ্ত ও কিছুটা অবদমিত হলে, ঊর্ধ্বায়ন যখন ঘটবার আপনা হতেই ঘটে (১৫)। ঊর্ধ্বায়নের কাজ সচেতন মনের অগোচরে হয়। ঊর্ধ্বায়নের শক্তি কারো মধ্যে বেশী, কারো মধ্যে কম (১৬)। এ শক্তি প্রধানতঃ সহজাত হলেও পরিবেশের প্রভাবে ঊর্ধ্বায়নের শক্তি বাড়ে। শিক্ষায় আমরা ঊর্ধ্বায়নের সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারি। কিন্তু ঐ সুযোগ মন কতখানি গ্রহণ করবে সে কথা আগে থেকে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে দেখা গেছে জৈবিক পরিতৃপ্তির সুযোগ যেখানে শিশু অবাধে পায়, ঊর্ধ্বায়ন স্বভাবতঃই সেখানে কম। স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি থেকে শিশুর কিছু পরিমাণ বঞ্চিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তার ফলে যদি শিশুর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয় তবে সেসব ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বায়ন আবার কঠিন হয়।

এ কথা মনে রাখতে হবে প্রবৃত্তির শক্তির রূপান্তর ঘটানোর দ্বারা শিশুর কল্যাণ হওয়া যেমন সম্ভব, অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনাও তেমন কম নয়। কিভাবে প্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটছে, কতখানি অন্তরের প্রেরণায় শিশু সংস্কৃতিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছে, শিশুর আচরণের মধ্যে কিছু বৈকল্য দেখা যাচ্ছে কিনা—এসবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রূপান্তর ক্রিয়ার রূপটি বুঝতে হবে। এ ছাড়া আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কোনো প্রবৃত্তির সবটুকু শক্তি কখনও

* নীটসের দর্শনের মধ্যে প্রেমের স্থান কম; সংগ্রাম ও বীরত্বের স্থান বেশী। সেটা কিয়ৎ-পরিমাণে একদর্শী। প্রাণের সহজ আনন্দের স্থান ঐ দর্শনে কম। তথাপি এ কথা সত্য—প্রেম ও সংগ্রাম এ দুই নিয়েই জীবন ও সাহিত্য গড়ে ওঠে

রূপান্তরিত হয় না। শিশু ও বয়স্ক—অধিকাংশেরই কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক বা জৈবিক পরিতৃপ্তি আবশ্যক (১৭)।

স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি থেকে কিছুটা বঞ্চিত হবার প্রয়োজন সবারই আছে ; বহু কারণে। একটি কারণ—সবটুকু শক্তিই যদি জৈবিক প্রয়োজনে নিঃশেষিত হয় তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেমন করে সম্ভব হবে? অবশ্য ব্যর্থতা সহ্য করবার শক্তি সকলের সমান নয়। কারো বেশী কারো কম। ছোটদের মধ্যে এ শক্তি কম থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, এবং কিছু কিছু সহ্য করে এ শক্তি বাড়ে। ব্যর্থতা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখন মনের ভারসাম্য সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

বিরেচন বা নিষ্কাশন

কোন আবেগ বা ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ বা নির্মূল করা সম্ভব নয়। আত্মপ্রকাশের পথ তাকে করে দিতে হবে। ইচ্ছা ও আবেগ জাগ্রত হলে মন উত্তেজিত হয়। পরিতৃপ্তির দ্বারা ঐ উত্তেজনার প্রশমন ঘটে। মন তার ভারসাম্য পুনরায় ফিরে পায়। ইচ্ছা ও আবেগকে আমরা মানসিক শক্তি বলেছি। প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির অর্থ হচ্ছে ঐ শক্তির ব্যয় বা বিরেচন। মনের ভারসাম্য রক্ষায় ইচ্ছা ও আবেগের বিরেচন দরকার ; স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির দ্বারা হোক বা বিকল্প পরিতৃপ্তির দ্বারাই হোক। বিকল্প পরিতৃপ্তির সামাজিক মূল্য বেশী হতে পারে। আবার এমন হতে পারে যে তার সামাজিক মূল্য কম বা বেশী কোনটাই নয়।

আধুনিক মনোবিদ্‌দের মধ্যে কেউ কেউ সহজাত প্রবৃত্তি বা ইনস্টিংট্ শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী নন। তাঁরা 'প্রয়োজন' বা 'উদ্দেশ্য' শব্দটি ব্যবহার করেন।

প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য : উডওয়ার্থের ধারণা

এই প্রয়োজনটিকে জীব নিজের প্রয়োজন বলে অনুভব করে। প্রত্যেকটি প্রয়োজনের একটি প্রেরণা, তাগিদ বা শক্তি আছে। সংক্ষেপে, প্রত্যেকটি প্রয়োজনই সক্রিয়। উড-ওয়ার্থ ও মারকুইস্ (১৮) প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যসমূহকে তিনভাগে ভাগ করেন :

(১) দৈহিক—যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসপ্রশ্বাস, বাহ্য প্রস্রাব, যৌন প্রয়োজন, কাজ ও বিশ্রাম।

(২) যে অবস্থায় জরুরী কর্মের প্রয়োজন। বিপদের সময়, শিকারের প্রয়োজনে, স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হলে ও বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হলে জীবকে তৎক্ষণাৎ কাজ করতে হয়।

(৩) বস্তুমুখী উদ্দেশ্য ও আগ্রহ।

(ক) পরিবেশ পরিচয় ঃ এটা মানুষ ও মানুষেতর জীবের মধ্যে দেখা যায় নূতন কোন জিনিষ ও নূতন কোন জায়গাকে জানবার চেষ্টা জীবের আছে। শিশু যখন হাঁটতে শেখেনি তখন নূতন কিছু দেখলে সে তাকিয়ে দেখে আবার কাছে পেলে মুখের মধ্যে দিয়েও দেখে। হাঁটতে শেখবার পর সে পরিবেশকে জানবার জন্য চলবার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে।

(খ) বস্তুকে পরীক্ষা ঃ শিশু বস্তুকে শুধু দেখেই ক্ষান্ত হয় না, তাকে নেড়ে চেড়ে, ভেঙ্গেচূরে দেখে। জিনিষটিকে ভাল করে সে বুঝতে চায়। নিজের কাজে তাকে লাগাতে চায়। যে সকল জিনিষ নিয়ে শিশু সাধারণতঃ ঐ জাতীয় খেলা করে তার শ্রেণীবদ্ধ তালিকা নীচে দেওয়া হল।

যে সব বস্তুকে নাড়ান যায়—যেমন, বই, দরজা, ড্রয়ার, জলের কল, বাক্স ইত্যাদি।

নমণীয় বস্তু—ভিজে বালি, কাদা, জল ইত্যাদি।

যা শব্দ করে—ঘণ্টা, মোটরের হর্ণ, পটকাবাজি, ড্রাম ইত্যাদি।

যার গতি আছে—গাড়ি, সাইকেল।

যা গতির সহায়ক—স্কিপিং দড়ি ইত্যাদি।

দূরত্বজয়ী—যে খেলার দ্বারা শিশু দূর পরিবেশের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে পারে—যেমন, বল ছোঁড়া, তীর ছোঁড়া, আয়নার সাহায্যে দূরে আলো ফেলা ইত্যাদি।

মাধ্যাকর্ষণ যার দ্বারা জয় করা যায়—জলে ভাসা, বেলুন, ঘুড়ি, দোল খাওয়া, ঢেঁকি, নৌকা ইত্যাদি।

বড়দের অনুকরণের জন্য আবশ্যক খেলার সামগ্রী—পুতুল, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, খেলার জন্তু, মোটরকার ও ট্রেন।

(গ) ঔৎসুক্য ঃ শিশু পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে, বস্তুকে ইচ্ছামত নেড়ে চেড়ে দেখে। পরিবেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এইভাবে আরম্ভ হয়। কোন কোন জিনিষকে কিছু নেড়ে চেড়ে দেখার পর তার সম্বন্ধে আর তার কোন ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু পরিবেশের কয়েকটি বস্তু হয়ত তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাদের সম্বন্ধে তার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ঔৎসুক্য বা আগ্রহ জন্মায়।

ঔৎসুক্যের মূলে একটি সহজাত প্রেরণা থাকলেও কোন একটি বস্তু বা

কাজের সঙ্গে সে প্রেরণার একটি স্থায়ী যোগ ঘটে। কাঠের কাজের প্রতি একটি ছেলের আগ্রহ জন্মাল। কাঠ নিয়ে কাজ করার মূলে কি সহজাত প্রেরণা আছে শিক্ষার দিক থেকে তা জানাই সব জানা নয়। 'কাঠের কাজে শিশুর আগ্রহ'— এটা একটা গোটা সক্রিয় মানসিক সত্য। ঐ আগ্রহের একটি অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন রূপ আছে। 'কাঠের কাজে শিশুর আগ্রহ' থেকেই শিক্ষার একটি ধারা আরম্ভ হতে পারে। সেজন্য ঐ আগ্রহ খুঁড়ে শিশুর যোধন প্রবৃত্তিকে আবিষ্কার করার আবশ্যকতা নেই। অবশ্য যতক্ষণ শিশু স্বাভাবিক ভাবে আচরণ করছে, শিশুশিক্ষা শিশুচিকিৎসার রূপ নেয়নি। শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক হলে অনেক সময় শিশুর আগ্রহের মূলে কি আছে তা দেখাও আবশ্যক হয়।

জীবের 'প্রয়োজন' সম্বন্ধে মারে'র (১৯) মতবাদ উল্লেখযোগ্য। মারে'র মতে প্রয়োজন হচ্ছে মস্তিষ্কদেশের একটি প্রেরণা (Force)—যা আমাদের জ্ঞান ও কর্মকে সংগঠিত করে। জ্ঞান ও কর্ম অসুখকর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিতরকার প্রেরণাতেই প্রয়োজনটির তাগিদ অনুভব করা যায়। বেশীর ভাগ সময়েই প্রয়োজনের তাগিদ আসে পরিবেশ থেকে। প্রত্যেকটি প্রয়োজনের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট আবেগ বা অনুভূতি যুক্ত থাকে। প্রয়োজনের প্রেরণায় জীব এক বিশেষ ধরনের কর্মে প্ররোচিত হয়। অবস্থার আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্তন ঘটিয়ে সে নিজেকে পরিতৃপ্ত করে।

মারে'র মতবাদ

পাঠক-পাঠিকাবর্গ লক্ষ্য করবেন—ম্যাকডুগালের ইনস্টিংটের সংজ্ঞা ও মারে'র প্রয়োজনের সংজ্ঞার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্যটি প্রধানতঃ নামকরণে। একজন যাকে 'ইনস্টিংট্, বলেছেন, আরেকজন তার নামকরণ করেছেন 'প্রয়োজন'।

কুড়িটি প্রয়োজন মানুষের আছে বলে মারে উল্লেখ করেন। নীচে নাম কয়টি দেওয়া হল।

আত্মনতি ঃ

সাফল্যলাভ ঃ

সম্বন্ধ স্থাপন ঃ অন্যদের কাছে যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে সানন্দ সহযোগিতা ও দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপন।

আক্রমণ ঃ

স্বাধীনতা ঃ	
বারবার চেষ্টা ও অধ্যাবসায় ঃ	ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করা, জয় করা।
প্রতিরোধ ঃ	অন্যের আক্রমণ, দোষারোপ ও সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।
শ্রদ্ধা ও সমর্থন ঃ	বড়কে সশ্রদ্ধ প্রশংসা করা, সমর্থন করা।
প্রভুত্ব স্থাপন ঃ	মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপন।
আত্মপ্রদর্শন ঃ	নিজেকে দেখানো, নিজের কথা শোনানো।
বিপদ এড়ান ঃ	আঘাত, বেদনা, অসুস্থতা ও মৃত্যুকে এড়াবার চেষ্টা।
অপমান এড়ান ঃ	
স্নেহ ও সহানুভূতি দেখানো ঃ	অসহায় বস্তুর প্রতি সহানুভূতি দেখানো, তাকে সাহায্য করা।
গোছানো মনোবৃত্তি ঃ	
খেলা ঃ	
বিকর্ষণ ঃ	অপছন্দের বস্তুর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া।
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ঃ	জগতকে প্রত্যক্ষ করবার তৃষ্ণা।
কাম ঃ	
আবেদন ও সাহায্য লাভ ঃ	
বোঝা ঃ	

মারে'র তালিকার সঙ্গে ম্যাকডুগালের তালিকার বহু মিল আছে। যোধন প্রবৃত্তিকে মারে আক্রমণ ও প্রতিরোধ দুটি 'প্রয়োজন' রূপে দেখেছেন। প্রথমটার মধ্যে—বাধা বিপত্তিকে চূর্ণ করা, শত্রুকে বিনষ্ট করবার ইচ্ছাটি প্রধান, দ্বিতীয়টির মধ্যে আত্মরক্ষার দিকটা বড়। তবে আক্রমণের মধ্যে অনেক সময় আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকে ও প্রতিরোধের মধ্যেও আক্রমণাত্মক মনোভাবটি বিরল নয়। ম্যাকডুগালের আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে মারে দুটি 'প্রয়োজন' দেখেছেন। একটি সাফল্য লাভের ইচ্ছা, অপরটি অন্যদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন। শিক্ষার দিক দিয়ে এ বিশ্লেষণ মূল্যবান। মারে'র 'সম্বন্ধ স্থাপন' ও ম্যাকডুগালের 'যূথ প্রবৃত্তি'র মধ্যে কিছু মিল আছে। তবে মারে এ প্রয়োজনটিকে আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত

করেছেন। জীবনে এ প্রয়োজনটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রয়োজনের একটি দিক সম্বন্ধে বলছি। শিশুর কথা ধরা যাক। সে যে কারোর, সে যে তার বাবা মায়ের এ কথা সে গভীর ভাবে অনুভব করতে চায়। বাবা মা তাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেই সে মনে করতে পারে যে সে তার বাবা মায়ের। শিশুর নিজের বৈরভাবও তাকে সময় সময় প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অন্য কারো সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, অন্য কারো ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছা বড়দের মধ্যেও অনেকখানি রয়েছে। এ ইচ্ছাটি পূর্ণ না হলে মানুষ নিজেকে একা মনে করে, তার নিরাপত্তা বোধ ক্ষুণ্ণ হয়।

স্বাধীনতা ও গোছান মনোবৃত্তি—এ দুটি প্রয়োজন ম্যাকডুগালের তালিকায় নেই।

অধ্যায় ৩

কৌতূহল ও জ্ঞানার্জন

জ্ঞান দান ও জ্ঞানলাভ বিদ্যালয়ের প্রধান কথা। জ্ঞান অর্জনের জন্য কৌতূহল বা জ্ঞানস্পৃহা আবশ্যক। যেখানে জিজ্ঞাসা নেই, কৌতূহল যেখানে দুর্বল— শিক্ষকের জ্ঞানদান সেখানে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভে পূর্ণতা লাভ করে না। শিক্ষকের শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিকট সেখানে সামান্যই পৌঁছায়।

জীবের প্রবৃত্তিসমূহকে, বিশেষতঃ ভয়কে জাগ্রত করবার জন্য বিভিন্ন উদ্দীপক বা বস্তু আছে। উদ্দীপকের মতন, কিন্তু ঠিক উদ্দীপক নয়—এ জাতীয় বস্তু জীবের কৌতূহল জাগ্রত করে, ম্যাকডুগাল (১) এমন মনে করেন।

কৌতূহল কি?

শিশুর সামনে একটি খরগোস রাখা হল। শিশু একবার সভয়ে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার ফিরে এসে তাকে দেখছে। কামড়ে দেবে নাকি? খানিকটা এমন আশংকা। আবার ওর দুধের মত সাদা রঙ, শান্ত শিষ্ট চেহারা দেখে ঠিক ততটা ভয়াবহ ওকে মনে হয় না। ভয় করব, কি করব না, ওকে নিয়ে খেলা করা যায়, কি যায় না এমন সংশয় দোলা তার মনকে কৌতূহলী করে তোলে। কৌতূহল একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এ প্রেরণা বা প্রবৃত্তি সাধারণতঃ জীবনের অন্যান্য অপেক্ষাকৃত মৌলিক প্রবৃত্তির প্রয়োজনে কাজ করে এ কথা বলা চলে।

কৌতূহল ও অন্যান্য মৌলিক প্রবৃত্তি

আত্মরক্ষার প্রেরণা ও যৌন প্রেরণাকে মানুষের দুটি প্রধান ও মৌলিক প্রেরণা বলা যায়। কৌতূহল গভীরভাবে এ প্রেরণাদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত। একটি সাদা ইঁদুরকে নূতন একটি জায়গায় ছেড়ে দিলে সে গোড়াতে ঘুরে ঘুরে শুঁকে শুঁকে সব জায়গাটা দেখবে। দেখবে কোথাও খাদ্য পাওয়া যায় কিনা, কোথাও কোন সঙ্গী আছে কিনা, কোথাও কোন বিপদের আশঙ্কা নেইত! মানুষের বেলাতেও এই জাতীয় কৌতূহল দেখা যায়। যৌন জীবন ও যৌনতৃপ্তির বস্তুর সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অনেকখানি।

বিপদ এড়িয়ে, প্রয়োজন মিটিয়ে জীবন যাপনের জন্য জ্ঞানের দরকার। কৌতূহলের মূল জীবন যাপনের প্রেরণায় থাকলেও জানবার জন্য জানার প্রেরণাও মানুষের বেলাতে দেখা যায়। বলা যেতে পারে বাঁচবার, যৌন, ভোগ করবার ও বংশরক্ষা করবার মৌলিক প্রেরণা হতেই এ প্রেরণা উদ্ভূত। গভীর মন পর্য্যন্ত বিস্তৃত অনুসন্ধান করলে নিছক জানবার প্রেরণার মূলে ঐ জাতীয় মৌলিক প্রেরণা খুঁজে বার করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে দেশের প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভের ইচ্ছায়, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সম্পর্কে ঔৎসুক্যে নরনারীর দেহ সম্বন্ধে যৌন কৌতূহলের রূপান্তরিত শক্তি প্রেরণা যোগায়।

মূলে যাই থাক না কেন—জানবার প্রেরণা জীবনে অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। 'কেন?' 'এটা কি?' 'ওটা কি?'—থেকে আরম্ভ করে প্রাপ্ত বয়স্কদের নিস্পৃহ একমনা জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনার মূলে রয়েছে ঐ কৌতূহল। আবার কোন কোন লোকের মধ্যে অন্যের দোষ ত্রুটী সম্বন্ধে অপরিমিত ও অসঙ্গত কৌতূহল দেখা যায়। কৌতূহল এমন ক্ষেত্রে, কোন অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কৌতূহলকে উন্নীত করা, মানুষের কল্যাণে লাগান শিক্ষার কাজ।

কৌতূহলের অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণতা

কোন বয়সে, কি জাতীয় ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল বেশী—শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা জানা আবশ্যক। সাত থেকে এগারো বছরের গ্রেট ব্রিটেনের ৬৪টি ছেলে এবং ১২০টি মেয়ে আপনা থেকে যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল—তিন বছর ধরে তার একটি রেকর্ড (২) রাখা হয়েছিল। ঐ সব প্রশ্নাবলীকে শ্রেণীবিভাগ করে প্রকাশ করে নীচে লিপিবদ্ধ করা হল।

সারণী—২

প্রশ্ন		বিভিন্ন বয়সে প্রশ্নের পরিমাণ হার ৯—১০ বছর	১০—১১ বছর
প্রাত্যহিক ব্যবহারের বস্তু সম্বন্ধে ঃ দৃষ্টান্ত ঃ কেমন করে গ্যাস হয়? বই লেখা কে প্রথম উদ্ভাবন করেন? ইত্যাদি	ছেলে	৯৫%	৫০%
	মেয়ে	৩২%	১১%

		বিভিন্ন বয়সে প্রশ্নের পরিমাণ হার	
		৯—১০ বছর	১০—১১ বছর
বিশ্বজগত সম্বন্ধে ঃ দৃষ্টান্ত ঃ কেমন করে পৃথিবী ঘোরে ? চাঁদ কেন পড়ে যায় না ? ইত্যাদি ?	ছেলে	৯০%	৫২%
	মেয়ে	৪১%	৫০%
মানুষের আদি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঃ দৃষ্টান্ত ঃ কোথায় আমি জন্মেছিলাম ? প্রথম মানুষ কে ? স্বর্গ কোথায় ?	ছেলে	৪৮%	—
	মেয়ে	৫০%	৫৫%
		৭—৯ বৎসর	১০—১১ বৎসর
প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে ঃ দৃষ্টান্ত ঃ কেমন করে রামধনু হয় ? কেমন করে গাছ বড় হয় ? আগুনে কেন জিনিষ পোড়ে ?	ছেলে	৫৭%	৪০%
	মেয়ে	২৩%	৫৮%

এগারো থেকে চোদ্দ বছরের ১৬৫৯ জন ছেলে ও ১৮৫০ জন মেয়ে নিয়ে র‍্যালিসন্ (৩) একটি অনুসন্ধান করেন। ছেলেমেয়েদের লিখতে বলা হয়—কি কি ব্যাপার তারা জানতে চায়। তাদের কৌতূহলের বিষয়গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের কৌতূহল অনেক বেশী। বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয়ে মেয়েদের কৌতূহল আবার বেশী। কারা কত প্রশ্ন করেছে—নীচে তা উল্লেখ করা হল।

	ছেলেরা	মেয়েরা
বৈজ্ঞানিক বিষয়—	১৮,০৪৯	৯,৩৭১
বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয়—	৪,৯৩১	১২,৩৩৩

র‍্যালিসনের অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে ভ্যালেন্টিন (৪) কয়েকটি তথ্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে সহরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় গ্রামের ছেলেমেয়েদের ঔৎসুক্য কম। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অবশ্য একথা বলা চলে না। সহর গ্রাম নির্বিশেষে ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বেশী জিজ্ঞাসা হচ্ছে জীবতত্ত্ব বিষয়ে। তের বছরের ছেলেরা প্রায় সমপরিমাণ আগ্রহ দেখিয়েছে বিদ্যুত এবং রসায়নে।

ছেলেমেয়েদের কৌতূহল ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ

প্রিচার্ড (৫) গ্রেট্‌বৃটেনের গ্রামার স্কুলের সাড়ে বারো থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ সম্বন্ধে একটি গবেষণা করেন। ফলাফল নীচে লিপিবদ্ধ করা হল।

সারণী—৩
জনপ্রিয়তা অনুযায়ী
পাঠ্যবিষয়ের তালিকা

	ছেলে	মেয়ে
১।	রসায়ন বিদ্যা	ইংরেজি
২।	ইংরেজি	ইতিহাস
৩।	ইতিহাস	ফরাসী
৪।	ভূগোল	ভূগোল
৫।	পাটীগণিত	রসায়নবিদ্যা
৬।	ফরাসীভাষা	পাটীগণিত
৭।	পদার্থবিদ্যা	উদ্ভিদতত্ত্ব
৮।	বীজগণিত	বীজগণিত
৯।	জ্যামিতি	পদার্থবিদ্যা
১০।	ল্যাটিন	ল্যাটিন
১১।	...	জ্যামিতি।

উপরোক্ত তালিকায় কয়েকটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, বিষয় পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকখানি মিল রয়েছে। ইংরেজি ও ইতিহাস ছেলেমেয়ে উভয় দলেরই খুব প্রিয়। ল্যাটিন কেউই পছন্দ করে না। জনপ্রিয়তায় পাটীগণিতের স্থান মাঝামাঝি হলেও বীজগণিত ও জ্যামিতি কোন দলই পছন্দ করে না। মেয়েরা অবশ্য যত বড় হয় পাটীগণিতের জনপ্রিয়তা ততই তাদের কাছে হ্রাস পায়। সাড়ে বারো বছরের মেয়েদের কাছে পাটীগণিতের স্থান পঞ্চম; ষোল বছরের মেয়েদের কাছে নবম। ছেলেরা রসায়ন বিদ্যাকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। মেয়েদের কাছে উদ্ভিদতত্ত্ব কিছুটা জনপ্রিয়।

এসব গড় বিচার থেকে প্রত্যেকটি ছেলে বা মেয়ের পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সম্ভব নয়। তবে সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

পছন্দ অপছন্দের কারণ

ছেলেমেয়েদের পছন্দ অপছন্দের কারণ কি—এ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। ওই প্রশ্নটির সমূহ পর্যালোচনা করে পাঠ্যবিষয়ে ছেলেমেয়েদের আগ্রহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি লক্ষ্য করা গিয়েছে :

(ক) বিষয়টির প্রতি সহজ ও স্বাভাবিক আকর্ষণ ; ভালো লাগে বলেই বিষয়টির প্রতি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ।

(খ) বিষয়টিতে পারদর্শিতা।

(গ) বিষয়টির ব্যবহারিক মূল্য। বিশেষ করে বলা যেতে পারে জীবিকার ব্যাপারে বিষয়টির মূল্য।

ইংরেজি পড়ার প্রতি ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। ইংরেজির ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধেও তারা সচেতন। ইংরেজি ব্যাকরণের প্রতি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বিতৃষ্ণা দেখা যায়। ইতিহাস ও ভূগোল ছেলেমেয়েদের ভালো লাগে বলে পড়ে। পড়বার কারণ বিষয়টিতে পারদর্শিতা, এমন খুব কম ছেলেমেয়েই বলেছে। ইতিহাস পছন্দ বা অপছন্দ কোন ব্যাপারেই পারদর্শিতার বিশেষ স্থান নেই। ইতিহাসে সন ও তারিখ মনে রাখতে হয়। ইতিহাস পাঠে বিতৃষ্ণার প্রধান কারণ দেখা গেছে সন ও তারিখের বাহুল্যে।

যে ভূগোলে কেবল নামের ছড়াছড়ি, মানুষ সম্বন্ধে যেখানে কমই লেখা আছে—সে জাতীয় ভূগোলের প্রতি, প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রতি ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ কম।

অঙ্কে আগ্রহের প্রধান কারণ—অঙ্কে পারদর্শিতা। যাঁরা অঙ্কে কাঁচা—অঙ্কে তারা আনন্দ পায় না। অঙ্কের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ নেই। ছেলেমেয়েরা যত বড় হয়, অঙ্কের ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে তারা তত সচেতন হয়। বীজগণিত সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা চলে। জ্যামিতি পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারে কিন্তু পারদর্শিতার চেয়ে স্বাভাবিক আকর্ষণের স্থান বড়।

পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ছেলেমেয়েরা ভালো লাগে বলে পড়ে। বিজ্ঞানে পরীক্ষার সুযোগ তাদের অনেকখানি আনন্দ ও উৎসাহ যোগায়। বিজ্ঞানে পারদর্শিতাকে আগ্রহের কারণ বলে ছেলেমেয়েরা বিশেষ মনে করে না। পদার্থ

বিদ্যায় যাদের আগ্রহ কম, তারা বলে যে বিষয়টিতে তাদের দক্ষতাও কম আর বিষয়টি তাদের ভালোও লাগে না। ভালো না-লাগাটাই মেয়েদের চক্ষে প্রধান কারণ। রসায়ন বিদ্যায় অনেক নাম ও সূত্র মনে রাখতে হয়। অত নাম ও সূত্র মনে থাকে না, সেজন্য রসায়ন বিদ্যা তারা পছন্দ করে না—এমন অনেকে বলেছে।

ফুল ও গ্রামাঞ্চল ভালোবাসে বলে উদ্ভিদতত্ত্ব তারা পছন্দ করে—এমন কথা অধিকাংশই বলেছে। অপছন্দ করবার প্রধান কারণ—অনেক ছবি আঁকতে হয়।

ল্যাটিন শিক্ষা ব্যাপারে আগ্রহের প্রধান কারণ হচ্ছে পারদর্শিতা।

ভাষাটি কঠিন, ওই ভাষা শিখে লাভ কী, ওই ভাষা মৃত—যারা ল্যাটিন পছন্দ করে না তাদের মুখ থেকে অমন কথা শোনা গেছে।

বিষয়ের ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে ছেলেমেয়েরা যত বেশী বড় হয় তত তারা সচেতন হয়। বিষয়টি পছন্দ করবার কারণ হিসাবে বিষয়ের ব্যবহারিক মূল্য-বোধ কোন বয়সে কতখানি সে সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানের ফল নীচে প্রকাশিত হল (৬)।

সারণী—৪

স্কুলপাঠ্য বিষয় পছন্দের কারণ

বয়স	পারদর্শিতা	ব্যবহারিক মূল্য
৯ বছর	২৩%	৭%
১০ বছর	৪৩%	১৫%
১১ বছর	৪৯%	১০%
১২ বছর	৩৩%	৩৭%
১৩ বছর	৩০%	৪৫%

বিষয় শিক্ষায় কি ছোট কি বড় সকলেরই বারংবার সাফল্যলাভের প্রয়োজন আছে। সাফল্য আগ্রহের ভিত্তিকে শক্ত ও সবল করে। বিষয়টির ব্যবহারিক মূল্য আছে, অতএব পড়াশোনা করা উচিত—এসব কথা ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে বলে লাভ নেই। লেখা পড়া করে যে

গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে—

এ উক্তির দ্বারা আট নয় বছরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভে উৎসাহিত হবে না। কিন্তু তের চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের কাছে অমন উক্তির অর্থ আছে।

বিষয়ের ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে অমন বয়সের ছেলেমেয়েদের সজাগ ও সচেতন করে তোলার আবশ্যকতা রয়েছে।

বাঙলা দেশের তিনটি স্কুলের ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করে—স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে তাদের পছন্দের ক্রম দেখা হয়েছে। দুটি স্কুল কলিকাতার। একটি পল্লী-গ্রামের।* পল্লীগ্রামের স্কুলটিতে ছেলেমেয়ে দুই-ই পড়ে। কলিকাতার একটি স্কুল ছেলেদের, অপরটি মেয়েদের। কলিকাতার স্কুল দুটিতে প্রচলিত ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয়। পল্লীগ্রামের স্কুলটি একটি বুনিয়াদী স্কুল। প্রাথমিক স্তরের ও মাধ্যমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের পছন্দের ক্রম নীচে দেওয়া হল।

সারণী—৫

বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বিষয়	তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের গড় ক্রম (সংখ্যা—৪২)	ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের গড় ক্রম (সংখ্যা—২৫)
ইংরেজি	(পড়ান হয় না)	১
বাংলা	১	২
গণিত	২	৩
বিজ্ঞান	৩	৪
সঙ্গীত	৫	৫
সমাজবিদ্যা	৭	৬
চিত্রাঙ্কন	৮	৭
সংস্কৃত	(পড়ান হয় না)	৮
বাগানের কাজ	৬	৯
সেলাই	×	১০
সুতাকাটা	৪	১১
তাঁতের কাজ	,,	১২

* কলিকাতার স্কুল দুটি—বালিগঞ্জ গভর্মেন্ট স্কুল ও সাখাওয়াত গার্লস স্কুল। পল্লীগ্রামের স্কুলটি—অরবিন্দ প্রকাশ বিদ্যালয়, কলানবগ্রাম। তথ্যসমূহের জন্য শ্রীদিবাকরদাস মহান্ত, শ্রীমতী শান্তি ব্যানার্জি, শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী সাধনা দেবীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সারণী—৬

কলিকাতার স্কুল

বিষয়	—ছেলেদের— সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর গড় ক্রম (সংখ্যা—১৪১)	—মেয়েদের— সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর গড় ক্রম (সংখ্যা—৬৭)
বীজগণিত	১	×
পাটীগণিত	৩	২
জ্যামিতি	৪	×
বিজ্ঞান	২	৫
ইংরেজি	৫	১
বাংলা	৬	৩
ইতিহাস	৭	৪
ভূগোল	৮	৯
ইংরেজি ব্যাকরণ	৯	×
চিত্রাঙ্কন	১০	৮
সঙ্গীত	×	৭
সংস্কৃত	১১	৭
বাংলা ব্যাকরণ	১২	×
হিন্দী	১৩	×

ছেলে ও মেয়েদের, সহরের ও পল্লীগ্রামের ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের ক্রমে মিলটি সর্বপ্রথম আমাদের চোখে পড়ে। ইংরেজি, বাংলা, গণিত ও বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা সকলের কাছেই বেশী। মেয়েরা অঙ্ক পছন্দ করে না বলে সাধারণতঃ একটি ধারণা আছে। অঙ্কে সামর্থ্য তাদের অপেক্ষাকৃত কম—গবেষণার দ্বারা এ কথাও জানা গেছে। কিন্তু আমাদের তালিকায় মেয়েদের পছন্দের ক্রমে পাটীগণিত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।* ছেলেদের কাছে বিজ্ঞান ও

* এ 'পছন্দ' কি আসলে 'পছন্দ করা উচিতের' ক্রম? বর্তমান জীবনে বিজ্ঞান ও টেকনলজির স্থান সর্বোচ্চে। বিজ্ঞান ও টেকনলজিতে পারদর্শিতা লাভের জন্য অঙ্ক দরকার। এ দরকার বোধই ছেলেমেয়েদের প্রভাবিত করেছে—এ কথা বলা চলে।

গণিতের স্থান একেবারে উপরের দিকে। বাংলা ব্যাকরণ ও হিন্দী ছেলেরা মোটেই পছন্দ করে না। মেয়েরা এ বিষয়ে কিছু বলে নি। ইতিহাস মেয়েরা বেশ পছন্দ করে (৪র্থ স্থান), ছেলেদের পছন্দের ক্রমে ইতিহাসের স্থান মাঝামাঝি (৭ম)। ভূগোলের স্থান, ছেলেদের বেলাতে ইতিহাসের পরে। ভূগোল মেয়েরা পছন্দ করে না। পল্লীগ্রামের ছেলেমেয়েদের পছন্দের ক্রম থেকে জানা যায় ছোটবেলায় হাতের কাজকে তারা যতটা পছন্দ করে, বড় হলে ততটা করে না। কি পছন্দ করে এবং কি তাদের পছন্দ করা উচিত—এ দুটি জিনিষ সম্ভবতঃ কিছু কিছু ছেলেমেয়ে গুলিয়ে ফেলেছে। কোনটা তাদের পছন্দ করা উচিত, এ বিষয়ে বড়রা কি বলেন—এটা তাদের কাছে বড়। জগদীশ গণিতে শূন্য পেয়েছে। পছন্দের ক্রমে বিষয়টিকে সে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। পতিতপাবন বাংলায় $\frac{১৬}{১০০}$ পেয়েছে। বাংলা তার পছন্দের ক্রমে প্রথম। কোন একটি বিষয়ে দক্ষতা সত্ত্বেও সেটিকে তেমন ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষমতা সত্ত্বেও বিষয়টিকে পছন্দ করা কিছুটা অস্বাভাবিক।

পছন্দের ক্রম অনেকের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত এটা আমরা মনে করি। পরীক্ষাধীন ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কম। এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলতে হলে আরও ব্যাপক ও আরও গভীর অনুসন্ধান দরকার।

অধ্যায় ৪

গঠন প্রবৃত্তি ও হাতের কাজ

গঠন প্রবৃত্তির যথোচিত সদ্ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করার চেষ্টা আজকাল বিদ্যালয়ে করা হয়। হাতের কাজ উন্নততর বিদ্যালয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। হাতের কাজে, বিশেষ করে শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ জ্ঞানের অবতারণা করা হয়।

শিক্ষায় হাতের কাজের স্থান

শিশুরা হাতের কাজ করতে ভালবাসে। লণ্ডন ও সাউথ ওয়েল্সে দশ থেকে তের বছরের ৮০০০ ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায়—স্কুলের বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হল তাদের হস্তশিল্প (১)। লণ্ডনের সাত থেকে তের বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বার্ট (২) একটি অনুসন্ধান করেন। ছেলেদের পছন্দের প্রথম হচ্ছে হস্তশিল্প, দ্বিতীয় ড্রইং। মেয়েদের বেলাতে নাচ ও গানের পরেই হচ্ছে হস্তশিল্প ও ড্রইং।

হাতের কাজের জনপ্রিয়তা

৯০০০ ছেলেমেয়ে নিয়ে অনুরূপ একটি গবেষণার (৩) ফলে দেখা যায় দশ, এগারো, বারো ও তের বছরের ছেলেরা হস্তশিল্প সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। দশ, এগারো ও তের বছরের মেয়েরা সবচেয়ে ভালবাসে সূচী-শিল্পকে। বারো বছরের মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় দেখা গেল গার্হস্থ্য বিজ্ঞান—যার মধ্যে যথেষ্ট হাতের কাজের স্থান রয়েছে। এসব কথা যে কেবল সাধারণ ছেলেমেয়েদের বেলাতে সত্য তা নয়। বুদ্ধিমতী ও বুদ্ধিমানদের বেলাতেও ঐ কথা সত্য বলে জানা গেছে।

এ দেশের ছেলেমেয়েদের পছন্দ অপছন্দ নিয়ে কোন ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের পছন্দের একটি ক্রম আমরা পেয়েছি। প্রাথমিক বিভাগের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৪২ ও মাধ্যমিক বিভাগের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ২৫। সূতাকাটা,

তাঁতের কাজ, বাগানের কাজ ও সেলাই—এসব হাতের কাজ ঐ বিদ্যালয়ে শেখান হয়। ছেলেমেয়েরা যা বলেছে তার থেকে দেখা গেল যে লেখাপড়াকেই তারা বেশী পছন্দ করে ; হাতের কাজ তাদের পছন্দের ক্রমে মাঝামাঝি কিম্বা তৎপরবর্তী স্থান অধিকার করেছে। প্রাথমিক বিভাগের ছেলেমেয়েরা হাতের কাজ যতটুকু পছন্দ করে, মাধ্যমিক বিভাগের ছেলেমেয়েরা তাও করে না।*

ছেলেমেয়েদের সংখ্যাল্পতার জন্য পছন্দের ক্রমটি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজের প্রতি মনোভাব অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল। তবে হাতের কাজ শেখাবার সুযোগ ও ব্যবস্থাও সেখানে তত ভালো নয়। পছন্দের ক্রমটির দ্বারা কিছু ছেলেমেয়ের মতামত প্রকাশিত হয়েছে একথা স্বীকার করতে হবে।

বাঙলা দেশের ছেলে মেয়েদের মনোভাবের সম্ভাব্য কারণ

হাতের কাজের প্রতি গ্রেটবৃটেনের ও বাঙলা দেশের ছেলেমেয়েদের মনো-ভাবের অমন পার্থক্যের কারণ কি? ওদেশের ছেলেমেয়েরা হাতের কাজকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে ; এদেশের ছেলেমেয়েরা হাতের কাজকে মধ্যম রকমের পছন্দ করে। এদেশের ছেলে-মেয়েদের দেহমনের স্বাভাবিক গঠন ওদেশের ছেলেমেয়েদের দেহমনের স্বাভাবিক গঠন থেকে ভিন্ন রকমের—এমন মনে করবার কারণ নেই। আমাদের মতে এর প্রধান কারণ বড়দের মনোভাব, সামাজিক সংস্কার। হাতের কাজের প্রতি এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোভাব মোটেই অনুকূল নয়। লেখাপড়াকে আমরা বড় বেশী মূল্য দিই, হাতের কাজকে সে পরিমাণে আমরা ছোট মনে করি। যে সংস্কারের মাঝখানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা গড়ে ওঠে—হাতের কাজকে তারা অবজ্ঞা করতে শিখবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। যে কাজ তাদের নিজের চোখেই ছোট সে কাজকে তারা কেমন করে সর্বান্তঃকরণে পছন্দ করবে? যদি করে, তাহলে তারা ছোট হয়ে যাবে না? বালিগঞ্জ গভর্মেণ্ট স্কুলের একটি ছেলে হাতের কাজকে পছন্দের ক্রমে—'দ্বিতীয় স্থান' দিয়েছিল। সে কথা শুনে শ্রেণীর কয়েকটি ছেলে তাকে পরে বললে—"দেখো, স্যার তোমাকে কি বলেন! তুমি হাতের কাজ পছন্দ কর লিখেছ!" কিছুটা অন্যের কাছে ছোট হয়ে যাবে, কিছুটা নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে—এই আশঙ্কাতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সহজ হতে পারে

* তালিকাটি 'কৌতূহল ও জ্ঞানার্জন' অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

না, নিজেদের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারে না। 'হাতের কাজের' স্থান পছন্দের ক্রমে নীচু স্থান অধিকার করবার এটাই প্রধান কারণ বলে আমাদের বিশ্বাস।

হাতের কাজের প্রতি ওদেশে এত বিজাতীয় অবজ্ঞা নেই। ওদেশের অধিকাংশ লোকই নিজেদের অনেক কাজ নিজেরা করে নেয়। তাই হাত তাদের আমাদের চেয়ে সচল ও হাতের কাজের প্রতি তাদের মনোভাবও অপেক্ষাকৃত অনুকূল। সেজন্যই ওদেশের ছেলেমেয়েরা 'হাতের কাজ' পছন্দ সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার ব্যাপারে এদেশের ছেলেমেয়েদের চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক।

বিদ্যালয়ে যা ছেলেমেয়েদের পঠণীয় ও করণীয় তা পড়তে এবং তা করতে তারা পছন্দ করবে—শিক্ষাদ্বারা তারা পূর্ণভাবে লাভবান হতে হলে এটা আবশ্যক। কিন্তু যে কাজ করতে শিশুরা চায়, যে কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ আছে বিদ্যালয়ে সে কাজ করবার সুযোগ থাকা দরকার। কোন জিনিষ বানান, কোন কিছু তৈরি করা শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়তা করে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

হাতের কাজে বিভিন্ন জৈবিক ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ও উর্ধ্বায়ন

গঠন প্রবৃত্তি মনের একটি প্রেরণা। মনের অন্যান্য প্রেরণার সঙ্গে তার গভীর যোগ আছে। সে কারণে যে কোন গঠনের কাজে মনের বহুবিধ ইচ্ছাই পরিতৃপ্ত হয়। ইচ্ছা একটি সক্রিয় শক্তি। প্রবল অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা মনকে পীড়িত করে। গঠনমূলক কর্মে সে ইচ্ছার কিছু রূপান্তর ও উর্ধ্বায়ন সম্ভব। এই আদিম ইচ্ছাসমূহের মধ্যে যৌন ইচ্ছা ও ধ্বংসাত্মক ইচ্ছার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঠের কাজে যখন শিশু করাত চালায়, পেরেক ঠোকে—গঠনের প্রেরণার সঙ্গে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা যুক্ত ও উন্নীত হয়ে তৃপ্ত হয়। বাগানের কাজে যখন কর্ষণ করা হয়, কিছু বপন করা হয়—রূপান্তরিত যৌন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটে। ইচ্ছার রূপান্তর ও পরিতৃপ্তির ফলে মনের সহজ শান্ত সুরটি ফিরে আসে, মনের ভারসাম্য বজায় থাকে; একদিক দিয়ে মানুষের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বাড়ে, অপরদিক দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটে।

শিশুর মধ্যে একটি সুস্থ আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য তার শৈশব জীবনে দরকার সাফল্য ও কৃতকার্যতা। সাফল্য ও কৃতকার্যতার একটি মাপকাঠি শিশুমনের কাছে রয়েছে। বড়দের প্রশংসা শিশুকে আনন্দ দেয়, শিশু হয়ত

গর্বিত হয় কিন্তু সে সাফল্যকে যতক্ষণ না সে নিজের মন থেকে সাফল্য মনে করতে পারছে ততক্ষণ তা দ্বারা তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে না। বিদ্যালয়ে শিশুরা প্রধানতঃ লেখাপড়া শেখে। কিছু কিছু গড়া ও সৃষ্টির কাজও তারা করে। সৃষ্টির জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের শিখতে হয়। লেখাপড়া শিখে নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করতে দীর্ঘ দিনের চেষ্টা দরকার। অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে হাতের কাজের ক্ষেত্রে কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব। অন্তত 'কিছু গড়েছি, কিছু গড়তে পেরেছি'—শিশু তা মনে করতে পারে। এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা ঘটে। ফলে আত্মবিশ্বাস লাভ করা তার পক্ষে সহজ হয়।

হাতের কাজের দ্বারা আত্মবিশ্বাস লাভ

এদেশের লোকেদের একটি বৃহদংশ হীনতাবোধে ভোগে। হীনতাবোধ একটি কষ্টকর অনুভূতি, মানসিক সুখ ও স্বাস্থ্যের একটি বড় বাধা। সচেতন হীনতাবোধের সঙ্গে অচেতন মনের অপরাধবোধের একটি সম্বন্ধ আছে বলে দেখা গেছে। শিশুর মধ্যে একটি ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা আছে। ঐ ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাদ্বারা সে তার প্রিয়জনদের ক্ষতি করবে এই আশঙ্কায় ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাকে সে অবদমিত করে। কিন্তু তবুও যখনি কারো অসুখ বিসুখ হয়, বিপদ আপদ ঘটে, কোন জিনিষ ভেঙ্গে যায়—সে মনে করে যে কারোর বৈর ইচ্ছার দ্বারাই অমন ঘটেছে। কারো অসুখ করলে সে জিজ্ঞাসা করবে, 'কে মেরেছে?' কোন জিনিষ ভাঙ্গলে সে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। তার মনে হয় যে সে একটি গুরুতর অপরাধ করেছে। মনের গভীরে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা থাকার জন্য তার ধারণা জন্মায় যে ঐ কাজ সেই করেছে। শিশুকে তখনি যদি বলা হয়—ওষুধ দিয়ে অসুখ সারিয়ে দেব, জিনিষটাকে জোড়া লাগিয়ে দেব কিম্বা অমন আরেকটা জিনিষ বানিয়ে দেব—শিশু অনেকখানি তৃপ্তি পায়। জোড়া লাগান বা বানাবার সুযোগ পেলে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে শিশু সে কাজে লেগে যায়। তার অন্তঃস্থলের কথা হল—'আমি ভেঙ্গেছি, আমি মেরেছি, আমি আবার গড়ব, আমি আবার বাঁচাব।' সব জিনিষকেই শিশুমন সজীব মনে করে। কাউকে মেরে শিশু যদি তাকে আবার বাঁচাতে পারে তবে অত সে ভয় পাবে কেন? গঠনমূলক কাজকে এদিক দিয়ে ক্ষতিপূরক * বলা হয়। ক্ষতি-পূরণের দ্বারা উদ্বেগ ও অপরাধ-বোধ কমে। হীনতাবোধের হ্রাস হয়।

মনের গভীরে হাতের কাজের তাৎপর্য

* একে মনঃসমীক্ষায় **'restitution'** বলা হয়।

বিমূর্ত বুদ্ধি যে সব ছেলেমেয়েদের কম, লেখাপড়ায় যারা কাঁচা—তাদের শিক্ষায় হাতের কাজের প্রয়োজন আরও বেশী। বুদ্ধিসম্পন্নদের তুলনায় স্বল্পবুদ্ধির ছেলেমেয়েরা হাতের কাজে সাধারণতঃ অধিক পটু এমন একটা ধারণা চলতি আছে। ঐ ধারণা সত্য নয়। তবে একথা ঠিক যে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় যতটা অক্ষমতা—হাতের কাজে ততটা অক্ষমতা নয়। একথার অবশ্য অর্থ এই নয় যে, যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে বা মেয়ে যে কোন অল্পবুদ্ধিযুক্ত ছেলে বা মেয়ের অপেক্ষা হাতের কাজে অধিক পারদর্শী। মোট কথা, হাতের কাজে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া অপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা দেখাতে পারে। স্বল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের বেলায় এ উক্তি আরো বেশী সত্য। লেখাপড়া ব্যাপারে সাধারণ ও উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা নিজেদের অত্যন্ত ছোট বলে মনে করতে আরম্ভ করে। হাতের কাজে সাফল্যের দ্বারা সে হীনতাবোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়—একথা মনে করা চলে।

হাতের কাজ শেখার দুটি পদ্ধতির কথা হেক্টর ল্যাম্ব (৪) উল্লেখ করেছেন। এক, সৃজনাত্মক পদ্ধতি; দুই, টেকনিক পদ্ধতি। সৃজনাত্মক পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েদের গোড়া থেকেই কোন সত্যিকার জিনিষ বানাতে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, উৎসাহিত করা হয়।

হাতের কাজ শেখাবার পদ্ধতি

টেকনিক পদ্ধতিতে হস্তশিল্পের টেকনিকটি গোড়াতে আয়ত্ত করবার উপর জোর দেওয়া হয়। সৃজনাত্মক পদ্ধতি ও টেকনিক পদ্ধতিতে কাঠের কাজ শেখবার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। সৃজনাত্মক-পদ্ধতিতে কাঠের কাজ শিক্ষার গোড়াতেই একটা আলনা বানান হবে স্থির করা হল। ছেলেমেয়েরা কাজটি করতে গিয়ে যে বিভিন্ন নৈপুণ্য আবশ্যক তা আয়ত্ত করল। টেকনিক পদ্ধতিতে প্রথমতঃ ছেলেমেয়েরা যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখে। তারপর একে একে কাঠ কাটা, মসৃণ করা, জোড়া লাগান এসব তারা আয়ত্ত করে।

ল্যাম্ব বারো থেকে চোদ্দ বছরের চল্লিশটি ছেলেকে দুটি সমকক্ষ দলে বিভক্ত করেন। একটি দলকে টেকনিক পদ্ধতিতে, অপর দলকে সৃজনাত্মক পদ্ধতিতে হস্তশিল্প শেখবার সুযোগ দেওয়া হয়। শেখবার আগ্রহে, ক্লাসে উপস্থিত থাকায় ও কাজে উন্নতিলাভে টেকনিক দলের তুলনায় সৃজনাত্মক দলকে

বেশী ভাল দেখা গেল। নয় মাস কাল শিক্ষালাভের পর সৃজনাত্মক দল অধ্যবসায়, আত্মনির্ভরতা ও নির্ভুলভাবে কাজ করার ব্যাপারে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করেছে—ল্যাম্ব তা লক্ষ্য করলেন।

বিভিন্ন মানসিক স্তরের উপযোগী হাতের কাজ

গোড়াতে হাতের কাজের জন্য দরকার এমন ধরণের মালমশলা যেগুলিকে শিশু অল্প চেষ্টাতে ইচ্ছামত রূপ দিতে পারে। নিজের দেহ ও মনের উপর শিশুর কর্তৃত্ব কম। সুতরাং কাজও তার সহজসাধ্য হওয়া আবশ্যক। কাদা, প্ল্যাস্টিসাইন ও ভিজে বালি নিয়ে শিশু খেলা করতে ভালবাসে। ঐ জাতীয় মালমশলা দিয়ে নিজের ইচ্ছামত জিনিষ গড়ে শিশু গঠনমূলক মনোভাবের পরিতৃপ্তি সাধন করে। শিশু যত বড় হয় সূক্ষ্ম কাজ করা তার পক্ষে তত সম্ভব হয়। শক্ত মালমশলা নিয়েও সে তখন কাজ করতে সমর্থ হয়। এসব

হাতের কাজের শ্রেণী বিভাগ : নৈপুণ্য অর্জন ও সৃজনাত্মক কাজ

কাজকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমতঃ একটি বিশেষ নৈপুণ্যকে আয়ত্ত করা। মানুষ হয়ত বহুদিনের সাধনায় কোন একটি কৌশল উদ্ভাবন করেছে। অভ্যাসের দ্বারা সে কৌশলটিকে শেখার দরকার হয়। চরকার সাহায্যে সুতাকাটা তার একটি দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়তঃ সৃজনাত্মক কাজ। সৃজনাত্মক কাজ করবার জন্যও কমবেশী নৈপুণ্য অর্জন আবশ্যক হয়। কিন্তু তারপর ছেলেমেয়েরা ঐ ক্ষমতার সহায়তায় নব নব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। মাটি দিয়ে ইচ্ছামত জিনিষ বানান, খুশীমত ছবি আঁকা—এ ক্ষমতার দৃষ্টান্ত। সুতাকাটা কিম্বা পুতুল বানানো—দুয়ের মধ্যেই 'কিছু করলাম, কিছু বানালাম' এ মনোভাব তৃপ্ত হয়। তবে ইচ্ছামত পুতুল (দেখে দেখে বানানো নয়) বানানোতে মনের যতখানি স্বাধীনতা, সুতাকাটাতে সে স্বাধীনতা নেই। প্রথমটিতে বড়রা যেমন করে আমি তেমন করি, আমি বড়—শিশুর এই ইচ্ছাটি তৃপ্ত হয়। সৃজনাত্মক কাজ, অপরপক্ষে, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি নিজস্ব সত্তা আছে। অন্য দশজনের থেকে সে আলাদা। সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে সেই বিশিষ্ট সত্তার পূর্ণতর উপলব্ধি ঘটে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশকে পার্সি নান (৫)—শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বলেছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সৃজনাত্মক কাজের অবদানটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

অধ্যায় ৫

আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-নতি

আত্মপ্রতিষ্ঠাকে ম্যাকডুগাল একটি সহজ প্রবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন, খেলায় জয়লাভ করা, সাইকেল, মোটর প্রভৃতি চালানো এই প্রবৃত্তির পরিচায়ক, এসব কাজের দ্বারা একজন লোক নিজের ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা

এই প্রেরণাটিকে আডলার (১) জীবনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। শিশুদের মধ্যে থাকে হীনতা ও অপূর্ণতাবোধ। বড়দের তুলনায় নিজেদের তারা নিতান্ত ছোট মনে করে। বড়রা যা পারে তারা তা পারে না। এই হীনতা ও অপূর্ণতাবোধ শিশুদের পীড়িত করে। বড় হবার জন্য, ক্ষমতালাভের জন্য তাদের মন উন্মুখ হয়।

আডলারের মতবাদ

শিশুর কর্মের অনেকখানি শক্তি আসে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা থেকে। একটু বড় হলেই শিশু বসতে চেষ্টা করে, হাঁটতে চেষ্টা করে, নিজের হাতে খেতে চায়। কথা বলতে পেরে, লেখাপড়া শিখতে পেরে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এসব কিছুর মধ্যে যেমন আত্মপ্রকাশের অর্থাৎ বিভিন্ন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির প্রেরণা আছে তেমনি আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা।

শিশুদের মধ্যে, বড়দের মধ্যেও, আরকেটি প্রেরণা দেখা যায় যাকে অনেকক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। মানুষ অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। অন্যেরা আমাকে দেখুক, অন্যেরা আমাকে বুঝুক, আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোক, আমার মূল্য উপলব্ধি করুক—প্রত্যেকের মধ্যেই এই গভীর কামনাটি আছে। এই কামনা আছে বলেই কেউ যদি আমার কথা মন দিয়ে শোনে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হই। আমার কথা কেউ যদি মনে রাখে তার কাছে নিজেকে আমি ঋণী বলে বোধ করি।

অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ

আমি শত সহস্রের একজন—এই অনুভূতি অনেক সময় মানুষকে পীড়িত করে। মানুষ নিজের মূল্য খুঁজে পায় না। নিজের অস্তিত্বও তার কাছে অকিঞ্চিৎকর ও অর্থহীন বলে বোধ হয়। আমার প্রতি অন্য একজনের মনোযোগ আমাকে মূল্য দেয়। অন্যের কাছ থেকে মূল্য পেয়ে—অন্ততঃ মূল্য পাচ্ছি মনে করে নিজেকে আমি মূল্য দিই। আমার অস্তিত্ব যদি আরেকজনের কাছে প্রয়োজনীয় হয় তবে আমার কাছেও তার দাম আছে।

প্রেমে একজন অপরজনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হয়। প্রেমিকার কাছ থেকে মূল্য পেয়ে প্রেমিক বলে ঃ

"অয়ি মহিয়সী মহারাণী, তুমি মোরে করেছ সম্রাট।"

প্রেমে যে অনুভূতির তীব্র প্রকাশ সহজ প্রীতির সম্বন্ধে তাকে অল্পপরিমাণে দেখা যায়।

নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে কিম্বা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিজেকে সে মূল্য দেয়, নিজের কাছে নিজের মূল্য বাড়ে। নিজেকে মূল্যবান মনে করবার ইচ্ছা ঐ দুয়ের দ্বারাই তৃপ্ত হয়। এই দিক দিয়ে দুটি প্রেরণার মধ্যে ঐক্য থাকলেও ঐ দুটি প্রেরণার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। বস্তু বা ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্বে অনেক সময় মানুষের কাছে নিজের 'আমি'টাই প্রধান। যাদের ওপর আমার আধিপত্য তাদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের কোন যোগাযোগ ঘটছে না। এ কারণেই ক্ষমতালিপ্সা সামান্য বাধা পেলে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতালিপ্সা কিছুপরিমাণে নিষ্ঠুর। সময় বিশেষে তাকে আক্রমণাত্মক আচরণের ঊর্ধ্বায়ন বলা যায়।

অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের মধ্যে নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যেও আমার কাছে কিছু পরিমাণে বড় হয়ে ওঠে। যার মনোযোগ আমি আকর্ষণ করছি তাকেও আমি ব্যক্তি বলে মনে করি। আধিপত্য বিস্তারের বেলাতে সে আমার কাছে বস্তু মাত্র। যে আমাকে মূল্য দিল তাকে আমি মূল্য দিই। সে আমার চক্ষে প্রীতির বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য বলা যায় অন্যের কাছ থেকে যখন আমরা মূল্য পাই তখন অন্যের কাছে নিজের মূল্য আছে জেনে খুশী হই এবং এও মনে হয় অন্যের প্রীতি আমি লাভ করলাম। তার প্রতি মনে কৃতজ্ঞতা জাগে। অহমিকায় যে অন্ধ কেবল তার বেলাতেই এর ব্যতিক্রম হয়।

এই দুটি মনোভাবের মধ্যে কোনটি আদিম এ প্রশ্ন আসে। দুটি সহজ প্রেরণা হলেও অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করাই সম্ভবতঃ আদিম। গভীরভাবে বিচার, করলে অন্যের ভালবাসা পাওয়াই হচ্ছে মূল ইচ্ছাটির রূপ। ভালবাসা পেয়ে যে পরিতৃপ্ত, ক্ষমতালিপ্সা তার কাছে উগ্রভাবে দেখা যায় না। বড় ছোট, উচ্চাশা—এসব কথারও বিশেষ মূল্য তার কাছে নেই।

ঐ দুটি প্রেরণা কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টার কথা আমরা জানি। বীরত্বের পরিচয় দিয়ে নারীর মন জয় করবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় নাইটদের কাহিনীতে, রামায়ণ ও মহাভারতে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ

দুটি বোন। বড়টির সতর ও ছোটটির যোল বছর বয়স। বড়টি মা বাবার ভালবাসা পেয়েছে। ছোটটির ভাগে বোধহয় ভালবাসা কম হয়েছে। অন্ততঃ তার ধারণা তাকে কেউ ভালবাসে না। প্রথমটির কাছে উচ্চাশার বিশেষ মূল্য নেই। লেখিকার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সকলে তাকে ভালবাসুক, ভাল বলুক—তাহলেই সে খুশী। ছোটজন বললো, তার ইচ্ছা সে বড় হয়ে ডাক্তার হবে। সবাই তাকে মানুক, সকলের উপর সে কর্তৃত্ব করতে পারুক এই হলেই তার ভাল হয়। অন্যে তাকে ভাল বলুক, অন্যে তাকে ভালবাসুক এটা তার কাছে বড় কথা নয়। কিছুক্ষণ কথা বলবার পর অবশেষে সে বললো যে কেউ তাকে ভালবাসে না। সে বিশ্বাস করে না যে কেউ তাকে ভালবাসে। এই কথা বলতে বলতে ছোটটি কেঁদে ফেলল। মনে হল ভালবাসায় অবিশ্বাস ও ক্ষমতালিপ্সার মধ্যে একটি গভীর সম্বন্ধ আছে। ভালবাসা পায় নি বলেই ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা তার কাছে এত বড় হয়েছে।

একটি প্রেরণার শক্তি আরেকটি প্রেরণাকে প্রবল করলেও শিশুজীবনের দিকে তাকালে বর্তমানে দুটিকেই মৌলিক প্রেরণা বলে মনে করা সঙ্গত হবে। শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নব নব ক্ষমতা অর্জন করে। চলাফেরার, কথাবলার, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইচ্ছামত পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করে সে আনন্দ পায়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তার ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ হয়। অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার ইচ্ছা শিশুর কাজেকর্মে বারে বারে ফুটে উঠে। মা বাবা তার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে অন্যের সঙ্গে কথা বললে শিশু বিরক্ত হয়, নানাভাবে মা বাবাকে জ্বালাতন করে। শিশু সকলের দৃষ্টির কেন্দ্ররূপে বিরাজ করুক শিশুমনে এমন একটি ইচ্ছা আছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রেরণার পরিতৃপ্তির ফলে ছেলেদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। অন্যের উপর প্রভুত্ব করে মানুষ নিজেকে বড় মনে করে। যে কাজ মানুষ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে সে কাজ বার বার করবার সুযোগ পেলে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস জন্মায়। এককথায় আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রেরণা সম্যক তৃপ্ত হলে শিশু মনে করে 'আমি কাজের'।

আত্মপ্রতিষ্ঠা পরিতৃপ্তির প্রয়োজন

এই ছোট বিশ্বাসটুকুর মূল্য কতখানি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের মনের খবর যদি

আমাদের জানা থাকে আমরা বুঝতে পারব। বেশীরভাগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাদের ধারণা—'আমরা কোন কাজের নই'।

আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্দম প্রেরণা ছেলেমেয়েদের মধ্যে রয়েছে। যেখানে সামাজিক ভাবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না সেখানে ঐ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য অসামাজিক, এমনকি সমাজবিরোধী পথ শিশুরা খুঁজে নেয়। দেখা গেছে বুদ্ধি যাদের কম, লেখাপড়ায় যারা ভালো নয়, তাদের মধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলের খেলনা ভাঙ্গে, সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়।* যে পাঠ আয়ত্ত করা ঐ ছেলেমেয়েদের সাধ্যাতীত সে পাঠ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়। সমাজ-বিরোধী কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুল তথা সমাজের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ চরিতার্থ করে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে কিছু করবার ক্ষমতা আছে তারও পরিচয় দেয়। সবাই বড় হতে চায়। রাম না হতে পারি—রাবণ হব। কলেজে ষ্ট্রাইক করা সম্বন্ধে একটি ছাত্র লেখককে যা বলেছিল, তাতে ঐ সত্যটি ফুটে উঠেছে। সে বলেছিল—'ষ্ট্রাইক না করলে বেঁচে আছি বলে বুঝতে পারি না।' ছেলেদের জীবনে সুস্থ ও স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ কম হলে সংগ্রামের নাটকীয় কার্যকলাপ তাদের মনকে টানবে এতে আশ্চর্যের কী আছে? সেইজন্য বিদ্যালয়ে এমন পাঠ ও কাজের ব্যবস্থা থাকা উচিত যা দ্বারা ছেলেমেয়েদের ঐ প্রেরণাটি সুষ্ঠুভাবে তৃপ্ত হয়। বিদ্যালয়ে ঐ জন্যই হাতের কাজের একটি বড় স্থান থাকা দরকার। ঐ কাজটি ছেলেমেয়েরা ভালবাসে, পারেও। উৎসব, অভিনয়, ক্রীড়ার মধ্য দিয়েও কেউ কেউ নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

অসামাজিক কর্মে আত্মপ্রতিষ্ঠা

আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের উচ্চাভিলাষের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আছে। উচ্চাভিলাষের মূলে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা। যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার কথা আজকাল কেউ আর ভাবে না। উচ্চাভিলাষকেই আজকের সমাজ বড় করে দেখে। বড় হতে হবে-ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আমরা ভাবি। 'আমরা বড় হব' আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাবে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ

---

* এ সম্পর্কে সিরিল বার্টের অনুসন্ধান (২) উল্লেখযোগ্য। ২০০টি অল্পবয়সী অপরাধীর সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করেন। দেখা যায়—তাদের ৮০% বুদ্ধিতে ১০৩'র নীচে।

ছেলেমেয়েদের সামর্থ্য ও প্রতিভায় পার্থক্য আছে। কারো প্রতিভা বেশী, কারো প্রতিভা কম ; কারো সামর্থ্য বেশী, কারো সামর্থ্য কম। সামর্থ্য আছে, প্রতিভা আছে কিন্তু উচ্চাশা বা প্রেরণা নেই অমন জীবনে প্রতিভার অপচয় ঘটে। একজনের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব ছিল—ততখানি সে করল না। সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হল, সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হল। উচ্চাশা ও প্রতিভার যেখানে সঙ্গতি রয়েছে সেখানে বলার কিছু নেই। অমন জীবন সার্থক হবে এবং আশা করা যায় সুখী হবে। কিন্তু যে জীবনে উচ্চাশা আছে কিন্তু তদনুযায়ী প্রতিভা বা সামর্থ্য নেই—সে জীবনে দুঃখ ও অসন্তোষকে ডেকে আনা হয়। যা হতে চায়, তা এরা হতে পারে না। কিন্তু যা আছে তাতেও এরা সন্তুষ্ট হয় না। শেষের ধরণের একটি প্রমাদ আজকের সমাজ-জীবনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। উচ্চাশাকেই আজকে আমরা বেশী বড় করে দেখছি। জীবনে সন্তুষ্টির প্রয়োজন আছে একথা আমরা ভুলতে বসেছি। উচ্চাশা ও সন্তুষ্টি, জীবনে দুইয়েরই দরকার আছে। শিশুদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়া আবশ্যক। যাদের যা সামর্থ্য তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে জীবনকে তারা সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলুক, এটি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু যা তাদের সাধ্যাতীত, যা লাভ করা তাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় তেমন একটি জীবনের প্রতি লোভ না করার শিক্ষাও শিক্ষার আরেকটি দিক হওয়া দরকার। যা তারা পেল তাতেই তাদের সন্তুষ্ট হতে শিখতে হবে ; নিজেদের পরিপূর্ণ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে।

নিজেদের তারা গ্রহণ করতে পারবে কিনা সেটা প্রধানতঃ নির্ভর করে, বড়রা—পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের কিভাবে গ্রহণ করেছেন তার উপর। স্নেহের চক্ষে বড়রা যদি ছোটদের দেখতে পারেন তবে শিশুদের দোষগুণটা তারা বড় করে দেখবেন না। তাদের কাছে বড় হবে মানুষ হিসেবে শিশুর প্রয়োজন, মানুষ হিসেবে শিশুর বাঁচবার দাবী। স্নেহশূন্য পরিবার ও সমাজে রূপ গুণের মাপকাঠিতে কে কতখানি গ্রহণযোগ্য তার বিচার হয়। শিশুর প্রতি বড়দের মনোভাবটি শিশুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ঐ মনোভাবকে আশ্রয় করে নিজের প্রতি তার মনোভাবটি গড়ে উঠে। বাবা মা যাকে 'দূরছাই' করে নিজেকে সে চিরদিন দূরছাই করবে। শত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বাবা মা যাকে ভালবেসেছেন, গ্রহণ

করেছেন—নিজেকে সে বহুল পরিমাণে প্রীতির চক্ষে দেখবে, নিজেকে সে গ্রহণ করতে শিখবে।

উগ্র উচ্চাশার মূলে অনেক সময় (বোধ হয় সব সময়ই)—ভালবাসার দৈন্য থাকে। অন্যের ভালবাসা পেল না অন্যকে ভালবাসতে পারলো না তাই উচ্চাশা নামক আত্মপ্রেমের পথ ব্যক্তি বেছে নিল।

উগ্র উচ্চাশার একটি কারণ ঃ ভালবাসার দৈন্য

বড় হব, বড় হতে হবে এমন যারা মনে করে তাদের দুভাগে ভাগ করা চলে। 'আমার গুণ নেই, তাই কেউ আমায় ভালবাসে না ; আমি যদি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারি তবে অন্যের ভালবাসা, অন্যের সমাদর পাব' কারো কারো বড় হবার চেষ্টা ও ইচ্ছার মূলে এমন একটি ইচ্ছা থাকে। আরেক দলের হতাশা আরও গভীর। তারা মনে করে তারা ভালবাসা পায়নি, পাবেও না। ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে মানুষের প্রতি তাদের মনোভাবে থাকে অনেকখানি বিদ্বেষ ও ঘৃণা। বড় হওয়ার একটি অর্থ তাদের চক্ষে অন্যদের হারিয়ে দেওয়া, অন্যদের ছোট করা।

শিশুদের মধ্যে (বড়দের মধ্যেও) যে অপূর্ণতাবোধ আছে অন্যের মনোযোগ সেই অপূর্ণতাবোধকে কিছুটা দূর করে। ঐ মনোযোগ বা প্রশংসার মধ্যে স্নেহ ও প্রীতি পেলাম—শিশু এমন মনে করে। এবং সে কথা সত্যও। প্রীতির চোখে শিশুকে বড়রা দেখছেন বলে তার গুণ বড়দের চোখে ধরা পড়ে।

শিশুজীবনে স্নেহ ও প্রশংসার প্রয়োজন

শিশুদের মধ্যে অনেকে নিজেদের খারাপ মনে করে। নিজের মধ্যে তার হীনতাবোধ রয়েছে। যে শিশুর ভাগ্যে বড়দের স্নেহ ও প্রশংসা অপর্যাপ্ত জুটেছে সে শিশু অনেক পরিমাণে ঐ মানসিক দীনতা ও অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রশংসার প্রয়োজন প্রত্যেক শিশুর জীবনে রয়েছে। শিশুর কথা মন দিয়ে শোনা দরকার। শিশুর কথা যদিবা আমরা শুনি একটু বড় হলে তার কথায় আর আমরা কান দিই না। আমরা চাই আমরা কথা বলব, তারা কথা শুনবে। শিক্ষার দিক থেকে তার কিছুটা দরকার আছে। কিন্তু বড়দের কাছে শিশুর মূল্য আছে এটি শিশু জানতে চায়, বুঝতে চায়। যখনি ঐ মূল্য সম্বন্ধে তার সংশয় জন্মে নিজেকে সে অত্যন্ত দীন মনে করে। শিশুর কথা

মনোযোগ দিয়ে শুনলে বড়দের কাছে তার মূল্য আছে এ কথা সে অনুভব করতে পারে।

আত্মনতি জীবনের আরেকটি স্বাভাবিক প্রেরণা। আত্মনতি প্রবৃত্তি আছে বলেই শ্রদ্ধাস্পদকে শ্রদ্ধা, প্রণম্যকে প্রণাম করে মানুষ তৃপ্তি লাভ করে। সু-উচ্চ হিমালয়ের কাছে দাঁড়িয়ে, সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মুখোমুখি হয়ে মানুষ নিজেকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করে। ঐ বিরাটত্বের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবার প্রেরণা তার মনে জাগে।

আত্ম-নতি

বড়র কাছে নিজেকে ছোট মনে করার ভিতরে আনন্দ আছে। দীনতার মধ্যে একপ্রকার পরিতৃপ্তি আছে। রবীন্দ্রনাথের গানের কয়েকটি লাইনের কথা আমরা স্মরণ করি ঃ

"ওই আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব ॥
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধুলার ধুলায় ধূসর হব ॥"

সবার সামনে নিজেকে সজোরে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করবার যেমন তৃপ্তি আছে তেমনি আত্মমোচনেরও একটি আনন্দ আছে। অন্যকে শাসন করে, অন্যের উপর প্রভুত্ব করে মানুষের যেমন আত্মপ্রসাদ হয়, তেমনি অন্যের প্রভুত্ব মেনে, অন্যকে সেবা করেও আনন্দলাভ করা যায়। অর্থাৎ বড় হবার সুখ যেমন আছে তেমনি ছোট হবার আনন্দও আছে।

কামজীবনে সক্রিয় কাম ও নিষ্ক্রিয় কামের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি। পুরুষের কাম অপেক্ষাকৃত সক্রিয়; নারীর কাম অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। তবে পুরুষের মধ্যেও নিষ্ক্রিয় কাম আছে এবং নারীর মধ্যেও সক্রিয় কাম রয়েছে। আবার সমকামের মধ্যেও সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দিক রয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সক্রিয় কামের এবং আত্মনতির সঙ্গে নিষ্ক্রিয় কামের সম্বন্ধ আছে বলে মনঃসমীক্ষকরা মনে করেন। ঐ দুই জাতীয় কামের পরিতৃপ্তির দ্বারা মানুষ সুখ পায়। ঐ দুটি কামকে ভোগের দুটি বিশিষ্ট ভঙ্গী বলা যেতে পারে।

বড় হয়ে যে আনন্দ পাওয়া যেতে পারে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু ছোট হবার আনন্দ আমাদের কাছে তত স্পষ্ট নয়। অনেকে ছোট হবার কথা

ভাবতেই পারেন না। ছোট হবার কথা শুনলেই তাঁদের অপমানবোধ হয়। অপমানবোধ একটি কষ্টকর অনুভূতি। আবার কেউ কেউ নিজেকে বাস্তবিকই হীন মনে করেন। 'আমি কিছু নই, আমি বাজে লোক'- এমন মনোভাব। নিজেকে ছোট মনে করে আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। এ তা নয়। নিজেকে এঁরা ছোট মনে করেন (সেটা হয়ত কিছুটা সত্য, কিছুটা আরোপিত) এবং তজ্জন্য অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেন। আরও লক্ষ্যণীয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের সম্বন্ধে অন্যদের যা ধারণা নিজেদের সম্বন্ধে তাঁদের সেই ধারণা নয়। অন্যরা যে মূল্য তাঁদের দেয় তার চেয়ে অনেক কম মূল্য তাঁরা নিজেদের দেন।

হীনমন্যতা

নিজের এই হীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া কোন কোন লোকের পক্ষে একান্ত কঠিন হয়। উল্টোটা তাঁরা ভাবতে চান, উল্টোটা তাঁরা ভাবতে আরম্ভ করেন। 'আমি মস্ত বড় আমার তুলনা নেই—ইত্যাদি'। অন্যদের কাছ থেকেও এই হীনতাকে ঢাকবার জন্য লোকেরা নিজেকে রাজা-উজির মনে করেন। সে জন্যই এ মনোভাবটিকে 'হীনতা কম্‌প্লেক্স' বলা হয়েছে। 'অহমিকা কম্‌প্লেক্স' বলেও একে কেউ কেউ আখ্যায়িত করেন।

হীনতা কম্‌প্লেক্স বা অহমিকা

হীনতাবোধের সঙ্গে 'হামবড়া' মনোভাবের সম্বন্ধ একটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট হবে। একদিন সন্ধ্যের সময় এক ভদ্রলোক একটি ডিসপেন্‌সারিতে উচ্চস্বরে—'ডাক্তার কোথায়', 'ডাক্তার কোথায়' বলতে বলতে ঢুকলেন। তাঁর মাথায় একটা জায়গা অল্প কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে। তাঁর ভাব দেখে মনে হল তিনি মস্ত বড় একজন লোক। কম্পাউণ্ডার—'ডাক্তার বেরিয়ে গেছেন' বলাতে তিনি উচ্চস্বরে বল্লেন 'আমার বাসায় তাকে পাঠিয়ে দিয়ো' ইত্যাদি। কম্পাউণ্ডার ক্ষীণস্বরে জবাব দিলেন 'আপনি কোথায় থাকেন ডাক্তার বাবু তো জানেন না।' কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করবার মত মনোভাব তাঁর নয়। 'আমি দেখতে পাইনি। পিছন থেকে—নইলে আমি দেখিয়ে দিতুম।' সামনের ভীড়কে উদ্দেশ করে তিনি বক্তৃতার স্বরে বলে চল্লেন। তাঁর পিছন পিছন একদল লোক এসেছিল। ব্যাপারটি উদ্ধার করে জানা গেল ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে আসছিলেন। পিছন থেকে একটা মহিষ এসে গুঁতো দিয়ে তাঁকে আরেকটি লোকের গায়ের উপর ফেলে দেয়। সেই লোকটির দাঁতে লেগে এ ভদ্রলোকের মাথার খানিকটা কেটে গেছে।

ভদ্রলোক মহিষের গুঁতো খেয়ে নিরতিশয় অপমানিত হয়েছেন। অপমান ঢাকবার জন্য নিজেকে তিনি মস্ত বড় কেউ কেটা মনে করছেন। এই ঘটনাটি লেখক আরেক ভদ্রলোককে বলাতে তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'মহিষে গুঁতোলে অপমানের কী আছে'? দুটি ভদ্রলোকের দুরকম মনোভাব। একজনের মনে হীনতাবোধ বাসা বেঁধে আছে। সামান্য কিছুতেই নিজেকে তিনি হীন মনে করেন। আবার সেই হীনতাকে ঢাকবার জন্য নিজেকে খানিকটা অতিরিক্ত রকম বড়ো ভাবতে হয়—দেখা দেয় হামবড়াই ভাব! আর একজনের মনে হীনতাভাবের বালাই নেই। মহিষের গুঁতোনোকে একটি দুর্ঘটনা হিসেবেই তিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন। এর মধ্যে মান অপমানের প্রশ্ন নেই।

নেপোলিয়ন বেঁটে ছিলেন, বাইরণ খোঁড়া ছিলেন, ডেমোস্থেনিস তোত্‌লা ছিলেন। নিজেদের অক্ষমতাকে তাঁরা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তাই একজনকে শ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভা, একজনকে শ্রেষ্ঠ কবি ও একজনকে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হিসাবে আমরা অবশেষে দেখতে পেলাম। এঁদের মধ্যে প্রতিভা ছিল, চেষ্টা ও অধ্যবসায় ছিল। তাই গৌরবের শিখরে এঁদের পক্ষে ওঠা সম্ভব হল। যে সব ক্ষেত্রে প্রতিভার অভাব আছে, চেষ্টার অভাব আছে সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় নিজেকে বড় করবার চেষ্টা না করে নিজেকে তাঁরা বড় মনে করেন। যদি রামবাবু নিজেকে ফ্রয়েডের সমতুল্য মনে করেন তবে তাঁকে আটকাচ্ছে কে? লোকে হাসবে? তা হাসুক। নিজের অহমিকার জালের বাইরে এসে কী সত্য, কী মিথ্যা সে তো তিনি দেখতে পাবেন না! নেশাগ্রস্ত লোক যেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, অহমিকার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে তেমনি তার দিন কাটবে।

কিন্তু অহমিকায় যারা ভোগে আত্মনতির মধ্যে যে গভীর আনন্দ আছে তা ভোগ করা তাদের জীবনে আর ঘটে ওঠে না। মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধে যে পরম আনন্দ আছে তা থেকে এদের অনেকখানি বঞ্চিত হতে হয়। 'হামবড়া' লোকদের শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পাছে তাঁদের অপমান হয় নিয়ত এই আশঙ্কায় মানুষের সঙ্গে এঁরা সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন না। মানুষের কাছ থেকে একটা দূরত্ব রেখেই এঁরা সারা জীবন কাটান। কিন্তু ঐ দূরত্বে আনন্দ নেই। গৌরবের চূড়ায় উঠেও তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালবাসা
করেছিনু আশা"

একটি জিনিষ এখানে স্পষ্ট করা দরকার। 'বড় হওয়াকে' আমরা হীনতা কম্‌প্লেক্স বা অহমিকা বলি না। নিজেকে প্রায় সর্বদা 'বড় মনে করাকে' অহমিকা বলা হয়। বড় মানে অন্যদের চেয়ে বড়। অহমিকা কম্‌প্লেক্স—কিছু পরিমাণে অসুস্থ মনোভাব। সে কথা যে বড় হয়েছে, তার বেলাতেও সত্য; যে বড় হয়নি তার বেলাতেও সত্য। জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের দ্বারা কেউ কেউ নিজের অসুস্থতাকে কিছু পরিমাণে ঢাকতে পারেন এই পর্যন্ত। আসলে, একজন কতটুকু বড় হতে পারে? নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন—সত্যের আমি কতটুকুই বা জেনেছি? আমি তো জীবনসমুদ্রের বেলাভূমিতে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। 'হামবড়া' ব্যক্তির মনঃসমীক্ষা করলেও মনের অসুস্থ রূপটি ধরা পড়ে।

বড় হওয়া ও অহমিকা

এখানে একটি প্রশ্ন করা চলে। আত্মপ্রতিষ্ঠা জীবের সহজ প্রেরণা। নিজের ক্ষমতা ও নিজের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হবার দরকার মানুষের আছে। কিন্তু এই সব প্রেরণার সহজ ও সুস্থরূপের সঙ্গে অহমিকা কম্‌প্লেক্সের পার্থক্য কি? মোটামুটি উত্তর হবে এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। আমি পারি। আমার ক্ষমতা আছে। ব্যক্তি বা বস্তুকে আমি পরিচালনা করতে পারি, তাদের উপর প্রভুত্ব করতে পারি। নিজের উপরও আমার কর্তৃত্ব আছে। আমি যদি পুরুষ হই নিজের পৌরুষ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে। আমি যদি একজন কাঠুরে হই তবে আমার সহজ বিশ্বাস থাকবে কুঠার দিয়ে আমি কাঠ কাটতে পারি, বাজারে গিয়ে সে কাঠ আমি বেচতে পারি। কাঠুরে হিসেবে আমার মূল্য আছে। শ্যাম তাঁতি। আমার মত কাঠ কাটা তার সাধ্য নয়। ঐ দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে বড়। কিন্তু তাঁতের কাজ আমি জানি না। তাঁতি হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়। আমি যদি নেতা হই তবে আমার বিশ্বাস থাকবে আমার কথা পাঁচজন শুনবে আমি তাদের চালাতে পারব। এক দিক দিয়ে আমি তাদের চেয়ে বড়। কিন্তু এমন বহুদিক আছে যেখানে তারা আমার

চেয়ে বড়। তাছাড়া এও আমি জানি, এই যে বড় ছোট এর মধ্যে সম্মান বা হীনতার কথা বড় নয়।

এই মনোভাব যখন রোগের পর্যায়ে পৌঁছায় তখন জগতে 'বড় ছোট' ছাড়া আর কিছু দেখি না। নিজেদের আমরা সবসময় বড় বলে ভাবি। আমি যদি কাঠুরে হই তবে আমি বিশ্বাস করি যে জগতে কাঠুরের চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই। আর সে কাজে আমার প্রতিভা অনন্য। এমন কোন ঘটনা যদি ঘটে থাকে যেখানে আমার ছোটত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে, সে সব ঘটনাকে আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলি। যে সব বিষয়ে আমি বাস্তবিকই ছোট সে সব বিষয়কে আমি আমল দিই না। এককথায় বাস্তব-বর্জিত, বাস্তব-বিস্মৃত অহমিকা-কম্‌প্লেক্সে আমি ভুগি। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে অন্যের প্রতি একটি বিরুদ্ধ মনোভাব অহমিকা কম্‌প্লেক্সের একটি লক্ষণ। যারা নমস্য অন্যদের কাছ থেকে তারা মূল্য লাভ করে। অহমিকা-কম্‌প্লেক্সে যে ভোগে সে নিজেকে যে মূল্য দেয় সেই মূল্য অন্যেরা তাকে দেয় না।

মানসিক স্বাস্থ্যের দুটি অর্থ

আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মোটামুটি মানসিক স্বাস্থ্যের ও অস্বাস্থ্যের রূপ আমরা উপরে বর্ণনা করলাম। মানসিক স্বাস্থ্যকে আমাদের পক্ষে দুইভাবে বোঝা সম্ভব। এক হচ্ছে সাধারণতঃ যেটুকু স্বাস্থ্য আমরা লোকের মধ্যে দেখি। এটা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান-মূলক সংজ্ঞা। একথা অবশ্য সত্য যে কেবলমাত্র পরি-সংখ্যানের সাহায্যে মানসিক স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য বোঝা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে যাদের সুস্থ বলা হয় তাদের চরিত্রে কিছু কিছু মানসিক গোলমাল থাকে। তবে সে ত্রুটির ফলে তাদের জীবনযাত্রা অচল হয় না। জীবনে তাদের কিছু আশা আনন্দ থাকে। অধিকাংশ মানুষকে এরা প্রীতির চক্ষে দেখে। তবুও বলব মানসিক স্বাস্থ্যের একটি আদর্শ আছে। সেই আদর্শে অধিকাংশের পক্ষে পৌছান সম্ভব না হলেও সেই আদর্শকে চোখের সামনে আমাদের রাখা দরকার।

আদর্শ মানসিক স্বাস্থ্যে যে পৌছায় অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতা থাকার জন্য সে অন্যদের চেয়ে বড় হয়ে গেল এ ধারণা তার হয় না এমন মনে করবার কারণ আছে। মানুষের প্রতি প্রীতির মনোভাবটাই তার প্রধান থাকে। মানুষকে সে ভালবাসে, মানুষের ভালবাসা সে চায়। নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করা মানেই নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে দেখা। এ মনোভাবে মানুষের প্রতি কিছুটা সচেতন বা অচেতন বৈরিতা আছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনতির সহজ ও সুষ্ঠু পরিতৃপ্তির বাধা কোথায় সে সম্বন্ধে গিরীন্দ্রশেখর বোসের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই দুটি প্রেরণার একটি যখন অপরটির পরিতৃপ্তির বাধা সৃষ্টি করে তখনই গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

যখন আত্মপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক তখন নিজেকে মানুষ দুর্বল বোধ করে, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তার সংশয় জাগে। আত্মনতি প্রেরণা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণাকে পেছনে টানে। আবার যে পরিস্থিতিতে আত্মনতির প্রয়োজন সে পরিস্থিতিতে নিজেকে নত করাতে এদের মানসিক বাধা আসে। 'মানুষের কাছে কেন মাথা নোয়াব, আইনশৃঙ্খলা কেন মানব'—এদের মুখেই শোনা যায়। মানা না-মানার বস্তু-গত যুক্তির দিকটা এখানে আমরা বিচার করছি না। নিজেদের নত করতে, কোন নিয়ম মানতে এঁরা আনন্দ পান না, এদিকটার কথাই বলছি। আনন্দ না পাবার কারণ, এঁদের আত্মনতি-প্রেরণা আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রেরণা দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনতির প্রেরণার দ্বন্দ্ব

এই দুটি প্রেরণা পরস্পর জট পাকালে কোনটারই সম্যক পরিতৃপ্তি হয় না। সহজ আত্মপ্রতিষ্ঠা বা সহজ আত্মনতি কোনটাই সম্ভব হয় না। অমন ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষার দ্বারা ঐ জটটি ছাড়াতে হয় যাতে প্রেরণা দুটি বাধামুক্ত হয়ে নিজেদের চরিতার্থ করতে পারে। তখন একটা বাসনা চরিতার্থ হলে, দেখা যায় অপর বাসনাটি মনে জাগে। এই সত্যটি বোঝাবার জন্য কথোপকথনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। দুটি সুস্থ লোকের কথোপকথনে একজন বলে, অপরজন শোনে। তার বলা শেষ হলে অন্যজন বলে, যে বলছিল সে শোনে। বলার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার উপাদানটা বড়, শোনার মধ্যে আত্মনতি। একজনের আত্মপ্রতিষ্ঠা অপরজনের আত্মনতি, আবার প্রথমজনের আত্মনতি দ্বিতীয়জনের আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই প্রেরণা-দ্বয়ের আত্মপ্রকাশের একটি ছন্দ আছে। দুটি অসুস্থ লোক। দুজনেই কথা বলছে, কেই শুনছে না। শুনতে গেলে তাদের অপমান হয়। তলিয়ে দেখলে দেখা যায় বলাতেও এদের আনন্দ কম, শোনাতেও এদের আনন্দ নেই। সূক্ষ্ম মানসিক বিশ্লেষণ ছাড়াও একথা বোঝা যায়, যে কথা কেউ শুনছে না সেকথা বলে কতটুকু আনন্দ পাওয়া সম্ভব? নিজেদের মনের অস্থিরতায়, নিজেদের জাহির করবার অদম্য প্রেরণায় এরা কথা বলে, কথা বলেই চলে। কেউ শুনুক আর নাই শুনুক। কথা বলায় এদের আনন্দ নেই, কিন্তু কথা বলতে না পারলে—'আমি কিছু নই, আমার আবার দাম কিসের'—এই মনোভাব এদের পীড়িত করে।

মনঃসমীক্ষা দ্বারা দ্বন্দ্ব মীমাংসা

আত্মনতি প্রেরণা পরিতৃপ্তির মধ্যে অনেকখানি আনন্দ আছে। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা সে আনন্দ লাভ সম্ভব নয়।

শিক্ষায় আত্মনতি প্রেরণার স্থান

সামাজিক জীবনে আত্মনতির বহু প্রয়োজন হয়। কত-জনের কত হুকুমই না প্রতিদিন আমাদের মানতে হয় সামাজিক নিয়ম মানতে হয়। রাষ্ট্রের আইন মানতে হয়। জীবনকে তাই আমরা বলি—'সমাজের সহিত সামঞ্জস্য সাধন', সমাজের সহিত খাপ খাইয়ে চলতে শেখা। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে। মাষ্টারমশাইদের কথা তাদের শুনতে হয়। স্কুলের নিয়ম ও শৃঙ্খলা তাদের মানতে হয়।

শৃঙ্খলা ভাঙ্গবার দিকে কোন কোন ছেলেমেয়েদের ঝোঁক দেখা যায়। কোন কোন বিধিনিষেধ হয়ত আছে যা তারা বুঝতে পারে না, যা তারা গ্রহণযোগ্য মনে করে না। কিছু কিছু বিধিনিষেধ বাস্তবিকই আছে যা ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলা চলে না। সে সমস্ত বিধিনিষেধ ছেলেমেয়েদের উপর না চাপানই ভালো। কিন্তু বিধিনিষেধ মাত্রেই 'তা মানব না, আমাদের যা খুশী তাই করব'—এমন ধরণের মনোভাব কারো কারো মধ্যে দেখা যায়। এদের মানসিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও আত্মনতি জট পাকিয়ে গেছে। বিধিনিষেধ মানার মধ্যেও এক গভীর তৃপ্তি আছে এ কথা অনুভব করার সুযোগ এদের হয় নি।

যারা শৃঙ্খলা মেনে চলে তারাও যে শৃঙ্খলা মেনে সবসময়ে আনন্দ পায় এ কথা সত্য নয়। শাস্তির ভয়ে কেউ কেউ শৃঙ্খলা মানে। শৃঙ্খলার প্রয়োজন এরা বোঝে না। প্রধানতঃ শাস্তির ভয়েই এরা শৃঙ্খলাভঙ্গ থেকে বিরত থাকে। শৃঙ্খলার প্রতি এদের মনোভাব দ্বিধাদীর্ণ। মানতে চাই না তবু মানতে হচ্ছে—এ মনোভাব মানসিক সুখ বা স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

শৃঙ্খলার প্রতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ আনুগত্য আত্মনতি প্রেরণা থেকেই আসবে সে জন্য বোধ হয় দুটি জিনিষ আবশ্যক। এক, শৃঙ্খলার অর্থ ও প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, যে শিক্ষার ফলে তারা শৃঙ্খলাকে আপন বলে গ্রহণ করবে সেই শিক্ষার মধ্যে শাস্তির চেয়ে ভালবাসার স্থান বেশী থাকা আবশ্যক। যাকে ভালবাসে, ভক্তি করে তার কাছেই মানুষ আত্মনতির প্রেরণা অনুভব করে। শিক্ষাদাতার প্রতি শিক্ষার্থীদের সত্যকার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকলে, তিনি চাইলে ছেলেমেয়েরা নিয়মশৃঙ্খলা মানবে।

কোনসময়ে, কি ভাবে কতটুকু তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ম মানতে বলবেন সেটা ছেলেমেয়েদের মনকে তিনি কতটা বোঝেন তার ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু সব-চেয়ে বড় কথা ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছেন কিনা। যাঁকে আমরা ঘৃণা করি হয়ত ভয়ও করি তার কথা শুনলে মন আমাদের বিদ্রোহ করে। যাঁকে আমরা ভালবাসি তিনি যদি আমাদের কাছে অনেক কিছু দাবী করেন—তবে সে দাবী মিটিয়ে আমরা আনন্দ পাই, তার কথা শোনবার একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা মনের মধ্যে অনুভব করি। মোটকথা মানুষের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও আনুগত্য নিয়ম ও শৃঙ্খলায় সঞ্চারিত হয়। মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থেকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মায়।

অধ্যায় ৬

ক্রীড়া

শিশুরা খেলা করে। সময় সময় বড়রাও।

খেলার স্বরূপ

খেলার স্বরূপ কি—এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। দেহ মনের শক্তির ব্যয় হয় মানুষের বিভিন্ন কাজে। কিন্তু শক্তির সবটুকুই কাজে ব্যয় হয় না। অতিরিক্ত বা বাড়তি শক্তি শিশু তথা মানুষ ব্যয় করে খেলায়। খেলার দ্বারা জীব নিজের অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করে—হারবার্ট স্পেন্সার এই মতবাদ প্রচার করেন।

হারবার্ট স্পেন্সারের মতবাদ : খেলা জীবের অতিরিক্ত শক্তিব্যয়

শিশুর কর্মক্ষমতা কম, কর্মের পরিধিও ছোট—তাই শিশু বেশী খেলা করে। বড়দের কর্মের পরিধি বড়, তাই খেলার পরিধি ছোট। এসব কথা বিবেচনা করলে স্পেন্সারের মতবাদে কিছু সত্যতা আছে স্বীকার করতে হবে। তবে কাজ করতে পারে না বলেই শিশু খেলে—এ কথার সবটুকু সত্য নয়। খেলার একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। কাজ ফেলেও লোকে খেলে।

কাজের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা কম। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত, খেলায় আনন্দই সবচেয়ে বড় কথা। খেলায় মানুষ নিজেকে অনেকখানি স্বাধীন অনুভব করে। খেলার নিয়ম আছে সত্য, কিন্তু সে নিয়ম খেলোয়াড়েরা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। কাজ করেন কেন জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ লোক বলবেন—'কাজ না করে উপায় নেই, তাই কাজ করি'। কিন্তু খেলেন কেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর হবে—'খেলতে ভালো লাগে বলে খেলি'। কেউ কেউ কাজকে খেলার মতই ভালোবাসেন—এ তথ্যের প্রতি পার্সি নান (১) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐসব ক্ষেত্রে তাঁর মতে কাজ খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।

খেলা স্বঃতস্ফূর্ত ও স্বাধীন

কাজ খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে না বলে কাজকে খেলার মত প্রীতিপ্রদ মনে করা হচ্ছে বললেই বোধহয় সঠিক বলা হবে। কারণ খেলা আমরা প্রধানতঃ খেলি খেলার জন্য। কিন্তু কেবলমাত্র কাজের জন্য কাজ নয়। জীবনধারণের কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ কাজ করে।

শিশুর চক্ষে খেলা ও কাজ

ম্যাথ্ (২) অবশ্য বলেছেন সাত বছরের পূর্বে ছেলেমেয়েরা কাজ ও খেলার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। তাদের চোখে কাজ ও খেলা এক। বোধহয় একথা বললে আরও সঠিক বলা হত যে তাদের কাছে প্রায় সবই খেলা। কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের ইচ্ছাকে, নিজের দেহমনকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা ছোট ছেলে-মেয়েদের সামান্যই আছে। যা করতে ইচ্ছা করে তাই তারা করে। তাই অনেক সময় বলা হয় শৈশব ও খেলা একই।

কার্ল গ্রুসের মতবাদ : খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়া

খেলার মূলে কোন্ প্রেরণা আছে—এটাও জানা দরকার। কার্ল গ্রুসের, ধারণা—খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরী হয়। ছোট ছেলে কল্পনায় ড্রাইভার হয়ে ট্রেন চালায়, কণ্ডাক্টার হয়ে টিকিট কাটে। ছোট মেয়ে রান্নাবাড়ি খেলে। খেলা যেন ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়া।

শিশু বড় হতে চায়, বড়দের মত হতে চায়। তার ক্রীড়া ও কল্পনা তার পরিবেশ থেকে তথ্য আহরণ করে। যে রেলগাড়ীতে চড়েছে, সে গার্ড হয়। যে এরোপ্লেন দেখেছে, সে পাইলট হয়। খেলার মধ্য দিয়ে বড় হবার আনন্দ সে লাভ করে। খেলা নানান্ দিক দিয়ে তার দেহমনের বিকাশে সাহায্য করে।

ষ্ট্যানলি হলের মতবাদ : খেলা বিবর্তনের সংক্ষিপ্তাবৃত্তি

কিন্তু খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়া এ মতবাদের দ্বারা খেলার সবটুকু ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। খেলায় অতীত পুনরুজ্জীবিত হয়। ষ্ট্যান্লি হলের কাছে এ মতবাদের জন্য আমরা ঋণী। ছোট ছেলেরা তীরধনুক নিয়ে খেলা করে। কল্পনায় জন্তু জানোয়ার শিকার করে। পরিবেশ থেকে ঐসব বিষয়ে শেখবার সুযোগ ছেলেদের কম হয়। তীরধনুক সভ্য মানুষেরা আজকাল ব্যবহার করে না। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ মনুষ্যাকৃতি লাভ করবার পূর্বে এমিবা থেকে আরম্ভ করে বিবর্তনের সব কিছু ধারা অর্থাৎ সব কিছু জীবাকৃতিই সে গ্রহণ করে।

ষ্ট্যান্‌লি হলের ধারণা—শিশুর মানসিক জীবনেও ঐ জাতীয় একটি বিবর্তন ঘটে। খেলা সম্বন্ধে এ মতবাদকে বিবর্তনের সংক্ষিপ্তাবৃত্তি বলা হয়। মানুষের পূর্ব-পুরুষ একদা তীরধনুকের সাহায্যে জীবজন্তু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। সেই পূর্বপুরুষ শিশুমনে রয়ে গেছে। সে কারণে এক সময়ে ঐ জাতীয় খেলা সে পুনর্বার আবিষ্কার করে। ঐ খেলা খেলে সে আনন্দ পায়। ঐ খেলা খেলেই সে বিবর্তনের একটি ধাপ অতিক্রম করে সভ্যতার দিকে এগিয়ে যায়।

কোন একটি ধারণা বা কল্পনা (যেমন তীরধনুকের ধারণা) মানুষ বংশানুক্রমে লাভ করে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রবৃত্তি ও প্রেরণা যে বংশগত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ম্যাকডুগালের মতবাদ ঃ খেলায় বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও প্রেরণা পরিতৃপ্ত হয়

মানুষের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি খেলার মধ্য দিয়ে বহুলাংশে পরিতৃপ্ত হয় ঐ সত্য ম্যাকডুগাল আবিষ্কার করেছেন। ম্যাকডুগালের মতে খেলা একটি সহজাত সাধারণ প্রেরণা। খেলার শক্তি—মূলতঃ বিভিন্ন প্রবৃত্তিচয়ের শক্তি।

খেলায় শিশুর বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন প্রতিফলিত হয়

খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে—এ কথায় সবটুকু বলা হল না। শিশুর অন্তর্জীবন প্রতিফলিত হয় খেলার মধ্যে—তার অভিজ্ঞতা, তার অর্জিত প্রেরণা সমূহ। খেলার মধ্য দিয়ে সে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে, ব্যর্থতার ক্ষোভকে সে জয় করবার চেষ্টা করে, তার অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা পরিতৃপ্তি লাভ করে। এক কথায় তার গোটা চরিত্রের ছাপ পড়ে তার খেলায়। এখানে দুই ধরণের খেলার কথা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রথম জাতীয় খেলা শিশু প্রায় একা একাই খেলে। এইসব খেলার মধ্যে কল্পনার স্থান খুব বেশী। এ জাতীয় খেলা অল্পবয়সেই শিশুরা খেলে। দ্বিতীয় জাতীয় খেলা হচ্ছে দলবদ্ধ খেলা। এ খেলায় কল্পনা তত স্বাধীন নয়। কল্পনার প্রাচুর্যও কম। ব্যক্তিগত কল্পনার স্থান গ্রহণ করেছে সামাজিক কল্পনা। দশ এগারো বছরের আগে এজাতীয় খেলায় শিশুরা পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

প্রথম জাতীয় খেলা থেকে শিশুর অন্তর্নিহিত কল্পনা-জীবনের স্বরূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। ফ্রয়েড একটি শিশুর খেলা বর্ণনা করেছেন। ছেলেটির

বয়স আঠারো মাস। তার মা তাকে বাড়ীতে ফেলে রেখে প্রায়ই বেরিয়ে যেতেন। একদিন দেখা গেল—শিশুটি একটি কাঠের রীলের সঙ্গে সুতো বেঁধে তাই নিয়ে খেলা করছে। সুতোর একটা দিক তার হাতে অপর দিকে রীলটি বাঁধা। শিশু রীলটি একবার ছুঁড়ে দিচ্ছে—বলছে উ উ উ (অর্থাৎ চলে যাও)। রীলটি তার খাটের পিছনে অদৃশ্য হচ্ছে। আবার তাকে কাছে টেনে আনছে। রীলটি দেখা মাত্র উল্লসিত হয়ে বলছে 'দা' (এই যে)। রীলটি শিশুর চক্ষে মায়ের প্রতীক। মা চলে যায়। মা'র সঙ্গ থেকে, শিশুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশুকে বঞ্চিত হতে হয়। মনে মনে শিশু রুষ্ট হয়ে উঠে। খেলায় সে ঘটনাটিকে উল্টে দেখাচ্ছে। না, মা চলে যাচ্ছেনা, শিশুই মা'কে দূর করে দিচ্ছে। 'চলে যাও'—এই বলে সে বলরূপী মা'কে দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মায়ের উপর তার রাগ হতে পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ মা'কে না দেখে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আবার সে মাকে (রীলকে) কাছে টেনে আনছে।

শিশুর জীবনের একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এই খেলার মাল মশলা যুগিয়েছে। কিন্তু খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর সেই দুঃখকে জয় করবার চেষ্টাটি স্পষ্ট। বারবার সেই ঘটনাটিকে ঘটিয়ে সেই দুঃখকে আয়ত্ত করা ও মনের ভার-সাম্যকে রক্ষা করা খেলাটির লক্ষ্য।

দলবদ্ধ হয়ে সামাজিক খেলায় শিশু চরিত্রের কয়েকটি দিক চোখে পড়ে। ফুটবল খেলার কথা ধরা যাক। একটি ছেলে বল পাস করতে নারাজ। যতক্ষণ পারে নিজের পায়ের কাছে সে বল রাখে। ছেলেটি কিছুটা আত্ম-কেন্দ্রিক, সামাজিক বোধ এর কম। বেশ ভালো খেলে, অথচ প্রতিপক্ষের গোলের মুখে এসে বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কিছুকিছু খেলোয়াড় এমন দেখা যায়। সাধরণতঃ এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ; সাফল্য লাভ করব, প্রতিষ্ঠা লাভ করব—এই সহজ বিশ্বাসটি কম।

ইচ্ছামত খেলা করে, খুশীমত কল্পনা করে শিশু তার আবেগজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করবার চেষ্টা করে। অতৃপ্ত কামনা, বাসনা মনকে ক্ষুব্ধ করে। আত্মপ্রকাশের জন্য বারংবার সে পথ খোঁজে। কিন্তু বাস্তব যেখানে বিরূপ, কামনা বাসনাকে স্বাভাবিক ভাবে তৃপ্ত করবার সেখানে উপায় নেই। 'চাই কিন্তু পাই না'—এ দুঃখকর অনুভূতি শিশুমনকে পীড়িত করে। শিশুমনের সব ইচ্ছাই সামাজিক নয়। ঐসব ইচ্ছার সহজ পরিতৃপ্তি শিশুর পক্ষে কল্যাণকরও নয়।

খেলার মধ্য দিয়ে ঐ সব ইচ্ছার অনেকখানি পরিতৃপ্তি সম্ভব। খেলার দ্বারা ঐ সব ইচ্ছার পরিতৃপ্তিতে সামাজিক বাধা নেই। শিশুর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে। জীবের প্রতি যদি সে নিষ্ঠুর হয় তাকে বাধা দেবার কথা ওঠে। কিন্তু কার্ণিশকে মানুষ ভেবে নিয়ে যদি সে বেত মারে, কাঠের মধ্যে যদি সে পেরেক ঠোকে—তবে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। আক্রমণাত্মক কর্ম অসামাজিক, কিন্তু আক্রমণাত্মক খেলা সামাজিক। এইজন্যই বলা যায়—খেলার মধ্য দিয়ে সে অতৃপ্ত ইচ্ছাকে তৃপ্ত করে, অসামাজিক ইচ্ছাকে সামাজিক রূপ দেয়। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ক্রীড়ার দরকার আছে।

খেলার দ্বারা আবেগ-জীবনের ভারসাম্য রক্ষা

শিশুমনকে বোঝবার জন্য তার ক্রীড়া পর্যবেক্ষণ অনেকখানি সাহায্য করে। শিশুর মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্যও মানসিক চিকিৎসকগণ আজকাল ক্রীড়া-সমীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ক্রীড়া-সমীক্ষা সম্বন্ধে 'অস্বাভাবিশিশু'ক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খেলা রোগ-নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ের পন্থা

দলবদ্ধ খেলার মধ্য দিয়ে শিশু সামাজিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ পায়। পাঁচ-জনে মিলেমিশে খেলার মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা, নিজের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষা শিশু লাভ করে।

প্রকৃত খেলোয়াড় যে খেলাটাই তার কাছে বড় কথা, জয় পরাজয় নয়। জয়পরাজয়কে প্রায় সমান মনে করা—এ শিক্ষাও কম বড় শিক্ষা নয়। খেলার মধ্যে সুখ ও আনন্দ পাওয়াটাই বড়। কিন্তু খেলার মধ্য দিয়ে লোকে ত্যাগও শেখে। এ জন্যই বার্ট (৪), বলেছেন "খেলাকে এক প্রকার ভোগ বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐ ভোগ আমাদের ত্যাগ শেখায়।"

খেলোয়াড়ী মনোভাব কেবলমাত্র খেলাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত বা সঞ্চারিত হলেই শিক্ষার দিক থেকে খেলার মূল্য বাড়ে। জীবনের সব কিছুর প্রতিই প্রকৃত খেলোয়াড়দের কম বেশী সমদৃষ্টি থাকে এ কথা বোধ হয় মনে করবার কারণ আছে। এ বিষয় সুনিশ্চিত রূপে কিছু বলতে হলে—আরও সঠিক অনুসন্ধান দরকার। সঞ্চারণের পরিমাণ নির্ণয় এবং কি ভাবে শিক্ষা দিলে সঞ্চারণ অধিক ঘটে এটা জানা দরকার। খেলোয়াড়েরাও যে আজকাল কিছু পরিমাণ খেলোয়াড়ি মনোভাব ত্যাগ

করেছে—তারই বা কারণ কি—এ সবও অনুসন্ধানের বিষয়-বস্তু হওয়া উচিত।

একমনা বহুল পরিশ্রমের দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞানলাভ ও নৈপুণ্য অর্জন সম্ভব। প্রচলিত শিক্ষায় একজন অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঐ জাতীয় পরিশ্রম আমরা পাইনা। পড়তে হবে বলেই সে পড়ে। পড়ার মধ্যে সবটুকু মন তার কখনও থাকে না। চেষ্টার মধ্যে তার সমগ্রতা ও দৃঢ়তা নেই। একথা সত্য ছেলেমেয়েদের বিশেষতঃ ছোটদের বেলায়—লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের নিজেদের জীবনের কোন যোগ নেই। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা ও আশা আকাঙ্ক্ষা পড়ার মধ্যে তারা দেখতে পায় না। তারা চায় খেলতে। কিন্তু খেলাকে, খেলার প্রতি শিশুর আকর্ষণকে বড়রা শিক্ষার প্রধান অন্তরায় মনে করেন।

খেলাকে শিক্ষার কাজে প্রয়োগের প্রয়োজন

খেলার প্রতি আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি পালটেছে। খেলবার শক্তিকে শিক্ষার কাজে লাগান যায়—এ তারা মনে করেন। খেলবার শক্তি যদি জ্ঞান অর্জনের চেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করে তবে সেই চেষ্টা অনেক বেশী ও ঐকান্তিক হবে। ছোটরা বিশেষতঃ মেয়েরা পুতুল খেলতে ভালবাসে। খেলার মধ্যে ছোটরা কিছু কিছু বাস্তব আমদানি করবার চেষ্টা করে। জীবনকে যেমন তারা বুঝেছে তেমনি ভাবে খেলাকে তারা রূপায়িত করে। যতটুকু তারা পারে, যতটুকু তারা বোঝে—ততটুকু বাস্তবই তাদের খেলার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষিকা সেখানে যদি তাদের সাহায্য করেন, তাহলে খেলার মধ্যে আরও বাস্তব আসবে, আরও জ্ঞানের স্থান হবে। অত্যধিক জ্ঞানের চাপে খেলার আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা আছে সত্য। সেইজন্যই শিশুদের মন শিক্ষিকাকে বুঝতে হবে। কতটুকু জ্ঞান শিশুরা সহজে ও সাগ্রহে নেবে—এসব বুঝে সুঝে কাজ করলে খেলা খেলাই থাকবে, সেই সঙ্গে শিক্ষা কাজেও সহায়তা করা হবে।

বস্তুর গুণাবলী (যেমন তার আকার, রঙ ; বস্তুদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যেমন ছোট, বড়, খাটো, লম্বা ইত্যাদি) বোঝাবার জন্য মাদাম মণ্টেসরি কয়েকটি উপকরণ বানান। ঐগুলিকে খেলনাও বলা চলে। শিশু খেলতে খেলতে বস্তুর গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। অবশ্য মণ্টেসরি নির্দেশিত পথেই খেলাটি হওয়া চাই। খেলার পূর্ণ স্বাধীনতা পেলে মণ্টেসরি সিলিণ্ডার (যা দিয়ে ছোট বড়,

মোটা সরু গুণ সম্বন্ধে শিশুরা শেখে) নিয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা রেলগাড়ী খেলায় মন দেয়—ছোটদের ইস্কুল পরিচালনা করতে লেখিকার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবুও বলব মণ্টেসরি প্রবর্তিত শিক্ষার পদ্ধতি মুখ্যতঃ খেলার পদ্ধতি। খেলার স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতেই ঐ শিক্ষা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত।

অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা

অভিনয়ের মাধ্যমে আজকাল অনেকে শিক্ষা দেবার কথা বলেন। অন্ততঃ সাহিত্য ও ইতিহাস (কিছু পরিমাণ ভূগোলও) শিক্ষার মাধ্যম রূপে অভিনয়ের স্থান উচ্চে। অভিনয় ক্রীড়াধর্মী। শৈশবে ছোটরা মনে মনে নানা রূপ গ্রহণ করে। একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তু বলে ভাবে। নিজে সে বাবা হয়, মা হয়, ড্রাইভার হয়, গার্ড হয় ইত্যাদি। হাতের লাঠিকে বন্দুক করে, চেয়ার সারি সারি সাজিয়ে ট্রেন বানায়। অভিনয় এই জাতীয় কল্পনারই পরিণতি। নাটকের একটি ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'play'—যার আর একটি অর্থ হচ্ছে খেলা। খেলার সঙ্গে নাটক ও অভিনয়ের একটি অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য আছে বলেই শব্দের অমন ঐক্য।

যেসব খেলায় দৈহিক মাংসপেশীর সঞ্চালন হয় সে খেলা দৈহিক স্বাস্থ্য বিকাশে সহায়তা করে। খেলা স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ যুগিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

অধ্যায় ৭

একাত্মতা

অনুকরণ, সহানুভূতি, পরানুভূতি, অভিভাব

ছোটরা বড়দের অনুকরণ করে ; বাবাকে, মাকে, শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে। রাণার দু' বছর বয়স। তার বাবার মত চেয়ারে বসে সে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন সে পড়ছে। মিতা রান্নাবাড়ির খেলনা নিয়ে মায়ের মতন রান্নাবাড়ি করে। বাপ্পা তার বোনকে তার মায়ের মতন করে ধমকায়—"তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে"। মালতি তার দিদিমণিদের মত চুল বেঁধে ইস্কুলে যায়। অনুকরণের এমন কত দৃষ্টান্তই না আমাদের চোখে পড়ে।

মানুষ দু' পায়ে ভর করে চলে। ভাষা ব্যবহার করে। যে শিশু হামাগুড়ি দিয়ে চলা আরম্ভ করেছিল, দৈহিক বিকাশ একটি স্তরে পৌঁছবার পর বড়দের দেখাদেখি সে দাঁড়ায় এবং ক্রমে ক্রমে সে হাঁটতেও আরম্ভ করে। বড়রা যদি দু' পায়ে না হাঁটত এবং শিশুর যদি অনুকরণ বৃত্তি না থাকত তবে শিশুরা কোন দিন হাঁটতে শিখত কিনা সন্দেহ আছে। নেকড়ে বাঘের কাছে মানুষের যে শিশুটি বড় হয়েছিল সে নেকড়ে বাঘের মত চার পায়েই চলাফেরা করত ঐ ঘটনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভাষা শিক্ষা ব্যাপারেও ঐ কথা বলা চলে। শিশু বড়দের কথা শোনে ও তাদের অনুকরণে পুনরাবৃত্তির দ্বারা শব্দ আয়ত্ত করে। বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিছুটা ভিন্নভাবে ও ভিন্ন সুরে বাঙলায় কথা বলা হয়। অনুকরণের দ্বারাই কথা বলা ছেলেমেয়েরা শেখে বলে বরিশালের লোকেদের কথা একরকম, ঢাকার আরেক রকম, শান্তিপুরের কথা আবার অন্য ধরণের।

ছোট শিশুদের অনুকরণকে সাধারণতঃ প্রাথমিক অনুকরণ বলা হয়। কথা বলার চেষ্টায় বড়দের অনুকরণে আট নয় মাসের শিশু নানাপ্রকার শব্দ করে, একটু বড় হলে বাবার দেখাদেখি বই খুলে বসে থাকে।

এই অনুকরণে কিছু আয়ত্ত করবার সচেতন ইচ্ছা বা চেষ্টা নেই। এজন্য একে স্বতঃস্ফূর্ত বা অচেতন অনুকরণ বলা যায়।

প্রাথমিক ও সচেতন অনুকরণ

অন্যপক্ষে সচেতনভাবে যখন আমরা কিছু শিখতে চাই—শুনে শব্দটি উচ্চারণ করতে চেষ্টা করি, দেখে তেমনি ভাবে আঁকতে চাই, তখন সে অনুকরণকে সচেতন অনুকরণ বলা চলে। ঐ অনুকরণে অনুকরণের ইচ্ছাটি সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন। প্রাথমিক অনুকরণের মূলেও নিশ্চয়ই ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে ইচ্ছা সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন নয়। সম্পূর্ণ সচেতন ও সম্পূর্ণ অচেতন অনুকরণের মাঝামাঝিও অনুকরণের দৃষ্টান্ত আছে সে সব ক্ষেত্রে অনুকরণ আংশিকরূপে সচেতন।

শিশু অনুকরণপ্রিয়। কিন্তু নির্বিচারে সব কিছুকে, সকলকেই সে অনুকরণ করে একথা সত্য নয়। যাকে সে ভালবাসে, যাকে সে ভক্তি করে সাধারণতঃ তাকেই সে অনুকরণ করে। যেখানে সম্বন্ধটি ঘৃণা বা অবজ্ঞার সেখানে অনুকরণের প্রেরণা জাগ্রত হয় না।

শিশুর অনুকরণের পাত্র

একটি ডাক্তারের ছেলে। বাবার সম্বন্ধে ছেলেটির যথেষ্ট গর্ব। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল "তুমি কি হতে চাও?" সে বললে "ডাক্তার।" বাবাকে সে ভক্তি করে বাবার অনুকরণে সে ডাক্তার হতে চায়। অন্যপক্ষে বার্ট (১) উল্লেখ করেছেন চোরের ছেলেকে চোর হতে তিনি বড় দেখেন নি। বাবা চোর হলে অধিকাংশ ছেলে তাকে ঘৃণা করে। সাধু হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। কারণ সাধুজীবনের আদর্শ তাদের চোখের সামনে নেই। কিছুটা সেজন্য হয়ত অন্য কোন সামাজিক দুষ্কৃতির পথ তারা বেছে নেবে। কিন্তু চোরের অনুকরণ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা চোর হবে না।

একাত্ম হবার ইচ্ছা অনুকরণের মূলে আছে বিশ্লেষণ করলে এ কথা ধরা যায়। শিশু বাবা হতে চায়, মা হতে চায় তাই বাবা মা'কে সে অনুকরণ করে।

অনুকরণের কারণ

শিশু যা দেখে, যা শোনে তা নির্বিচারে অনুকরণ করে না এ কথা আর এক দিক দিয়েও সত্য। প্রত্যক্ষ জগৎ শিশুর সামনে সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। তার মধ্যে যেকাজ ও আচরণ তার মনে সাড়া জাগায়, তার প্রবল অন্তর্নিহিত প্রেরণার সঙ্গে যেগুলির সাদৃশ্য বা নিকট সম্বন্ধ আছে তারাই শিশুর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে,

শিশু কোন জিনিষ অনুকরণ করে? কেন?

সে সবকেই কিছু কিছু শিশু অনুকরণ করে। একটি অনাথ আশ্রমে কয়েকটি ছেলে খাচ্ছিল। খাওয়া তাদের মনঃপুত না হওয়ায় একটি ছেলে কাঁচের গেলাসটা ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলল। তার দেখাদেখি আরও দুজন সে কাজটি করল। কয়েকজন ঐ কাজে তাদের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ততখানি অগ্রসর হল না। বাকি ক'জন ঐ কাজটিকে রীতিমত অপছন্দ করল। ঐ ব্যাপারে ছেলেদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কারণটি বুঝতে হলে তাদের প্রকৃতির দিকে তাকাতে হবে। কারো মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবটি প্রবল ; কারো সাহস কম, আবার কারো মধ্যে সামাজিক আনুগত্যটিই বড়।

সঙ্গদোষে ছেলেমেয়েরা কু-অভ্যাস শেখে একথা অনেকে মনে করেন। এ কথার মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। তবে ব্যাপারটা আরও গভীর। প্রথমতঃ কিছুটা নিজের ভিতরকার তাগিদেই ছেলেমেয়েরা সঙ্গী বেছে নেয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মেশবার ভাল লোকের একান্ত অভাবে কাছাকাছি যাদের পাওয়া যায় তাদের সঙ্গেই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মিশতে হয়। অনুরূপ অবস্থায় দশ এগারো বছরের একটি ছেলের বন্ধুত্ব হল অপর একটি ছেলের সঙ্গে যে-ছেলেটি সিগারেট খায়। তবু সিগারেট খাওয়ার কথা প্রথম ছেলেটি কখনও ভাবে নি। কাজটি তার মনঃপুত নয়। এ ব্যাপারে ছেলেটির সঙ্গে তার মা বাবার সম্বন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বাবা মা'কে ছেলেটি ভালবাসত। তাদের বাড়ীর কেউ সিগারেট খেতেন না। সিগারেট খাওয়া তার মা বাবা খারাপ মনে করতেন। মা বাবার সঙ্গে ছেলেটির সম্বন্ধ ভাল থাকায় তাঁদের মনোভাব ছেলেটির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তার বন্ধুর সিগারেট খাওয়া তাকে সিগারেট খেতে প্ররোচিত করে নি।

এক জনের মধ্যে আবেগ বা অনুভূতির প্রকাশ দেখে আরেকজনের মনে কম বেশী সেই আবেগ বা অনুভূতির উদয় হয়। একে নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি বলা হয়। সাধারণভাবে সুখদুঃখের বেলাতেই সহানুভূতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কারণ সুখদুঃখেই সহানুভূতি বেশী ঘটে। যন্ত্রণা, ভয় ও রাগ—সহানুভূতির প্রেরণায় অনেক সময় একের থেকে অপরে সঞ্চারিত হয়।

নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি

ঐ সহানুভূতিকে নিষ্ক্রিয় বলবার কারণ কি? সহানুভূতির ফলে একের দুঃখ অপরে বুঝতে পারে। কিন্তু অন্যের দুঃখ দূর করবার সে যে চেষ্টা করবে

এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন অনেকে আছেন যাঁরা অন্যের দুঃখ দেখলে নিজেরা অভিভূত হন, কিন্তু সাহায্য করবার প্রেরণা ঠিক অনুভব করেন না। এঁরা সাধারণতঃ অন্যের দুঃখদুর্দশার দৃশ্য থেকে সরে থাকতে ভালবাসেন। ছোটদের বেলাতে একথা অনেক সময় সত্য। সহানুভূতির সঙ্গে যখন সক্রিয় প্রেরণার যোগ হয় তখনই মানুষ অন্যের দুঃখ বোঝে, অন্যের দুঃখ দূর করতে সচেষ্ট হয়। ম্যাকডুগালের মতে ঐ সক্রিয় প্রেরণা আসে স্নেহ বা বাৎসল্য থেকে।

সক্রিয় সহানুভূতি

নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি সম্বন্ধে কয়েকটি জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে। দুঃখ যতখানি মানুষের সহানুভূতি জাগায়, সুখ ততখানি সহানুভূতি জাগায় না। সহানুভূতির ব্যাপারে অবশ্য ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। কারো মধ্যে সহানুভূতির শক্তি বেশী, কারো মধ্যে কম। কোন একজনের প্রতি আমাদের মনোভাবের উপরও সহানুভূতি অনেকখানি নির্ভর করে। বন্ধুর দুঃখে আমরা যতখানি বেদনা বোধ করি, সাধারণতঃ একজন অচেনা লোকের দুঃখে ততখানি বেদনা বোধ করি না। সে লোকটি শত্রু হলে, তার দুঃখে দুঃখ বোধ না করে কোন কোন লোক একপ্রকার নিষ্ঠুর তৃপ্তি বোধ করেন। অন্যের দুঃখে দুঃখ বোধ আমরা বেশী করি। অন্যের সুখে সুখ বোধ করতে ততখানি দেখা যায় না। কিছু পরিমাণে এর কারণ আমাদের ঈর্ষা। ঈর্ষা হেতু আরেকজনের সঙ্গে আমরা মনে মনে এক হতে পারি না।

নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি সম্বন্ধে আরো আলোচনা

এ কথাও বলা চলে—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটি দুটি বিপরীত আবেগের দ্বারা প্রভাবিত। একই মানুষকে আমরা যুগপৎ প্রীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখি। একটি আবেগ অপরটিকে বাধা দেয়। কিন্তু একটি যখন তৃপ্ত হয়, পরিতৃপ্তির দ্বারা সাময়িক ভাবে তার শক্তির বিরেচন ঘটে। বাধা দূর হওয়ায়, অপরটির পক্ষে আত্মপ্রকাশ করা তখন সহজ হয়। কেউ দুঃখে পড়েছে। তার দুঃখ দেখে আমাদের বৈরভাব তৃপ্ত হওয়ায় তার প্রতি প্রীতির ভাবটি মনের উপরে ভেসে উঠে। ফলে তার প্রতি সহজ সহানুভূতি আমরা অনুভব করি। অন্যপক্ষে, তার সুখ মনের বৈরিতাকে তৃপ্ত করে না। ফলে তার প্রতি সহানুভূতি জাগা কঠিন হয়। উপরন্তু অতৃপ্ত বৈরিতায় মন পীড়িত হয়।

জনতার মধ্যে সময় সময় আবেগের চরম প্রকাশ দেখা যায়। সময় বিশেষে আমরা দেখি—ভয় ও ত্রাসে সকলে পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটছে, কিম্বা নিষ্ঠুর উন্মত্ত রোষে আগুন লাগাচ্ছে, খুন করছে ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে

একজনের আবেগ সহানুভূতির ফলে আরেকজনে সঞ্চারিত হয়ে সব মিলে আবেগের একটি তুমুল আলোড়ন ঘটে। যে সব আবেগ অপেক্ষাকৃত আদিম সাধারণতঃ জনতার মধ্যে সেগুলিই দেখা যায়। সূক্ষ্ম, সুচারু অনুভূতি জনতার পক্ষে বোধ করা কঠিন।

নৈতিক শিক্ষায় সহানুভূতির স্থান

কাউকে আঘাত না করা, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া বোধ হয় নীতির সব চেয়ে বড় কথা। অন্যকে আমরা আঘাত করব না কেন, এর তিনটি উত্তর হতে পারে। আমি যদি অন্যকে আঘাত করি, অন্যেরাও আমাকে আঘাত করতে দ্বিধা করবে না। আমি আঘাত পেতে, কষ্ট পেতে চাই না। সুতরাং যে অবস্থায় হানাহানি, কাটাকাটি সামাজিক অভ্যাসে দাঁড়াবে—সে অবস্থাটি আমি এড়াতে চাই। সেজন্য আমি আদর্শ গ্রহন করি 'আমি কাউকে আঘাত করব না'। নীতির এই ভিত্তিকে স্বার্থপরতা বলা চলে। কিন্তু এ আদর্শের অসুবিধা এই যে কেউ ভাবতে পারে আমি আঘাত করব, কিন্তু আমাকে কেউ আঘাত করবে না। যে ছেলে ছোটদের উৎপীড়ন করে, যে অন্যদের জিনিষ চুরি করে—তাদের বেশীর ভাগই ঐ ধরণের কথা ভাবে। এদের স্বার্থপরতা বহুল পরিমাণে অন্ধ।

অন্যকে আঘাত করতে বিরত থাকবার দ্বিতীয় কারণ হতে পারে—শাস্তির ভয়। 'ছোট ভাইকে মারলে বাবা আমাকে মারবে'—এই ভয় টুলুকে ঐ অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করে। ছোটভাইয়ের উপর রাগ হয়েছে, মারতে ইচ্ছা করছে—তবু বাবার ভয়ে সে ছোট ভাইকে মারতে পারছে না। ক্রমে মা বাবার নৈতিক শিক্ষাকে সে মনের ভিতরে নিয়ে নেয়। যেটা এককালের বাবা মায়ের নিষেধ ও অনুশাসন ছিল সেটা তার নিজের বিবেকের নিষেধ ও অনুশাসন হয়ে দাঁড়ায়। বাবা মায়ের শাস্তির ভয়ে নয়, নিজের কাজ থেকে শাস্তির ভয়েই মন অন্যায় থেকে নিবৃত্ত থাকে।

অন্যকে আঘাত করতে নিরস্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হতে পারে—সহানুভূতি। আমি কাউকে আঘাত করছি। অপরকে আঘাত করা যদি অনেকটা নিজেকে আঘাত করারই সমতুল্য হয়, তবে অন্যকে আঘাত করা আমার পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন হবে। ছোটদের মধ্যে সহানুভূতি বোধ থাকলেও, অন্যকে আঘাত করলে সে যে কতখানি ব্যথা পাচ্ছে সবসময়ে তারা তা বোঝে না। সে অনুভূতিটি যাতে তাদের গোচর হয়, সেজন্য সময় সময়

আঘাতের বেদনা কি তাদের বুঝতে দেওয়া দরকার। ধরা যাক একটি ছেলে তার চেয়ে ছোট একটি ছেলেকে মারছে। ছোটটি কাঁদছে—বড়টি উল্লসিত হচ্ছে। সে সময় বড়টিকে যদি মেরে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ছোটটি মার খাওয়ার জন্য কতখানি কষ্ট পাচ্ছে, তবে মার খাবার কষ্টটা বড় ছেলেটি বুঝতে পারবে। সহানুভূতি তার পক্ষে সহজ হবে। সহানুভূতিবোধের জন্য অনুরূপ আবেগ ও অবস্থার সঙ্গে পরিচয়ের কিছু প্রয়োজন আছে। জীবনে অভাবের সঙ্গে যাদের কোনদিন পরিচয় ঘটেনি, স্বাস্থ্য যাদের চিরদিন চমৎকার—তাদের পক্ষে অভাবের দুঃখ কি, স্বাস্থ্যহীনতার কষ্ট কতখানি ঠিক বোঝা কঠিন।

সৌন্দর্য উপলব্ধির শিক্ষা—শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই শিক্ষার ধারাটি কি হবে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। অঙ্ক শেখান, বানান শেখান, শব্দের অর্থ শেখান ব্যাপারটা আমরা বুঝি। কিন্তু একটি কবিতার সৌন্দর্য শিক্ষার্থীদের গোচর করার পদ্ধতি কি হবে? শব্দের অর্থ, বাক্যের অর্থ, পঙ্‌ক্তির অর্থ আমরা বুঝি, বলতে পারি। কিন্তু ঐ বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ফলে কবিতার সৌন্দর্যটি নষ্ট হয়ে গেল, ছাত্রছাত্রীরা কবিতার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারল না এমনও অনেক সময় দেখা যায়। এজন্য অনেক সময় বলা হয় সৌন্দর্য শেখবার জিনিষ নয়, ওটা অনুভব করবার জিনিষ। শিক্ষক যদি কবিতার সৌন্দর্য নিজে উপভোগ করে থাকেন, যথাযথ আবেগের সঙ্গে কবিতাটি আবৃত্তি করেন—তার সেই আবেগ ও সৌন্দর্যানুভূতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণতঃ সঞ্চারিত হয়। শিক্ষক শিক্ষিকাকে যদি ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ অপছন্দ করে, তবে হয়ত এ সঞ্চারণ হবে না। সংক্ষেপে, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্পের মাধুর্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সহানুভূতির একটি মূল্যবান স্থান রয়েছে।

চারু সাহিত্য ও শিল্পের সৌন্দর্য উপলব্ধি

একটি লোককে সম্মোহিত করা হল। তারপর যিনি সম্মোহিত করছেন—তিনি সম্মোহিত ব্যক্তিকে বললেন, "আপনি এ দেশের রাজা"। তৎক্ষণাৎ সম্মোহিত ব্যক্তি তাই বিশ্বাস করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "আপনি কে"? উত্তর হল, "আমি এ দেশের রাজা"। তারপর আবার তাকে বলা হল, "আপনার ডানহাতে পক্ষাঘাত হয়েছে। এ হাত আপনি তুলতে পারেন না। বুঝলেন?" সম্মোহিত ব্যক্তি মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি বুঝেছেন। তারপর তাকে বলা হল, "চেষ্টা

অভিভাব সম্মোহন

করুন ত ডানহাত তুলতে"। তিনি বহু চেষ্টা করেও হাত তুলতে পারলেন না।*

সম্মোহনে হাস্যকর রূপে সম্মোহক সম্মোহিতের বিশ্বাস উৎপাদন করেন। সে বিশ্বাস বাস্তববর্জিত। তবু অভিভাবের ফলে সম্মোহিত ব্যক্তি তাই বিশ্বাস করেন। সাধারণ জীবনেও অভিভাবের স্থান রয়েছে। এ সম্বন্ধে দু একটি ছোট অনুসন্ধানের কথা উল্লেখ করি। একটি ছবি। একদল ছেলে মাঠে খেলা করছে—তাতে আঁকা। ছবিটি কিছু সময় ছেলেদের দেখিয়ে তারপর সরিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'ছবিতে কটা কুকুর দেখেছ—বল'। বেশ কয়জন উত্তর দিল যে ছবিতে তারা কুকুর দেখেছে—একটি কিম্বা দুটি। তাদের ভেতরকার ভাবটা বোধ হয়, মাষ্টারমশাই যখন বলছেন কুকুর আছে, নিশ্চয়ই কুকুর আছে। শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে ছবিতে কুকুর আছে।

অভিভাবের সংজ্ঞা

ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যুক্তিবিচার না করে কোন উক্তিতে যদি আমরা বিশ্বাস করি তবেই তাকে অভিভাব বলা চলে। নাৎসিরা অন্যান্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ইহুদীরা অভিশপ্ত জাত, সমস্ত পৃথিবীময় ইহুদীদের এক গূঢ় চক্রান্ত চলেছে—হিটলার ও অন্যান্য নাৎসি নেতাদের বক্তৃতা শুনে, লেখা পড়ে জার্মানির অনেকের মনেই অমন বিশ্বাস জন্মেছিল। এ দেশেও অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। রাহুকেতু চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে বলে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ হয়। কোন অন্ত্যজ জল ছুঁলে জল অশুচি হয়ে যায়। এসব কথা যাদের আমরা বড় মনে করি তাদের মুখ থেকে শুনে আমরা বিশ্বাস করতে শিখি। উল্লিখিত বিশ্বাসের সবগুলিকেই ভ্রান্ত বলা চলে। কিন্তু অভিভাবপ্রসূত বিশ্বাস মাত্রেই কি ভ্রান্ত? এমন নাও হতে পারে। কোন একটি বিষয়ে বিশ্বাস করতে আমরা অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবিচারের সাহায্য নিতে পারি। আবার ব্যক্তিত্বের প্রভাবেও কোন একটি বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারি।

* ঐ জাতীয় অভিভাব জাগ্রত অবস্থাতেও কাজ করে—এমন দেখা গেছে। বিশেষতঃ ছোটদের বেলায়। বারো বছরের ৬৫ জন ছেলেকে সামনে হাত প্রসারিত করে থাকতে বলা হল। তারপর পরীক্ষক বিশেষ জোরের সঙ্গে তাদের বললেন, 'দেখো, তোমরা এখন হাত মুঠো করতে পারবে না'। দেখা গেল এক-তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়ে হাত মুঠো করতে পারছে না। জন বারো ছেলে পারল, কিন্তু অনেক চেষ্টার পর। বাকিদের উপর অভিভাবের কোন ফল হল না। (২)

শেষেরটি অভিভাব, প্রথমটি অভিভাব নয়। উক্তিটি সত্য হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসটি অভিভাব-আশ্রিত হতে পারে। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতন। টুলু এ কথা বিশ্বাস করে, কারণ তার বাবা তাকে এ কথা বলেছে। আমরাও ঐ কথা বিশ্বাস করি। তবে আমাদের বিশ্বাস কয়েকটি প্রমাণের উপর (হয়ত সেগুলি অসম্পূর্ণ) আশ্রিত।

আমাদের বিশ্বাসগুলিকে যদি যাচাই করে দেখা যায় তবে অনেক বিশ্বাসের মধ্যেই অভিভাবের কিছু উপাদান পাওয়া যাবে। ভগবানের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। তার প্রধান কারণ আমাদের বাবা মা ভগবানে বিশ্বাস করতেন। তাদের মুখে শুনেছি ভগবান্ আছেন, তাই আমাদের বিশ্বাস ভগবান আছেন। পরে হয়ত প্রমাণ কিছু জড় করলাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস আগে, প্রমাণ পরে। তেমনি আমরা বিশ্বাস করি—বিশ্বভূমণ্ডল সসীম অথচ ক্রমবর্ধমান। যে গাণিতিক যুক্তির উপর ঐ ধারণাটি আশ্রিত—সেটি বোঝবার সামর্থ্য আমাদের অনেকেরই নেই। তবু আমরা বিশ্বাস করছি, কারণ বিজ্ঞানীরা অমন কথা বলেছেন। বিজ্ঞানীদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের অবশ্য কারণ আছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাই বিজ্ঞানীদের অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের বিশ্বাসটিকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বাস বলা চলে না। ব্যক্তিকে বিশ্বাসের যুক্তি আমাদের আছে। কিন্তু ব্যক্তিকে বিশ্বাস করি বলেই না-বুঝে তার কথায় বিশ্বাসের মধ্যে অভিভাবের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। একে অভিভাব ও যুক্তিআশ্রিত বিশ্বাসের মাঝামাঝি বলা চলে।

বড়দের জীবনে অভিভাব

ছোটদের জীবনে অভিভাবের স্থান বেশী। তার কারণ তাদের জ্ঞান কম ও বড়দের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে তাদের উচ্চধারণা রয়েছে। একটা সহরে আকাশ লোকদের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে এ কথা একজন বয়স্ক লোককে বললে সাধাণতঃ সে কথা সে বিশ্বাস করবে না। কারণ তখুনি তার মনে হবে যে আকাশ মহাশূন্য; মহাশূন্য কেমন করে মাথায় ভেঙ্গে পড়বে? আকাশ কি—একটি ছোট ছেলে তা জানে না। সুতরাং 'আকাশ মাথায় ভেঙ্গে পড়ল'—এ উক্তির মধ্যে কোন অসঙ্গতি তার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় এবং উক্তিটি বিশ্বাস করা সহজ।

ছোটদের জীবনে অভিভাব

বিশ্বাস করতে চাই বলেই আমরা অনেকসময় বিশ্বাস করি এমনও দেখা গেছে।

একটি ছেলে চকোলেট খেতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু চকোলেট খাওয়া ব্যাপারে সচেতন মনে তার কিছু বাধা আছে। বেশী চকোলেট খাওয়া নিয়ে তাকে দুএকবার বড়দের বকুনী খেতে হয়েছে। তার বন্ধু একদিন তাকে বল্লে চকোলেট খুব পুষ্টিকর জিনিব। অমনি সেকথা সে বিশ্বাস করল। ঐ ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসের মূলে প্রধান কথা হচ্ছে তার ইচ্ছা। আপাতঃদৃষ্টিতে একে অভিভাব মনে হলেও অভিভাবের উপাদান এ ক্ষেত্রে কম। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সচেতন আমির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে একথা ভাবতে আমাদের ভালো লাগে না। তাই আত্মা অবিনশ্বর এ কথা শোনামাত্র আমরা বিশ্বাস করি। এ সবের মূলে ইচ্ছা ও অভিভাব দুইই থাকে।

বিশ্বাসে ইচ্ছার প্রভাব ও অভিভাব

কোন একটি ব্যাপারে নিজের ইচ্ছাটা যেখানে গৌণ, ব্যক্তিত্বের প্রভাবটা যেখানে বড় তাকেই প্রকৃত অভিভাবের দৃষ্টান্ত মনে করা সঙ্গত হবে। 'ব্যক্তিত্বের প্রভাব' ব্যাপারে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করছে তার মনের বৈশিষ্ট্যটি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে আত্ম-নতির প্রেরণা, আনুগত্যের প্রেরণা। বড় বলেই অনুগত হই যেমন সত্য কথা, তেমনি অনুগত হতে চাই বলেই বড় বলে মনে করি সেও তেমন সত্য কথা। অভিভাবের শক্তির অনেকখানি আসে আত্মনতির প্রেরণা থেকে।

এই আত্মনতির প্রেরণা ব্যাপারে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। কারো মধ্যে এটি প্রবল। কারো মধ্যে এটি দুর্বল। কারো কারো জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনতি প্রেরণা দুটি জট পাকিয়ে গেছে। আত্মনতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রেরণার শক্তি ও তাদের সম্বন্ধের উপর জীবনে অভি-ভাবের স্থান কতখানি সেটা নির্ভর করে।

অভিভাব ও আত্মনতি

যাকে ভালবাসি, তার কথায় স্বভাবতঃ আমরা বিশ্বাস করি। এ ভাল-বাসায় শ্রদ্ধাভক্তির উপাদানটি বড়। মা বাবার প্রতি শিশুর ভালোবাসা এই জাতীয় ভালবাসার দৃষ্টান্ত। মা বাবাও শিশুকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন। কিন্তু ঐ ভালোবাসা অভিভাবের প্রেরণা যোগায় না।

অভিভাব আলোচনা করতে গেলে বিপরীত-অভিভাবের কথাও এসে পড়ে। অন্যের কথা বিশ্বাস না করাই কোন কোন লোকের প্রকৃতি। হয়ত অবিশ্বাসটি একআধজনের বেলাতেই সীমাবদ্ধ, কিম্বা হয়ত সে কাউকেই

বিশ্বাস করে না। কোন কোন মানসিক রোগীর মধ্যে নঞ্‌বৃত্তি বলে একটি জিনিষ দেখা যায়। একজন রোগীকে হয়ত বলা হল, 'আপনি হাত পাতুন।' রোগী তার হাতটি উপুর করে রাখল। বলা হল, দাঁড়ান। রোগী বসে পড়ল। এ জাতীয় বিপরীত আচরণ ছোটদের মধ্যেও দেখা যায়। পড়তে বলা হলে সে পড়বে না—সে খেলবে। খেলতে ডাকা হলে সে খেলবে না সে পড়বে। উল্টো বিশ্বাসের চেয়ে উল্টো কাজ করাটাই বিপরীত-অভিভাবের মধ্যে প্রধান। যা বলা হল একজন তার উল্টো বিশ্বাস করল এমনটা বড় দেখা যায় না।

বিপরীত অভিভাব

বিপরীত-অভিভাবে ব্যক্তি অন্যের প্রেরণা অস্বীকার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, ভ্যালেন্টিন (৩) এমন মনে করেন। একথা কিছু পরিমাণে সত্য। কিন্তু বিপরীত-অভিভাব অনেকাংশে বিদ্রোহ ও বৈরিমনোভাব প্রসূত। শৈশব জীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট স্তরে বিপরীত-অভিভাবের কিছু বাহুল্য দেখা যায়—দুই তিন বছর বয়সে এবং কৈশোরে। কৈশোরে ছেলেমেয়েরা বড়দের উপর একান্ত নির্ভরতা ঘুচিয়ে নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু মনের একদিক তাদের নির্ভরতাও চায়। সুতরাং তাদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে, নিজেদের মনের একাংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব দেখা যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিদ্রোহ—এই দুইয়ের শক্তিই একযোগে বিপরীত-অভিভাবে প্রেরণা যোগায়।

শিক্ষায় অভিভাবের স্থান

অভিভাব ছেলেমেয়েদের মানসিক দুর্বলতার পরিচয়, অভিভাবের ফলে ছেলেমেয়েদের সবল চরিত্র গড়ে উঠবে না—এমন অনেকে আশঙ্কা করেন। অভিভাবের যেখানে আতিশয্য সেখানে একথা কিছুটা সত্য হলেও একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে জীবনে—বিশেষতঃ শৈশবে—অভিভাবকে সম্পূর্ণ এড়ান সম্ভব নয়। ছোটরা বড়দের কথা বিশ্বাস করবেই। সে বিশ্বাসের দ্বারা তারা কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হবেই। শক্তিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে তেমনি বড়রাও কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হবে।

জীবনের ছন্দে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনতি এ দুয়েরই যথাযথ স্থান আছে। একথা যদি আমরা স্মরণ রাখি তবে অভিভাবকে আমরা সম্পূর্ণ গ্রহণের অযোগ্য মনে করব না। অভিভাবের ফলে কি আমরা গ্রহণ করছি এটাই বড় কথা। ভালমন্দের মূলে কি যুক্তি আছে একথা একান্ত শৈশবে ভালো করে বোঝা

সম্ভব নয়। 'অন্যের জিনিষ নেওয়া উচিত নয়', নীতির এমন অনেক কথাই গোড়াতে ছেলেমেয়েরা মা বাবার কাছ থেকে অভিভাবের বশে গ্রহণ করে। একথা সত্য ঐ স্তরকে বিচারশূন্য নীতির স্তর বলা হয়। যতদিন না ছেলেমেয়েরা নীতির মূলে কোন যুক্তিবিচার আছে বুঝতে পারছে, নীতিকে যুগপৎ বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছে—ততদিন নীতিবোধ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে। তবুও শিশু-চরিত্রের কথা যদি আমরা মনে রাখি—অসম্পূর্ণতার ঐ স্তর স্বীকার না করে উপায় নেই।

তেমনি জ্ঞান যেখানে একান্ত অসম্পূর্ণ, সেখানে কিছু পরিমাণে বিশ্বাসের সাহায্য আমাদের নিতে হয়। থিয়োরি অব রিলেটেভিটি বুঝেসুঝে বিশ্বাস করা অধিকাংশের পক্ষে কঠিন। বিজ্ঞানীদের কথা বিশ্বাস করেই ঐ মতবাদ অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বিশ্বাস করে। ঐ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অভিভাবপ্রসূত না হলেও তাতে অভিভাবের উপাদান আছে।

একাত্মতা

অনুকরণ, সহানুভূতি ও অভিভাব—এসবের মধ্য দিয়ে একজন অপরজনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে চায়। অনুকরণের মধ্য দিয়ে শিশু বাবার মত হয়, মা'র মত হয়—মনে মনে বাবা হয়, মা হয়। খেলা ও কল্পনার মধ্য দিয়েও শিশু মা বাবা হবার ইচ্ছা চরিতার্থ করে। সহানুভূতির দ্বারা অন্যের সুখদুঃখ আমরা অনুভব করি। মুহূর্তের জন্য তার সঙ্গে এক হই। আত্মনতি অভিভাবে প্রেরণা জোগায় এ কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ আত্মনতির মূলে থাকে একাত্ম হবার ইচ্ছা।

একাত্মতার পদ্ধতি সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষকেরা কিছু আলোকপাত করেছেন। জ্ঞানের জন্য, বিশেষতঃ মানুষকে জানবার জন্য একাত্মতা পদ্ধতির বিশেষ দরকার। আরেকজনের সঙ্গে মনে মনে এক হতে না পারলে তাকে প্রকৃত জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গিরীন্দ্রশেখর বোসের ধারণা—এক গ্লাস জলকে জানতে হলেও মনে মনে এক গ্লাস জল হওয়া দরকার। ধূমাৎবহ্নি। ধূম থেকে বহ্নির অস্তিত্ব জানবার পন্থাটিকে সংস্কৃতে 'অনুমান' বলা হয়। কারো চোখ ছলছল করছে দেখে আমরা 'অনুমান' করতে পারি তার কষ্ট হয়েছে। কিন্তু 'অনুমানের' দ্বারা মানুষকে জানা খুব আংশিক ও অসম্পূর্ণ। একজনকে জানতে হলে মনে মনে—ক্ষণেকের জন্যও—'সে' হতে হবে। নিজেকে প্রক্ষেপ করে আমি পরের

সঙ্গে এক হচ্ছি। একে 'পরানুভূতি' বলা হয়। সহানুভূতির সঙ্গে পরানুভূতির তফাৎটা কোথায় এখানে উল্লেখ করা দরকার। আমি কারো অসুখ দেখলাম। আমারও একবার অমন অসুখ করেছিল মনে পড়ল। পীড়িতের কষ্ট আমার মনে কষ্টের বোধ জাগিয়ে তুলল। মুখ্যতঃ নিজের মধ্যেই আমি রইলাম, নিজের মনেই আমি কষ্ট পেলাম। পরানুভূতির বেলাতে আমি মনে মনে মিশে যাই পীড়িতের সঙ্গে। নিজের মধ্যে আমি আর থাকি না। মনে মনে তার সঙ্গে এক হয়ে তার কষ্টটাই আমি অনুভব করি। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমরা একাত্ম হই। তারা শূট করলে আমরা শূট করি। তাদের গায়ে বল লাগলে আমাদের দেহ সঙ্কুচিত হয়। যেন আমরা তখন খেলোয়াড়ই হয়ে গেছি।

পরানুভূতি বা একাত্মতা সঠিক ও সম্পূর্ণ হচ্ছে কিনা এইটে বড় কথা। গ্রীষ্মকালে রাস্তা দিয়ে একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখে বল্লাম, 'আহা, লোকটার কি ভীষণ কষ্ট।' মনে মনে আমি তার স্থল অধিকার করে আমি অমন অনুভব করলাম, ঐ ধারণা আমার হল। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় যে রিক্সা টানছে ঐ কাজটি তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সে ঠিক কি অনুভব করছে সেটা বোঝবার সাধ্য আমার হল না। মোটকথা, রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আমার প্রকৃত একাত্মতা ঘটলো না, আমি রিক্সা টানলে আমার কি বোধ হত-অস্পষ্টভাবে তাই আমার মনে এল। এই জাতীয় একাত্মতাকে বাহিক-একাত্মতা বলা হয়। রিক্সাওয়ালার অবস্থা অংশতঃ কল্পনায় আমার অবস্থা হয়েছে, কিন্তু রিক্সাওআলার মনোভাব আমি গ্রহণ করতে পারিনি। প্রকৃত একাত্মতায় কেবলমাত্র অবস্থা নয়, মনোভাবও সম্পূর্ণরূপে এক হতে হবে। কতটা অন্যের সঙ্গে এক হতে পারি তার উপর কতটা প্রকৃত একাত্মতা আমাদের পক্ষে সম্ভব তা নির্ভর করে। আমরা অধিকাংশই নিজেদের মধ্যে বড় বেশী আবদ্ধ। মনের সহজ গতি নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত। বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে জীবনের বিচিত্র আনন্দ ভোগ করবার শক্তি আমাদের সীমিত।*

এ কথা বলা যায় যে আমরা প্রত্যেকেই যেন এক একটি বিশ্বভূমণ্ডল। সব

* মনঃসমীক্ষার দ্বারা একাত্মতার শক্তি বাড়ে। প্রাণশক্তির রূপান্তরগ্রহণের পরিধি বাড়িয়ে একদিক দিয়ে আনন্দলাভের শক্তি বাড়ান হয়, অপরদিক দিয়ে মানুষকে বোঝবার ক্ষমতা, মানুষের প্রতি প্রীতিকে বাড়ান হয়।

রকম ইচ্ছা ও ভাব আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। যে কোন একটি মানুষের মধ্যে নারী পুরুষ, শৈশব থেকে বার্ধক্য, আদিম মানুষ, সভ্যমানুষ, সাধু ও পাপী, এমন কি মানুষেতর জীবের মনোভাব রয়েছে। মনের এই বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে তার নিজের কতখানি সহজ পরিচয় আছে, মনের এই সক্রিয় সত্তাসমূহের আত্মপ্রকাশের পথ কতখানি সহজ ও স্বচ্ছন্দ—তার উপরই নির্ভর করে কতখানি সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে অন্যের সঙ্গে সে একাত্ম হতে পারবে। নিজের শিশুইচ্ছা যার মনে রুদ্ধ ও কণ্টকিত, শিশুদের সঙ্গে কেমন করে একাত্ম হবে? ঐ ক্ষেত্রে যে একাত্মতা—তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।*

জীবনে একাত্মতার স্থান

একাত্মতার সহজ স্বছন্দ গতি জীবনে দরকার বহু কারণে। অহমিকার নিঃসঙ্গ কারাগারে যদি আমরা বন্দী হয়ে সারাজীবন না কাটাতে চাই তবে অপরের সুখদুঃখে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে আমাদের মুক্তি খুঁজে পেতে হবে। শুধু দেহ নয়, মানুষের হৃদয় আছে—একথা আমাদের জানতে হবে। একাত্মতার দ্বারাই তা সম্ভব।

মানুষের জীবনে প্রীতির স্থান বোধ করি সবচেয়ে উচ্চে। প্রীতির দ্বারা যেমন একাত্মতার ক্ষমতা বাড়ে, তেমনি একাত্মতা যে জীবনে স্বচ্ছন্দ, প্রীতির আবির্ভাব সেখানে সহজে ঘটে।

প্রকৃত নৈতিক জীবনের ভিত্তিও একাত্মতা। অন্যের দুঃখ যদি নিজের দুঃখ বলে বোধ করতে পারি, অন্যের সুখ যদি নিজের সুখ বলে মনে হয়, তবে অন্যের দুঃখের কারণ যাতে না হই তার চেষ্টা করব, অন্যের সুখ যাতে বাড়ে তারই চেষ্টা করব।

একাত্মতা ও শিক্ষা

একাত্মতার প্রয়োজন জীবনে স্বীকার করে নিলে স্বভাবতঃ এ প্রশ্ন মনে আসে—একাত্ম হবার ক্ষমতা শিশুদের মধ্যে শিক্ষার সাহায্যে বাড়ান যায় কিনা! একাত্ম হতে বললেই কেউ একাত্ম হতে পারে—এ কথা সত্য নয়। তবে অন্যের সুখদুঃখের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করতে পারি। যেমন, তোমার ভাই কাঁদছে, তার কষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি। যদি কারো প্রতি আমার গভীর ঘৃণা ও অবজ্ঞা থাকে, তার সঙ্গে

* Empathy শব্দটির পরিভাষা গিরীন্দ্রশেখর বসু 'সমানুভূতি' করেছেন। পরানুভূতি যেখানে সম্পূর্ণ—অন্যের সমান অনুভূতি যখন হচ্ছে—তখনই তাকে সমানুভূতি বলা চলে।

একাত্ম হবার ইচ্ছা আমাদের হবে না। এজন্যই উচ্চবর্ণের লোকেরা এককালে অন্ত্যজদের নিজেদের মতো মানুষ বলে মনে করত না। ঘৃণা ও অবজ্ঞায় মানুষের এক বৃহদংশ থেকে তারা সরে থাকত। এককালে নারীদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবেও অমন ধরণের একটা অবজ্ঞা ছিল। ফলে মেয়েদের সুখদুঃখ পুরুষেরা বুঝত না। মানুষের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা একাত্মতার অন্তরায়; মানুষের প্রতি সহজ প্রীতি ও শ্রদ্ধা একাত্মতার পথ সুগম করে। একথা যদি আমাদের স্মরণ থাকে, তবে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানুষের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে আমরা জাগাতে চেষ্টা করব। ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে তাদের যথাসম্ভব দূরে রাখবার চেষ্টা করব।

অধ্যায় ৮

কাম প্রবৃত্তি ও যৌন শিক্ষা

কাম প্রবৃত্তি মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। বংশ রক্ষার সঙ্গে কাম প্রবৃত্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। কাম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নর নারীর যৌন মিলন ঘটে ও সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু একমাত্র বংশরক্ষার জন্যই মানুষের কাছে কামের মূল্য—একথা সত্য নয়। কাম চরিতার্থ করে মানুষ তীব্র ও প্রভূত আনন্দ পায়। রমণ কাম আচরণের চরম। কিন্তু কাম প্রবৃত্তির কার্যাবলী রমণ অপেক্ষা ব্যাপকতর। দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, চুম্বন প্রভৃতি নানাবিধ কাজের দ্বারা কাম প্রবৃত্তি কিছু পরিমাণে তৃপ্ত হয়। মানুষের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সময় বিশেষে কাম-পরিতৃপ্তি ঘটানোর কাজে লাগে। লিঙ্গ বা যোনি অবশ্য চরমতম ও তীব্রতম সুখানুভূতি লাভের অঙ্গ।

কাম প্রবৃত্তির স্বরূপ

শিশুর মধ্যেও কাম ইচ্ছা আছে মনঃসমীক্ষা এ তথ্য আবিষ্কার করেছে; এ কথা অবশ্য সত্য যে ফ্রয়েড কাম শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে কোন সুখ ভোগেরই একটি কামজ দিক আছে। মাতৃস্তন্য পান ক'রে শিশু খাওয়ার সুখ পায়। তাছাড়াও চোষবার যে আরাম তাকে যৌন সুখ মনে করা যায়। বয়স্ক ও শিশুদের কামজীবনের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য আছে। বড়দের জীবনে দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের কামলিপ্সার মধ্যে লিঙ্গ ও যোনির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চুম্বনের কথা ধরা যাক। চুম্বনের দ্বারা সাধারণতঃ প্রেমিক প্রেমিকারা সুখ পায়, আবার উত্তেজিতও হয়। ফলে আরও গভীর ও নিবিড় দৈহিক সান্নিধ্য তারা খোঁজে। অবশেষে মৈথুনের দ্বারা—চরম সুখের মধ্য দিয়ে—তৎকালীন উত্তেজনা তাদের প্রশমিত হয়।

বয়স্ক ও শিশুর কামের পার্থক্য

শিশুদের কাম জীবনে লিঙ্গ বা যোনির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রত্যেক

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পরিতৃপ্তি দাবী করে (১)। কাম ইচ্ছার স্বরূপটিও সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপে বয়স্কদের মত নয়।

শৈশবে কামের অঙ্গ

শৈশব জীবনে একেকটি বয়সে একেকটি অঙ্গ যৌন সুখের প্রধান অঙ্গ থাকে। গোড়াতে মুখ থাকে সুখ লাভের অঙ্গ। আর একটু বড় হলে গুহ্যদ্বার কামতৃপ্তির প্রধান অঙ্গরূপে দেখা দেয়। মল ত্যাগ, মল ধরে রাখা ইত্যাদি ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু যৌন তৃপ্তি লাভ করে। আরও বড় হলে লিঙ্গ বা যোনি সুখের প্রধান অঙ্গ হয়।

শৈশবে কাম-পাত্র

কাম পাত্র সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা দরকার। একেবারে গোড়াতে নিজের সঙ্গে জগতের পার্থক্য সম্বন্ধে শিশু সচেতন থাকে না। সব কিছুই তার কাছে একাকার মনে হয়। 'আমি' জ্ঞানও তার নেই। সেই বয়সে ভাষা তার আয়ত্ত হয়নি। সেই সময়কার অবস্থায়—'ভালো লাগছে'—এটুকুই সে কেবল অনুভব করে। একে স্বতঃকামের স্তর বলা যায়। স্বীয় ইচ্ছা ও বাস্তবের মধ্যে শিশু ক্রমে পার্থক্য বুঝতে আরম্ভ করে। বাস্তব যদি সর্বদা শিশুর ইচ্ছাধীন হত, তবে এই পার্থক্য সে হয়ত বুঝতে পারত না। মাকে সে চাইছে, কিন্তু পাচ্ছে না। অমন ক্ষেত্রে শিশু বেদনার সঙ্গে মা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু নিজের সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠে। নিজেকে, নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে শিশু ভালবাসে। এদের থেকে সে আনন্দ সংগ্রহ করে। এ স্তরকে আত্মরতি বা আত্মকামের স্তর বলা যায়।

স্বতঃকামের স্তর

আত্মকামের স্তর

বস্তুকামের স্তর

ক্রমে অন্যের প্রতি শিশু কাম অনুভব করে। ঐ স্তরকে বস্তুকামের স্তর বলা যায়। শিশুর বস্তুকামকে দুইভাগে ফেলা যায়। এক হচ্ছে সমলিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি কাম-ইচ্ছা। যেমন পুরুষের প্রতি পুরুষের বা মেয়েদের প্রতি মেয়েদের কাম। একে সমকাম বলা হয়। অপরটি হ'ল পুরুষের মেয়েদের প্রতি বা মেয়েদের পুরুষের প্রতি কাম। একে বলা হয়—বিপরীতকাম। সমকামের স্তর অতিক্রম করেই শিশু বিপরীত কামের স্তরে পৌছায়।

সমকাম ও বিপরীতকাম

কাম-ইচ্ছা সাধারণতঃ শৈশবেই অবদমিত হয়। সে জন্য এ সব ইচ্ছা শিশুর

কাছে সব সময় স্পষ্ট নয়। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, মেলামেশার ইচ্ছা রূপে সচেতন মনে ইচ্ছাগুলি থাকে। ফ্লুগেলের ভাষায় নির্জ্ঞান সমকাম-ইচ্ছা সচেতন মনে স্বরূপ-সামাজিক ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়।* বিপরীত কামের বেলাতেও কিছু পরিমাণে ঐ কথা বলা চলে।

স্বরূপ-সামাজিক ইচ্ছা ও বিপরীতসামাজিক ইচ্ছা

পুরুষ ও মেয়েদের কাম-ইচ্ছার স্বরূপের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সুখ-ভোগ যদিও শেষ পর্যন্ত সব কামেরই উদ্দেশ্য, তবু সুখ-ভোগের জন্য পুরুষ অপেক্ষাকৃত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, মেয়েরা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। বিপরীত কামের দুটি রূপ আছে। একটি পুরুষ-কাম, অপরটি স্ত্রী-কাম। সমকামে নর বা নারী সক্রিয় কিম্বা নিষ্ক্রিয়—কি অংশ গ্রহণ করছে তার উপর ভিত্তি করে সমকামেরও সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুটি রূপ আছে বলা যায়। কামের এই চারটি রূপকে নিম্নলিখিত ধারায় সাজান চলে :

সক্রিয় কাম ও নিষ্ক্রিয় কাম

পুরুষ-কাম—সক্রিয় সমকাম—নিষ্ক্রিয় সমকাম—স্ত্রী-কাম।

সক্রিয়তা প্রথম দুটির বৈশিষ্ট্য ও নিষ্ক্রিয়তা শেষের দুটির বৈশিষ্ট্য।

ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের মধ্যে কামের সব কয়টি ইচ্ছাই রয়েছে। ছেলেদের মধ্যে সাধারণতঃ সক্রিয় ইচ্ছাগুলি প্রবল থাকে, মেয়েদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় ইচ্ছা। তবে এর ব্যতিক্রমও ঢের দেখা যায়। বড় কথা এই যে, মনের দিক থেকে পুরুষকে কেবলমাত্র পুরুষ ও নারীকে কেবলমাত্র নারী মনে করা ভুল হবে। কি নারী, কি পুরুষ, প্রত্যেকের মধ্যে পুরুষত্ব ও নারীত্ব দুই-ই রয়েছে।**

শিশুদের যৌন ইচ্ছা ও আচরণের প্রতি বড়দের মনোভাব সাধারণতঃ সহজ নয়। কাম ইচ্ছাকে আমরা ঘৃণ্য ও কাম আচরণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপ বলে মনে করতে শিখে এসেছি। শিশুদের মধ্যে কাম আছে স্বভাবতঃই আমরা ভাবতে রাজী নই। সেজন্য শিশুদের যৌন আচরণ আমরা দেখেও দেখি না। সময় সময় অবশ্য না দেখে উপায় থাকে না। সে সব ক্ষেত্রে পিতামাতার আতঙ্কের সীমা থাকে না। পিতামাতার আচরণের ফলে সে আতঙ্ক শিশুর মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

শিশুর যৌন জীবনের প্রতি বয়স্কদের মনোভাব

* ফ্লুগেলের কথায় **'Homo-social wish'.**

** পুরুষের দেহেও নারীচিহ্ন ও নারীর দেহে পুরুষের চিহ্ন রয়েছে। পুরুষের স্তনচিহ্ন ও নারীর ক্লাইটোরিস এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছেলেমেয়েদের দৈহিক পার্থক্য সম্বন্ধে কৌতূহল প্রায় সব শিশুরই আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সময় সময় হস্তমৈথুনও করে। এসব তারা করে সত্য—কিন্তু এসব ভালো নয়, এসব গুরুতর অন্যায় এও তারা মনে করে।

শিশুর কাম আচরণ ও অপরাধবোধ

বয়ঃসন্ধিকালে কাম জীবনের বিকাশ হয়। হ্যাভলক এলিসের (২) অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ব্রিটেনে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ঐ বয়সে কিছু না কিছু হস্তমৈথুন করে। হস্তমৈথুনের অভ্যাস সম্ভবতঃ এদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও কম নয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছু সমকাম আচরণের খবর পাওয়া যায়। হস্তমৈথুন করার দরুণ তাদের কঠিন রোগ হবে, যক্ষা হবে, কুষ্ঠ হবে, তারা পাগল হয়ে যাবে এমন ধারণা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। বীর্যক্ষয়ের ফলে শরীর দুর্বল হবে এবং দেহমনের ক্ষতি হবে এটা প্রায় সবাই বিশ্বাস করে।

হস্তমৈথুনের সঙ্গে জড়িত অপরাধবোধই ছেলেমেয়েদের প্রধান ক্ষতি করে। অপরাধবোধ, শাস্তির ভয় ও মনের গভীরে শাস্তিকামনা মনের শান্তি নষ্ট করে। দেহমনের রোগ প্রতিরোধের শক্তিকে খর্ব করে। অত্যধিক হস্তমৈথুন দেহমনের পক্ষে ভালো নয়। কিন্তু অত্যধিক হস্তমৈথুন মানসিক স্বাস্থ্য যাদের ভালো নয় এমন ছেলেমেয়েরাই করে। অত্যধিক হস্তমৈথুনকে সোজাসুজি নিবৃত্ত করবার চেষ্টা না করে কারণটির অনুসন্ধান করে সে কারণটিকে দূর করবার চেষ্টা করলেই সুফল পাবার সম্ভাবনা বেশী। ঐ জন্য অবশ্য ব্যাপারটি সম্বন্ধে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক—যেটা সাধারণতঃ মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছেই আশা করা যায়।

শিশুজীবনে যৌনসুখের (ব্যাপক অর্থে) একটি তাগিদ আছে। অনেকে মনে করেন কিছু যৌনসুখ তার পাওয়া দরকার। অপরাধবোধমুক্ত পরিমিত যৌনসুখের দ্বারা শিশুর কোন ক্ষতি হয় না—এ কথা সম্ভবতঃ সত্য। তবে যৌনসুখলাভের অবাধ স্বাধীনতা তার পাওয়া উচিত নয়, এ কথাও ঠিক। এ বিষয়ে কয়েকটি অনুসন্ধান হয়েছে, তবে কোনটাই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। ফলাফল সম্বন্ধেও মনোবিদরা একমত নন। (৩)

যৌনশিক্ষা ও প্রেম

হুফার (৪) তার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিছু ছেলেমেয়ে গৃহের মুক্ত পরিবেশে বড়

হবার সুযোগ পেয়েছিল। যৌন আচরণ ও যৌন ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করবার অনেকখানি স্বাধীনতা ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয়েছিল। হস্তমৈথুনকে সংযত করা হয় নি। ঈর্ষাকে খুশীমত আত্মপ্রকাশে তাদের বাধা দেওয়া হয়নি। সময় সময় পিতামাতার নগ্নদেহ দেখবার সুযোগও ছেলেমেয়েরা পেয়েছিল।

এ সব ছেলেমেয়েরা কি ভাবে বড় হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর রেখে দেখা গেছে কিছু কিছু ব্যাপারে ভালো ফল পাওয়া গেলেও মন্দ দিকটার পরিমাণও কম নয়। এসব ছেলেমেয়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আগ্রহ ও প্রতিভার স্ফুরণ হলেও কোন জটীল বিষয়ে, মনোনিবেশ করা কিম্বা অধ্যবসায় সহকারে কাজ করা এদের পক্ষে কঠিন হয়। এরা বহুল পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক থেকে যায়। বাস্তবের দাবী মানতে, বড়দের কথা শুনতে এদের অনিচ্ছা এবং দিবাস্বপ্ন এরা বেশী দেখে। এদের মধ্যে বিরক্তি ও বিষণ্ণতা প্রবল হয়ে ওঠে।

হফার কতজনকে দেখে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—তিনি তা উল্লেখ করেন নি। তা ছাড়া ঐ এক্সপেরিমেণ্টে সম্ভবতঃ কোন্ নিয়ন্ত্রণদল ছিল না। সুতরাং ঐ সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করায় বাধা আছে। তা ছাড়াও আরেকটি কথা আছে। একটি শিশু তার পিতামাতা, শিক্ষক শিক্ষিকার কাছ থেকে যে শিক্ষাই পাক না কেন, বৃহত্তর সমাজ জীবনের নীতি ও আচরণের দ্বারা সে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হবেই। পিতামাতার শিক্ষা ও সামাজিক নীতির মধ্যে যদি একটি গুরুতর ব্যবধান থাকে, তবে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বে সেটা প্রতিফলিত হবে। অমন ক্ষেত্রে শিশুর পক্ষে সহজভাবে অনুভব ও আচরণ করা কঠিন। নিজের ইচ্ছা ও আচরণের জন্য নিজেকে কিছুটা অপরাধী মনে করা এবং সেজন্য সময় সময় বিষণ্ণ ও বিরক্ত হওয়া তার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

যৌনকাজের অবাধ অধিকার শিশুদের দেওয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে চোদ্দমাস পর্যন্ত বয়সের শিশুরা নিজেদের বিষ্ঠা নিয়ে খেলা করে আনন্দ পায়; কিন্তু কোন মায়ের পক্ষেই শিশুদের সে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ঐ প্রয়োজনটির বিকল্প পরিতৃপ্তির জন্য শিশুদের সময় সময় কাদা বা প্ল্যাস্টিসাইন দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, শৈশবে যৌনসুখ বেশী পেলে, শিশুরা সেই অবস্থা ও মনোভাবকে আঁকড়ে থাকতে চাইবে—যাকে মনঃসমীক্ষায় সংবন্ধন বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে বড় হবার, বিকাশলাভ করবার প্রেরণাটি দুর্বল হবে। সংবন্ধনের দুটি দিক আছে। এক, আবেগ ও আচরণের দিক; দুই পাত্রের দিক। শৈশবের সুখকে আঁকড়ে থাকলে শিশুদের আবেগজীবনের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে না। এরা দেহে বড় হলেও, এদের মন অনেকাংশ অপরিণত থেকে যায়। শিশু সুলভ যৌনতৃপ্তির উপরই এদের ঝোঁক বেশী থেকে যায়। এরা ভালবাসা চায়, কিন্তু ভালবাসতে পারে না।

পাত্র সংবন্ধন সম্বন্ধে বলা যায় যে, শৈশবে যাদের কাছ থেকে

এরা সুখ ও ভালোবাসা পেয়েছিল, মনেমনে (সচেতন মনে না হোক, নির্জ্ঞান মনে) তাদেরই আঁকড়ে থাকতে চায়। তাদেরও যে এরা ঠিক ভালবাসে তা নয় (সময় সময় সচেতন মনে তাদের এরা ঘৃণাই করে, নির্জ্ঞানে অবশ্য থাকে আকর্ষণ) ; তবে তাদের এরা ছাড়তে পারে না। নিজের মনকে সরিয়ে এনে অন্য কোন পাত্রে মনকে ন্যস্ত করা এদের পক্ষে অনেকাংশে অসম্ভব হয়। বিপুলাধরণীর মানুষের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ করে, (স্বামী বা স্ত্রীকে) ভালোবেসে সুখী হওয়া এদের পক্ষে কঠিন। মন অতীতে আবদ্ধ থাকায় এদের মধ্যে পরকে আপন করবার শক্তির অভাব দেখা যায়।

এও মনে রাখা দরকার শিশুর অহম্ দুর্বল। উত্তেজনার ঝড় সইবার শক্তি তার মধ্যে কম। প্রবল উত্তেজনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার দরকার আছে। আবার যৌন সুখ যেমন সে চায়, বড় হতেও তেমনি সে চায়। সুতরাং যৌন জ্ঞান যেমন তার দরকার, যৌন ইচ্ছাকে কিছু পরিমাণে সংযত করতে বড়দের সাহায্যও তার তেমন দরকার।

তবে এটা দেখতে হবে যে শিশুর যৌন ইচ্ছাকে যেন বড়রা ভয় না করেন, শিশুও যেন ভয় না করে। ঐসব ইচ্ছার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই ; না-দেখবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। ঐসব ইচ্ছার কিছুটা পরিতৃপ্তি দরকার, কিছুটা বিকল্প পরিতৃপ্তি। সংযমের প্রয়োজনের কথা সময়মত শিশুকে বলা দরকার। খেলা ও কাজকর্মের অনেক রকম ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন— যার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের যৌন ইচ্ছাসমূহকে নানাভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারে।

যৌন বিষয়ে শিক্ষা

যৌন বিষয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের দরকার আছে। নিজেদের ভিতরকার তাগিদে, বড়দের আচরণ, নাটকনভেল, সিনেমা থেকে অস্পষ্টভাবে তারা যেটুকু সংগ্রহ করে—তাতে সমস্ত যৌন ব্যাপারটি সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরই বহুলাংশে ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা জন্মায়। আড়ালে ঐ বিষয় ছোটদের মধ্যে অনেকসময় যে ধারণা বিনিময় হয় তার সুরটি সুস্থ ও শোভন নয়।

ছেলেমেয়েদের যৌনজীবন সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল আছে। তাদের সঙ্গে সব ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করলে যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে তাদের মধ্যে একটি সুস্থ মনোভাব গড়ে তোলবার সহায়তা করা হবে। কাম সম্বন্ধে আমাদের অহেতুক ভয় ও ঘৃণার একটি

কারণ—কাম সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা। সুষ্ঠু জ্ঞান যৌন বিষয় সম্বন্ধে অশোভন কৌতূহল, অহেতুক ভয় ও ঘৃণাকে অনেক পরিমাণে দূর করবে আশা করা যায়।

যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু

যৌন জীবন সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনায় নরনারীর দৈহিক পার্থক্য, কেমন করে শিশু জন্মায়, যৌন মিলন, পুংকোষ এবং ডিম্বকোষের মিশ্রণ থেকে আরম্ভ করে ভ্রূণের মনুষ্যাকৃতি গ্রহণ, শিশুর জন্ম, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে বলা দরকার। যৌন জীবনে প্রেম ও ভালোবাসার একটি বড় স্থান আছে সেটি ছেলেমেয়েদের জানা ও বোঝা দরকার। যৌন রোগ সম্বন্ধেও কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের কিছু জ্ঞান থাকা ভালো।

শিক্ষাদাতার যোগ্যতা

সমস্ত আলোচনার সুরটি সহজ ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া দরকার। এ বিষয় আলোচনার ভার যাদের উপর, যৌন জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণাটি সুস্থ ও সহজ কিনা তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। নিজের মধ্যেই যদি অনেকখানি বাধা ও সংকোচ থাকে, কিম্বা আলোচনা দ্বারা যৌন আনন্দ লাভ করাই যদি কারো স্বভাব হয়, তবে আলোচনা দ্বারা সুফল ফলবে না। বক্তার মনোভাব অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যৌন ব্যাপারটি যাতে ছেলেমেয়েরা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে নিতে শেখে, ওই সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারণা জন্মায়, যৌন জ্ঞান দানের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। বক্তার আলোচনার দ্বারা ছেলেমেয়েদের বাধা ও সংকোচ যদি বাড়ে কিম্বা তাদের যৌন উত্তেজনা যদি বৃদ্ধি পায় তবে আলোচনায় ত্রুটি আছে বুঝতে হবে।

যৌন শিক্ষা সম্বন্ধে আপত্তি

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। যৌন বিষয়ে জ্ঞান ছেলেমেয়েদের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে, তাদের যৌন আচরণে প্ররোচিত করবে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা করেন। জ্ঞানলাভের সময় সাময়িকভাবে যৌন উত্তেজনা কিছু বাড়লেও সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে যৌন জীবন সম্বন্ধে যদি ছেলেমেয়েরা সুস্থ মনোভাব অবলম্বন করতে পারে তাহলে সেটাই বড় কথা হবে। সুষ্ঠু যৌন-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের যৌন আচরণে প্ররোচিত করবে এটা আমরা মনে করিনা। তবে এটা ঠিক, ছেলেমেয়েদের যৌন আচরণ

সম্বন্ধে যেখানে সহজ মনোভাব ও সহনশীলতার একান্ত অভাব, ছেলে-মেয়েদের যৌন জীবনের কথা শুনলে যেখানে বড়রা আঁতকে উঠেন—সেখানে ছেলেমেয়েদের যৌন জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বিশেষ অর্থ হয় না। যৌনশিক্ষার কার্যকারিতা অমন ক্ষেত্রে বহুলাংশে হ্রাস পায়।

যৌন শিক্ষায় বয়স্কদের সহনশীল মনোভাবের প্রয়োজন

কোন্ বয়সে ছেলেমেয়েদের যৌন জ্ঞান দেওয়া উচিত—এটি একটি বড় প্রশ্ন। কৈশোরে কাম প্রবৃত্তি অনেকাংশে পূর্ণতা লাভ করে, কাম উত্তেজনাও বাড়ে। যৌন-তথ্যকে ঐ বয়সে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা কঠিন। কাম বিষয়ে ঐ বয়সে প্রথমে শুনলে ভাবাবেগ ও উত্তেজনাই বড় হবে। সেজন্য কৈশোরের পূর্বেই যৌন জ্ঞান দেওয়া উচিত। কৈশোরে সেই জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক হতে পারে।

যৌন শিক্ষা লাভের বয়স

তিন চার বছর বয়সে ছোটরা নানা রকম প্রশ্ন করে। বাড়ীতে একটি নূতন শিশু জন্মালে জিজ্ঞাসা করে—ও কেমন করে এল, কোথেকে এল ইত্যাদি। ঠিক ঐ বয়সে যতটা সে গ্রহণ করতে পারবে ততটুকু জ্ঞান অকপটে তাকে দেওয়া উচিত। মনে রাখা আবশ্যক ঐ জ্ঞানের ব্যাপারে দ্বিধা বড়দের, শিশুদের নয়। কোন ব্যাপারেই সংকোচ করবার মত সংস্কার তার মনে জমে ওঠে নি। তবে যৌন জীবনের সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝা অত ছোটবেলায় সম্ভব নয়। তার জন্য কিছু বড় হওয়া দরকার। কিন্তু শৈশবে যারা নিজেদের প্রশ্নের সহজ ও সঠিক উত্তর পেয়েছে, খোলাখুলি পরিবেশে বড় হবার যাদের সুযোগ হয়েছে—পরবর্তীকালে সহজ ও স্বাভাবিক চিত্তে ধারাবাহিক যৌন জ্ঞান লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

জীবনের দুটি ঘটনা সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের আগে থেকেই তৈরি করার বিশেষ আবশ্যকতা আছেঃ মেয়েদের বেলাতে তাদের ঋতু ও ছেলেদের বেলায় যাকে অনেক সময় বলা হয় 'স্বপ্নদোষ'।

ছেলেদের 'স্বপ্নদোষ' ও মেয়েদের ঋতু

ঋতুর ব্যাপারটা যেসব মেয়েরা জানে না হঠাৎ রক্তস্রাব তাদের কি ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত করে তা বলবার কথা নয়। ঋতুকে তারা স্বভাবতঃই একটি রোগ বলে মনে করে। ঋতু আরম্ভ হবার বেশ কিছু আগেই ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটি সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান মেয়েদের পাওয়া দরকার—অহেতুক আতঙ্ক যাতে তাদের জীবনকে দুর্বহ না করে তোলে।

একটি বয়সে ছেলেদের জননগ্ল্যাণ্ড কাজ আরম্ভ করে। দেহাভ্যন্তরে—জনন গ্ল্যাণ্ডের নিঃসরণের ফলে শুক্র জমে। সেই শুক্র যখন বেশ বেশী হয়, রাত্রে ঘুমের সময় লিঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাধারণতঃ যৌনবিষয়ক স্বপ্ন দেখে যে উত্তেজনা হয়, তারই ফলে ঐ ক্ষরণ ঘটে। এমনটি প্রত্যেকেরই হয়, এটা দেহমন বিকাশের একটি স্বাভাবিক নিয়ম, এটা কোন রোগ নয়—এসব কথা ছেলেদের জানা দরকার। ব্যাপারটি ঘটবার পূর্বেই ঐ বিষয়ে ছেলেদের জ্ঞান দেওয়া উচিত। তাহলে অহেতুক মানসিক পীড়া ও ভয়ে তাদের ভুগতে হবে না।

শৈশবে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধির বিপদ: শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন

যৌন উত্তেজনার বাড়াবাড়ি ঘটলে বড়দের জীবনেও ক্ষতি হয়। ছোটদের বেলায় একথা আরও অধিকতর সত্য। নাটক, নভেল, সিনেমার আজকাল ছড়াছড়ি। যৌন আবেদনই হচ্ছে এদের অধিকাংশের প্রধান কথা। বড়দের আচরণও অনেক সময় ছোটদের বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করে। এক হল, বড়দের নিজেদের মধ্যে প্রায় খোলাখুলি যৌন আচরণ। দুই, ছোটদের প্রতি বড়দের আচরণ। ছোটদের বাড়াবাড়ি চুমো দেওয়া, ছানাছানি করা কোন কোন লোকের স্বভাব। এতে ছোটদের যৌন উত্তেজনা বাড়ান হয় যার ফল ছোটদের পক্ষে ভালো নয়।

যে উত্তেজনাকে কর্মের দ্বারা পরিতৃপ্ত ও প্রশমিত করা সম্ভব নয়, তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ছোটদের জীবনে যৌন পরিতৃপ্তির পরিধি সংকীর্ণ ও সীমিত। যৌন উত্তেজনা তাদের মনে যাতে না বাড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক।

যৌন জীবনে সংযমের প্রয়োজন

যৌন জীবনে সংযমের প্রয়োজন আছে একথা ছেলেমেয়েদের জানা দরকার। যৌন ইচ্ছা সম্বন্ধে ভয় পাবার কিছু নেই। সে ভয়ের ফলে প্রধানতঃ অবদমনই ঘটে। কিন্তু স্থান কাল নির্বিচারে যৌন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ও অপরিমিত যৌন আচরণের দ্বারা অনেক সময় নিজেদেরই ক্ষতি করা হয়। জীবনে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন প্রয়োজন আছে। ঐ সব ইচ্ছার প্রতি সুবিচার করতে হলে কোন একটি ইচ্ছাকে খুব বড় করে দেখা সম্ভব নয়। খাওয়া দরকারী হতে পারে—কিন্তু যে ব্যক্তি খাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু বোঝে না, জীবনের বিচিত্র আনন্দের অনেকখানি থেকে সে বঞ্চিত হল। তদুপরি খাওয়ার সুখ পেতে হলেও ক্ষুধা

আবশ্যক। ক্ষিধে পাবার আগেই যে খায়, খাওয়াকে ঠিকমত সে উপভোগ করতে পারে না। যৌন ইচ্ছারও ভালোমত বিকাশ হবার আগে তার অপরিমিত ভোগের দ্বারা যৌন সুখকে খর্ব করা হয়। এ ছাড়াও আরেকটি কথা বলবার আছে। যৌন ইচ্ছা কিছু পরিমাণ অপরিতৃপ্ত হলে পরেই তার ঊর্ধ্বায়ন সম্ভব। যে সমাজে আমরা বাস করি, যৌন পরিতৃপ্তি সম্বন্ধে সে সমাজে অনেক নিয়ম কানুন আছে। সে নিয়ম কানুন কিছু কিছু বদলাবার কথা আমাদের মনে হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সে সব নিয়ম কানুন প্রচলিত আছে, ততক্ষণ তা আমাদের মেনে চলতে হবে। অসামাজিক জীবনযাপন করে কেউ সুখী হতে পারে না।

যৌন জীবনে প্রেমের প্রয়োজন

বিবাহের মধ্য দিয়ে যে যুগ্ম-জীবন ছেলেমেয়েদের একদিন যাপন করতে হবে, তাকে সফল ও সার্থক করে তোলবার জন্য উপযোগী হয়ে তারা যাতে বড় হয়ে উঠতে পারে—সেদিকেও শিক্ষার দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কেবলমাত্র জ্ঞান নয়, এজন্য আবশ্যক উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ রচনা।

যৌন লিপ্সার সঙ্গে সাধারণতঃ হৃদয়ের কোমলবৃত্তির যোগাযোগ দেখা যায়। কিন্তু বয়স ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বিকর্ষণ ও বিদ্বেষও লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে যারা গড়ে ওঠে, পরিণত বয়সে তাদের পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা ও ভালবাসাটাই প্রধান হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সবক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের কাম ও প্রেমজীবনের বিকাশ সম্পূর্ণতা লাভ করে না। কাম ও প্রেম দুটি শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা শব্দ দুটির পার্থক্য এভাবে করব। নিজের ইন্দ্রিয় সুখই কামের লক্ষ্য। প্রেমে প্রেমাস্পদের সুখ প্রেমিকের কাছে বড় হয়ে উঠে *। 'তার সুখে আমার সুখ, তার দুঃখে আমার দুঃখ'।

যে কামজীবনে প্রেমের অভাব—সে সব ক্ষেত্রে নর (কিম্বা নারী) নারীর (কিম্বা নরের) প্রতি নিষ্ঠুর হয়। এসব ক্ষেত্রে কামের সঙ্গে ঘৃণার একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঘটে। এর বহু কারণ থাকতে পারে। কামের প্রতি ঘৃণা, কামকে অপরাধ মনে করা—এর একটি বড় কারণ। কামের বেগ প্রবল, কাম চরিতার্থ

* বৈষ্ণব কবি বলেছেন—"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা—তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥"

না করে মানুষ পারে না। কিন্তু পরিতৃপ্তি দ্বারা যৌন উত্তেজনা প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা ও অপরাধবোধ মনকে আচ্ছন্ন করে। নিজেকে ঘৃণা করা একটি কষ্টকর অনুভূতি, তাই ঘৃণা ও অপরাধের বোঝা পুরুষ নারীর স্কন্ধে চাপায়। 'নারী নরকের দ্বার'—এঁরাই এমন কথা বলেন। অনুরূপ কারণে নারীও পুরুষকে ঘৃণার পাত্র মনে করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ নারীর সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন। যৌনজীবনে নিজের সুখটাই তার কাছে বড়, নিজের সুখ হলেই হল। মেয়েরা ছেলেদের যদিবা বোঝে, ছেলেরা মেয়েদের প্রায়ই বুঝতে পারে না। মেয়েরা পুরুষের চক্ষে হয় দেবী, নইলে পুরুষের ভোগের সামগ্রী। তারাও যে মানুষ, তাদেরও যে পুরুষের মতন সুখদুঃখ আছে—এটা পুরুষদের কাছে সবসময় স্পষ্ট নয়।

সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে কোন বস্তুকে আমরা নিজেদের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখি। আলফ্রেড বিনের বুদ্ধি পরীক্ষার ছয় বছরের শিশুদের মতই প্রায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী। আম কি? খাবার জিনিস। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বাইরে দাঁড়িয়ে আমের বস্তুনিষ্ঠ রূপটি জানতে পারলেই তার স্বরূপের অনেকটা জানা সম্ভব।

অন্য একটি মানুষকে জানতে হলে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিও যথেষ্ট নয়। নিজের মনের সঙ্গে, সঠিক রূপে বলতে গেলে, সচেতন মনের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। কিন্তু অন্যের মনকে প্রত্যক্ষরূপে জানবার কোন উপায় নেই। অন্যের ব্যবহার দেখে তার মন সম্বন্ধে আমরা আঁচ করতে পারি। ঐ বুদ্ধিগত বিচারে উপলব্ধির পূর্ণতা নেই। ইচ্ছা ও আবেগ মানুষের মনের প্রধান উপাদান। অন্যের ইচ্ছা ও আবেগকে—কেবল মাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়—হৃদয় দিয়ে, অনুরূপ ইচ্ছা ও আবেগ নিজের মধ্যে অনুভব করে যে জানা তাকেই প্রকৃত জানা কিম্বা উপলব্ধি বলা যেতে পারে। রামের যদি শ্যামকে বুঝতে হয় তবে ক্ষণেকের জন্য রামকে মনে মনে শ্যাম হতে হবে। শ্যামের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তার সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা রামকে অনুভব করতে হবে।

অন্যের দুঃখ বুঝতে আমি নিজের দুঃখের সাহায্য নিই, অন্যের ভয়কে উপলব্ধি করতে ভয় নামক আমার নিজের আবেগ সহায়তা করে। কিন্তু স্ত্রী-ইচ্ছা পুরুষ বুঝবে কেমন করে? পুরুষ-ইচ্ছাই বা নারী বুঝবে কেমন করে?

স্বাভাবিক নিয়মে পুরুষের মানসিক গঠনে নারীত্ব ও নারীর মানসিক গঠনে পুরুষত্ব রয়েছে। নিজের স্ত্রী-ইচ্ছা যে পুরুষের মনের কাছে সহজ ও স্বচ্ছ, মেয়েদের সহজেই সে বুঝতে পারে। একটি মেয়ের উপর নিজের স্ত্রী-ইচ্ছাকে প্রক্ষেপ করে ক্ষণেকের জন্য পুরুষ তার সঙ্গে এক হয়। মেয়েটির সুখ দুঃখ, কামনা বাসনা—তার নিজের সুখ দুঃখ, কামনা বাসনা বলে বোধ হয়। মেয়েদের পুরুষদের বোঝবার বেলাতেও এই কথা বলা চলে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে নিজের স্ত্রী-ইচ্ছা সম্বন্ধে পুরুষেরা ততখানি সচেতন নয়। নিজের স্ত্রী-ইচ্ছা সম্বন্ধে তাদের মনে বাধা আছে।

৭।৮ বছরের ছেলেমেয়ে নিয়ে লেখক একটি অনুসন্ধান করেন। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "যদি তোমাকে বলা হয়—ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে হয়ে যেতে পার তবে তুমি তাই হতে চাইবে কি?" মেয়েদের বলা হয়—"যদি তোমাকে বলা হয়—ইচ্ছে করলে তুমি ছেলে হয়ে যেতে পার তবে তুমি তাই হবে কি?" ৩০টি ছেলের একটিও মেয়ে হতে চাইল না; ২৯টি মেয়ের ১১টি ছেলে হতে চাইল।

এ সমাজে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকৃত। বেশীর ভাগ সুখ সুবিধা পুরুষেরাই ভোগ করে। ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে নিজেদের বড় মনে করে। মেয়েরা ছেলেদের সমান হতে পারলেই যেন খুশী। লিঙ্গ থাকবার জন্য ছেলেরা নিজেদের বড়, এবং তা নেই বলে মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে করে—মনঃসমীক্ষার এ আবিষ্কারে কিছু সত্যতা থাকলেও সামাজিক অসাম্য ঐরূপ মনোভাবের একটি বড় কারণ। মেয়েদের প্রতি যাদের অবজ্ঞা, নিজেদের মানসিক নারীত্বকে তারা স্বীকার করতে পারে না। এ সব লোকের পক্ষে মেয়েদের বোঝা অসম্ভব হয়। নিজের বাইরে এরা যেতে পারে না। নারীকে ভোগের পণ্য বলেই এরা মনে করে। কিন্তু প্রেমবর্জিত অমন জীবনে কেবলমাত্র আংশিক যৌন পরিতৃপ্তি ঘটে। মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দ অমন জীবনে সম্ভব নয়। কামতৃপ্তি যেখানে প্রেমেরই চরম প্রকাশ, যৌনসঙ্গম যেখানে নরনারীর গভীরতম দেহ ও মনের মিলনের প্রতীক—কামের পূর্ণ মূল্য সেখানেই লাভ করা সম্ভব। পরিপূর্ণ মিলনের সুখ তখনই—যখন পুরুষ যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে পুরুষের সুখ ও আনন্দ এবং নারীর সুখ ও আনন্দ দুইই ভোগ করে। নারীর বেলাতেও সেই কথা সত্য। প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েই প্রেমের চরম মুহূর্তে অনুভব করে—'আমার সুখ আমার, তোমার সুখও আমার।'

কিন্তু কেবলমাত্র সাময়িক ভাবে পরস্পরকে বুঝলে (সেটাও প্রকৃত ঘটে কিনা সন্দেহ) ও পরস্পরের সুখদুঃখ পরস্পর অনুভব করলেই হ'বে না। নর ও নারীর মধ্যে স্থায়ী একাত্মতা জন্মালেই তাকে সার্থক প্রেম বলা যেতে পারে। নরের মানসিক নারীত্ব অমন ক্ষেত্রে একটি নারীর উপরই প্রধানতঃ আরোপিত হয়। তার সুখদুঃখকে সে সবচেয়ে বড় মনে করে। নারীর বেলায়ও একথা সত্য। বিবাহের মধ্যে অমন একটি সম্বন্ধ গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়।

সার্থক বিবাহে স্বামীর নারীত্ব রূপ লাভ করে স্ত্রীর মধ্যে, স্ত্রীর পুরুষত্ব মূর্তি নেয় স্বামীর মধ্যে। নারীত্ব ও পুরুষত্বের এমন প্রক্ষেপ বাস্তবিকই ঘটে। সে জন্যই স্বামী স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী-অংশ*, স্ত্রী স্বামীকে নিজের পুরুষ-অংশ বলে অনুভব করে। এ অনুভূতি সব সময়ে স্পষ্ট বা সচেতন না হলেও, অচেতন ভাবে মনে থাকে। একজনকে বাদ দিলে অপরজন নিজেকে আংশিক ও ভগ্ন বলে বোধ করে। দুজনে মিলেই তারা এক ও পূর্ণ। 'আমরা দুজনে এক' এ অনুভূতির মূলে হয়ত আরও কিছু থাকে। 'জীবনে একই ভাগ্যের আমরা অধিকারী, একই সন্তানের পিতামাতা, একই গৃহ, একই ভবিষ্যৎ আমাদের'।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। অধিকাংশ জীবনে পরিপূর্ণ একাত্মতা ঘটে না। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে আংশিক ও অসম্পূর্ণ একাত্মতা সচরাচর দেখা যায়। নিজেদের স্ত্রী-ইচ্ছা ও পুরুষ-ইচ্ছা কতখানি স্পষ্ট ও মুক্ত—একাত্মতার পরিমাণ তার উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করে।

একাত্মতা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের কেন্দ্রস্বরূপ হলেও ঐ সম্বন্ধের আরও অনেক দিক আছে—এ কথাও যোগ করা দরকার। বহু আবেগ ও রসের দ্বারা সম্বন্ধটি অভিষিক্ত। এ সম্বন্ধে আরেকটি প্রধান আবেগ—স্নেহ। পুত্রসম স্বামী স্ত্রীর স্নেহ ভোগ করে, কন্যাসম স্ত্রী স্বামীর স্নেহ লাভ করে। ফ্রয়েড মনে করেন (৫) মায়ের স্নেহে স্ত্রী স্বামীকে যতক্ষণ দেখতে না পারছে ততক্ষণ বিবাহবন্ধন স্থায়ী ও সুনিশ্চিত নয়।

যে গৃহ ও সামাজিক পরিবেশে ছেলেমেয়েরা বড় হবে—সেখানে তারা যেন সমান স্নেহ ও যত্ন লাভ করে, এটা দেখা দরকার। কাউকে আদর, কাউকে অনাদর, কারো অধিকার বেশী, কারো অধিকার কম—এমন পরিবেশ ভালো নয়। দেহ মনের গঠনে ছেলে ও মেয়েদের কিছু বিভিন্নতা আছে। ছেলে

* এ কারণে এ দেশে স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী।

হবার যেমন সুবিধা, মেয়ে হবারও তেমন কতগুলি সুবিধা আছে। আবার উভয় দলেরই কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে। অসুবিধাগুলি দুই ক্ষেত্রে এক না হলেও—অসুবিধা অসুবিধাই। ছেলেমেয়েরা যাতে পরস্পরকে কিছুটা শ্রদ্ধা করতে পারে সেজন্য চেষ্টা করা দরকার। মেয়ে হবার সুবিধা বুঝতে পারলে, মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে শিখলে—নিজেদের অন্তর্নিহিত নারীত্বকে সহজ স্বীকৃতি দেওয়া ছেলেদের পক্ষে সম্ভব হবে। মেয়েদের বেলাতেও অনুরূপ কথা বলা চলে। সার্থক প্রেম অমন মনোভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়।

ছোটবেলা থেকে সমান অধিকার ভোগ করে একসঙ্গে মানুষ হবার সুযোগ ছেলেমেয়েদের পাওয়াও বোধহয় দরকার। পড়াশোনা, খেলাধূলা, উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে জানবার ও বোঝবার তরেই তাদের সুযোগ হবে। একে অপরকে সাথী ও সুহৃদরূপে গ্রহণ করতে শিখবে। একের প্রতি অপরের দৃষ্টিভঙ্গিটাই, অবশ্য বড়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির উপর সান্নিধ্য ও সাহচর্যের প্রভাব রয়েছে। কাছাকাছি থেকে পরস্পরকে জানাশোনার মূল্যও কম নয়।

অধ্যায় ৯

ভাবগ্রন্থি, মানসপ্রকৃতি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

মানুষের মনকে আমরা দুভাগে ভাগ করে দেখবার চেষ্টা করেছি—তার ক্ষমতা ও তার প্রেরণা। সহজ ভাষায় তার পারার দিক ও তার চাওয়ার দিক। তার চাওয়া বা প্রেরণার মূলে সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনের কথা একটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। জন্মাবার পরে শিশুর সঙ্গে জগতের পরিচয় ঘটে। তার মা'কে সে দেখে, বাবাকে দেখে, ভাই-বোনকে দেখে, পোষা বিড়ালটিকে সে চেনে, নিজের পুতুল ও ছবির বইটার সম্বন্ধে তার মমতা জন্মায়, পাড়ার কুকুরটাকে সে ভয় করতে শেখে। অভিজ্ঞতার ফলে তার সহজ প্রবৃত্তিচয় বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়। পাড়ার কুকুরটিকে শিশু ভয় করে, তাকে দেখলেই শিশু সেখান থেকে সরে আসে। শিশুর মধ্যে যে ভয় ও অপসরণ প্রবৃত্তি ছিল তা ঐ কুকুরটির উপর সে ন্যস্ত করেছে।

ভাবগ্রন্থি

বস্তু বা ধারণার সঙ্গে সহজপ্রবৃত্তির এমন সম্বন্ধ গড়ে উঠলে তাকে ভাবগ্রন্থি* বা সেন্টিমেণ্ট বলা হয়। একটি বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে শিশুর যে একটিমাত্র আবেগেরই যোগ সাধিত হয় এমন মনে করবার কারণ নেই। শিশুকে মা ভালবাসেন। শিশু সম্বন্ধে মায়ের গর্ব আছে। শিশু পড়াশোনায় তত ভাল নয়, সেজন্য মা নিজেকে কিছুটা হীন মনে করেন। শিশু যে মায়েরই সৃষ্টি! শিশু সম্বন্ধে মায়ের আশঙ্কা রয়েছে—তার স্বাস্থ্য, তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে। শিশুর প্রতি মায়ের যে মনোভাব তা জটীল। একাধিক আবেগের স্থান তাতে রয়েছে।

---

* ভাব শব্দটি আমরা বাংলায় কখনও ধারণা, কখনও আবেগজনিত মনোভাব বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করি। কোন ধারণাকে কেন্দ্র করে আবেগসমূহ সংগঠিত হলে তাকে ভাবগ্রন্থি বলা যায়। ভাবের অর্থ ধারণা ও আবেগ দুইই হয়। এ কারণে ভাবগ্রন্থি শব্দটি আমরা ব্যবহার করলাম।

ভাবগ্রন্থিতে ঠিক আবেগ নয়, আবেগের সম্ভাবনা বা প্রেরণার স্থান রয়েছে বললে সঠিক বলা হবে। একটি জিনিষকে দেখে আমার রাগ হল। রাগ হল, আবার রাগ মিলিয়ে গেল। কিন্তু কোন একটি জিনিষকে দেখলেই আমার রাগ হয়—রাগের একটি নিত্য সম্ভাবনা মনের মধ্যে থেকে যায়। অমন রাগের সম্ভাবনা একটি ভাবগ্রন্থিরূপে মনের কাঠামোর একটি স্থায়ী অংশরূপে বিরাজ করে।

ভাবগ্রন্থি ও যৌগিক আবেগের মধ্যে পার্থক্য কি এখানে উল্লেখ করা দরকার। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে একটি আবেগ বা আবেগের সম্ভাবনা যুক্ত আছে, ম্যাকডুগালের এ মতবাদ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ঐ সব আবেগকে প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ বলা হয়। রাগ, ভয়, বিস্ময়, আত্মমোচনের অনুভূতি প্রভৃতি মৌলিক আবেগের দৃষ্টান্ত। জীবনে যে সব আবেগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, সেগুলি সবই মৌলিক আবেগ এ কথা সত্য নয়। যৌগিক আবেগের অভিজ্ঞতাও আমাদের ঘটে। একাধিক মৌলিক আবেগের মিশ্রণে যৌগিক আবেগের সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্বেষ বা শ্রদ্ধার কথা বলা যেতে পারে। বিদ্বেষের মধ্যে রাগ ও ভয় এ দুইটি মৌলিক আবেগের উপাদান আছে ; বিস্ময় ও আত্মমোচনের অনুভূতির সমাবেশে শ্রদ্ধার জন্ম হয়।

যৌগিক আবেগ ও ভাবগ্রন্থি

কোন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে যখন আবেগ (মৌলিক কিম্বা যৌগিক) গ্রথিত হয়—তখনি তাকে ভাবগ্রন্থি বলে। বস্তুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফলে বস্তুটির প্রতি একটি মনোভাব গড়ে ওঠে। ইচ্ছা ও আবেগ সমন্বিত ঐ মনোভাবই হ'ল ভাবগ্রন্থি ।

বিভিন্ন আবেগের সম্ভাবনা ভাবগ্রন্থিতে থাকলেও একটি আবেগ বা সঠিকরূপে তার সম্ভাবনা ভাবগ্রন্থির কেন্দ্রস্থল। তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য আবেগেরআবির্ভাব হয়। শিশুর প্রতি মায়ের মনোভাবে বাৎসল্যই মূল আবেগ ।

সাধারণতঃ ভালোবাসা বা ঘৃণাই ভাবগ্রন্থির মূল আবেগ এমন দেখা যায়। আলেকজাণ্ডার স্যাণ্ড (১) সেন্টিমেণ্ট বা ভাবগ্রন্থির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রথম চেষ্টা করেন। কোন বস্তু বা ব্যক্তি উপস্থিতি দ্বারা কয়েকটি আবেগকে জাগ্রত করে। সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে সে সব আবেগ, সঠিকরূপে বলতে গেলে, আবেগের সম্ভাবনা সংগঠিত হয়।

স্ট্যাণ্ড মনে করেন মনের একটি সহজাত সংগঠনী শক্তি আছে। ভাবগ্রন্থি সে শক্তিরই একটি পরিচয়। সে শক্তির ফলে ভাবগ্রন্থিগুলির মধ্যেও সম্বন্ধ গড়ে উঠে। এমন ভাবেই ধীরে ধীরে একটি সুসংগঠিত, একীভূত চরিত্রের সৃষ্টি হয়।

শিশুর অভিজ্ঞতার ফলে এক বা একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি বা আবেগ, একটি বস্তু বা ব্যক্তির ধারণাকে কেন্দ্র করে শিশুর মনে গড়ে ওঠে। এসব বিভিন্ন ভাবগ্রন্থির মধ্যে কোনটার গুরুত্ব তার জীবনে বেশী, কোনটির কম। মা'র স্থান শিশুর জীবনে অনেকদিন পর্যন্ত খুব বেশী। পাশের বাড়ির নূতন বন্ধুটিকেও সে ভালোবাসে। কিন্তু সে বন্ধু তার কাছে আজও অতখানি মূল্যবান নয়। পড়াশোনা? বাবা মা চান বলে সে করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দরকারি তার কাছে—সে নিজে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুখদুঃখ ছাড়াও আরো কোন কোন জিনিষ তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। নিজের মনের কাছে তার একটি আদর্শ গড়ে ওঠে। তাই সে হতে চায়। নিজেকে সে মূল্য দিতে চায়, মর্যাদা দিতে চায়। অপরেও তাকে মূল্য ও মর্যাদা দিক তাই সে আকাঙ্ক্ষা করে। তার আত্মমর্যাদাবোধ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিজেকে ঘিরে এই আবেগের জালকে আত্মবিষয়ক ভাবগ্রন্থি বলা চলতে পারে।

আত্মবিষয়ক ভাবগ্রন্থি ও চরিত্র

মানুষের জীবনে আত্মশ্রদ্ধার পাশাপাশি আত্ম-অশ্রদ্ধাও দেখা যায়। বিভিন্ন জীবনে আত্ম-অশ্রদ্ধার পরিমাণের অবশ্য তারতম্য আছে। নিজেদের যারা অশ্রদ্ধা করে, ঘৃণা করে—তাদের মনে শান্তি কম। এদের মধ্যে সময় সময় অসামাজিক ও অস্বাভাবিক আচরণও দেখা যায়। যে আত্মশ্রদ্ধা অসামাজিক কাজ থেকে মানুষকে বিরত করে—এদের জীবনে সেটার অভাব বলেই এমনটি ঘটে। নিজেকে শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা ব্যাপারে মনের নৈতিক অংশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। মনের নৈতিক অংশকে নৈতিক ভাবগ্রন্থি বলা যেতে পারে।

ভাবগ্রন্থির মধ্যে আত্মবিষয়ক ভাবগ্রন্থিই প্রধান। আত্মবিষয়ক ভাবগ্রন্থিকে কেন্দ্র করে মনের অন্যান্য ভাবগ্রন্থি গড়ে ওঠে। এই সংঘকে বলা হয় ভাবগ্রন্থিদের সংগঠন।

ভাবগ্রন্থি গড়ে ওঠে আবেগের প্রেরণা ও অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে। ছোট শিশুদের কার্যকলাপে ভাবগ্রন্থির প্রভাব কম, সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব বেশী। অভিজ্ঞতার স্বল্পতার জন্য বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে তাদের আবেগ তত দৃঢ়ভাবে গড়ে

ওঠে নি। শিশুমনের সংগঠনী শক্তিও সম্ভবতঃ দুর্বল। সেজন্য তাদের মন ছাড়াছাড়া, সুসংগঠিত নয়।

ভাবগ্রন্থি গঠনে এক বা একাধিক আবেগ থাকে। অনেক সময় দেখা যায় বিপরীতধর্মী আবেগ একটি ভাবগ্রন্থিকে আশ্রয় করেছে। একই ব্যক্তির প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা দুইই রয়েছে। একে দ্বিমুখী মনোভাব বলা যায়। একই বস্তুকে আশ্রয় করে আবেগের এই বৈপরীত্য শিশুর জীবনে প্রায়ই দেখা যায়। দুটির মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা ছোটদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মা'কে কখনও শুধু সে ভালোবাসে, আবার কখনও মা'র প্রতি ক্রোধে ও ঘৃণায় সে আচ্ছন্ন হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেশীর ভাগ লোকের মনে আবেগের অতখানি বৈপরীত্য দেখা যায় না। আপোষ মীমাংসার দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি একটি স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মনে গড়ে উঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ একটি আবেগকে নির্জ্ঞানে অবদমিত করে।

দ্বিমুখী মনোভাব

ভাবগ্রন্থিগুলির মধ্যে সময় সময় সংঘাত ও সংঘর্ষ ঘটে। ইচ্ছার সংঘাতরূপেই তা দেখা দেয়। ছোটদের বেলায়—পড়াশোনা করব, না—খেলা করব, বড়দের বেলায়—নিজের সুখ, না—ছেলেমেয়েদের সুখের জন্য সচেষ্ট হব—এই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

ভাবগ্রন্থিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন খুব তীব্র হয়, ব্যক্তি তখন বিরোধমান একটি ভাবগ্রন্থির সঙ্গে সচেতন মনের সম্পর্ক ছিন্ন করবার চেষ্টা করে। সে ভাবগ্রন্থিটিকে তার সচেতন মন অস্বীকার করে। এই ধরণের ভাবগ্রন্থিকে কমপ্লেক্স বলা যেতে পারে। মায়ের প্রতি যৌন ইচ্ছা ও পিতার মরণ ইচ্ছা প্রত্যেক পুরুষই পোষণ করেন বলে মনঃসমীক্ষা মনে করে। কিন্তু এমন ইচ্ছা বা মনোভাব অধিকাংশ লোকেই সচেতন মনে পোষণ করেন না। এগুলির অস্তিত্ব নির্জ্ঞান মনে। এজন্যই এদের ইডিপাস * কমপ্লেক্স বলা হয়।

কমপ্লেক্স

কমপ্লেক্স শব্দটি অবশ্য ফ্রয়েড সেন্টিমেন্ট বা ভাবগ্রন্থির অর্থেই ব্যবহার করার কথা বলেছেন। "একই আবেগের সুরে বাঁধা" কতগুলি ধারণার সমষ্টিকে একটি কমপ্লেক্স বলা

* ইডিপাস প্রাচীন গ্রীক নাটকের নায়ক। সে পিতাকে হত্যা করেছিল এবং নিজের মাতাকে বিবাহ করেছিল। মা'কে অবশ্য নিজের মা বলে সে জানত না।

যেতে পারে। ফ্রয়েডের মতে (২) ইডিপাস কমপ্লেক্স একটি অবদমিত কমপ্লেক্স। মনের প্রধান সচেতন অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন বলাই বোধ হয় সঠিক হবে। কারণ কমপ্লেক্স অভিজ্ঞতা নয় এবং অবদমন শব্দটি ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ব্যবহার করাই ভালো। কার্যতঃ কিন্তু বিছিন্ন ভাবগ্রন্থি সম্পর্কেই কমপ্লেক্স শব্দটি ব্যবহার করা হয়। (৩) এ কারণেই সেন্টিমেন্ট বা ভাবগ্রন্থি শব্দটিকে মনের প্রধান স্থায়ী অংশ বা অহমের সংগঠন বলা সঙ্গত হবে। অন্যপক্ষে উপ-অহম আশ্রিত মনের বিচ্ছিন্ন স্থায়ী অংশকে আমরা কমপ্লেক্স বলব।

মানসিক বিভক্তি

মনের দুটি ভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতির ফলে সময় সময় মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। দুটি মন যেন দুটি মানুষ—একই দেহকে আশ্রয় করে পরপর আত্মপ্রকাশ করছে। ডরিস (৪) বলে একটি মেয়ে দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের একটি দৃষ্টান্ত। তার তিন বছর বয়সে তার বাবা মাতাল অবস্থায় তাকে বিছানা থেকে ফেলে দেন। সেই থেকে ডরিস অত্যন্ত শান্ত, পরিশ্রমী ও বিবেকসচেতন একটি মেয়ে হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে অমন শান্ত মেয়েটি কিন্তু একেবারে উদ্দাম, অশান্ত ও অসামাজিক হয়ে উঠত। আশ্চর্য এই শান্ত ভালোমানুষ ডরিস দুরন্ত ডরিসের কার্যকলাপের কথা কিছুই স্মরণ করতে পারত না। অমন কাজ সে করেছে এই কথা ভালোমানুষ ডরিস কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারত না। দুরন্ত ডরিস কিন্তু ভালোমানুষ ডরিসের কথা জানত। দুরন্ত মেয়েটি শান্ত ডরিসকে বিদ্রূপ ও করুণার চোখে দেখত।

একই দেহকে আশ্রয় করে সময় সময় দুইয়ের বেশী ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখা গেছে।

একটি ভাবগ্রন্থির মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী আবেগের উপস্থিতি, দুটি ভাবগ্রন্থির পরস্পরবিরুদ্ধতা ও সংঘাত, এমন কি মনের দুইটি অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি আলাদা ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি—এসব কথা আমরা উল্লেখ করলাম। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশলাভ করেছে এমন একটি ব্যক্তির মনটি সুসংগঠিত, এমন আমরা আশা করব। ছোটখাটো বৈপরীত্য থাকলেও সে সবের সমাধান তার জানা আছে। জীবনে কোন্ পথে চলতে হবে বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে সে তা জানে। সেই পথেই সে চলে। ভাবগ্রন্থির কোনটিকে কতখানি মূল্য দিতে হবে সে জ্ঞান তার হয়েছে।

ভাবগ্রন্থির সংগঠন ছাড়া ব্যক্তির আরেকটি দিক উল্লেখ করা দরকার।

কেউ হয়ত আশাবাদী। জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাই তার চোখে পড়ে। কারো দৃষ্টিভঙ্গীতে হতাশাই বড়। জীবনের অশুভ সম্ভাবনাই তার আগে মনে পড়ে। কেউ হয়ত অন্তর্মুখী—নিজের চিন্তা ও কল্পনা নিয়েই থাকতে ভালোবাসে। কারো মন বহির্মুখী—বাইরের জগত সম্বন্ধে তার আগ্রহ বেশী। মনের এসব বৈশিষ্ট্যকে আমরা মানসপ্রকৃতি বলতে পারি। দেহ ও দৈহিক রসায়নের সঙ্গে এ সকল মানসিক বৈশিষ্ট্যের গুরত্বপূর্ণ যোগ রয়েছে।

মানসপ্রকৃতি

আবেগমূলক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে অলপোর্ট (৫) মানসপ্রকৃতি বা Temperament বলেছেন। উদ্দীপক কি ভাবে, কতখানি একজনের আবেগকে জাগ্রত করে, উদ্দীপ্ত আচরণের দ্রুতি ও শক্তি, একজনের মনের স্বাভাবিক সুর (যেমন প্রফুল্ল, বিষণ্ণ প্রভৃতি), সেই সুরটির কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে—আবেগমূলক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বলতে এসব বোঝায়। অলপোর্ট মনে করেন, মানসপ্রকৃতি প্রধানতঃ বংশগত।

আত্ম-আবৃত ও আবর্তিত প্রকৃতি

মানসপ্রকৃতি বিভাগ করতে গিয়ে ক্রেসমার (৬) আত্ম-আবৃত বা সিজোথাইম এবং আবর্তিত বা সাইক্লোথাইমদের কথা উল্লেখ করেছেন।*

ইয়ুং মানস-প্রকৃতিকে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বলে ভাগ করেছেন। আত্ম-আবৃতেরা কিছুটা অন্তর্মুখী ও আবর্তিতেরা কিছুটা বহির্মুখী এ কথা বলা চলে।

---

* মানসিক রোগের মধ্যে চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা সিজোফ্রেনিয়া এবং খেদোন্মত্ত বাতুলতা বা সাইক্লিক ব্যধির কথা আমরা জানি। প্রথমটিতে রোগী নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি ক্রমে ক্রমে সে ছিন্ন করে। এরা আপনমনে হাসে, কথা বলে—নিজেদের মনগড়া জগতে বাস করে। সাইক্লিক রোগীকে কখনও উত্তেজিত, কখনও অবসন্ন হতে দেখা যায়। উত্তেজিত অবস্থায় কথা বলতে আরম্ভ করলে কথার তোড়ে নিজেই সে ভেসে যায়। যা বলছে শেষ পর্যন্ত তার কোন অর্থ থাকে না। আবার অবসাদের মুহূর্তে হয়ত সে বসে বসে কাঁদে, চুপ করে হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে। আত্ম-আবৃত প্রকৃতির লোকেরা অসুস্থ হলে, সাধারণতঃ তারা সিজোফ্রেনিয়া রোগগ্রস্ত হয়। আবর্তিতদের মানসিক রোগ—সাইক্লিক ব্যাধি। এ কথার অর্থ এই নয় যে আত্ম-আবৃত বা আবর্তিত প্রকৃতি দুটি মানসিক রোগ। ঐ ধরণের মানসপ্রকৃতি সাধারণ স্বাভাবিক লোকদের মধ্যে দেখা যায়, প্রতিভাযুক্ত শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। এদের অনেকেরই সারাজীবন সুস্থভাবে কাটে। এসব মানসিক প্রকৃতির মধ্যে কিছুটা অসুস্থ মনোভাব আছে কিনা সেটা অবশ্য চিন্তা করার বিষয়।

তবে আত্ম-আবৃত ও আবর্তিত বিভাগ অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বিভাগের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক নয়। আত্ম-আবৃত ও আবর্তিত মানসিক প্রকৃতির সঙ্গে দেহের গড়নের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে। ঢেঙ্গা রোগা ফ্যাকাসে ধরণের চেহারাকে এসথেনিক গড়ন বলা হয়। মোটাসোটা গোলগাল চেহারাকে বলা হয় পিকনিক গড়ন। এসথেনিকদের মানসপ্রকৃতি আত্ম-আবৃত ও পিকনিকেরা আবর্তিত মানসপ্রকৃতি-সম্পন্ন।

আত্ম-আবৃত লোকেদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও ঐ প্রকৃতির একটি মূলসুর আছে। মনে মনে এরা কিছুটা নিঃসঙ্গ। মানুষের সঙ্গে আত্ম-আবৃত লোকেরা সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ হতে পারে না। মানুষের সঙ্গে এরা কথা বলে, গল্প করে--তবু সর্বদা একটা ব্যবধান বাঁচিয়ে চলে। একজন অসুস্থ আত্মআবৃতের ভাষায় "পৃথিবী ও আমার মাঝখানে নিরন্তর রয়েছে একখানা কাঁচের দেয়াল।" ঐ কথা সব আত্ম-আবৃতের বেলাতেই কিছু পরিমাণে বলা চলে। মানুষের সম্বন্ধে এদের অনেকেরই মনে রয়েছে এক গভীরমূল বিরুদ্ধতা ও অবিশ্বাস। আত্ম-আবৃত লোকেরা কিছুটা সাবধান প্রকৃতির লোক। তারা হিসাব করে কথা বলে। কোন জায়গায় গিয়ে সন্তর্পণে বসে। আদর্শবাদ, সৌন্দর্য-বোধ, আত্মোন্নতির চেষ্টা এদের অনেকের মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এদের আবেগজীবন অনেক সময় নিরুত্তাপ। এরা শিল্পী হলে, বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ ভঙ্গি বা স্টাইল এদের কাছে বড়। কবি হলে অনেক সময় এরা রোমান্টিক কবি হয়। গবেষণায় এরা ন্যায় ও দর্শনের ক্ষেত্র বেছে নেয়।

আবর্তিত প্রকৃতির মধ্যে নানাধরণ আছে। মানুষের প্রতি একটি সহজ শুভেচ্ছা প্রায় সব ধরণের আবর্তিত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। মানুষ এরা পছন্দ করে। মানুষের সাহচর্যে এরা আনন্দ পায়। দলের মধ্যে এদের অনেকের কণ্ঠস্বর দূর থেকে শোনা যায়। অনর্গল কথা বলে, রঙ্গরসিকতা করে এরা সকলকে প্রাণবন্ত করে রাখে। মানুষের সঙ্গে এরা অনেকেই অন্তরঙ্গ হতে পারে। জীবনে এদের অধিকাংশের সন্তুষ্টি আছে। জীবনকে এরা উপভোগ করতে পারে। শিল্পে এদের কাছে বিষয়বস্তু বড়। প্রকাশভঙ্গিকে এরা তত দাম দেয় না। সাহিত্যে রিয়্যালিস্ট, হিউমারিস্ট এদের মধ্যেই দেখা যায়। গবেষণার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর এদের ঝোঁক বেশী।

বিশুদ্ধ আত্ম-আবৃত বা বিশুদ্ধ আবর্তিত বড় দেখা যায় না। মাঝামাঝি ও মিশ্রিত লোকের সংখ্যাই বেশী। তবে কোন কোন লোকের মধ্যে কোন একটি উপাদানের প্রাধান্য দেখা যায়।

মানুষের মনের উপর এনডোক্রিন গ্লাণ্ডের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। 'মনের দেহগত ভিত্তি' অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। তবে অধিকাংশমানুষের বেলাতে গ্লাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে। সে সব ক্ষেত্রে মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে পার্থক্যের কারণ গ্লাণ্ড নয়, সম্ভবতঃ অন্য কিছু।

ভাবগ্রন্থির সংগঠন ও মানসপ্রকৃতি এই দুই নিয়েই মানুষের চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব। স্ত্যাণ্ড ও ম্যাকডুগাল চরিত্র শব্দটি ঐ অর্থে ব্যবহার করেছেন। ম্যাকডুগালের ভাষায় সহজাত প্রবৃত্তি ও মানসপ্রকৃতির ভিত্তির উপর অর্জিত প্রেরণাসমূহের সমষ্টিকে চরিত্র বলা যেতে পারে (৭)। কিন্তু চরিত্র শব্দটি সাধারণতঃ নৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে ভালো ও মন্দ এই ভাবটা রয়েছে। এজন্য অলপোর্ট প্রভৃতি আধুনিক মনোবিদরা চরিত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিত্ব শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব কি বলতে গিয়ে অলপোর্ট বলেছেন—পরিবেশের সঙ্গে স্বকীয় সামঞ্জস্য সাধনের জন্য একজন লোক দেহমনের যে অংশসমূহ ব্যবহার করেন সেগুলির সক্রিয় সংগঠনকে ব্যক্তিত্ব বলা চলে। (৮)

চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ পরিমাপ করবার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য কিছু চেষ্টাও হয়েছে। নীচে তাই লিপিবদ্ধ করা হল। প্রথমেই এ কথা বলে রাখা ভালো, মানুষের ক্ষমতার দিকটা (যেমন বুদ্ধি ইত্যাদি) পরীক্ষা করা যত সহজ, চরিত্র পরীক্ষা তত সহজ নয়। এ কারণে চরিত্র পরীক্ষা ব্যাপারে সাফল্যের পরিমাণ আজও কম। চরিত্র পরীক্ষায় নীচের বিষয় সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করা হয়েছে ঃ

(১) পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ।

(২) আবেগের শক্তি। যেমন কারো রাগ কম না বেশী, ভালোবাসা কম না বেশী ইত্যাদি।

(৩) দৃষ্টিভঙ্গী। ধর্মের প্রতি, রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি, সামাজিক আচার বিচার সম্বন্ধে তার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী।

(৪) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যেমন ব্যক্তি সাধু কি অসাধু, অন্তর্মুখী না বহির্মুখী, আশাবাদী না নৈরাশ্যবাদী ইত্যাদি।

(৫) মানসিক সংগঠন। যেমন লোকটির মন সুসংগঠিত না অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বিধাদীর্ণ। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা চলে—লোকটি সুস্থ না অসুস্থ। অসুস্থ হলে কি জাতীয় অসুস্থতা।

(৬) ভাবগ্রন্থির সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান।

নিম্নোক্ত উপায়ে এ সবের পরীক্ষা করা যেতে পারে :

(১) প্রশ্নাবলী।

(২) নির্ধারণ মাপক বা তুলনামূলক পরিমাপ।

(৩) অবস্থা সৃষ্টি দ্বারা চরিত্র পরীক্ষা।

(৪) প্রক্ষেপমূলক অভীক্ষা।

প্রশ্নাবলী :

পরীক্ষার্থীকে সোজাসুজি বা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে তার মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ জানতে হলে—কি সে পছন্দ করে এবং কি করে না জানা দরকার। সেটা সবটাই তাকে নিজে বলতে না বলে পরীক্ষক সাধারণতঃ একটি তালিকা পরীক্ষার্থীর কাছে হাজির করেন। পরীক্ষার্থীকে বলতে হয়—কোনটি তার পছন্দ, কোনটি অপছন্দ। তেমনি ব্যক্তি বহির্মুখী না অন্তর্মুখী জানবার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে বেশীর ভাগ সময় তিনি একা থাকতে ভালোবাসেন, না অন্যদের সঙ্গ কামনা করেন। লোকের সঙ্গ তার কেমন লাগে? একা থাকতেই বা তিনি কিরূপ বোধ করেন ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলীর সাহায্যে কাউকে জানবার অসুবিধা হল মনের সব খবর, বিশেষতঃ মনের গভীরতর দিকটি সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর নিজেরই জ্ঞান নেই। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও সময় সময় তিনি ঠিক উত্তর দিতে রাজী হবেন না। যেটা বললে অন্যদের তার সম্বন্ধে ভাল ধারণা হবে, অন্ততঃ খারাপ ধারণা হবে না—সেইটেই হয়ত তিনি বলবেন।

একজন কতখানি ভালবাসা চান বা অন্যদের তিনি কতখানি ভালবাসেন—প্রশ্নাবলীর সাহায্যে নির্ণয় করবার চেষ্টা করে লেখক কিছুটা সফল হয়েছেন। কিন্তু নিজেদের পরীক্ষার্থীরা কতখানি ভালবাসেন—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাঁদের

কাছ থেকে পেয়েছেন বলে লেখক মনে করেন না। নিজেদের ভালোবাসা পরীক্ষার্থীদের বেশীর ভাগের চোখেই অনুচিত মনে হয়েছে।

পরীক্ষার্থীকে নানাভাবে দেখবার সুযোগ যাদের হয়েছে—তাঁরা কোন একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার্থীর খুব বেশী, বেশী, মাঝামাঝি, কম না খুব কম আছে বলতে পারেন। পরিমাপ ঠিক আঙ্কিক না হলেও—কেবলমাত্র আছে বা নেই—এর চেয়ে এ ধরণের তুলনামূলক পরিমাপের মূল্য নিশ্চয়ই বেশী। তুলনার জন্য ৪টি থেকে ১০টি স্কেল বা মানক ব্যবহার করা যেতে পারে।

তুলনামূলক পরিমাপ বা স্কেল

এ ধরণের পরিমাপে কয়েকটি জিনিস মনে রাখলে পরিমাপটি সঠিকতর হবে। যে কোন বৈশিষ্ট্য পরিমাপে মধ্যম গুণসম্পন্নরাই হচ্ছে অধিকাংশ। তাদের চেয়ে ঐ বৈশিষ্ট্য অল্প বেশী বা কম আছে—এমন লোকের সংখ্যা অল্প। বৈশিষ্ট্য খুব বেশী আছে বা খুব কম আছে—এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। চলতি বিচারের জন্য একটি হার উল্লেখ করা যেতে পারে।* মধ্যম গুণসম্পন্নেরা হবে ৫০%, কিছু বেশী ও কিছু কম—এদের প্রত্যেকটি দল ২০% এবং খুব বেশী ও খুব কম এমন প্রত্যেকটি অংশ ৫%। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা যদি খুব কম হয়, অথবা তারা যদি বিশেষভাবে একটি নির্বাচিত গ্রুপ হয়—তবে অবশ্য ঐ হার প্রয়োগ করায় কিছু অসুবিধা আছে।

পরীক্ষকদের সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পরিমাপে বাধা সৃষ্টি করে। চেষ্টা করলেও পরীক্ষকদের পক্ষে সব সময়ে পক্ষপাতিত্ব বা সংস্কারদোষমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য একটি পরীক্ষার্থীকে যদি একাধিক শিক্ষক বা শিক্ষিকা পরিমাপ করেন এবং সে সব পরিমাপের গড় নেওয়া হয়—তবে পরিমাপটি সঠিকতর হবে বলে মনে করা যেতে পারে। কয়েকজন পরীক্ষক আলাপ আলোচনা করে, পরীক্ষার্থীকে কোন শ্রেণীতে ফেলা হবে—এটি স্থির করতে পারেন। পরিমাপের পন্থা হিসাবে ঐটিও গ্রহণযোগ্য। উপরের দুইটির মধ্যে কোনটি অধিকতর ভালো বলা কঠিন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি প্রথম পন্থা অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী ভালো বলে দেখা গেছে।

পরীক্ষকেরা যেখানে পরীক্ষার্থীকে ভালোমত জানেন এবং পরীক্ষা

---

* প্রাকৃতিক বিন্যাসের নিয়মকে ভিত্তি করেই ঐ কথা আমরা বলছি। 'প্রাকৃতিক বিন্যাস' সম্বন্ধে ১৩ এবং ২৫ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ব্যাপারে নিজেরা যেখানে দক্ষ সে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষকের পরিমাপে উচ্চ ঐক্যাঙ্ক পাওয়া গেছে। পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্কের পরিমাণে +.৮০ থেকে +.৯০ পর্যন্ত হয়েছে। *

তুলনামূলক স্কেলের সাহায্যে শিশুর উদ্যম, সাহস, সহযোগিতা, মানসিক চাঞ্চল্য, প্রফুল্লতা প্রভৃতি বিচার করা যেতে পারে।

একজনকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—তিনি সত্যবাদী কিনা, বিপদে তিনি স্থির থাকতে পারেন কিনা, তিনি হয়ত বলবেন—হাঁ। কিন্তু সব সময় সে কথা সত্য নাও হতে পারে। তাই পরীক্ষাগৃহে উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে তার সত্যনিষ্ঠা, বিপদে তার মানসিক স্থৈর্য বা অন্যান্য গুণাবলীর পরীক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়।

অবস্থা সৃষ্টি

ছেলেমেয়েদের সাধুতা পরীক্ষার জন্য একটি প্রশ্নপত্রে কতগুলি শব্দ লিখে তাদের দেওয়া হল। কতগুলির বানান ঠিক, কতগুলির বানান ভুল। বলা হল —"ভুল বানানগুলির পাশে একটা দাগ দাও।" পরীক্ষক প্রশ্নপত্রগুলি নিয়ে গেলেন। পরদিন এসে ছেলেমেয়েদের বললেন, "প্রশ্নগুলি দেখতে তোমরা আমাকে সাহায্য কর।" প্রত্যেকের প্রশ্নপত্র প্রত্যেককে ফিরিয়ে দেওয়া হল। ব্ল্যাকবোর্ডে শুদ্ধবানানসহ শব্দগুলি লিখে দেওয়া হল।

ছেলেমেয়েদের কাছে পেন্সিল ও রবার আছে। ইচ্ছা করলে বেশী নম্বর পাবার জন্য নিজেদের ভুল তারা কম করে দেখাতে পারে। কিন্তু পরীক্ষক প্রথম দিনে কে কি উত্তর লিখেছে তাঁর নিজের খাতায় তুলে রেখেছেন। সুতরাং কেউ যদি তাদের দেওয়া দাগ রবার ও পেন্সিলের সাহায্যে বদলায় তিনি সেটা সহজেই ধরতে পারবেন। এভাবে ছেলেমেয়েদের বানান জ্ঞান নয়, সাধুতা পরীক্ষা করা হল।

বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে, সৈনিকদের মানসিক স্থৈর্য, নেতৃত্বের ক্ষমতা, সহযোগিতা প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

একটি অবস্থা সৃষ্টি করে একটি ছেলের একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য (যেমন সাধুতার) পরীক্ষা করা হল। পরবর্তী পরীক্ষাতেও ঐ ফলাফল পাওয়া যাবে কিনা —এটি একটি প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ঐ পরীক্ষার ফল প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা। অর্থাৎ বানান পরীক্ষায় সাধু বলে যাকে দেখা গেল,

* পারম্পর্য ও ঐক্যাঙ্ক কি জানবার জন্য 'পরিসংখ্যান' অধ্যায়টি দেখুন।

খেলার মাঠেও সে অমন সাধু কিনা! এক ধরণের বিপদে কোন এক ব্যক্তি স্থির থাকেন। কিন্তু অন্য ধরণের বিপদে তিনি চঞ্চল হবেন এমন কি বলা যায় না? এ সম্বন্ধে অধ্যায়ের শেষে দিকে আমরা আলোচনা করেছি।

ব্যক্তিত্বের সবদিক এ ধরণের পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায় কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

প্রক্ষেপমূলক অভীক্ষা

ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা ব্যাপারে প্রক্ষেপমূলক অভীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। একটি ছবি দেখিয়ে একজনকে একটি গল্প বানাতে বলা হল। কিম্বা কাগজের উপর কালির একটি ছাপ। পরীক্ষার্থীকে বলা হল, 'কী দেখতে পাচ্ছ আমায় বল।' পরীক্ষার্থী ঐ কালির ছাপের মধ্যে যা দেখতে পেল বল্‌ল। ঐ দেখা ও বলাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা ও আবেগ জীবনের বৈশিষ্ট্য। প্রক্ষেপমূলক অভীক্ষার কয়েকটি ধরণ নীচে উল্লেখ করা হল।

শব্দ-অনুষঙ্গ পরীক্ষা

পরীক্ষক পর পর কতগুলি শব্দ বলেন। প্রত্যেকটি শব্দ শোনবার পর পরীক্ষার্থীকে একটি করে শব্দ বলতে হয়। পরীক্ষার্থী কোন শব্দ বললো, তার শব্দ শোনা ও বলার মধ্যে কতখানি সময়ের ব্যবধান ইত্যাদির দ্বারা পরীক্ষার্থীর ভাবগ্রন্থি ও কমপ্লেক্সদের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। এ পরীক্ষাকে শব্দ-অনুষঙ্গ পরীক্ষা বলা হয়। একটি ছেলে ছোটবেলায় চুরি করত। তাকে শব্দ-অনুষঙ্গ পরীক্ষা করা হল। তার প্রতিক্রিয়া বা উত্তরের নমুনা নীচে দেওয়া হল।

সারণী—৭

উদ্দীপক শব্দ *	**উত্তর** (প্রতিক্রিয়া শব্দ)	**দ্বিতীয়বার উত্তর** †
চুরি	চোর	খুব অন্যায়
মিথ্যা	পাপ	পাপ
ধরা পড়ল	চোর	চোর
পুলিশ	সাফ করে	চোর ধরবে।

ছেলেটি চুরি করত। সেজন্য নিজেকে সে অত্যন্ত অপরাধী মনে করত। তার সব সময়েই ভয় ছিল তার শাস্তি হবে, পুলিশ তাকে ধরবে। শব্দ-অনুষঙ্গ পরীক্ষায় ঐ মনেভাবটি ধরা পড়েছে।

* পরীক্ষক বলেন।

† প্রথমবার পরীক্ষার কিছুক্ষণ পর আবার পরীক্ষক এক এক করে শব্দগুলি বলেন ও পরীক্ষার্থী শুনে দ্বিতীয়বার তার ইচ্ছামত শব্দ বলে।

প্রক্ষেপমূলক পরীক্ষায় থেমাটিক এ্যাপারসেপ্সন্ অভীক্ষা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভীক্ষাটি উদ্ভাবন করেন আমেরিকান মনোবিদ মারে। (১০)

থেমাটিক এ্যাপারসেপসন অভীক্ষা

অনেকগুলি ছবি একটার পর একটা পরীক্ষার্থীর কাছে হাজির করা হয়। তাকে কয়েক মিনিট সময় দেওয়া হয় একেকটি গল্প বলবার বা লিখবার জন্য। বলা হয়—'ঐ ছবিটা দেখ। এরা কি করছে এবং ভবিষ্যতে এদের কি হবে, এরা কি করবে—ভেবে লেখ।

পরীক্ষার্থীকে উত্তরটি কল্পনা করতে হয়। ঐ কল্পনার মূলে থাকে পরীক্ষার্থীর ইচ্ছা ও মানসিক প্রবণতা। দুঃখবাদীর গল্প দুঃখ ও নৈরাশ্যে বারম্বার সমাপ্ত হয়। নায়ক কখনও তার অভীষ্ট লাভ করে না। কিন্তু নায়ক বারংবার কি চায়, অভীষ্টলাভে কী জাতীয় বাধা সে আশঙ্কা করে তাও গল্প থেকে ধরা পড়ে।

গল্পগুলিকে কি ভাবে বুঝতে হবে, পরিমাপ করতে হবে—সে সম্বন্ধে মারে নির্দেশ দিয়েছেন। গল্পগুলির মধ্যে দুটি জিনিস বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। ব্যক্তির মানসিক প্রয়োজন ও পরিবেশের প্রভাব। যাকে মারে বলেছেন যথাক্রমে Need এবং Press.

রসাক অভীক্ষার কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। সুইস মনোবিদ রসাক (১১) দশটি কালির ছাপের সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার একটি অভীক্ষা

রসাক অভীক্ষা

উদ্ভাবন করেন। কালির ছাপের কয়েকটি কালো, কয়েকটি রঙিন। প্রত্যেকটি কালির ছাপ পরীক্ষার্থীকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়—কি সে দেখতে পাচ্ছে। পরীক্ষার্থী সমগ্র ছাপটি দেখছে না ছোট ছোট অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে, ছাপের রঙ, রূপ বা চেহারা কতখানি পরীক্ষার্থীর উত্তরকে নিয়ন্ত্রিত করছে, ছাপের মধ্যে সে কোন গতি প্রক্ষেপ করছে কিনা এবং সর্বশেষে পরীক্ষার্থী কি দেখতে পাচ্ছে—এসবের দ্বারা ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়ে। ব্যক্তিত্বের গঠন ধরবার পক্ষে এ অভীক্ষাটি বিশেষভাবে কার্যকরী। মানসিক সুস্থ ও বিভিন্ন ধরণের মানসিক রোগগ্রস্ত লোকদের উত্তরের মধ্যে অনেক সময় সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে।

রসাকের মতে ছাপটিকে সমগ্রভাবে দেখবার মধ্যে বিমূর্ত ও সংশ্লেষণকারী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ যাদের উত্তরকে অধিক নিয়ন্ত্রিত করে তারা

* একে **Thematic Apperception Test** বলা হয়। সংক্ষেপে **T. A. T.**

সাধারণতঃ আবেগপ্রবণ হয়, যখন যা খুশী তারা করতে চায়। গতিশীল মানুষ যারা কালিতে দেখে তারা চিন্তাজগত ভালবাসে। বেশীর ভাগ ছাপের মধ্যে যারা জন্তু জানোয়ার দেখে তাদের মানসিক শৈশব আজও কাটেনি। স্পষ্ট, সঠিকরূপ যারা দেখে নিজেদের মনের উপর তাদের কর্তৃত্ব আছে।

চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে আত্মসঙ্গতি ও উপযুক্ত ব্যাপকতা আছে কিনা—ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটি ছেলের বানান পরীক্ষায় সাধুতার একটি নমুনা পাওয়া গেল। অল্প দিনের ব্যবধানে তাকে আবার পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষাটির ফলাফলের মধ্যে উচ্চ পজিটিভ পারম্পর্য পাওয়া গেলে বলা যাবে যে অভীক্ষার ফল ছুটি, অথবা, ব্যক্তিত্বের ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু আত্মসঙ্গত। অন্ততঃ এটুকু বলবার অধিকার আমাদের থাকবে যে একটি বানান পরীক্ষা ব্যাপারে যদি সে সাধু বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে—পরবর্তীকালেও (তার স্বভাবে বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটলে) বানান পরীক্ষায় তাকে সাধুরূপে পাওয়া যাবে। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে তার বানান পরীক্ষার সাধুতা থেকে খেলার মাঠে তার সাধুতা সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব কিনা? সাধুতার পরীক্ষাগুলি অনুরূপ হলে অভীক্ষার মধ্যে উচ্চ পজিটিভ পারম্পর্য পাওয়া যায়। স্কুলের বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষার মাধ্যমে সাধুতা পরীক্ষার পরম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক +·৭০ দেখা গেছে। কিন্তু খেলার মাঠে নিজের খেলা সম্বন্ধে বড়াই করা—অর্থাৎ যা নিজে নয়, তাই বলা এবং স্কুলের পরীক্ষায় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ায় পারম্পর্য কম। ঐ ক্ষেত্রে পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্গের পরিমাণ+·২০। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, যারা সাধু তারা প্রায় সব ব্যাপারেই কমবেশী সাধু। কিন্তু অসাধুতা তেমন ব্যাপক বৈশিষ্ট্য নয়। স্কুলে অসাধু হলে খেলার মাঠে অসাধু হবে কিম্বা খেলার মাঠে যে অসাধু সে স্কুলেও অসাধু—এমন পাওয়া যায় নি। দেখা গেছে যারা সাধু তাদের গৃহ ও পাড়ার পরিবেশ ভালো, আত্মীয়স্বজনের তারা প্রিয়। অসাধুদের গৃহ ও পাড়ার পরিবেশ ভালো নয়, আত্মীয়স্বজনেরা তাদের ভালোবাসে না। (১২)

ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের আত্মসঙ্গতি ও উপযুক্ত ব্যাপকতা

বিভিন্ন অবস্থাতেও একজনের সাধুতা বজায় থাকে। এজন্য বলা যেতে পারে সাধুতা নামক বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত ব্যাপকতা আছে। কিন্তু অসাধুতাকে বাদ দিয়ে সাধুতা পরীক্ষা সম্ভব নয়। অসাধুতার ব্যাপকতা কম।

নিম্নোক্ত চারিত্রিক উপাদানের আত্মসঙ্গতি ও ব্যাপকতা আছে বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই বারোটি বৈশিষ্ট্যকে প্রাথমিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য বলে মনে করবার কারণ আছে। এদের পরস্পরের মধ্যে পজিটিভ পারস্পর্যের পরিমাণ অল্প (১৩) :

প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য	বিপরীত
১। উদার ঢিলেঢালা।	কঠিন, ভীরু বৈরভাবাপন্ন ও লাজুক।
২। বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা, নির্ভরযোগ্য।	নির্বোধ, চিন্তাশূন্য ও লঘুচিত্ত।
৩। স্থিরচিত্ত ও বাস্তববাদী।	নিউরোটিক, অস্থিরচিত্ত।
৪। উদ্ধত ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী	নম্র ও আত্মমোচনকামী।
৫। শান্ত, প্রফুল্ল, সামাজিক ও আলাপী।	বিষণ্ণ, দুঃখী, নিঃসঙ্গ ও অস্থির।
৬। স্নেহশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন।	কঠোর ও দয়ামায়াশূন্য।
৭। শিক্ষিত, সৌন্দর্যপিপাসু।	অশিক্ষিত, সৌন্দর্যবোধশূন্য।
৮। দায়িত্বশীল, বিবেকসম্পন্ন ও কষ্টসহিষ্ণু।	দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, খেয়ালী ও নির্ভরশীল।
৯। দুঃসাহসী, নির্ভাবিত ও দয়ালু।	বাধাপ্রাপ্ত, সাবধানী।
১০। প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী ও ক্ষিপ্র।	নির্জীব, ধীর ও স্বপ্নালস।
১১। সহজেই যারা উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত হয়।	নিরুত্তেজ ও সহনশীল।
১২। বন্ধুভাবাপন্ন ও বিশ্বাসপরায়ণ।	বৈরীভাবাপন্ন ও সন্দিগ্ধচিত্ত।

অধ্যবসায় বা w উপাদান

মানুষের চরিত্রে w আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—ওয়েব (১৪) এমন মনে করেন। wকে অধ্যবসায়ের ক্ষমতা মনে করা যেতে পারে। wকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়েব বলেছেন w হচ্ছে উদ্দেশ্যের স্থিতি ও স্থায়িত্ব, 'ইচ্ছাশক্তির দরুণ কর্মে সঙ্গতি।' যাদের মধ্যে w উপাদানটি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, একটি লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত অটল থেকে দীর্ঘদিন

ধরে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তারা কাজ করে যায়। এ ধরণের লোকেরা সাধারণতঃ অস্থিরচিত্ত ও আবেগপ্রবণ হয় না। কোন কোন চরিত্রে আবেগ প্রবল। রাগ, দুঃখ, ভয়, প্রভৃতি সব আবেগেরই শক্তি এদের মধ্যে বেশী। আবেগ প্রাবল্যের সঙ্গে অধ্যবসায়ের একটি নেগেটিভ সম্বন্ধ আছে। (১৬)

'ইচ্ছাশক্তি' বলে একটি শব্দ আমরা ব্যবহার করেছি। ইংরেজিতে একে will বলা হয়। কারো মধ্যে ইচ্ছাশক্তি প্রবল, কারো ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। 'আমি এই কাজটি করব'—এ কথা দুজনের মুখে আমরা শুনলাম। শত বাধা বিপত্তি একজনকে নিবৃত্ত করতে পারল না। সে কাজটি করল। বিন্দুমাত্র বাধা দেখামাত্র অপরজন পরাজয়কে মেনে নিল। কাজটি তার আর করা হল না। ইচ্ছাশক্তি অহমের শক্তি। যে অহম সচেতন ও নির্জ্ঞান অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল, তার ইচ্ছাশক্তি সবল হতে পারে না। যে চরিত্র সুসংগঠিত ও একীভূত—যেখানে নিজের মনের মধ্যে হাজারো রকমের বাধা নেই—সেখানে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি প্রবল। বাইরের বাধার সঙ্গে যোঝবার জন্য প্রায় গোটা মানুষটা সেখানে প্রস্তুত। মনের একাংশের বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন তাকে হতে হয় না।

ইচ্ছশক্তি বা অধ্যবসায় একটি সত্যেরই দুটি দিক। ইচ্ছাশক্তি থাকলে লোকের পক্ষে অধ্যবসায়ী হওয়া সম্ভব। অধ্যবসায় থাকলে লোকটির ইচ্ছাশক্তি আছে আমরা অনুমান করতে পারি।

শিক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য দীর্ঘদিনের একত্রে সাধনা আবশ্যক একথা সকলেই জানেন। একটি কাজে কে কতখানি লেগে থাকতে পারে—তার উপর শিক্ষা ও সাফল্যের পরিমাণ কতকাংশে নির্ভর করে। প্রতিভা সম্বন্ধে একটি চলিত কথা আছে। প্রতিভা হচ্ছে এক দশমাংশ প্রেরণা ও নয়দশমাংস পরিশ্রম। কেবলমাত্র সামর্থ্য ও প্রতিভা থাকলেই হয় না। অবিচলিত নিষ্ঠায়, সুদীর্ঘ সাধনা দ্বারা প্রতিভা সার্থক রূপ লাভ করে।

অধ্যায় ১০

শিশুর বিকাশ

—ক—

বিকাশের বিভিন্ন দিক

শৈশব বিকাশের সময়, বৃদ্ধির সময়। নয়মাস দশদিন (ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্য ঘটে) মাতৃগর্ভে থেকে যে শিশু জন্মালো সে অতি ক্ষুদ্র ও অসহায়। হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, তাকিয়ে দেখতে পারে না, দাঁত নেই, অধিকাংশ সময় সে ঘুমিয়ে কাটায়। এ জীবনে বাঁচবার, বেঁচে থাকবার একমাত্র পাথেয় তার পিতামাতার স্নেহ, প্রাপ্তবয়স্কদের সাহায্য। শিশু কাঁদে। বড়দের চক্ষে সে কাঁদার অর্থ, শিশুর অসুবিধা হচ্ছে, শিশুকে সাহায্য কর। পাওয়া নিয়ে শিশুর জীবন আরম্ভ হয়। সে চাওয়া পাওয়াও শিশুর কাছে অধিকাংশ সময়ে স্পষ্ট নয়। এই শিশু বড় হয়। সে তাকিয়ে দেখতে পারে, হাঁটতে পারে ও কথা বলতে শেখে। যে হাত একদিন তার বশে ছিল না, সে হাত দিয়ে কত সূক্ষ্ম কাজ করতে শেখে। পাওয়া নিয়ে যার জীবন আরম্ভ হয়েছিল সে দিতে শেখে। কেবলমাত্র নিজের জন্য সে নিজে নয়, পরের জন্যও তার অস্তিত্ব তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। যে সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে সে জন্মেছিল, সেগুলি আরও বিকশিত হয়। যেগুলি কেবলমাত্র প্রেরণা ছিল, বস্তুর সংস্পর্শে এসে সেগুলি সঠিক রূপ গ্রহণ করে।

শিশুর জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে সে জীবন চাওয়া ও পারা'র দ্রুত বিকাশের একটি বিস্ময়কর অধ্যায়।

স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষা

এই বিকাশের প্রধানতঃ দুটি রূপ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমটিকে বলা চলে স্বাভাবিক বিকাশ, দ্বিতীয়টিকে বলব শিক্ষা-জনিত বিকাশ। কুড়ি ইঞ্চি শিশু আঠারো বৎসর বয়সে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হল। এটাকে স্বাভাবিক বিকাশ বলা চলে।

অন্যপক্ষে যে শিশু কথা বলতে জানত না, শব্দের অর্থ বুঝত না, শব্দ উচ্চারণ করতে পারত না—একদিন সে কথা বলতে ও বুঝতে শিখল। এই বিকাশকে শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করব। বটগাছের বীজের মধ্যে বটগাছের সম্ভাবনা লুক্কায়িত থাকে। একদিন সে বীজ থেকে বটগাছ হয় (আম গাছ হয় না)। এটা প্রধানতঃ স্বভাবিক বিকাশ। কিন্তু একটি একমাসের বাঙালী শিশুকে (অর্থাৎ পিতামাতা যার বাঙালী) বাঙলাভাষাভাষী পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে চীনাভাষাভাষী পরিবেশে রাখলে সে চীনাভাষা শিখবে, বাঙলা ভাষা নয়। কারণ ভাষা শিশু শেখে, স্বাভাবিক বিকাশের দ্বারা তার ভাষায় অধিকার জন্মায় না।

বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। স্বাভাবিক বিকাশে বংশগতি * ও শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব প্রধান এ কথা বলা চলে।

স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষার পার্থক্যের কথা আমরা বললাম। কিন্তু অনেক দিক দিয়ে স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষা পরস্পর নির্ভরশীল—এ কথা স্মরণ রাখা দরকার। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে পরিবেশের প্রভাবকে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। শিশুর লম্বা হবার কথাই ধরা যাক। পরিবেশ থেকে শিশু আহার গ্রহণ করে, পুষ্টিলাভ করে। পুষ্টিলাভ না করলে শিশু বাঁচতে পারত না। এটা ঠিকই সে কি খায় তার উপরে কতখানি সে লম্বা হবে সেটা বিশেষ নির্ভর করে না। কিন্তু না বাঁচলে শিশু লম্বা হবে না। সোজাসুজি না হলেও ঘুরিয়ে দেখলে শিশুর লম্বা হবার উপর পরিবেশের প্রভাব আছে। কিন্তু সেটা গৌণ। প্রধানতঃ স্বাভাবিক বিকাশের প্রেরণায় শিশু লম্বা হয়।

স্বাভাবিক বিকাশের একটি দৃষ্টান্ত

স্বাভাবিক বিকাশে পরিবেশের প্রভাব যতটা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, শিক্ষায় স্বাভাবিক বিকাশের স্থান তার চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলা কথা শুনে শিশু বাঙলা কথা বলতে ও বুঝতে শেখে। কিন্তু কোন সময়ে? যখন তার

* বংশানুক্রমিক (**inherited**) ও সহজাত (**innate**)—এই দুটি শব্দের পার্থক্য স্মরণ রাখা আবশ্যক। শিশু একটি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মালো। কালে সে সম্ভাবনার বিকাশ হল। সম্ভাবনাটি সহজাত—সে সম্ভাবনার প্রধানতঃ স্বাভাবিক বিকাশ হল। এই সম্ভাবনাটি সে বংশগতিতে পেয়েছে কিনা—সেটা আরেক স্তরের প্রমাণ-সাপেক্ষ।

বোঝবার ক্ষমতা ও শব্দ উচ্চারণ করবার ক্ষমতা স্বাভাবিক বিকাশের ফলে একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ যতক্ষণ না শিশুর বুদ্ধির কিছু বিকাশ হচ্ছে, যতক্ষণ না জিহ্বাপেশীর উপর তার কর্তৃত্ব জন্মাচ্ছে ততক্ষণ হাজার বাঙলা কথা শুনলেও সে বলতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। শিশু গোড়াতে ত বর্গের বর্ণ উচ্চারণ করতে শেখে, ট বর্গের বর্ণ নয়। টুটুল বলতে বললে সে বলবে তুতুল। ট উচ্চারণ করতে জিহ্বাকে যে ভাবে চালনা করবার ক্ষমতা আবশ্যক সে ক্ষমতা তার প্রথমদিকে হয় না।

শিক্ষায় স্বাভাবিক বিকাশের স্থান

লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। লেখাপড়া শেখবার ব্যাপার। সে সুযোগ যে পেল না সে লেখাপড়া শিখবে না। কিন্তু সুযোগ পেলে কোন বয়সে, কতখানি সে শিখতে পারবে—সেটা নির্ভর করে প্রধানতঃ তার দেহ মনের স্বাভাবিক প্রস্তুতির উপর। একটি তিন বছরের ছেলেকে লিখতে শেখান যায় কিনা? এ প্রশ্নের সাধারণতঃ উত্তর হবে—না। হাতের বড় ও ছোট মাংসপেশীর উপর তিন বছরের শিশুর সে কর্তৃত্ব জন্মায়নি, চোখ ও হাতের যোগাযোগ আবশ্যকানুযায়ী দৃঢ় হয়নি—যা দিয়ে, দেখে দেখে তার পক্ষে লেখা সম্ভব। সে ইচ্ছামত হিজিবিজি কাটতে পারে, ছবি আঁকতে পারে—কিন্তু কোন কিছুকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে পারে না। কেবলমাত্র হাতের মাংস-পেশী নয়, নিজের মনোযোগের উপরও একটি তিন বছরের শিশুর কর্তৃত্ব কম। লেখক একটি ছেলেকে ৭ বছর বয়সে (ছেলেটির বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪২) * জ্যামিতির প্রথম উপপাদ্যটি পড়াতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিল—ছেলে উপপাদ্য বুঝতে পারে কিনা দেখা। দেখা গেল ছেলেটি জ্যামিতির পর পর দুই লাইনের যুক্তিধারা বুঝতে পারছে। তৃতীয় লাইনে যাওয়া মাত্র সব গুলিয়ে ফেলছে। জ্যামিতি বোঝা ও শেখার একটি মনোবয়স আছে। সেটা সম্ভবতঃ বারো বছর। ঐ মনোবয়সের আগে জ্যামিতি শেখাবার চেষ্টা করলে শিক্ষার্থী জ্যামিতি তোতাপাখীর মত মুখস্থ করবে, কিন্তু জ্যামিতি বুঝতে পারবে না। যে সব অল্পসংখ্যক অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের বয়স কোনকালেই বারো বছর হয় না—জ্যামিতি তাদের পাঠ্য হলে জ্যামিতি তারা মুখস্থ করবে, কিন্তু বুঝতে পারবে না।

লেখাপড়া শেখার স্বাভাবিক প্রস্তুতি

---

* বুদ্ধ্যঙ্ক, মনোবয়স কি আমরা 'ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

লেখাপড়া কত বয়সে আরম্ভ করা উচিত মনোবিদ্‌রা এ বিষয়ে কিছু গবেষণা করেছেন। সাধারণ ছেলেমেয়েদের পক্ষে সাড়ে ছয় বছর বয়সের আগে (অর্থাৎ সাড়ে ছয় বৎসর মনোবয়সের আগে) লেখাপড়া শিখলে সেটা বিশেষ কাজের হয় না আমেরিকান মনোবিদ্‌দের (১) অনেকের এইরূপ ধারণা।

দৈহিক ক্ষমতা ও আচরণের বিকাশের সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাভাবিক বিকাশের নিবিড় সম্বন্ধ স্মরণ রাখা আবশ্যক। স্বাভাবিক বিকাশের ফলে দৈহিক ক্রমবর্ধন, কোষসমূহের বিভিন্নরূপ পরিগ্রহণ, মাংসপেশীর সংযোজনা প্রভৃতি ঘটে। দেহ একটি কাজের জন্য প্রস্তুত হলে পর পুনঃ পুনঃ আচরণের দ্বারা জীব দক্ষতা অর্জন করে। একটি মুরগীর ছানা ডিম থেকে বেরিয়ে আসবার অল্পকাল পরেই ঠুকরে ঠুকরে মাটি থেকে শস্য খাবার চেষ্টা আরম্ভ করে (স্বাভাবিক বিকাশ)। কিন্তু তার লক্ষ্য স্থির না হওয়াতে শতকরা মাত্র ২০ ভাগ চেষ্টা তার সফল হয়। দিনে দিনে তার লক্ষ্য নিশ্চিততর হতে থাকে। (২) তার লক্ষ্যের যে উন্নতি তার মূলে প্রধানতঃ রয়েছে তার চেষ্টা ও শিক্ষা, কিছুটা অবশ্য স্বাভাবিক বিকাশ।

জীবতত্ত্ব থেকে দৃষ্টান্ত

স্বাভাবিক বিকাশের প্রধানতঃ দুটি দিক আছে। এক হচ্ছে, বৃদ্ধি। দেহাবয়বের বৃদ্ধি তার একটি ভালো দৃষ্টান্ত। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং বাড়ে। দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে দেহ একটি সুসংবদ্ধ এককরূপে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন অংশকে সংহত করে দেহের পক্ষে একটি সুসংবদ্ধ সমগ্ররূপ লাভ স্বাভাবিক বিকাশের আরেকটি দিক। দেহের কথা এক মুহূর্ত চিন্তা করলে বোঝা যায় দেহ হচ্ছে বহু মিলে এক। মনের বিভিন্ন অংশের একীকরণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে একটি সুসংবদ্ধ চরিত্র গড়ে উঠে। এর মূলেও স্বাভাবিক বিকাশের প্রেরণা আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

বিকাশের দুটি দিক

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় বৃদ্ধির জন্য চারটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, খাদ্য। উপযুক্ত খাদ্য না পেলে শিশুর যথোচিত বৃদ্ধিতে বাধা জন্মাবে। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন পরিমাণে খাদ্য শিশুর দরকার। দ্বিতীয়তঃ, এনডোক্রিন গ্লাণ্ড হতে নিঃসৃত হরমোনের উপর বৃদ্ধি নির্ভর করে। বৃদ্ধি ব্যাপারে পিটুইটারি গ্লাণ্ডের দানই প্রধান। হরমোন নিঃসরণ অল্প হলে শিশু

বৃদ্ধির চারটি প্রধান কারণ

খর্বাকৃতি হয়। খুব বেশী হলে আবার অত্যধিক ঢেঙ্গা হয়। তৃতীয়তঃ, বৃদ্ধির মূলে রয়েছে বংশগতির প্রেরণা। সর্বশেষে বলা যায় দেহ ও মনের উপযুক্ত ব্যবহার তার বৃদ্ধি ও বিকাশের সহায়তা করে। দেহমনের ব্যবহার শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

শিশুর হাঁটার কথা ধরা যাক। শিশু কি হাঁটতে শেখে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য লক্ষ্য করা দরকার শিশু কেমন করে, কখন প্রথম বসতে শেখে, হামাগুড়ি দিতে শেখে, দাঁড়াতে শেখে ও দু-একপা চলতে শেখে।

শিশুর হাঁটা

সাধারণতঃ একটি ছেলে ছয়সাত মাস বয়সে মেঝেতে গড়াবার চেষ্টা করে, আট মাসে একটু-একটু হামাগুড়ি দিতে পারে। নয় মাসে হামাগুড়ি দেওয়াটা মোটামুটি আয়ত্ত করে। তিনচার মাস বয়সে মাথা সোজা করে রাখতে পারে, সাত আট মাস বয়সে সে বসতে পারে। দশ মাস বয়সে কিছু ভর করে দাঁড়াতে পারে, বারো মাস বয়সে নিজেই দাঁড়াতে পারে। দশ এগারো মাসে কারো সাহায্য নিয়ে সে হাঁটতে পারে, চোদ্দ মাস বয়সে সে একা হাঁটতে পারে।

বিভিন্ন শিশুদের বেলাতে সময়ের কিছু তারতম্য ঘটলেও বিকাশের ধারাটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই ঐ রকম। এই বিকাশকে স্বাভাবিক বিকাশ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বসতে পারবার আগে শিশু মাথা তুলতে পারে কেন? উড-ওয়ার্থের মতে (৩) তার কারণ পা ও পাছা নিয়ন্ত্রণের স্নায়ুকেন্দ্রের পরিণতির পূর্বে ঘাড় নিয়ন্ত্রণের স্নায়ুকেন্দ্রের পরিণতি ঘটে। মানুষের সোজা হয়ে বসা, দাঁড়ান ও মানুষের চলাফেরা একটি জটিল স্নায়ুযন্ত্রের উপর নির্ভর করে। সম্ভবতঃ ঐ স্নায়ুযন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি হলে পর শিশু হাঁটতে পারে। ছয় মাসের শিশুকে হাঁটতে শেখান যায় না। কেন? তার আবশ্যকানুযায়ী দৈহিক বিকাশ ঘটেনি। এক বছর বয়সে অধিকাংশ শিশুই কারো সাহায্য নিয়ে দু'এক পা হাঁটতে পারে। তার প্রধান কারণ হাঁটবার জন্য তার দেহযন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে। হাঁটতে শেখার স্থান কতটুকু? শিশুকে পিতামাতা কিম্বা বড়রা হাঁটতে শেখান এটা মনে করবার কারণ নেই। কিন্তু সময়মত হাঁটবার জন্য শিশুর অন্যদের হাঁটতে দেখা, অনুকরণ ও চেষ্টা করার কিছু দরকার আছে। দেখা গেছে—অন্ধ ছেলেমেয়েদের দাঁড়াতে ও হাঁটতে শিখতে অনেক সময় নয়দশ মাস দেরী হয়। (৪)

মোটামুটি দেখা গেল স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আছে। বিভিন্ন বয়সে দেহমনের স্বাভাবিক বিকাশ বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। সেই স্তরটির প্রতি দৃষ্টি রেখেই শিক্ষার সময় স্থির করতে হবে। সহজ ভাষায়, যে বয়সে শিশু যা শিখতে পারে সেই বয়সেই তাকে সেই শিক্ষা দিলে শিক্ষা কার্যকরী হবে।

১। আচরণের বিকাশ

শৈশবের কয়েকটি আচরণ সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করব। নবজাত শিশু শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, হাঁচি দেয়, কাশে, হাই তোলে, চোষে, গেলে, বাহ্যি প্রস্রাব করে—সর্বোপরি ঘুমোয়।

ঘুম

প্রথম কয়েকমাস শিশু ২৪ ঘণ্টার বেশীর ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। ক্রমে ঘুমের পরিমাণ তার কমে আসে। ঘুমের পরিমাণ সব শিশুর সমান নয়। কোন সময় ঘুমোবে, কোন সময় জাগবে এ বিষয়ে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য আছে। শীতকালে শিশুরা ঘুমোয় বেশী, গ্রীষ্মকালে কিছু কম। কয়েকজন মনোবিদদের সংগৃহীত তথ্য থেকে আর্থার জারসিল্ড (৫) শিশুদের দৈনিক ঘুমের গড় পরিমাণের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। নীচে তা উল্লেখ করা হল ঃ

ঘুমের দৈনিক গড় পরিমাণ

বয়স	ঘণ্টা	মিনিট
১—৬ মাস	১৫	৩
৬—১২ মাস	১৪	৯
১২—১৮ মাস	১৩	২৩
১½— ২ বছর	১৩	৬
২— ৩ বছর	১২	৪২
৩— ৪ বছর	১২	৭
৪— ৫ বছর	১১	৪৩
৫— ৬ বছর	১১	১৯
৬— ৭ বছর	১১	৪
৭— ৮ বছর	১০	৫৮

কতটা সময় যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা বিছানায় শুয়ে থাকে—এ সম্বন্ধে টারম্যান ও হকিং (৩) কিছু ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করে—একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সেটি নীচে উল্লেখ করা হল :

	শুয়ে কাটাবার গড় সময়ের পরিমাণ	
বয়স	ঘণ্টা	মিনিট
৮— ৯ বছর	১০	৪২
৯—১০ বছর	১০	১৩
১০—১১ বছর	৯	৫৬
১১—১২ বছর	১০	০০
১২—১৩ বছর	৯	৩৬
১৩—১৪ বছর	৯	৩১
১৪—১৫ বছর	৯	০৬
১৫—১৬ বছর	৮	৫৪
১৬—১৭ বছর	৮	৫০
১৭—১৮ বছর	৮	৪৬

ঘুমের পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ নয়। কারণ একজন শুয়ে আছে, চোখ বুজে আছে—কিন্তু তবু সে ঘুমোচ্ছে কিনা এটা আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না। কারো শুলেই ঘুম আসে। কারো বেলায় ঘুমোতে সময় লাগে। শোবার সময়ের পরিমাণ হিসাব করা সহজ। ঘুমের পরিমাণ নির্ধারণ করা তত সহজ নয়।

ওপরের তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের পরিমাণ কমলেও ১৮ বছর বয়সেও দিনের (অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার) এক-তৃতীয়াংশ মানুষের শোওয়া ও ঘুমের জন্য দরকার হয়।

ঘুমের দৈহিক প্রয়োজন আছে। জাগ্রত অবস্থায় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাজ করার ফলে দেহের দাহিকাশক্তি কমে আসে ও মানুষের শরীরের ভিতর ল্যাকটিক এ্যাসিড জাতীয় একপ্রকার দূষিত পদার্থ সৃষ্টি হয়। ঘুমের মধ্য দিয়ে দেহের শক্তির পুনর্লাভ ঘটে ও দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু ঘুমের প্রয়োজন যে কেবল দৈহিক এ কথা সত্য নয়। ঘুমের মানসিক প্রয়োজনের দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। ঘুমিয়ে লোক স্বপ্ন দেখে। একান্ত শৈশবে স্বপ্ন না দেখলেও * দুএকবছরের ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অপরিতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ হয়। মনের ভারসাম্য রক্ষার দিক থেকে তার মূল্য কম নয়। প্রত্যাবৃত্তির * * দিকটিও লক্ষ্যণীয়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যে অবস্থায় থাকে, ঘুমের মধ্য দিয়ে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটান হয়। অনেকের শোবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত মাতৃগর্ভে পরিণত ভ্রূণের ভঙ্গির মতন। ঘুমের মধ্য দিয়ে মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্ত নির্ভরতাই *** যেন মানুষ সাময়িকভাবে ফিরে পেতে চায়।

পরিমাণই একমাত্র কথা নয়, ঘুমের গুণের বিচার আবশ্যক। শিশু কতটা সময় ঘুমোল শুধু এইটুকু জানলে হবে না, তার ঘুমের ধরণটি কি, ঘুম ভালো হয়েছে কিনা, ঘুমের মধ্যে সে কি ছটফট করেছে, ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠেছে—না—নিরুদ্বিগ্ন, গভীর ও প্রশান্ত ঘুম ঘুমিয়েছে এ সমস্ত খোঁজ নেবার দরকার আছে। ঘুমের 'গভীরতা' দিয়ে ঘুমের গুণের বিচার বোধ হয় করা চলে। মন উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত থাকলে ঘুম গভীর হয় না। দেহ ও মন যাদের সুস্থ নয় ঘুমে তাদের বারম্বার ব্যাঘাত ঘটে। পরিমাণ ও গভীরতা উভয় দিক থেকেই ঘুম বিঘ্নিত হয়। যাদের ঘুম ভালো হয় না তাদের কেউ কেউ ঘুমের জন্য বেশী সময় ব্যয় করেন। ঘুম গভীর হলে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণ ঘুমের দ্বারা দেহমনের ক্লান্তি দূর হয়, কর্মক্ষমতা ফিরে আসে।

ঘুমের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সামান্য দুএকটি কথা বলতে চেষ্টা করলাম। আসল কথা জ্ঞানের দিক থেকে ঘুম আজও একটি রহস্যাবৃত রাজ্য। ঘুম সম্বন্ধে আজও আমরা অল্পই জানি।

---

* এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা কঠিন।

* * জীবনের বিকাশে আচরণের কতগুলি পর্যায় রয়েছে। একটির পর একটি পর্যায় অতিক্রম করে জীবন এগিয়ে চলেছে। কেউ যদি এগোবার শক্তি হারিয়ে ফেলে—কোন একটি আচরণের পর্যায়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে—তাকে আমরা 'সংবন্ধন' বলি। কেউ হয়ত এগিয়েছে, কিন্তু সামনের বাধার জন্য এবং পিছনের টানে আবার একটি পূর্ব পর্যায় বা পুরানো আচরণে ফিরে আসছে—তাকে প্রত্যাবর্ত্তন বা প্রত্যাবৃত্তি বলে।

* * * 'নিশ্চিন্ত নির্ভরতার' কথা কতটা সত্য, কতটা কাল্পনিক—তা আমরা জানি না।

শিশু যখন জন্মায় তখন সে নিতান্ত অসহায়। মাতৃস্তন চোষবার ক্ষমতা তার থাকে। কিন্তু স্তন তার মুখের কাছে এগিয়ে ধরতে হয়। নিজের হাত পায়ের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। চোখ ও হাতের কাজের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। বলা চলে মায়ের দুধ খেয়েই শিশুর জীবন আরম্ভ হয়। এর থেকে সে কেবলমাত্র পুষ্টিলাভ করে এমন নয়। মাতৃস্তন্য পানে সে চোষবার সুখ পায়, তার চোষবার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়। চোষবার একটি গভীর ইচ্ছা শিশুর মধ্যে আছে। সেটা সে যেমন করেই পারে তৃপ্ত করতে চায়। একটি শিশু বোতল থেকে দুধ খেত। তার বোতল থেকে দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। দেখা গেল বাচ্চাটি আঙ্গুল চুষতে সুরু করেছে। কিছুদিন পর তাকে আবার বোতল থেকে খাবার সুযোগ দেওয়া হল। শিশুটির আঙ্গুল চোষাও বন্ধ হল। (৭)* চুষে শিশুরা তীব্র ও গভীর সুখ পায়।

মাতৃস্তন্য পান

মাতৃস্তন্য পানে শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের সাথে সাথে মানসিক প্রয়োজনের দিকটাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। সব শিশুর প্রয়োজন সমান নয়। ঐ বিষয়ে শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। কতক্ষণ পর পর শিশু মায়ের দুধ খাবে, কমাস পর্যন্ত সে দুধ খাবে এটা শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন দেখে স্থির করতে হবে। এ বিষয়ে কিছুটা নিয়মের দরকার আছে। নিয়মের সঙ্গে শিশু সামঞ্জস্য সাধন করতে শেখে।

নিয়মকে যখন শিশু গ্রহণ করতে পারে তখন সে নিয়ম 'তার' নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। ঐ নিয়মের ছন্দে তার দেহমন সাড়া দেয়। শিশুর নিরাপত্তাবোধেও নিয়মের দান আছে। ব্যাপারটাকে আরেকটু বুঝিয়ে বলি। খাবার সময় ঠিক না থাকলে শিশু কেন, বড়রাই অনেকসময় অনিশ্চয়তা বোধ করেন। খাবার

---

* শিশু মাতৃস্তন্য পান করছে আবার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলও চুষছে—এমন দৃষ্টান্তও আছে। কোন কোন শিশু বাড়াবাড়ি রকম আঙ্গুল চোষে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়—এ সব শিশুদের মধ্যে চোষবার ইচ্ছাটি প্রবল। চোষবার প্রবল ইচ্ছার মূলে কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্ত দেখা যায়—অন্য একটি কষ্ট বা অভাববোধ কাজ করছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ফরাসী মনঃসমীক্ষক মেরি বোনাপার্টি সেটি উল্লেখ করেছেন। একটি শিশু কষ্টকর পেটের ব্যথায় ভুগছে। হঠাৎ সে হাতের বুড়ো আঙ্গুল মুখে দিয়ে পাগলের মত চুষতে লাগল। সাময়িকভাবে ব্যথার পীড়নকে যেন সে ভুলতে পারলো। ঐ ক্ষেত্রে পেটের ব্যথা তাকে আঙ্গুল চোষাতে প্ররোচিত করেছে। নিরাপত্তার অভাব, মানসিক দুঃখও সময় সময় ঐ জাতীয় চোষার প্ররোচক রূপে কাজ করে।

জন্য ঠিক সময় থাকলে সময়মত খাবার আশা করা যায়, খাবার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বোধও করা যায়। বড়দের বাস্তবজ্ঞান অনেক বেশী। তা সত্ত্বেও খাবার সময় ঠিক না থাকলে তারা কেউ কেউ উদ্বেগ বোধ করেন। সুতরাং শিশু ক্ষিধে পেলে গুরুতর অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বোধ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মাতৃস্তন্য, শিশুর পক্ষে সুখ, নির্ভরতা ও নিরাপত্তার উৎস স্থল। মাতৃদুগ্ধ থেকে (কিম্বা অন্য কোন মায়ের দুধ থেকে) যে বঞ্চিত হল পুষ্টি তাকে অন্য উপায়ে দেওয়া হয়ত সম্ভব। কিন্তু মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত হলে শিশুদের মানসিক জীবনে গুরুতর ক্ষতি ঘটে এমন পরিচয় পাওয়া গেছে। এর প্রভাব বিশেষ করে শিশুদের আবেগ জীবনের উপর দেখা যায়। বঞ্চিত শিশুদের কারো কারো জীবনে চিরকাল একটা হাহাকার থেকে যায়। আমি মায়ের ভালোবাসা পাই নি, আমাকে কেউ ভালোবাসে না এমন ধরণের বদ্ধমূল ধারণা এদের মধ্যে থাকা আশ্চর্য্য নয়। একথা নিশ্চয়ই বলা চলে মাতৃস্তন শৈশবের সর্বোত্তম আশীর্বাদ।

মাতৃস্তন্য পান করতে সব শিশুই যে সমান ভাবে পারে একথা সত্য নয়। কোন কোন শিশু দুধ খেতে অসুবিধা বোধ করে। হয়ত দুধ বেশী, শিশুর চোখে মুখে এসে পড়ছে। হয়ত দুধ কম, শিশু চুষেও উপযুক্ত পরিমাণ দুধ পাচ্ছে না। শিশুর মনোভাব এ ব্যাপারে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন কোন শিশু যেন অসহিষ্ণু হয়েই জন্মায়। সে যেন ধনুকের টানা জ্যা'র মতন। ধীর চিত্তে—কিছুটা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কোন সুখই সে উপভোগ করতে পারে না।

এ ব্যাপারে মায়ের মনোভাবের গুরুত্ব বোধহয় আরও বেশী। যে মায়ের স্তন্য দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছার অভাব নেই, শিশুর প্রতি স্নেহের অভাব নেই সে মায়ের স্তন্যপানে সাধারণতঃ শিশু তৃপ্ত হয়। শিশুকে মা চেয়ে পেয়েছে কিনা এটি একটি বড় কথা। শিশুকে মা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে কিনা সেটা তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। শিশুর প্রতি মায়ের দ্বিধামুক্ত স্নেহের দ্বারাই শিশুকে মায়ের স্তন্যদান সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে শিশু আকাঙ্ক্ষিত অতিথিরূপে সংসারে আসে না। ঐ সব শিশুদের প্রতি মায়ের মনোভাবে স্নেহের সঙ্গে একটি বিরুদ্ধতা থাকে। মায়ের আচরণেই অনেক সময় (হয়ত মায়ের অগোচরেই) এমন কিছু থাকে যার ফলে শিশু সম্পূর্ণ সুখ ও নিরাপত্তা বোধ করে না।

কোন্ বয়সে শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হবে এটি একটি গুরুতর প্রশ্ন। সাধারণতঃ ছয় সাত মাসে শিশুদের দু'একটি দাঁত গজায়, অন্ততঃ মাড়ি শক্ত হয়ে ওঠে। সে সময়টাকেই শিশুর মায়ের দুধ ছাড়াবার বয়স বলে মনে করা হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিশুদের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। কোন কোন শিশুর পক্ষে হয়ত আরও কিছুকাল দুধ খাবার দরকার থাকে।

মায়ের দুধ ছাড়ান

সুস্তান আইজাকসের মতে (৮), দুধ ছাড়ানো ব্যাপারে কিছু দেরী করা ভালো। সাত থেকে নয় মাস পর্যন্ত শিশু মায়ের দুধ খেতে পেলে সাধারণতঃ তার স্তন্যপানের ইচ্ছার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি হয়। প্রথম কয়েক মাস মাতৃদুগ্ধ শিশুর কাছে মায়ের ভালোবাসা। মায়ের ভালোবাসাকে অন্যভাবে বোঝবার সাধ্য তার থাকে না। সাত আট মাস বয়সে সে দেখতে শেখে, ভালোবাসাকে কিছুটা অন্যভাবে বুঝতে শেখে। মায়ের মুখ দেখে, মায়ের হাসি দেখে মায়ের ভালোবাসা সে অনুভব করে। মাতৃস্তনে বঞ্চিত হলেই তার মনে হয় না, মা বুঝিবা তাকে আর ভালোবাসল না।

দুধ ছাড়ানো সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষক ফেনিচেলের (৯) অভিমতটি উল্লেখযোগ্য। তাড়াতাড়ি যাদের দুধ ছাড়ান হয়, নৈরাশ্যবাদ কিম্বা নিষ্ঠুরতা তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয় বলে দেখা যায়। মায়ের দুধ যারা বেশীদিন খাবার সুযোগ পায় তাদের চরিত্রে আশাবাদ ও আত্মপ্রত্যয়টি বড় হয়।* ফেনিচেলের এই অভিমতটি অন্যান্য অনুসন্ধানে পুরোপুরি সমর্থিত না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে যে ঐ কথা সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মলমূত্র নিষ্কাশনের ব্যাপারটা বড়দের জীবনে অনেকটা নিয়মাধীন। মলমূত্রের বেগ যদিও দৈহিক ও স্বভাবের প্রেরণাতেই ঘটে তবু এগুলিকে কয়েকটি নিয়মাধীনে আনা সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রথম হচ্ছে, স্থান। মলমূত্র ত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে। দ্বিতীয়তঃ, সময়। মলমূত্র, বিশেষতঃ মল নিষ্কাশনের একটি সময় স্থির করা সম্ভব।

মলমূত্র নিষ্কাশনে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা

শিশুদের জীবনে অমন নিয়ম দেখা যায় না। বেগ আসলেই তারা বাহ্যি-প্রস্রাব করে। এ সম্বন্ধে তাদের শিক্ষাদানে মা'দের কোন কার্পণ্য নেই।

* এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানের ফল এই অধ্যায়েই পরে আমরা উল্লেখ করেছি।

কারণ বিছানা, কাপড়জামা ভেজালে, নোংরা করলে—ভুগতে হয় তাঁদেরই। কিন্তু কেবলমাত্র শিক্ষা ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক বিকাশের একটি স্তরে না পৌছান পর্যন্ত শিক্ষা ঐ ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

প্রস্রাবের ব্যাপারটাই নেওয়া যাক। প্রস্রাব পাওয়া মাত্র বড়রা প্রস্রাব করে ফেলে না। প্রস্রাবের উপর তাদের ঐচ্ছিক পেশীসমূহের অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে। সহজ ভাষায়, প্রস্রাবের বেগ অনুভব করলেও অবস্থা বিশেষে কিছুক্ষণ প্রস্রাব না করে থাকা এবং যথাস্থানে গিয়ে প্রস্রাব করা এসব তাদের ইচ্ছাধীন। ঐ ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা আছে ও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা আছে। শিশুদের ইচ্ছা নেই। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা থাকত না। নিষ্কাশনের সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের আপনা থেকেই ঘটে যায়, ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর বিশেষ নির্ভর করে না।

স্বাভাবিক বিকাশের ফলে নিজের ঐচ্ছিক মাংসপেশীর উপর ক্রমে ক্রমে শিশুর কর্তৃত্ব জন্মে। চলাফেরার ক্ষমতা অর্জন করবার সঙ্গে নিষ্কাশনের উপর কর্তৃত্ব অর্জনের একটি সুন্দর তুলনা চলে। মাংসপেশীগুলির বিকাশ ও সংযোজনার ফলে এই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। এই বিকাশটি ধীরে ধীরে হয়। এক বছর থেকে আরম্ভ করে বছর দুয়েকের মধ্যেই মূত্র নিষ্কাশনের উপর শিশুদের কিছু কর্তৃত্ব জন্মে এমন দেখা যায়। প্রস্রাবের বেগ এলে আগে থেকে তারা বুঝতে পারে ও মা বাবাকে হয়ত বলে। একটু ধৈর্য ধরে যথাস্থানে গিয়ে প্রস্রাব করে। এ বিষয়ে শিশুদের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য আছে। শিশুদের ক্ষমতাটি জন্মায় কারো কিছু আগে, কারো পরে। কারো কারো বেলায় তিন, চার, পাঁচ বছর পর্যন্ত কর্তৃত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। জাগ্রত অবস্থায় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেখা গেলেও, কিছু কিছু ছেলেমেয়ে বেশ বড় বয়স পর্যন্ত (১১, ১২, ১৩) ঘুমের সময় বিছানা ভিজিয়ে ফেলে। ঐ কর্তৃত্বটি তারা ঘুমের সময় কাজে লাগাতে পারে না। দুবছর বয়সে একটি ছেলে হয়ত কর্তৃত্ব অর্জন করল। হঠাৎ আবার প্রত্যাবৃত্তি ঘটল, কাজটির উপর সাময়িক ভাবে তার কর্তৃত্ব লোপ পেল এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। ক্ষমতা পুনরায় এদের ফিরে আসে।

ঐচ্ছিক মাংসপেশীর বিকাশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় কথা হলেও এ ব্যাপারের একটি মানসিক দিক আছে। অনেক বয়স পর্যন্ত যারা বিছানায় প্রস্রাব করে—তাদের ঐচ্ছিক পেশীসমূহের বিকাশ হয়নি এ কথা বলা চলে না।

কাজটির উপর এদের মানসিক কর্তৃত্ব কম। এসব ক্ষেত্রে শিশুর কোন অদম্য ইচ্ছা সম্ভবতঃ মূত্র নিষ্কাশনের মধ্য দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে। মিনুর দুবছর বয়স। প্রস্রাবের উপর মোটামুটি তার কর্তৃত্ব জন্মেছে। বাড়ীতে একটি নূতন শিশু জন্মালো—মিনুর ভাই। মিনু আবার বিছানায় প্রস্রাব করা সুরু করল। এটি মিনুর প্রত্যাবৃত্তি।

নিয়মানুবর্তিতায় আবেগ জীবনের প্রভাব

শিশুকে কেবলমাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেই মায়েরা ক্ষান্ত হন না। শিশুর মধ্যে একটি পরিচ্ছন্নতাবোধ তাঁরা জাগ্রত করতে চান। মলমূত্র অপরিচ্ছন্ন জিনিস। ঐ জিনিসগুলি শিশুরা ঘেন্না করতে শিখুক মায়েরা এই চান। এ সম্পর্কে মলমূত্র সম্বন্ধে খুব ছোটদের স্বাভাবিক মনোভাব কি এটা আগে জানা দরকার।

পরিচ্ছন্নতা বোধ শিক্ষা

ছোট শিশুরা মলমূত্র নিয়ে খেলা করে, এমনকি সময় সময় খেয়ে ফেলে এমন ঘটনা অনেক সময় চোখে পড়ে। মলমূত্রকে শিশুরা পছন্দ করে, ঐসব জিনিসকে তারা নিজেদের শরীরের অংশ বলে মনে করে—এসব তথ্য শিশু-সমীক্ষকেরা উদ্ধার করেছেন। সুতরাং মলমূত্রের প্রতি মা'দের ঘেন্না শিশুরা গোড়াতে বুঝতে পারে না। মা'দের কাছ থেকে মলমূত্র ঘেন্না করতে শিশুরা ক্রমে ক্রমে শেখে। যে জিনিসগুলি শিশুর চোখে প্রিয়, সেগুলিকে শিশুকে ঘেন্না করতে শেখাতে মা'দের ধীরে ধীরে, ধৈর্য সহকারে অগ্রসর হতে হবে। নইলে ব্যাপারটা শিশুর মনে আকস্মিক আঘাতের কাজ করবে।

মলমূত্র শরীরের আবর্জনা। তাদের প্রতি কিছু ঘেন্না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুসংখ্যক মা'র মধ্যে মলমূত্রের প্রতি ঘেন্নাটা বাড়াবাড়ি রকম দেখা যায়। মলমূত্র শিশুর প্রিয়, সময় সময় শিশু মলমূত্র মেখে থাকে বলে—শিশুকে মা বলেন 'নোংরা'। মুখে সবসময় না বললেও তাঁর ভাবে তা প্রকাশ পায়। শিশু তা বুঝতে পারে। মায়ের দেখাদেখি নিজেকে সে নোংরা বলে মনে ভাবতে শেখে। ঐ ধারণা তার মানসিক সুখ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। মলমূত্রের প্রতি বাড়াবাড়ি ঘেন্নাও তার মধ্যে সংক্রামিত হওয়া আশ্চর্য নয়।

মলমূত্র সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করলে ওগুলি যে খুব মারাত্মক ও ঘেন্নার জিনিস নয় এটা বোঝা যাবে। জিনিসগুলি পরিষ্কার নয়, শিশুকেও পরিচ্ছন্ন

হতে হবে। শিশুকে পরিষ্কার করা ব্যাপারে মায়ের মনোভাব সহজ হওয়া দরকার। ঐ সব ব্যাপারে শিশুর মনোভাবটি তাহলেই সহজ হবে আশা করা যায়।

মল নিষ্কাশনের প্রাচুর্য ও ভঙ্গি চরিত্রের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে বলে মনঃসমীক্ষকেরা দাবী করেন। কোষ্ঠবদ্ধতায় যাঁরা ভোগেন সাধারণতঃ তাঁরা কৃপণ, একগুঁয়ে, গোছান মনোবৃত্তি সম্পন্ন হন। শেষ মুহূর্তে কাজ করার অভ্যাসটি এঁদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আরম্ভ করলেও কাজটি সুসম্পন্ন করতে এরা প্রাণপণ করেন। (১০)

২। দেহ ও অন্যান্য কর্মশক্তির বিকাশ

শিশু ভ্রূণাবস্থায় মাতৃগর্ভে থাকে। ডিম্বকোষ ও পুংকোষের মিলনের ফলে যে কোষটি সৃষ্টি হয় সে নিজেকে বারম্বার দ্বিগুণিত করে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বহু সংখ্যক কোষ সম্বলিত একটি জীবে পরিণত হয়। কোষগুলি কেবলমাত্র সংখ্যায় বাড়ে এমন নয়, তারা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে। মায়ের শরীর থেকে ভ্রূণ পুষ্টি গ্রহণ করে। মায়ের গর্ভ ভ্রূণের পক্ষে একটি সুখকর, নিরাপদ আশ্রয়। ঠাণ্ডাগরমের আধিক্য নেই, জগতের কোন দাবীদাওয়া নেই। এই আশ্রয়ে সাধারণতঃ নয়মাস দশদিন ধরে তার গুণগত ও পরিমাণগত দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। হাত, পা, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, হৃদ্‌পিণ্ড, ধমনী প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ধীরে ধীরে গঠিত হয়। এর সবটাকেই স্বাভাবিক বিকাশ বলা চলে।

দেহের বিকাশ

শিশু জন্মলাভ করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈর্ঘ্য ও ওজন বাড়ে। তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আকারে বৃদ্ধি পায় ও তাদের পারস্পরিক অনুপাতেরও পরিবর্তন ঘটে। জন্মকালে একটি সাধারণ বাঙালী শিশুর গড় দৈর্ঘ্য ১৯ থেকে ২০ ইঞ্চি ও গড় ওজন ৬ পাউণ্ডের মতন। দেহের অনুপাতে বড়দের তুলনায় তার মাথাটি বড়। প্রাপ্তবয়স্কদের নিম্নাঙ্গ-উর্ধ্বাঙ্গের যে অনুপাত, শিশুর নিম্নাঙ্গ-উর্ধ্বাঙ্গের অনুপাত তার চেয়ে বেশী।

ছেলে ও মেয়েদের দৈর্ঘ্যে কিছু পার্থক্য আছে। নবজাতকের বেলায় একটি ছেলে একটি মেয়ে অপেক্ষা ½ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাঁচবছর বয়সেও একটি মেয়ে অপেক্ষা একটি ছেলে লম্বা। দশ, এগারো বছর বয়সে তারা সমান। বারো, তেরো বছর বয়সে সাধারণতঃ একটি মেয়ে একটি ছেলে অপেক্ষা কিছু লম্বা। চোদ্দ, পনেরোতে

ছেলেমেয়েদের দৈহিক বিকাশে পার্থক্য

ছেলে মেয়ের সমান, সময় সময় মেয়ের চেয়ে লম্বা। আঠারো বছর বয়সে একটি ছেলে একটি মেয়ের থেকে ২।৩ ইঞ্চি লম্বা হয়। মেয়েরা সাধারণতঃ আঠারো'র পরে আর লম্বা হয় না—ছেলেরা এর পরেও আরো সামান্য কিছু লম্বা হয়।

দেহের যৌন বিকাশ

যৌন জীবনের পূর্ণ বিকাশ মেয়েদের ছেলেদের চেয়ে আগে হয়। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের একটি অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে—শতকরা ৫০টি মেয়ের সাড়ে তের বছরে ঋতু আরম্ভ হয়। ছেলেদের যৌন বিকাশ* হয় সাড়ে চোদ্দ বছর বয়সে। এদেশে সম্ভবতঃ এক বছর আগেই ছেলে ও মেয়েদের যৌন জীবনের বিকাশ ঘটে। দৈহিক ও মানসিক যৌন বিকাশের সঙ্গে আবেগ জীবন ও সামাজিকবোধের পরিণতি লাভের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এটা একটা প্রশ্ন। এ বিষয়ে যে সব অনুসন্ধান হয়েছে তা থেকে কোন সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া কঠিন। এটুকু বোধহয় বলা চলে যে ঐ বয়সে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ছেলেমেয়েদের অসম যৌন বিকাশে সমস্যা

বিবাহ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের অসম যৌনবিকাশের সত্যটি আমরা সাধারণতঃ কাজে লাগাই। বর ও বধূর মধ্যে কয়েক বৎসরের পার্থক্য খোঁজাই আমাদের নিয়ম। বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে পাঠ্যতালিকা নির্বাচনের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে। আবেগ-জীবনের বিকাশের সঙ্গেও পাঠ্যতালিকার কিছু সম্বন্ধ থাকা উচিত। ছেলেমেয়েদের আবেগ-জীবনের বিকাশ কিছু পরিমাণে অসমান হলে পাঠ্যতালিকায় সেটা কিভাবে প্রতিবিম্বিত হবে সেটা ভাববার কথা। হাই-স্কুল পর্যায়ে অসম বিকাশের সমস্যাটি দেখা দেয়। হাই-স্কুলে সহশিক্ষায় আমরা বিশ্বাস করি না। ছেলেমেয়েদের অসমান বিকাশ তার একটি কারণ ধরা যেতে পারে। একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে অপেক্ষা বেশী পরিপক্ক। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া একটু কঠিন। সহশিক্ষা মানে কেবলমাত্র এক শ্রেণীতে বসে পড়া বোঝায় না। মেলামেশা ও বন্ধুত্বের দ্বারা তারা পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে শিখবে, ভবিষ্যত জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহচর্য তাদের পক্ষে সহজ ও সুন্দর হবে—সহশিক্ষার এই উদ্দেশ্য যদি আমরা

* পুরুষাঙ্গের উপরিভাগে লোম জন্মানকে যৌনবিকাশের চিহ্ন ধরা হচ্ছে।

স্মরণ রাখি তবে অসম মানসিক বিকাশসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের এক শ্রেণীভুক্ত করাতে উক্ত ফললাভ সম্ভব হবে কিনা সেটা বিচার্য।

দৈহিক কর্মশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে দুচার কথা বলা দরকার। নবজাতক দৈহিক সঞ্চালনে প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই একসঙ্গে ব্যবহার করে। শিশু যখন কাঁদে, সে হাত ছোড়ে, পা ছোড়ে, মাথা ও দেহ আন্দোলিত করে। এই কারণে অনেক সময় শিশুর দেহ সঞ্চালনে কোন সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। শিশু যখন বড় হয় তখন তার দৈহিক কাজ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ হয়। তার আচরণও সুস্পষ্টরূপে উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠে।

দৈহিক কর্মশক্তির বিকাশ

শিশুর দৈহিক গঠন ও কর্মশক্তি বিকাশের গতি মাথা থেকে পায়ের দিকে। ভ্রূণাবস্থার পায়ের কুঁড়ি'র পূর্বে হাতের কুঁড়ি দেখা দেয়। পায়ের দিকের আগে মাথার দিকের বিকাশ ঘটে। এ কারণে নবজাতকের মাথা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাতে বড়। দৈহিক ক্ষমতার কথা যদি ধরা যায় তবে দেখব ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে পা ব্যবহারের পূর্বে শিশু রীতিমত দক্ষতার সঙ্গে হাত ব্যবহার করতে পারে। হাতের আঙ্গুল ভাল ভাবে ব্যবহারের পূর্বে তার উপরের দিকের হস্তপেশীর উপর কর্তৃত্ব জন্মায়। অর্থাৎ হাতের সূক্ষ্ম মাংসপেশীর বিকাশের পূর্বে স্থূল পেশীসমূহের বিকাশ হয়। এই কারণে শিশুদের একটা বয়স পর্যন্ত যে সব কাজে কেবলমাত্র বৃহৎপেশীর ব্যবহার প্রয়োজন সে সবই শুধু তাদের শিক্ষণীয় বিষয় বলে গণ্য করা হয়। মাথা থেকে বিকাশের গতি পায়ের দিকে। সেজন্যই দেখা যায় অনেক সময় পায়ের স্থূলপেশীর আগে হাতের আঙ্গুলের সূক্ষ্মপেশীর বিকাশ সাধিত হয়! একটি ছেলে হয়ত অনামিকা ও বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে একটি গুলি দিয়ে বেশ খেলতে পারছে কিন্তু একটা ট্রাইসাইকেল চালাতে সে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং কাজটিতে শরীরের কোন অংশের কী ধরণের পেশীর ব্যবহার দরকার হবে, শিশুদের সে সব পেশীর উপর কতখানি কর্তৃত্ব জন্মেছে—এসব বিচার করে কোন কাজ কোন স্তরের উপযোগী এটা স্থির করতে হবে।

দৈহিক কর্মশক্তি বিকাশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গায়ের জোর ও ছুটাছুটির ব্যাপারে সাধারণতঃ একটি ছেলে একটি মেয়েকে ছাড়িয়ে যায়। যে কোন ছেলে যে কোন মেয়ে অপেক্ষা বেশী দৈহিক শক্তি

বা গতিসম্পন্ন এমন কথা অবশ্য আমরা বলছি না। একটি সাধারণ ছেলে ও একটি সাধারণ মেয়ের পার্থক্য যতখানি—ছেলেদের কিম্বা মেয়েদের নিজেদের ভিতরে পার্থক্য তার চেয়ে বেশী। কিন্তু সূক্ষ্ম কাজে ছেলে মেয়েদের মধ্যে অমন পার্থক্য আছে কিনা সন্দেহ। ছেলেরা যে কাজে অভ্যস্ত সে কাজ তারা ভালো পারে। মেয়েরা যে কাজ অভ্যাস করেছে, সে কাজে তারা ভালো। একটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করি। কিছু কাঠের অংশ একত্র করে একটা হুইলব্যারো তৈয়েরি ব্যাপারে ছেলেরা গড়ে বেশী নম্বর পেল। আবার কয়েক টুকরা কাপড়ের সাহায্যে একটা পোশাক তৈয়ারিতে মেয়েদের গড় নম্বর বেশী হল।

দৈহিক কর্মশক্তি বিকাশে ছেলেমেয়েদের পার্থক্য

বিভিন্ন প্রকারের দৈহিক কর্মশক্তির মধ্যে পারস্পর্যের ঐক্যাঙ্ক খুব উচ্চ নয়। একটি ছেলে ভালো লাফাতে পারে। সে ভালো ছুটতে পারবে—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবে দৈহিক শক্তি দরকার—এমন সব কাজের মধ্যে কিছু পজিটিভ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু যে সব কাজে জটিল দৈহিক কৌশল ও দক্ষতা আবশ্যক—সে সব কাজের মধ্যে ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ কম।

শিশুর হাঁটতে শেখার মধ্যে স্বাভাবিক বিকাশের প্রভাবই প্রধান—একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। হাঁটতে শেখা—শিশুর পারবার অধ্যায়ের একটি বড় কথা। হাঁটতে শিখে শিশু দূরকে নিকট করে। সব কিছুর জন্য বড়দের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে তাকে থাকতে হয় না। নিজে গিয়েও কিছু কিছু জিনিস সে ধরতে পারে, নিতে পারে।

চলচ্ছক্তির বিকাশ

হাঁটতে পারার মধ্যে স্বাভাবিক বিকাশের প্রাধান্য থাকলেও চলচ্ছক্তির নানা ধরণের নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে শেখবার সুযোগ ও চেষ্টার দরকার। নাচ শেখার দৃষ্টান্তটি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক বিকাশের দ্বারা কেউ নাচতে শেখে না যদিও নাচ শেখবার জন্য দেহমনের স্বাভাবিক প্রস্তুতি দরকার। কারো হাঁটার মধ্যে একটি সুন্দর ছন্দ যদি আমরা দেখতে চাই— তবে সে জন্য তার শিক্ষার দরকার আছে।

কাঠের ব্লক নিয়ে শিশুরা খেলা করতে ভালোবাসে। একটার উপর একটা ব্লক

বসিয়ে তারা টাওয়ার বানায়। সাধারণতঃ আড়াই বছর বয়সে যে টাওয়ার তারা বানায় সেগুলি মোটেই মজবুত নয়, প্রায়ই আপনা থেকে ভেঙ্গে পড়ে। তিন থেকে সাড়ে তিন বছরে তাদের টাওয়ার বেশ মজবুত হয়। একটার উপর আরেকটা ব্লক তারা সাবধানে বসাতে পারে। সাড়ে তিন বছরে কেউ কেউ ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ী, ট্রেন প্রভৃতি বানায়। সে সব ঘরবাড়ীতে তারা জানালা দেয়। ট্রেনের লাইনও তারা বসায়। এ বিষয়ে শিশুদের মধ্যে অবশ্য অনেকখানি পার্থক্য আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। (১২)

কাঠের ব্লক দিয়ে খেলা

জনসন প্রভৃতি মনোবিদরা লক্ষ্য করেছেন গোড়াতে শিশুরা ব্লকগুলি নাড়া-চাড়া করে, জড় করে। দুই তিন বছরে ঐ ব্যাপারে তাদের গঠনমূলক মনো-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একটার উপর আরেকটা সাজিয়ে তারা টাওয়ার বানায়, কিম্বা হয়ত একটা ব্রিজ বানাবার চেষ্টা করে। চারপাঁচ বছরে ব্লকের সাহায্যে তারা তাদের কোন কল্পিত কাহিনীকে রূপ দেবার চেষ্টা করে। এটা কতকটা পুতুল খেলা জাতীয়। পাঁচছয় বছর বয়সে কোন একটি বাস্তব কাঠামো —সত্যিকারের বাড়ি, ব্রিজ, গ্রাম বা সহরকে তারা ব্লক দিয়ে গড়বার চেষ্টা করে। (১৩)

৩। ভাষার বিকাশ

শিশুর ভাষা বিকাশ সম্বন্ধে গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকায় যে কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই আমরা কিছু লিখছি। এ দেশের ছেলেমেয়েদের ভাষা বিকাশের ধারা সম্বন্ধে এ থেকে কিছু অনুমান করা যাবে। সবটা নয়। তার কারণ শিশু ভাষা আহরণ করে একটি সমাজের সঞ্চিত ভাষার ভাণ্ডার থেকে। সে ভাণ্ডারের ভাষাসম্পদ যদি কম হয় তবে শিশুর শেখবার সুযোগ কম হবে; বেশী হলে শিশুর সুযোগ সম্ভবতঃ বেশী। ভাষা আয়ত্তের ব্যাপারে শিশুর পরি-বেশের প্রভাব বড়। যেখানে অনেক কিছু দেখবার ও শেখবার সুযোগ বেশী— সেখানে দেখা বা শোনা যায় এমন জিনিসের নামকরণে শিশুর শব্দসম্ভার বাড়ে। ইলেক্‌ট্রিসিটি যে পরিবেশে নেই—ইলেক্‌ট্রিসিটি শব্দটি শেখবার প্রয়োজন সেখানে শিশু নিজের থেকে অনুভব করবে না। এ দেশের ও ওদেশের পরিবেশে

তফাৎ আছে। ইংরেজি ভাষা ও বাঙলা ভাষার শব্দসম্ভার ও প্রকাশ ভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তথাপি এ কথা বলব যে ঐ পার্থক্যকে খুব বড় করে দেখা উচিত নয়। পার্থক্য যতখানি সাদৃশ্য তার চেয়ে অনেক বেশী। মানুষ মূলতঃ একই। যে ভাষা তারা তাদের অন্তর ও বাহিরের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে—তাদের মধ্যে গভীর ঐক্য রয়েছে। নইলে একজন বাঙালীর পক্ষে একজন ইংরেজকে বোঝা সম্ভব হত না।

শিশু কোন বয়সে কথা বলতে শেখে? পাঁচ ছয় মাস বয়সে শিশু নানা প্রকার শব্দ করে। তার আনন্দ হচ্ছে, না কষ্ট হচ্ছে তার শব্দের বিভিন্নতা থেকে সময় সময় ধরা যায়। সার্লির (১৪) অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে যে শতকরা ৫০টি শিশু একবছরের সময় কথা বলতে শেখে। প্রচলিত ভাষার একটি দুটি শব্দ উচ্চারণ করে। শতকরা ২৫ জন তাদের ৪৭ সপ্তাহ বয়সেই ঐ ক্ষমতা অর্জন করে। কোন কোন শিশুর কিছু দেরী হয়। তাদের বয়স ৬৬ সপ্তাহ হবার আগে তারা কথা বলতে পারে না। এমন শিশুদের সংখ্যাও প্রায় ২৫% হবে।

কথা বলার বয়স

নীচে (১৫) শিশুদের শব্দসম্ভার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে বেড়ে চলে—তার তালিকা দেওয়া হল :

বয়স	অর্জিত শব্দসম্ভার
১২ মাস	৩
১৫ ,,	১৯
১৮ ,,	২২

কথোপকথনে শিশুরা কোন বয়সে কত শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করে—তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হল :

বয়স	ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা
২ বছর	২৭২
৩ ,,	৮৯৬
৪ ,,	১,৫৪০
৫ ,,	২,০৭২
৬ ,,	২,৫৬২

অল্পসংখ্যক শিশুদের শব্দ ব্যবহারের পরিমাণ লক্ষ্য করে ঐ তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঐ তালিকা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তবে ঐ তালিকা থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

শব্দসম্ভার ও বুদ্ধির সম্বন্ধ

শিশুর শব্দসম্পদের সঙ্গে তার বুদ্ধির একটি সম্বন্ধ আছে বলে মনোবিদেরা অনেকে মনে করেন। যে শিশুর বুদ্ধি বেশী, শব্দের অর্থ বোঝবার ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষমতাও তার বেশী। শব্দসম্পদও তার সম্ভবতঃ বেশী হয়। বিনের বুদ্ধি অভীক্ষায় শিশু তিন মিনিটে ৬০টি শব্দ বলতে পারলে একটি নম্বর পায়। থারস্টোন, কেলি প্রভৃতি আধুনিক মনোবিদদের মতে বাচনিক সামর্থ্য একটি আলাদা সামর্থ্য। ঐ সম্বন্ধে আমরা ১৩ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আত্মকেন্দ্রিকতা শিশুমনের ধর্ম। তার কথাবার্তাতেও সেটা ধরা পড়ে। সর্বনাম ব্যবহারের একটি তালিকায় দেখা যায় 'আমি', 'আমার', 'আমাকে' অর্থাৎ উত্তম পুরুষ সর্বনাম শিশু সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করে। নীচে একটি সারণী (১৬) দেওয়া হল :

ব্যবহৃত সর্বনাম	বয়স ২৪-২৯ মাসে	৩০-৩৫ মাস	৩৬-৪১ মাস	৪২-৪৭ মাস
আমি (আমার, আমাকে প্রভৃতি)	১৪৪২	২,৯৯১	৫,৬৯২	৫,৭৫৩
তুমি (তোমার, তোমাকে প্রভৃতি)	৯৪	৪৬৮	১,৭৭০	২,৩৭২
আমরা (আমাদের প্রভৃতি)	২৮	১৭৭	৪০৬	৮৮১
সে (তাকে, তার প্রভৃতি)	৩৩	১৮৭	৪৩৭	৬৯৮
এ (এর, একে প্রভৃতি)	১৫৫	৫৬৭	১,২০৬	১,৪৮৫
তারা (তাদের প্রভৃতি)	২৪	৫৮	১৩৯	২৬৬

দুই আড়াই বছরের শিশুর কথাবার্তায় ব্যবহৃত সর্বনাম 'আমি' (আমাকে) প্রায় ৮০%। ধীরে ধীরে 'তুমি'ও শিশুর কাছে বড় হয়ে উঠে। ৪ বছরের শিশুর কথাবার্তায় 'তুমি' 'আমি'র পাঁচ ভাগের প্রায় দুই ভাগ।

শিশুর তথা মানুষের কাছে চিরদিনই 'আমি' বড়। তবে সামাজিক মনোভাব বিকাশের ফলে অন্যেরাও ক্রমে ক্রমে তার কাছে বড় হয়ে উঠে। সে সত্যটি তার ভাষাতেও প্রতিফলিত হয়।

৪। শিশুর আবেগ জীবন

অনুভূতি কি প্রথমে বলবার চেষ্টা করব। ভালো লাগা ও মন্দ লাগা—সঙ্কীর্ণ অর্থে একেই অনুভূতি বলা হয়। ভালো লাগা, মন্দ লাগা যদি দুটি মানসিক অবস্থা হয়, তবে মনের এমন অবস্থাও সম্ভব যখন বলব ভালোও লাগছে না, মন্দও লাগছে না। ভুণ্ডট্ অনুভূতির আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। মানসিক অবস্থা উত্তেজিত হতে পারে, শান্ত হতে পারে এমন কি জড়বৎ হতে পারে। অনুভূতির অপর বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় যখন কোন কিছুর জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করি, ঘটনাটি ঘটে গেলে সেই উদগ্রীব ভাবের অবসান হয়, মনটা সাময়িক ভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। উডওয়ার্থের মতে (১৭) অনুভূতির প্রথম দুইটি বৈশিষ্ট্য—ভালো লাগা, মন্দ লাগা ও ভালোমন্দ কিছুই না লাগা এবং উত্তেজিত, শান্ত ও জড়বোধ করা অধিকতর প্রতিষ্ঠিত সত্য।

আবেগ ও অনুভূতি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্রোধ, ভয়, বাৎসল্য প্রভৃতি আবেগের দৃষ্টান্ত। ভয় মনের একটি উত্তেজিত, অস্বস্তিকর ,মানসিক অবস্থা। এই দিক দিয়ে ভয় একটি অনুভূতি। কিন্তু এ ছাড়াও ভয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য আছে বলে ভয়কে আমরা ক্রোধ প্রভৃতি আবেগ থেকে আলাদা করে দেখি। ভয় কি তা ভয় পেলেই বোঝা সম্ভব। বিশ্লেষণ করে সবটা প্রকাশ করা কঠিন। এটুকু বলা যেতে পারে ভয় অনুভূতি এবং আরও কিছু।

প্রত্যেকটি আবেগের সঙ্গে কর্ম-প্রেরণার যোগ আছে। ভয় ও পলায়নের ইচ্ছা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, যেমন যুক্ত ক্রোধের সঙ্গে আক্রমণ-ইচ্ছা। দুঃখের সঙ্গে কান্না, আনন্দের সঙ্গে হাসির যোগাযোগের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।*

আবেগ ও কর্ম-প্রেরণা

আবেগের উদয় হলে দেহেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। ভয় পেলে আমাদের বুক দুরুদুরু করে, রাগ হলে আমাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে। এ সব দৈহিক পরিবর্তনকে আবেগের 'দৈহিক ঝঙ্কার' বলা হয়। আবেগের সঙ্গে সঙ্গে এ সব দৈহিক

আবেগের দেহাত্মক ও দেহতাত্ত্বিক দিক

---

* সহজাত প্রবৃত্তির অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

ঝঙ্কারকেও আমরা কিছু কিছু অনুভব করি।* আবেগের ফলে দেহের অভ্যন্তরেও পরিবর্তন ঘটে। রক্তের চাপ বাড়ে, কোন কোন গ্লাণ্ডের রস নিঃসরণ হয়—ইত্যাদি। স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুতন্ত্রের কাজের দ্বারাই এসব পরিবর্তন ঘটে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তবাহ, পাকস্থলী, অন্ত্রাশয় এবং দেহের ভিতরে অন্যান্য যন্ত্র ও ঘাম নিঃসরণ গ্লাণ্ড, চুল ও চোখের ক্ষুদ্র পেশী সমূহ পর্যন্ত এই স্নায়ু বিস্তৃত। এই সব স্নায়ুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ উপরিভাগ, মধ্যভাগ ও নিম্নভাগ। উপরিভাগের স্নায়ুসমূহ অধোমস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়েছে। এসব স্নায়ু হৃদ্‌পিণ্ডের গতিকে মন্থর করে, গ্লাণ্ড ও পাকস্থলীয় পেশীগুলিকে উদ্দীপ্ত করে। উদ্দীপনার ফলে গ্লাণ্ড থেকে গ্যাস্ট্রিক্ রস নিঃসরণ হয় ও পাকস্থলীতে মন্থন কাজ আরম্ভ হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের মেরুরজ্জুর সঙ্গে সমান্তরালভাবে মধ্যভাগের স্নায়ুসমূহের যোগ আছে। এগুলিকে সংবেদনশীল স্নায়ু বলা হয়। এসব স্নায়ু হৃদ্‌পিণ্ডের গতি ও রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, পাকস্থলীর কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। মধ্যভাগের স্নায়ুসমূহের কাজ উপরিভাগের বিপরীত। এইসব সংবেদনশীল স্নায়ুর প্রভাবে আবেগের সময় চোখে মুখে ও চেহারায় পরিবর্তন ঘটে। নিম্নভাগের স্নায়ুসমূহের যোগ মেরুরজ্জুর নীচের অংশের সঙ্গে। এরা জননেন্দ্রিয় ও মলমূত্র নিষ্কাশনের অঙ্গকে উদ্দীপ্ত করে। বিভিন্ন অংশের প্রভাব বিভিন্ন রকমের হলেও এদের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা দেহে আছে।

উত্তেজিত হলে আমাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বয়, হৃদপিণ্ডের কাজ দ্রুত চলে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রেকর্ড করবার একপ্রকার যন্ত্রও আছে। নিঃশ্বাস

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস

প্রশ্বাসের রেকর্ড থেকে আবেগ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যায়। কোন ব্যাপারে কেউ সত্যিকার অপরাধী কিনা তা নির্ণয় করবার জন্য তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের রেকর্ড নেওয়া যেতে পারে। তবে এর থেকে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু অনুমান করা কঠিন।

রক্তের চাপ

হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত নিঃসরণ ও রক্ত চলাচলে ছোট ছোট ধমনীর বাধা—এই দুয়ের সম্বন্ধের দ্বারাই প্রধানতঃ রক্তের চাপ স্থির হয়। মিথ্যাকথা বলার সময় লোকের রক্তের চাপ প্রায় ৮০%

* ল্যাং জেমস-এর তত্ত্বানুসারে দৈহিক পরিবর্তন আবেগের ফল নয়, আবেগের কারণ। দৈহিক পরিবর্তন দ্বারা আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও, আবেগই দৈহিক পরিবর্তন ঘটায়—অধিকাংশ মনোবিদ এরূপ মনে করেন।

বেড়ে যায় এমন দেখা গেছে। কেউ প্রকৃত অপরাধী কিনা এটা নির্ণয় করাবার জন্য পুলিশ অনেক সময় অপরাধী ব্যক্তির রক্তের চাপ দেখে।

ভাল করে খাবার পর পাকস্থলীতে একরূপ মন্থনের কাজ চলে। সে সময় যদি ভয় বা রাগের কারণ ঘটে তবে দেখা গেছে আলোড়নটি অকস্মাৎ থেমে যায়। পাকস্থলীতে জারক রস নিঃসরণও বন্ধ হয়। এজন্যই খাবার সময় ও খাবারের পর দেহমনকে উত্তেজিত হতে দেওয়া ঠিক নয়। রাগ ও ভয়ে হৃদপিণ্ডের চলাচল বাড়ে। এ্যাড্রিনেল গ্লাণ্ডের রসও রক্তে নিঃসরিত হয়। ভয়ের সময় চুল খাড়া হয়ে ওঠে, চোখ বড় বড় হয়। এসব সংবেদনশীল স্নায়ুর প্রভাব।

বিভিন্ন মানুষের আবেগ জীবন বিভিন্ন ধাঁচে গড়ে ওঠে। দেহের উপরও তা প্রভাব বিস্তার করে। আবেগ জীবনের ত্রুটী দৈহিক রোগ সৃষ্টি করে বা দৈহিক রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। রক্তের চাপ, ডাইবেটিস, পেপ্‌টিক আল্‌সার, হজমের গোলমাল, কোষ্ঠবদ্ধতা ও আমাশয়ের সঙ্গে আবেগ জীবনের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে—আধুনিক চিকিৎসকেরা এরূপ মনে করেন।

শিশুর আবেগ

নবজাত শিশুর কান্না ও হাত পা ছোঁড়া দেখলে অনুভূতি ও আবেগের অস্তিত্ব অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে বিভিন্ন আবেগর পরিচয় খুঁজে পাওয়া কঠিন। নির্বিশেষ উত্তেজনা নবজাত শিশুর আবেগের স্বরূপ বলে মনে হয়। শিশুর যখন চার সপ্তাহ বয়স তখন গেসেলের (১৮) মতে, তার কান্নার বিভিন্ন ধরন থেকে ধরা যায় তার রাগ হয়েছে, ক্ষিধে পেয়েছে অথবা সে ব্যথা পেয়েছে। এক বছরের মধ্যেই শিশুর আচরণ দেখে বোঝা যায় যে সে ভয়, আনন্দ ও ভালোবাসাকে অনুভব করতে শিখেছে।

জীবনের গভীরতম অর্থ মানুষের অনুভূতি ও আবেগে রয়েছে। কর্ম ও জীবনযাপনের প্রেরণা যোগায় অনুভূতি ও আবেগ। কর্ম ও জীবনযাপনের দ্বারা শেষ পর্যন্ত আমরা অনুভূতি ও আবেগকেই উপলব্ধি করি। কিন্তু আবেগ মাত্রেই সবক্ষেত্রে মানুষেয় অনুকূল এ কথা ঠিক নয়। মানুষের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী আবেগ রয়েছে। সেজন্যই জীবনে বিচার ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

নীচে কয়েকটি] প্রধান প্রধান আবেগ সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করব।

ছোট শিশুদের লক্ষ্য করে ওয়াট্‌সন্ (১৯) সিদ্ধান্ত করেন তাদের ভয়ের স্বাভাবিক কারণ মাত্র দুটি: উচ্চশব্দ শুনলে তারা ভয় পায়, এবং অকস্মাৎ আশ্রয় বা স্থানচ্যুত হলে তাদের ভয় হয়। আঠারো মাস বয়সে শিশুদের কারো কারো সম্বন্ধে একথা বলা চললেও পরবর্তীকালে শিশুর ভয়ের তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ। একটু বড় হলে শিশু অন্ধকারকে ভয় করে, একা থাকতে ভয় পায়, ক্রমে ভূত প্রেত প্রভৃতি কাল্পনিক জীবকেও ভয় করে। এ সব ভয় যে সর্বাংশে অর্জিত একথা বলা ঠিক হবে না। এর মধ্যে স্বাভাবিক বিকাশেরও অংশ আছে।

শিশুর ভয়

মানসিক সত্যগুলিকে আমরা আলাদা আলাদা করে আলোচনা করলেও একথা মনে রাখা দরকার যে এগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধি বিকাশের উপর শিশুর আবেগ জীবনের বিকাশ কিছুটা নির্ভর করে। তেমনি আবেগ জীবনের সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দবিকাশ বুদ্ধি-বিকাশে সহায়তা করে।

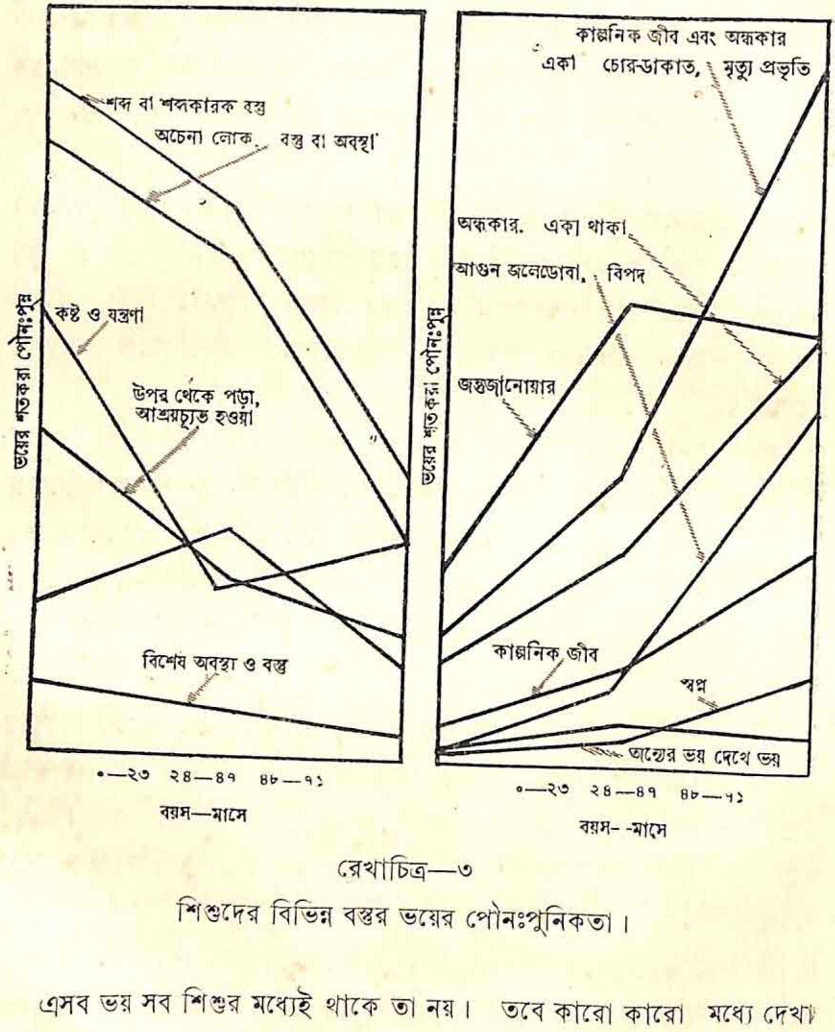
হম্‌স্ (২০) কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন—কোন অবস্থা বা বস্তুকে সাধারণতঃ যে বয়সে শিশুদের ভয় করতে দেখা যায়, উচ্চ মানসিক সামর্থ্যসম্পন্ন শিশুরা সে বয়সের আগেই ঐ সব অবস্থা ও বস্তুকে ভয় করে। সাপের ভয় সাধারণতঃ তিন বছরে দেখা যায়। উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের অনেকের মধ্যে ঐ ভয়টা দুই বছরে লক্ষ্য করা যায়।

শিশুর ভয়ের বস্তু

শিশু একটু বড় হলে, তার বুদ্ধি কিছুটা পরিণতি লাভ করলে অন্ধকার নিরাপদ নয় এটা সে বুঝতে পারে। অন্ধকারকে ভয় করবার কারণও হয়ত কারো কারো জীবনে ঘটে। অন্ধকারকে তাই তারা ভয় করে। এই ভয়ে স্বাভাবিক বিকাশের স্থান আছে, অনেক সময় অভিজ্ঞতারও স্থান আছে।

শিক্ষক ও পিতামাতারা ২১ দিন ধরে শিশুদের ভয় লক্ষ্য করেছিলেন। তাদের রেকর্ডের ভিত্তিতে শিশুরা কোন বস্তুকে বা কোন অবস্থাতে কি পরিমাণ ভয় পায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় (২১)। দুটি লেখে সেটি পরের পৃষ্ঠায় দেখান হয়েছে।

উচ্চ শব্দ, পড়ে যাওয়া, অচেনা জিনিস বা ব্যক্তির ভয় দুই বছর কি তার আগে থেকেও কমতে দেখা যায়। জন্তুর ভয় দুই বছরে চরমে ওঠে, চারপাঁচ বছর পর্যন্ত প্রায় একই রকম থাকে। অন্ধকার, কাল্পনিক জীব, একা থাকার ভয় দুই বছরের পর থেকে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।



রেখাচিত্র—৩

শিশুদের বিভিন্ন বস্তুর ভয়ের পৌনঃপুনিকতা।

এসব ভয় সব শিশুর মধ্যেই থাকে তা নয়। তবে কারো কারো মধ্যে দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভয় সাধারণতঃ কিরূপ দেখা যায় তার একটি তালিকা নীচের সারণীতে দেওয়া হল (২২)।

ভয় পায়—এমন শিশুদের হার%

অবস্থা বা বস্তু	বয়স ২৪—৩৫ মাস	৩৬—৪৭ মাস	৪৮—৫৯ মাস	৬০—৭১ মাস
একা থাকা	১২·১	১৫·৬	৭.০	০
অন্ধকার ঘর	৪৬·৯	৫১·১	৩৫·৭	০
অচেনা লোক	৩১ ৩	২২·২	৭·১	০
উচ্চ শব্দ	২২·৬	২০·০	১৪·৩	০
সাপ	৩৪ ৮	৫৫·৬	৪২·৯	৩০·৮

বিভিন্ন বয়সের শিশুদের সংখ্যা ছিল ১২ থেকে ৪৫। অবস্থার পরিবর্তনে বা বস্তুর উপস্থিতিতে শিশুদের আচরণ কি হয় তা দেখে তাদের মনোভাবটি অনুমান করা হয়েছে। মনে মনে ভয় পেলেও আচরণে সে ভয় প্রকাশ না পেলে তাকে ভয় বলে ধরা হয় নি।

শৈশবের ভয় কি কাটে?

প্রশ্ন এই যে শৈশবে শিশুরা তো অনেক কিছুকে ভয় করে। বড় হলে সে ভয়ের কতখানি তারা কাটিয়ে উঠতে পারে। ঐ সম্বন্ধে দেখা গেছে (২৩) যে ৮০৪টি ভয় শিশুদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, বড় হয়ে তার শতকরা ষাটভাগ তারা কাটিয়ে উঠেছে। যে সব ভয় ছিল তার মধ্যে জন্তুর ভয়, আগুন, অসুস্থতা ও ডুবে মরার ভয়, অন্ধকারকে ভয়, একা থাকতে ভয় ও ভূতের ভয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য

কোন একটি ভয় একটা বিচ্ছিন্ন মানসিক সত্য—এ কথা মনে করা চলে না। গোটা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর যোগ আছে। মানসিক স্বাস্থ্য যাদের ভালো ভয়কে সহজে তারা কাটিয়ে উঠতে পারে। অসুস্থ মনোভূমিতে ভয় শিকড় গেড়ে বসে। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। মনঃসমীক্ষক ডক্টর তরুণ চন্দ্র সিংহের কাছ থেকে ঘটনাটি আমাদের শোনা। তিনটি ছেলেকে বাড়ীর চাকর অনেক আজগুবি ভূতের গল্প বললো। তারপর থেকে দেখা গেল ছেলেমেয়েরা ভয়ে জড়সড়। একা কেউ উপরে যাবে না, অন্ধকারে তাদের ভয়। উনি ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ওদের সঙ্গে ভূতের ভয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। কয়েক দিনের মধ্যে দুজন ভয়কে মোটামুটি কাটিয়ে উঠল। কিন্তু একজনের ভয় আর কিছুতেই গেল না। তার

বেলায় বলা যেতে পারে উর্বর মনোভূমিতে ভয়টি উপ্ত হয়েছিল। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ছেলেটির মধ্যে ভয়টি প্রথম থেকেই উপ্ত ছিল। সেটা তার ভিতরের ভয়, বোধ করি নিজেকে ভয়। সেই ভিতরের ভয় বাইরের ভয়ের সমর্থন পেল। সেজন্যই ঐ ভয়ের এমন নাছোড়রূপ।

উৎকণ্ঠা এক জাতীয় ভয়। কখন কি বিপদ ঘটে যাবে নিয়ত মনের এই আশঙ্কাকে উৎকণ্ঠা বলা যেতে পারে। শিশুজীবনে উৎকণ্ঠার পরিমাণ অনেকখানি।

শিশুর উৎকণ্ঠা

কোন একটা অমঙ্গল ঘটতে পারে—এমন একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা শিশুদের অনেককেই কমবেশী ভারাক্রান্ত করে রাখে। শিশুর ভয়কে (প্রাপ্ত বয়স্কদের ভয়কেও) প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) অস্পষ্ট আশঙ্কা (২) কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণাকে ভয়। আশঙ্কায় ভয়ের সঙ্গে কোন বস্তুর যোগটা দৃঢ় নয়। আশঙ্কাপীড়িত মন কখনও এটাকে ভয় পায়, কখনও ওটাকে ভয় পায়—শিশু কখন কি ঘটে যাবে মনে করে ভয়ে মুহ্যমান হয়।

আবার দেখা যায় যে শিশু বিভিন্ন ধারণা ও বস্তুকে ভয় করে। এ ভয়ের মধ্যে অভিজ্ঞতার কিছু স্থান আছে। শিশু ছোট, তার বাস্তববোধ কম। সামান্য জিনিস তার কাছে অসামান্যরূপে দেখা দেয়। শিশু নিজেকে ভয় করে,

শিশুর নিজেকে ভয়

বিশেষতঃ নিজের বৈর ইচ্ছাকে। শিশুজীবনে ভারসাম্যের অভাব থাকে। বিভিন্ন আবেগ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে মনে ও আচরণে যে সামঞ্জস্য দেখা যায় শিশুজীবনে তখনও সেটি আসে নি। শিশুর যখন রাগ হয় তখন রাগই তার কাছে একমাত্র সত্য। রাগে সে 'পাগল' হয়ে যায়। সে কি করে আর না-করে, তার ঠিক থাকে না। যারা তার বিশেষ অন্তরঙ্গ, যাদের যত্ন ও ভালবাসা পেয়ে সে বাঁচছে রাগটা মাঝে মাঝে তাদের উপরই তার হয়।* মা'র উপর রাগ হলে শিশু ভাবে—মা মরুক! কিন্তু মার মৃত্যু যে, শিশুর কাছে কতখানি ভয়াবহ সেটা সেই মুহূর্তে স্পষ্ট না হলেও শিশু পরে বুঝতে পারে। মায়ের উপর রাগ করা অন্যায়—ন্যায়-অন্যায়বোধ বিকাশের সঙ্গে এটাও সে মনে করতে শেখে। সুতরাং

* ঈর্ষা ও রাগের উৎসস্থল ইডিপাস কমপ্লেক্স—মনঃসমীক্ষা এই মনে করে। শিশু মা'র ভালোবাসায় একাধিপত্য চায়, সুতরাং বাবার মৃত্যুকামনা করে; আবার যখন সে বাবার ভালোবাসায় একচ্ছত্র অধিকার চায় তখন সে মা'র মৃত্যু চায়।

আশ্চর্য নয় যে শিশু নিজের রাগকে ভয় করবে। এ অসুবিধাজনক অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সময় সময় সে তার রাগটা যার উপরে তার রাগ হয়েছে তার ঘাড়ে চাপায়। একে বলে প্রক্ষেপ। সে ভাবে, 'না মার উপর আমি রাগ করি নি ; মা আমার উপর রাগ করেছে'। নিজেকে ভয় করার পরিবর্তে মা'কে ভয় করাতে কিছু সুবিধা আছে। নিজেকে নিজের সঙ্গে সর্বদা থাকতেই হবে। মা'র সান্নিধ্য থেকে মাঝে মাঝে সরে থাকা যায়। কিন্তু তাও কি যায়? মা যে বড় আপন, তাঁকে যে শিশুর বড় দরকার! শিশু তখন মা'কে দুভাগে ভাগ করে ফেলে। 'ভালোমা' ও 'মন্দমা'। মা তার 'ভালোমা' হয়ে থাকেন ; বাড়ীর ঘেউঘেউয়ে কুকুরটাকে সে 'মন্দমা' বলে খাড়া করে। নিজের রোষ কুকুরের ঘাড়ে চাপিয়ে—কুকুর তাকে কামড়াবে, খেয়ে ফেলবে এমন ভয়ে সে জড়সড় হয়। তবে ঐ কুকুরটার কাছ থেকে দূরে থাকা তেমন কঠিন নয়—ঐ যা সুবিধা। এসব মানসিক কাজের অধিকাংশই সচেতন মনের অগোচরে ঘটে। শিশুমনের সমীক্ষা দ্বারা এসব তথ্য জানা যায়।

শিশুদের মধ্যে অনেক সময় নিরাপত্তাবোধের অভাব লক্ষ্য করা যায়। 'কখন কি ঘটে যেতে পারে' এমন একটা ভাব। বাঁচবার জন্য শিশু প্রধানতঃ পিতামাতার স্নেহের উপর নির্ভর করে। সে মা-বাবার আবেগ জীবনে যদি স্থৈর্য না থাকে, কখনও তাঁরা ভালোবাসায় গলে যান, কখনও সংহার মূর্তি ধারণ করেন (বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব হেতু এগুলি শিশুর কাছে আরও চরম বলে মনে হয়)—তবে শিশুর পক্ষে জীবনের কল্যাণময় রূপে আস্থালাভ করা কঠিন। নিজের সম্বন্ধে সে নিশ্চয় নয়, মা-বাবার সম্বন্ধে সে নিশ্চয় নয়। নিরাপত্তাবোধ তার মনে আসবে কোত্থেকে? এলা সার্প বোধহয় এজন্যই একজায়গায় লিখেছেন, পিতামাতার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান নয়, তাঁদের আবেগ জীবনের স্থৈর্যই শিশুর সুস্থ বিকাশের প্রধান সহায়।

নিরাপত্তাবোধের অভাব

প্রীতিকর অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞানের সাহায্যে শিশুর ভয় কিছুটা দূর করা সম্ভব। যে কুকুরটাকে সে ভয় পাচ্ছে সেটা ভালো, তাকে ভয়ের কিছু নেই—এটা শিশু উপলব্ধি করতে পারলে কুকুরের ভয় অনেক সময় দূর হয়। কিন্তু শিশুর পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার একটি সুস্থ, নিশ্চিন্ত পরিবেশ যার উপর শিশু সহজ চিত্তে নির্ভর করতে

ভয়কে জয়

পারে, যেখানে শিশু নির্ভয়ে নিজেকে এমন কি, অনেক পরিমাণে নিজের বৈর ইচ্ছাকেও প্রকাশ করতে পারে। এটা ঠিক যে, শিশুকে তার ধ্বংসাত্মক ইচ্ছার সবটা কাজে প্রকাশ করতে দেওয়া সম্ভব নয়। সেটা যেমন অন্যের বিপদের কারণ, তেমন শিশুর বিপদেরও কারণ হবে। নিজের ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাকে মনেমনে শিশু ভয় পায়। কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছার পরিতৃপ্তি দরকার। সর্বোপরি শিশুর ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা আছে, সেজন্য তার ভীত ও লজ্জিত হবার কারণ নেই এটা তাকে বুঝতে দেওয়া আবশ্যক। নীচের ঘটনাটি ড্যানিস মনঃসমীক্ষক ডক্টর রাইমার ইয়েনসেনর কাছ থেকে শোনা। ইয়েনসেনের ছোট ছেলে জন্মাবার বছরখানেক পর তার বড় মেয়ের (৫ বছরের তফাৎ) তোতলামি দেখা দিল। কথা বলতে তার আঁটকে যাচ্ছে। তাছাড়া মেয়েটির আরেকটি আশঙ্কা—ভাইকে যখন বাবা মা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেড়াতে নিয়ে যান, নামবার সময় তখন তাঁরা তাকে ফেলে দিতে পারেন। কয়েকদিন এ ব্যাপার লক্ষ্য করবার পর ইয়েনসেন মেয়েকে বল্লেন যে ছোট ছেলের উপর মাঝে মাঝে ইয়েনসেনের রাগ হয়—কারণ দিদির খেলার জিনিসপত্র সে নষ্ট করে ফেলে। প্রথমে দিদি ভাইকে সমর্থন করবার চেষ্টা করল। ধীরে ধীরে দেখা গেল বাবার সঙ্গে সে এক-মত। ইয়েনসেন বললেন—দিদিরও ভাইয়ের উপর রাগ হওয়া খুব স্বাভাবিক। তারপর দেখা গেল মেয়েটির তোতলামি ও ভাইকে ফেলে দেওয়া হবে এ আশঙ্কা উভয়ই দূর হয়েছে। ভাইয়ের প্রতি যে হিংসা ও দ্বেষ তার মধ্যে ধূমায়িত হয়েছিল—তার প্রকাশ মেয়েটির ভয় দূর করতে সাহায্য করল। বাবার কাছ থেকে সমর্থন লাভ করে তার সচেতন মনের পক্ষে ভাইয়ের প্রতি নিজের বৈর মনোভাবকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হল। বৈর মনোভাব সচেতন মনের বাধা হেতু অচেতন মনে বাসা বেঁধে যে তোতলামি ও আশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল তা দূর হল। এ বিষয়ে তার প্রতি বাবার ভালবাসাও তাকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল এরূপ মনে করবার কারণ আছে।

ভয়ের বস্তুটিকে বুঝতে পারলে, তাকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে ভয় দূর হয়। কুকুরকে শিশু ভয় পায়। কুকুরকে খেতে দিয়ে পোষ মানাতে পারলে কুকুরকে সে আর ভয় করবে না। কুকুরের প্রকৃতি বুঝলেও সে জ্ঞান তার ভয় দূর করতে তাকে সাহায্য করবে। ভয়কে জয়

করবার এটি একটি সক্রিয় পন্থা। আচরণের বিয়োজনের মত নিষ্ক্রিয় নয়।*

সামান্য বিরক্তিবোধ থেকে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ ও ধ্বংস করা সবই রোষের অন্তর্ভুক্ত। ঈর্ষার মধ্যে ভয়, দুঃখ ও রাগ থাকে, দ্বেষের মধ্যে দেখা যায় রাগ ও ভয়।

রোষ

একান্ত শৈশবে শিশুকে জড়িয়ে ধরে তাকে নড়তে চড়তে বাধা দিলে কিম্বা তার খাওয়াতে বিঘ্ন জন্মালে সে রুষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে যে কোন ইচ্ছার পরিতৃপ্তির বাধা ঘটলেই শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের রাগ হয়।

রাগের ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। ঐ ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ কিছুটা বংশগতি এমন মনে করা হয়। তবে একথাও সত্য মা-বাবার রাগ বেশী হলে সে রাগই শিশুকে রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হতে প্ররোচিত করে। ঐ রাগের অভিব্যক্তি কি হবে সেটা অবশ্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেটা সে বাইরে প্রকাশ করবে না নিজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করবে—সেটা রাগ প্রকাশ করার ফলাফল দেখে শিশু শেখে। প্রশান্তি যে গৃহে বিরাজ করে সে গৃহে রাগের প্ররোচনা কম। সে ক্ষেত্রে বলা যায়, বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ই শিশুকে মানসিক প্রশান্তি লাভে সাহায্য করছে।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের রাগ কম এ কথা কেউ কেউ মনে করেন। এ বিষয়ে কোন ব্যাপক ও চূড়ান্ত অনুসন্ধান আজও হয় নি। বার্টের ধারণা—মেয়েদের রাগ কম এ কথা বলা ঠিক নয়। রাগ প্রকাশের ভঙ্গিটি ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন বলাই সঙ্গত।

শিশু পালনের পদ্ধতি ব্যক্তির চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে—বিভিন্ন আদিম সমাজ দেখে মীড, গোরার, বেনেডিক্ট প্রভৃতি (২৪) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শিশু বা ব্যক্তির চরিত্রে ক্রোধের উপাদান আমাদের বর্তমান অলোচ্য বিষয়। দেখা গেছে যে সব উপজাতির শিশুরা বড়দের কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ লাভ করে, বাচ্চাদের মায়ের দুধ দেরীতে ছাড়ান হয়, নিয়ম শৃঙ্খলার কড়াকড়ি যেখানে কম এবং শিশুদের কাছ থেকে খুব বেশী দাবী করা হয় না—সে সব

শিশুপালনের পদ্ধতি'র প্রভাব

* আচরণের সংযোজন ও বিয়োজন—আমরা 'শেখা' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ভয়কে কেমন করে দূর করা যায় ঐ অধ্যায়ে কিছু আলোচিত হয়েছে।

জায়গায় সাধারণতঃ সহযোগী মনোভাব, উদারতা ও ক্রোধের স্বল্পতা বড় হলে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। যে সব সমাজে শিশুদের অনাদর বেশী, শিশুদের বারম্বার বাধা দেওয়া হয়, বঞ্চিত করা হয়—সে সব শিশুরা বয়সকালে ধূর্ত, উদাসীন কিম্বা বদমেজাজী হয়।

বঞ্চিত হবার সঙ্গে রাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। চাই, কিন্তু পাই না, পাচ্ছি না—এতে শিশু রুষ্ট হয়ে ওঠে। পাওয়ার পথে যে বাধা তাকে নষ্ট করবার জন্য শিশুর রোষ উদ্যত হয়। মায়ের ভালবাসা শিশু চাইছে কিন্তু তার মনে হচ্ছে তা বুঝিবা সে পেল না, তার ছোট ভাই মাকে নিয়ে নিল। ছোট ভাইয়ের প্রতি তার মন ঈর্ষা ও রোষে জর্জরিত হয়ে ওঠে। ছোট ভাইকে সে আঘাত করতে চায়। কিন্তু সে জানে ছোট ভাইকে আঘাত করলে মাবাবা তাকে ক্ষমা করবেন না, তাকে শাস্তি দেবেন, ভালবাসবেন না। ভাইয়ের বিরুদ্ধে তার ঈর্ষাকে সে অবদমন করবার চেষ্টা করে। কিন্তু নির্জ্ঞানে তা থাকে। সেই রুদ্ধ আক্রোশ হয়ত তখন সে বাড়ীর পোষা বিড়ালটাকে মেরে খানিকটা প্রশমিত করে। একে বলা হয়—সঞ্চারণ বা 'আবেগের বিষয়ান্তরণ'।* যদি বাইরের পরিবেশে কোন বস্তুকে আঘাত করার বাধা বেশী থাকে, রাগ প্রকাশের বস্তু হিসাবে শিশু নিজেকে বেছে নেয়। নিজের উপর সে রাগ করে, নিজের পরে সে নিষ্ঠুর ও নির্মম হয়ে উঠে।

বঞ্চিত হওয়া ও রোষ

---

* কোন একটি বস্তু বা ধারণা একটি আবেগকে উজ্জীবিত করে। মানসিক কোন বাধার জন্য যখন আবেগটি সেই বস্তু বা ধারণা থেকে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন অন্য একটি বস্তু বা ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে আবেগের বিষয়ান্তরণ বলা হয়। যে কোন আবেগই বিষয়ান্তরিত হতে পারে।

অন্যত্র আমরা ভালোবাসা ও ঘৃণার পাত্রান্তরণের কথা উল্লেখ করেছি। শিশু জীবনের প্রথমে মা'কে ভালোবাসে, বাবাকে ভালবাসে। হয়ত তাদের প্রতি কিছু ঘৃণাও থাকে। পরবর্তীকালে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পিতামাতার প্রতিভূজ্ঞানে (এই জ্ঞানটি প্রায়ই অস্পষ্ট ও অচেতন থাকে) ভালোবাসে কিম্বা ঘৃণা করে। তখন তাকে বলা হয় ভালোবাসা ও ঘৃণার পাত্রান্তরণ।

আবেগের বিষয়ান্তরণ একটি ব্যাপকতর মানসিক নিয়ম বা পদ্ধতি। পাত্রান্তরণ তারই একটি অংশবিশেষ। বিষয়ান্তরণে (১) বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণা যে কোন একটি থেকে আরেকটিতে আবেগ বিষয়ান্তরিত হয় এবং (২) যে কোন আবেগের বেলাতেই একথা বলা চলে। পাত্রান্তরণে (১) ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বেলাতেই আবেগের পাত্রান্তর ঘটে এবং (২) ভালোবাসা ও ঘৃণা এই দুটি আবেগের বেলাতেই ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পাত্রান্তরণ সম্বন্ধে আমরা অস্বাভাবিক শিশু অধ্যায়ে মনঃসমীক্ষা বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচনা করেছি।

রাগের কিছুটা জৈবিক মূল্য আছে। ইচ্ছা পরিতৃপ্তির বিঘ্নস্থলকে রাগ বিনষ্ট করবার প্রেরণা যোগায়। অপেক্ষাকৃত সহজ ও আদিম সমাজে রোষ ও আক্রমণের দ্বারা বাধা বিনষ্ট করা হয়ত সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমান জীবন জটিল। এখানে কৌশলের প্রয়োজন, আত্মসংযমের প্রয়োজন বেশী। রাগ অধিকাংশ সময়েই ব্যক্তির পক্ষে অনুকূল না হয়ে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। রাগ যাতে না হয়, রাগ হলেই বা কি ভাবে তাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায় এটাই শিক্ষার প্রধান কথা। কিন্তু এটা প্রধান কথা হলেও এটা কার্যকরী করা খুব সহজ নয়। শিশুর ইচ্ছা পরিতৃপ্তির বাধা কমান দরকার। তেমন পরিবেশ শিশুর দরকার যেখানে সহজ ও স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ তার পক্ষে সম্ভব। তথাপি শিশুর পক্ষে সব কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। যা পাওয়া সম্ভব তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই উচিত নয়। তা ছাড়া শিশু পারতে চায়। কেবলমাত্র আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠাও তার লক্ষ্য। সে যাতে বহুল পরিমাণে পারবার আনন্দ লাভ করে সে সুযোগ তাকে করে দিতে হবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে অনেক সময়, রোষের একটি অংশ পরিতৃপ্ত হয়।* অবশ্য রোষের স্বাভাবিক রূপটি সেখানে থাকে না। তার রূপান্তর ঘটে। এই অবস্থাকে রোষের ঊর্ধ্বায়ণ বলা যেতে পারে।

শিশু পালনে ত্রুটী

প্রতি নিয়ত শিশু যা করতে চায় তাকে তা করতে না দিয়ে অনেক সময় শিশুকে রুষ্ট** করা হয়। আবার কোন কোন পিতামাতা আছেন যাঁরা শিশুকে প্রথম বাধা দেন; কিন্তু শিশু রাগ করলে, কান্নাকাটি ও চেঁচামিচি করলে শিশুর ইচ্ছার কাছে হার মানেন। শিশু শেখে, 'রাগ করলে পাওয়া যায়। রাগ না করলে এখানে পাবার কিছু উপায় নেই।' এ সব ক্ষেত্রে রাগকে শিশু জীবনের ব্রহ্মাস্ত্র মনে করতে শেখে। পারিবারিক জীবনে এ অস্ত্র কিছুটা কার্যকরী হলেও জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে ঐ অস্ত্র অক্ষম। রোষ ও ইচ্ছা পরিতৃপ্তির যোগাযোগটি ছিন্ন করেই শিশুর ঐ ভ্রান্ত ধারণাটি দূর করা দরকার।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—রাগের কারণ শিশু জীবনে যাতে কম

---

* আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনতি এবং ক্রীড়া অধ্যায় দুটি দ্রষ্টব্য।

** সময় বিশেষে ভীত করা হয়। নিজের চাওয়াকে সে ভয় করতে শেখে। বঞ্চিত হবার ক্ষোভ, দৈন্য ও রোষকে মনে মনে সে এড়াবার চেষ্টা করে। ভয় ও রাগের মধ্যে সম্বন্ধটি অতি নিকট।

ঘটে তা দেখা দরকার। কিন্তু রাগকে জীবন থেকে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। শিশুকে বঞ্চিত হতেই হবে। শিশু সময় সময় রুষ্ট হবেই। রাগ ও যোধন প্রবৃত্তির কিছুটা স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। রাগের রূপান্তরণের দ্বারা জীবনকে কিছু পরিমাণ বীরোচিত রূপ দেওয়া সম্ভব। বীরত্বের রূপ যে সব সময়ে দৈহিক এমন মনে করবার কারণ নেই। ভাইদের হারাবার ইচ্ছা ভিক্টর হুগোর মনে প্রবল ছিল। পরে তিনি ঠিক করলেন তিনি সৈনিক হবেন। সবশেষে তিনি বেছে নিলেন সাহিত্যসৃষ্টির পথ। এ পথেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন।

যোধন প্রবৃত্তির উর্ধ্বায়ণ ও পরিতৃপ্তি

ভালোবাসার দুটি রূপ আছে। ভালোবাসা পাওয়া ও ভালোবাসা দেওয়া। মা ও শিশুর সম্পর্ক যদি বিচার করা যায় তবে বলা যেতে পারে, মা প্রধানতঃ দেন ও শিশু প্রধানতঃ পায়। মা শিশুকে যত্ন করেন, আহার দেন, বহু ক্লেশ স্বীকার করে বাঁচিয়ে রাখেন, বড় করে তোলেন। এর সবার মূলে আছে মা'র ভালোবাসা, ভালোবাসা দেওয়া। শিশু মায়ের ভালোবাসার অর্ঘ গ্রহণ করে। কিন্তু নেওয়াতে সে একান্ত নিষ্ক্রিয় নয়। সে পেতে চায়, সে ভালোবাসা চায়, কোমল কৃতজ্ঞতায় তার স্বীকৃতি জানায়। শিশুর (বয়স্কদেরও) ভালোবাসা চাওয়াও ভালোবাসার একটি রূপ।

ভালোবাসা পাওয়া ও ভালোবাসা দেওয়া

শিশুর প্রতি ভালোবাসাকে ম্যাকডুগাল বাৎসল্য বলে অভিহিত করেছেন। অসহায় ক্ষুদ্র শিশু মানুষের—বিশেষতঃ মেয়েদের—বাৎসল্যকে জাগ্রত করে। 'শিশুর প্রয়োজন, তাকে সাহায্য কর'—বাৎসল্যের কর্মপ্রেরণার সুরটি এ ধরণের। ভালোবাসা চাওয়াকে স্পষ্টতঃ ম্যাকডুগাল কোন আবেগ বা সহজাত প্রবৃত্তির অংশরূপে উল্লেখ করেন নি। তবে 'আবেদন' বলে একটি সহজ প্রবৃত্তি মানুষের আছে বলে তিনি মনে করেন। বিপদ ও দুঃখে মানুষ তাকেই মনে মনে খোঁজে যে তাকে সাহায্য করেছে, যে তাকে ভালোবেসেছে। ভালোবাসা চাওয়ার সঙ্গে আবেদন প্রবৃত্তির কিছু যোগ রয়েছে।

লেখক লেখিকা একটি প্রশ্নাবলীর সাহায্যে শিশুদের ভালোবাসা পাওয়া ও দেওয়ার পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাতে দু-একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। কয়েকটি শিশুকে (চার থেকে পাঁচ বছর বয়স) জিজ্ঞাসা

করা হয়েছিল—(১) কাকে তারা ভালোবাসে এবং (২) কে কে তাদের ভালোবাসে। দুটি প্রশ্নের উত্তরই তাদের এক হয়েছিল। দুজন শিশু দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনে উত্তর করেছিল, ওতো বলেছিই। অর্থাৎ কে তাকে ভালোবাসে এবং সে কাকে ভালোবাসে এদের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করবার মত মানসিক বিকাশ শিশুর হয়নি। শিশুকে যে ভালো-বাসে, শিশু তাকে ভালোবাসে। এটাই শিশুজীবনের মূলসুর। অন্য কথায়, পাওয়ার সঙ্গে সম্পর্করহিত ভালোবাসা দেওয়া শিশুজীবনে কম দেখা যায়।* কোন মাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় আপনি কাকে ভালোবাসেন—সম্ভবতঃ উত্তর হবে, ছেলেকে। 'কেন ভালোবাসেন' জিজ্ঞাসা করলে একথা তিনি বলবেন না, 'যেহেতু ছেলে আমাকে ভালোবাসে।' ছেলে ছোট, অসহায়, তার ভালোবাসা দরকার—এমন জাতীয় উত্তরই সাধারণতঃ আমরা পেয়েছি। কিন্তু শিশুকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি অমুককে (সাধারণতঃ শিশু বাবা মা'র কথাই বলে, ভাইবোনের নামও মাঝে মাঝে থাকে) ভালোবাস বললে। কেন ভালোবাস?" অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উত্তর হবে, 'অমুকে আমাকে ভালোবাসে, আমাকে জিনিস দেয়, আমাকে আদর করে' ইত্যাদি।

শিশুর ভালোবাসার রূপ

শিশুদের ভালোবাসা পাওয়া ও দেওয়ার বস্তু সাধারণতঃ তাদের পিতামাতা ও সময় সময় ভাইবোন। একটি ছেলে, বিশেষতঃ একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে ভালোবাসছে, তার জন্য সব কিছু করছে এমন দেখা যায়। এর মধ্যে বাৎসল্যই প্রধান একথা বোধ হয় সত্য নয়। এর মধ্যে তার মায়ের মত বড় হবার চেষ্টা, ছোট ভাইকে ভালোবাসলে মাবাবা তাকে ভালোবাসবেন এমন ধারণা ও নানাবিধ আবেগের প্রভাব রয়েছে।

ছোটদের জীবনে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ভালোবাসা পাবার দরকার আছে। ভালোবাসাই তাদের বাঁচবার প্রধানতম পাথেয়। সে ভালোবাসায় সন্দেহের কারণ ঘটলে** তার নিরাপত্তাবোধ দুর্বল হয়, তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। শিশুজীবনে আলোবাতাসের মতই পিতামাতার স্নেহ সহজ ও সর্তহীন হওয়া আবশ্যক।

ছোটদের জীবনে ভালোবাসা পাবার প্রয়োজন

* এ সম্বন্ধে সব মনোবিদরা অবশ্য একমত নন।

** বাস্তব অভিজ্ঞতা অভাবহেতু শিশুর সামান্যকে অসামান্য মনে করে। মা যদি একবার বলেন, তোমাকে ভালোবাসব না—সে মনে করে হয়ত বা সে কথা সত্য।

কিন্তু মা-বাবা সত্যিকার ভালোবাসলেও শিশু যে সময় সময় ভুল বোঝে না এ কথাও বলা চলে না। মা'র যখন আরেকটি ছেলে বা মেয়ে হয় তখন তাকে নিয়ে মাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। সে সময় বড়টির পক্ষে এমন মনে করা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে মা তাকে আর ভালোবাসেন না। এর উপর ঈর্ষা আছে। ঈর্ষার মেঘ শিশুমনকে যখন আচ্ছন্ন করে, তখন যা দেখতে পারত তাও শিশু দেখতে পায় না। মোটকথা, বাড়ীতে একটি ছোট ভাই বা বোন শিশুর মানসিক জীবনে একটি গুরুতর ঘটনা। সে জন্য ভাই বা বোন জন্মাবার আগে থেকে তার মনকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা দরকার। মায়ের অনুপস্থিতিতে অন্য কারো যত্ন ও ভালোবাসা পেলে শিশুর মনের বেদনা কিছুটা লাঘব হয়। তার পক্ষে ছোট ভাই বা বোনকে ভালোবাসতে পারলে কিছুটা উপকার হওয়া সম্ভব। সর্বোপরি পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার শিশু যাতে না মনে করে তাকে আর মা ভালোবাসেন না।

শৈশবে যে বাবামায়ের (বা তৎস্থানীয় কারো) ভালোবাসা পেল না বা যে মনে করল বাবামায়ের ভালোবাসা সে পায় নি জীবনের প্রতি সুস্থ মনোভাব তার কাছ থেকে আশা করা কঠিন। গিরীন্দ্রশেখর বসু একদিন বলেছিলেন,

স্নেহবঞ্চিত জীবনের পরিণতি

যে রোগী মনে করে তাকে কেউ ভালোবাসে না, তার রোগ সারান বড় শক্ত। ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত জীবন সামাজিক অপরাধের পথ গ্রহণ করেছে এমন, অনেক সময় দেখা যায়। এ যেন ভালোবাসা না পাওয়ার জন্য মা-বাবা তথা সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশোধ।*

হ্যাডফিল্ড, আইয়ান সাটি ও ক্যারেণ হর্ণি প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করবার জন্য ভালোবাসা পাবার প্রয়োজন অনেকখানি। বর্তমান জীবনের একটি অভিশাপ—মানুষকে আমরা নিজেদের সুখসুবিধার যন্ত্রমাত্র মনে করি। একমাত্র যে ভালোবাসে তার কাছেই মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্য আছে। ভালোবাসা লাভ করেই মানুষের নিজের মূল্য নিজের কাছে উপলব্ধি করা সম্ভব।

---

* ছেলেমেয়েদের চুরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে গিলসপাই লিখেছেন, "পিতামাতার ভালোবাসায় বঞ্চিত হয়ে তার ক্ষতিপূরণার্থে শিশুরা অনেকসময় চুরি করে। ঐ চুরি পিতামাতার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশোধও বটে।" (২৫)

শিশুদের ভালোবাসা পাওয়ার দরকার আছে। ভালোবাসা চাওয়ার শক্তিও যেন তাদের অক্ষুণ্ণ থাকে এটি দেখা দরকার। চেয়ে বারবার ব্যর্থ ও বঞ্চিত হলে অবশেষে চাইতে আমরা ভয় ও বাধা পাই। সহজ ও সচেতন ভাবে আমরা আর চাইতে পারি না, চাই না। লেখক তার প্রশ্নাবলীর সাহায্যে অনাথ আশ্রমের ৩১ জন ছেলেমেয়ে ও ৪৭ জন সাধারণ ছেলেমেয়েদের (অর্থাৎ যাদের পিতামাতা বেঁচে আছেন, পিতামাতার কাছেই তারা থাকে) ভালোবাসা চাওয়ার পরিমাণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন। ফলাফলটি নীচে প্রকাশ করা হল (২৬)।

জীবনে চাওয়ার দরকার

সারণী—৮

শিশুদের ভালোবাসা চাওয়ার শক্তির পরিমাণ

পরিমাণ (প্রমাণ স্কোর)*	শিশুদের (মোট সংখ্যা ৭৮)	সাধারণ গৃহের শিশু (মোট সংখ্যা ৪৭)	অনাথ আশ্রমের শিশু (মোট সংখ্যা ৩১)
৬০'র বেশী	৩০%	৪৬·৬%	০%
৫৬—৬০	৯%	৬·৬%	১৫%
৪৫—৫৫	৩২%	৪০%	১৫%
৪০—৪৫	৯%	০%	২১%
৪০'র নীচে	২০%	০%	৪৯%

	সমক *	প্রমাণ ব্যত্যয় *
সাধারণ শিশু	৩৭·৫	১০·৫
অনাথ শিশু	২০·৪	১১

[প্রশ্নের নমুনা : ১। তুমি কি চাও মা তোমাকে ভালোবাসুন ? খুব ? কিছু ? না ? ২। তুমি কি চাও মাস্টারমশাই তোমাকে ভালোবাসুন ? খুব ? কিছু ? না ? পর্যায়ক্রমে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের নম্বর ধরা হয়েছে ৪, ২, ০ ; দ্বিতীয় প্রশ্নের ২, ১, ০। এ জাতীয় এবং কিছু অন্য ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিশুরা কতখানি ভালোবাসা চায়, এটা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।]

* এ শব্দগুলির সঠিক অর্থ বোঝবার জন্য পরিসংখ্যান অধ্যায়টি দেখুন।

ভালোবাসা চাওয়ার শক্তি নির্ধারণে পরিবেশের প্রভাব অনেকখানি। এ কথাও বলা চলে যে সহজ ভাবে চাইবার শক্তি যে হারিয়েছে—ভালোবাসা পেলেও তাকে ভালোবাসা বলে সব সময়ে বোঝা তার পক্ষে কঠিন হয়। কেউ তাকে সত্যিই ভালোবাসে এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারে না। ভালোবাসা পাবার সে অনুপযুক্ত—এমন একটি বিশ্বাসও তার মনে গড়ে ওঠে। ফলে পরবর্তীকালে ভালোবাসা পেলেও পাওয়ার দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্তি এদের কখনও হয় না।

ভালোবাসা দেওয়া

মা বাবার ভালোবাসা পেয়ে শিশু মা বাবাকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা ক্রমে ভাইবোনদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়।* এ ভালোবাসা বাৎসল্যের মত নিঃস্বার্থ না হলেও এর সামাজিক মূল্য কম নয়। শিশুকে সভ্য ও সামাজিক হতে হলে তাকে তার অনেক ইচ্ছাকে সংযত করতে শিখতে হয়, কোন কোন ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হয়। পিতামাতার ভালোবাসা পেয়ে, পিতামাতাকে ভালোবেসেই এ ত্যাগ ও সংযমের দুঃখ তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়। যে শিশু পিতামাতাকে ভালোবাসতে পারল না, শ্রদ্ধা করতে পারল না—সামাজিক শিক্ষা, নীতিশিক্ষা তার জীবনে প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকে।

অসহায়, ক্ষুদ্র জিনিসকে ভালোবাসা শিশুদের মধ্যে অল্প পরিমাণে দেখা যায়। যৌবনে বাৎসল্যের রূপটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়। বোধ হয় ঐ আবেগটি পূর্ণতালাভ করে মানুষের যৌবনের শেষদিকে বা প্রৌঢ়ত্বে। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। বাৎসল্য মেয়েদের মধ্যে যতখানি প্রবল,

* ভালোবাসায় যে বঞ্চিত ভালোবাসা দেবার শক্তিও তার সাধারণতঃ কম হয়। অনাথ শিশুদের বেলাতে এটা লক্ষ্য করা গেছে (২৭)। ভালোবাসা দিতে চাওয়ার পরিমাণের গড় সাধারণ শিশুদের বেলাতে ২২·৫ অনাথ শিশুদের ১৬·৫। কাকে তুমি ভালোবাস?—এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন রকম উত্তর পাওয়া গেছে। মা, মাস্টারমশাই, ছোট ছেলেমেয়ে (যে উত্তর দিচ্ছে—তার চেয়ে ছোট)। সাধারণ ও অনাথ শিশুদের ভালোবাসার পাত্রের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়ে শতকরা কত ভাগ এটা আমরা নির্ণয় করেছি। অনাথ শিশুদের বেলাতে ২৩, সাধারণ শিশুদের বেলাতে ৫০। আমরা প্রধানতঃ ছোটদেরই ভালোবাসি। ভালোবাসবার শক্তির অভাব বলেই অনাথ শিশুরা ভালোবাসার পাত্র হিসেবে ছোটদের কথা বেশী বলে নি। অনাথ আশ্রমে ছোট ছেলেমেয়ে অনেক আছে। ভালোবাসতে চাইলে ভালোবাসার পাত্রের অভাব তাদের হত না।

পুরুষদের মধ্যে ততখানি নয়। কারো মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স থেকেই ভালোবাসা দেবার শক্তিটি প্রবল, চিরকাল ভালোবাসা চাওয়াই কারো জীবনে প্রধান সুর। মেয়েদের রবীন্দ্রনাথ দুই ভাগে ভাগ করেছেন—মায়ের জাত ও প্রিয়ার জাত। ভালোবাসা দেবার শক্তি যাদের বেশী তারা প্রথমোক্ত দলে পড়েন; চাইবার প্রয়োজন যাদের বেশী তারা দ্বিতীয়োক্ত দলে পড়েন।

সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে দুটি প্রেরণাই থাকে। চাওয়া ও দেওয়া। দুটি আবেগ মিলে জীবনকে পরিপূর্ণ করে। চাওয়া অপূর্ণ থাকলে মানুষ অসুখী হয়। কিন্তু দিয়েই মানুষ সুখী হতে পারে।

পাওয়ায় বঞ্চিত হয়ে, দিয়ে বাঁচবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। ছেলেটির দশ বছর বয়স। সে বল্লে, মা-বাবা তাকে ভালোবাসেন না। কিন্তু সে ভালোবাসে তার ছোট বোনকে। সে যা বলছে—খবর নিয়ে জানা গেল—তার মধ্যে সত্যতা আছে। তবু কিন্তু তার ঐ দেওয়ার সুরটি সহজ নয়। যে ক্ষোভ (ও রোষ) তার মধ্যে ধূমায়িত হয়েছে তার পরিণতি কি হবে বলা কঠিন। অন্যপক্ষে যে জীবনে পাওয়া ও দেওয়া সহজ ও স্বচ্ছন্দ, সে জীবনের ভারসাম্য রাখা কষ্ট নয়।

একটি কথা অবশ্য এখানে বলা দরকার। শৈশবে যারা অত্যধিক আদর পায়, দেবার প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগে না। নিজেদের নিয়েই তারা তন্ময়। জীবনে কিছু পাওয়া ও কিছু না পাওয়ার দরকার আছে। চাইবার শক্তি কিছুটা অতৃপ্ত থাকলে সম্ভবতঃ রূপান্তরিত হয়ে তা দেবার শক্তিতে পরিণত হয়; অন্ততঃ দেবার শক্তিকে তা সমৃদ্ধ করে।

নবজাত শিশু তাকিয়ে কিছু দেখতে পারে না। দৃশ্যমান সব কিছু একাকার হয়ে তার দৃষ্টি পথে পড়ে। প্রথম দুমাসের মধ্যেই শিশু তাকিয়ে দেখতে পারে।

সামাজিক বিকাশ

মানুষ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুমাস বয়সে মানুষ দেখলে সে হাসে। পাঁচমাসের পূর্বে শিশু মানুষদের মধ্যে যে কোন পার্থক্য করছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় না। পাঁচ থেকে ছয়মাসের মধ্যে চেনা এবং অচেনা লোকদের প্রতি তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়। এ বিষয়ে অবশ্য সব শিশু এক রকম নয়। পঁচিশটি শিশু নিয়ে সার্লি একটি অনুসন্ধান করেন (২৮)। ছয়টি শিশু চার মাসের শেষের দিকে কিম্বা পাঁচ ছয় মাসে সার্লিকে দেখে ভয় পেল। অচেনা লোকদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া, কাঁদা,

শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অচেনা লোকদের কিছু সন্দেহ, কিছু ভয়—একটু বড় হলে বোধহয় অধিকাংশ শিশুই করে। ঐ সন্দেহ বা ভয়টা সার্বজনীন কিনা বলা শক্ত।

বয়স্কমুখী স্তর

শৈশবের প্রথম দিকে বড়দের উপর শিশু একান্ত নির্ভরশীল থাকে। তার সামাজিক আগ্রহের পাত্রও থাকে বড়রা। তার দশমাস বয়সে, বড়রা তাকে নিয়ে খেললে, খেলায় সে সাধ্যমত যোগ দেয়। বারোমাস বয়সে বড়দের সে কিছু কিছু অনুকরণ করে। ন'দশমাস পর্যন্ত অন্য শিশু সম্বন্ধে শিশুদের বিশেষ কৌতূহল দেখা যায় না। নয় থেকে চোদ্দ মাস বয়স পর্যন্ত অন্য শিশুদের সম্বন্ধে তার মনোভাবে বিরুদ্ধতাটাই প্রবল দেখা যায়।

বড়দের বিরুদ্ধাচরণ

দুই থেকে চার বছরের বয়সের ছেলেদের মধ্যে মাঝে মাঝে বড়দের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যায়। বড়দের কথা না শোনা, তাদের কথা অমান্য করা, জিদ ও একগুঁয়েমি—এ বয়সে স্বাভাবিক। বড়দের উপর একান্ত নির্ভরতায় তার জীবন আরম্ভ রয়। তার শৈশব এক হিসেবে সেই একান্ত নির্ভরতাকে কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টার ইতিহাস। সে প্রচেষ্টায় যে গোড়াতে কিছু বাড়াবাড়ি হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের রূপ নেবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। ঐ বিদ্রোহের কারণ কিছুটা বড়রা, এ কথা সত্য। শিশু নিজে কাজ করতে চাইলে বড়রা অনেক সময় বাধা দেন। বড়রাই তার সে কাজ করে দিতে চান। ঐ বাধা শিশুকে রুষ্ট করে। তার আত্মপ্রতিষ্ঠা বিদ্রোহাত্মক হয়ে ওঠে।

তবু বলব ঐ বয়সে শিশুর বিরুদ্ধ মনোভাবের সম্ভবতঃ ওটাই সবখানি কারণ নয়। বড়দের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ অমন বয়সের শিশুর পক্ষে কিছুটা স্বাভাবিক। ঐ বিরুদ্ধতা পরবর্তী কালে একটি সবল, শক্তিমান চরিত্র গঠনের সহায়তা করে বলে মনঃসমীক্ষকেরা দাবী করেন। বছর চারেকের পর ঐ বিরুদ্ধতার যদি হ্রাস না হয় তবে অবশ্য ভাববার কথা।

ছোটদের স্বাভাবিক অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণের প্রতি বড়দের সহনশীল মনোভাব দরকার। ঐ অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণকে কঠোরভাবে দমন করলে একটি সহজ সবল চরিত্ররূপে শিশুর গড়ে ওঠবার পথে গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে। তবে ঐ অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ যদি অস্বাভাবিকের পর্যায়ে

পড়ে, দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, তবে ভিতরের কারণটি বোঝবার চেষ্টা করা দরকার।

চোদ্দ থেকে আঠারো মাসে অন্য শিশু সম্বন্ধে শিশুদের সামাজিক মনোভাবে কিছু পরিবর্তন হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে একটি শিশু আরেকটি শিশুকে দেখে হাসছে, হয়ত একজন অন্যজনকে কিছু দিচ্ছেও। অন্য শিশু সম্বন্ধে সে কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন। দুবছর বয়সে শিশুদের দেওয়া নেওয়া অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত এবং পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ ও বৈরভাবের পরিমাণও কম নয়।

অন্য শিশুদের প্রতি সামাজিক মনোযোগ

নার্সারি স্কুলের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে আঠারো মাস বয়সে শিশুরা অধিকাংশ সময় নিজেদের মনে খেলে। অন্য শিশুদের প্রতি তারা মনোযোগ দেয় না। দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে "সমান্তরাল খেলা" খেলতে শিশুদের দেখা যায়। অর্থাৎ একই জিনিস নিয়ে পাশাপাশি বসে একই রকম খেলা তারা খেলে। কিম্বা হয়ত একজনের খেলা আরেকজন দেখে। মাঝে মাঝে পরস্পর পরস্পরকে ছোঁয়, টানে কিম্বা ধাক্কা দেয়। দুএকসময় একসঙ্গে যে তারা খেলে না এমন নয়। কিন্তু ঝোঁকটা পাশাপাশি খেলবার উপর, একসঙ্গে খেলবার উপর নয়। তিন বছরের পর থেকে কয়েকজন মিলে একসঙ্গে খেলবার সময় ক্রমশঃ বাড়ে। পাঁচ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত পাঁচ ছয় জন মিলে মাঝে মাঝে খেললেও, তিনজনের দলটি সাধারণতঃ তারা পছন্দ করে।

এ বয়সে পরস্পরের প্রতি বৈরমনোভাব যথেষ্ট থাকে। অচেনা শিশুদের প্রতি একটি শিশুর মনোভাবে অনেক সময় বিরুদ্ধতাকেই আগে দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিই। বালিগঞ্জের পার্কে একটি তিন বছরের ছেলে আরেকটি সমবয়সী ছেলেকে দেখে মন্তব্য করল, "ঐ ছেলেটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।" লেনা ইংলণ্ডের নার্সারি স্কুলে পড়ে। সে একটি বিড়াল বানিয়েছিল। সহপাঠী ফিনিয়াস্‌কে সে বললে, বিড়ালটি ফিনিয়াস্‌কে পছন্দ করে না। 'কেন' জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল, "বিড়ালটি তোমায় আগে দেখে নি কিনা!"(২৯) যাকে চেনে না, তাকে শিশুরা অপছন্দ করে।

একথা অবশ্য ঠিক, তিন চার বছর বয়সে শিশুদের সহযোগী আচরণের তুলনায় বৈর আচরণ কম। কিন্তু বৈরিতার পরিমাণ ও গুরুত্ব কোনপ্রকারেই

উপেক্ষণীয় নয়। শিশুদের অহম দুর্বল, মনের ইচ্ছা ও আবেগের উপর অহমের কর্তৃত্ব কম। বৈরমনোভাব প্রবল ও অহম দুর্বল হওয়ার ফলে শিশুদের সামাজিক জীবনে স্থৈর্য ও নিশ্চয়তার অভাব দেখা যায়। এই তারা খেলছে, এই ঝগড়া লেগে তাদের খেলা ভেঙ্গে গেল। শিশুদের খেলার স্থায়িত্ব কম। বৈরমনোভাব তার একটি কারণ। এ জন্যই এবয়সে শিশুদের খেলায় বড়দের তত্ত্বাবধান আবশ্যক।

আত্মকেন্দ্রিকতা শিশুমনের ধর্ম। দলবদ্ধ খেলাতেও শিশুদের স্বার্থপরতা বারেবারেই প্রকাশ পায়। নিজের খেলার জন্য, নিজের আনন্দের জন্য—একজন শিশুর ব্যাট দরকার, বল দরকার এবং আরও কয়েকজন শিশু দরকার। কিন্তু অন্য শিশুরা তার কাছে বল ও ব্যাটের চেয়ে অধিক বলে প্রায়ই মনে হয় না। তার খেলা ও কার্যকলাপে—তার আনন্দের জন্যই দুনিয়া—এ মনোভাবটাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। অন্য একটি শিশু ঠিক তারই মতন আর একজন, ঐ শিশুর আনন্দও তার আনন্দের মত মূল্যবান—একথা একজন শিশুর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এ বিষয়ে অবশ্য ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। কোন কোন শিশু কিছু বোঝে, আবার কেউ একেবারেই বোঝে না। দশ এগারো বছর বয়সে ছেলেদের কোন কোন ক্ষেত্রে দল গড়তে দেখা যায়। এই বয়সে দল গড়ার মধ্যে প্রতিরোধ—বিশেষতঃ একটি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রায়ই থাকে। দল পাকিয়ে ছেলেরা অনেক সময় মারামারি করে। দল গড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় তারা লিপ্ত হয়।

দশ এগারো বছর বয়সে ছেলেরা দল গড়ে খেলতে ভালোবাসে সত্য, কিন্তু দলের স্বার্থকে খুব বড় বলে মনে করতে শেখে না। নিজের আত্মকেন্দ্রিকতাকে ছাড়িয়ে মন তখনও বেশী দূর ওঠে নি। দলের কল্যাণের চেয়ে তার নিজের স্বার্থ বড়—তার কার্যকলাপে এই ভাবটাই প্রধানতঃ ফুটে ওঠে। খেলায় দলের জয় পরাজয়ের চেয়ে তার কাছে তার নিজের খেলার, নিজের কৃতিত্বের সাধারণতঃ মূল্য বেশী। ফুটবল খেলায় এরা বল পেলে পাস করতে চায় না, যতক্ষণ পারে নিজের কাছে বল রাখে। তের চোদ্দ বছরে, বয়ঃসন্ধিকালে মনের ভাবাবেগে গভীর পরিবর্তন সুরু হয়। সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ হলে এই বয়সে ছেলেদের মধ্যে সংঘ বোধ দেখা যায়। নিজেদের চেয়ে তাদের কাছে দল বড় হয়ে ওঠে। দলের জন্য স্বার্থত্যাগ, আত্মদান এ বয়সে ছেলেদের মধ্যে

বিরল নয়। দলের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যও এদের মধ্যে দেখা যায়। দলকে কেন্দ্র করে অনেক কিশোরসুলভ স্বপ্নও রচিত হয়।

সামাজিক মনোভাবে গুরুতর পার্থক্য লক্ষ্য করেই মনোবিদদের কেউ কেউ মানুষকে দুটি টাইপে ভাগ করার কথা বলেন। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। বহির্মুখীরা অন্যের সান্নিধ্য খোঁজে, অন্যের সাহচর্যে তারা স্বস্তি ও আনন্দ পায়। একা থাকতে এদের আনন্দ নেই। অন্তর্মুখীরা একা থাকতেই ভালোবাসে, অন্যদের সঙ্গ তাদের কাম্য নয়। এ শ্রেণী বিন্যাসে কিছু সত্য থাকলেও, সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী বা সম্পূর্ণ বহির্মুখীর সংখ্যা একান্ত বিরল। বেশীর ভাগ লোকই সময়ে একা থাকতে চায়, সময়ে সঙ্গ কামনা করে।

সামাজিকতায় ব্যক্তিগত পার্থক্য

অন্যের সান্নিধ্যে একজন কতখানি সহজ হতে পারছে, সাহচর্যে মন কতখানি নিজেকে মেলতে পারছে এটিও সামাজিকতার আরেকটি দিক। কিছু লোক দেখা যায়—যারা সন্দিগ্ধচিত্ত, মানুষের শুভেচ্ছায় যাদের বিশ্বাস নেই।* শৈশবে ঐ মনোভাবটি আরও বেশী দেখা যায়। অশুভকে সক্রিয়ভাবে বাধা দেবার শক্তি শিশুর কম, সেটাও বোধ হয় এর একটি কারণ।

শিশু তথা বয়স্কদের সামাজিক মনোভাবের পার্থক্যের কারণ সম্ভবতঃ কিছুটা সহজাত। কিন্তু এ মনোভাব গড়ে ওঠার ব্যাপারে তাদের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা অনেকাংশে দায়ী এ কথা মনে করবার কারণ আছে। অনুকূল পরিবেশে বাস করলে শিশু মানুষকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে শেখে। যে পরিবেশে মানুষের হাতে শিশুকে বারম্বার লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হতে হয় সে পরিবেশে বাস করে মানুষের শুভেচ্ছায় বিশ্বাস করা শিশুর পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন।

সুস্থ ও স্বাভাবিক মনোভাব ও আচরণের বিকাশের জন্য শিশুর পক্ষে অন্য শিশুদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। নার্সারি স্কুলে পড়লে এই সুযোগ শিশু লাভ করে। নার্সারি স্কুলে শিশু অন্য শিশুদের সান্নিধ্য পায়। একসঙ্গে কাজ ও খেলা করবার সুযোগ সে পায়। দেখা গেছে (৩০) নার্সারি স্কুলে পড়লে যৌথ কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা ছেলেমেয়েদের বাড়ে। নিজে অংশ গ্রহণ না করে, দূরের থেকে অন্যদের কাজ ও খেলা দেখার মনোবৃত্তিটি কমে।

অন্য শিশুদের সাহচর্যের প্রয়োজন

* এই ধরণের মনোভাব সম্বন্ধে ৯ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদের সাহচর্য তাদের কাছে সহজ, স্বচ্ছন্দ হয়। অন্যদের সম্বন্ধে সঙ্কোচ ও ভীতি, বড়দের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াবার শিশুসুলভ মনোবৃত্তি নার্সারি স্কুলের ছেলেমেয়েরা অনেকখানি কাটিয়ে ওঠে।

শিশুজীবনের ভয়, ভালোবাসা প্রভৃতি আবেগের দ্বারা তার সামাজিকতা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় একথা বলাই বাহুল্য। বড়দের কাছ থেকে শিশু কি লাভ করল শিশুর সামাজিক বিকাশে এটিও একটি বড় কথা।

পরিণত সামাজিক বোধের স্বরূপ কি এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। একটি মনের সঙ্গে বহু মনের যোগাযোগই সামাজিকতার ভিত্তিস্থল।

পরিণত সামাজিক বোধের স্বরূপ

কোন কোন মানুষ অপরের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বলে যেন কিছু নেই। অন্যের ইচ্ছায় সে চলে ; অন্যের আবেগ তাকে অভিভূত করে। উল্টোটা হচ্ছে—অন্যের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ দুঃখ ব্যক্তির কাছে কিছু নয়। নিজের মনের নিচ্ছিদ্র কারাগারে সে বাস করে। অন্য তার উপরে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। এ দুটিকেই অস্বাভাবিক বিকাশ বলব। পরিণত বিকাশ হলে পর অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ দুঃখ সম্বন্ধে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সচেতন ও সংবেদনশীল হবে। কিন্তু সে অভিভূত হবে না। অন্যের দিক ও নিজের দিক—দুদিক ভেবেই সে কি করণীয় তা স্থির করবে।

মানুষের প্রতি সহজ বিশ্বাস ও বন্ধুমনোভাব সুস্থ সামাজিক বোধের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যে সব কমপ্লেক্সের কাজ ও প্রভাব সামাজিক অপরাধ ও মানসিক রোগে দেখা যায়, তার মধ্যে ইডিপাস কমপ্লেক্সকেই মনঃসমীক্ষকেরা মূল মনে করেন।

ইডিপাস কমপ্লেক্স ও তার সমাধান

শিশু মা'কে সম্পূর্ণ নিজের করে চায়। মায়ের প্রতি তার শিশুসুলভ যৌন ইচ্ছা আছে বলেও মনঃসমীক্ষকেরা দাবী করেন। বাবা তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বাবা চলে যাক, বাবা মরে যাক—সময় সময় এমন সে ভাবে। বাবার ভালবাসাও সে আবার একান্ত করে চায়। তখন মা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে সময় তার মনে হয়, মা দূরে চলে যাক, বাবার ভালোবাসায় যেন ভাগ না বসাতে আসে। ভাই বোনদের সে ভালোবাসে, আবার তাদের নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীও সে মনে করে। এসব মানসিক সমস্যার সমাধান সহজ নয়। অধিকাংশ জীবনে ঐ সমাধানটি অসম্পূর্ণ ও

ত্রুটীপূর্ণ থেকে যায়। জীবনের প্রারম্ভে এই সমস্যা সমাধানের রূপটি শিশুর ভবিষ্যত জীবন ও তার কার্যকলাপকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে শিশু এ সমস্যার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা খুঁজে পেল না, সারাজীবন সেই অক্ষমতার জন্য তাকে খেসারত দিতে হয়। পিতামাতার প্রতি যৌন ইচ্ছা ও ঘৃণার ঊর্ধ্বে যে-জন উঠতে পারল না, মানুষের সঙ্গে সহজ প্রীতির সম্বন্ধ তার জীবনে কোন দিনই সম্ভব হয় না। অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে না পারলে মানুষ একদিকে পীড়িত বোধ করে, অপরদিকে ভবিষ্যতে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ ঘটলে তার সমাধান করাও তার পক্ষে কঠিন হয়। শৈশবজীবনের অমীমাংসিত অন্তর্দ্বন্দ্ব জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধানের স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস করে।

মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিচার করলে জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরের গুরুত্ব সর্বাধিক। মা বাবা, ভাইবোন এদের প্রত্যেকের সঙ্গে শিশুর যদি প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, সেই প্রীতির মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবের উপাদানটি যদি কম হয়—তবেই আশা করা যায় মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে।

ইডিপাস কমপ্লেক্সের সমাধান

কি করে ইডিপাস কমপ্লেক্সের মীমাংসা সম্ভব, কেমন করে পারিবারিক পরিবেশে শিশুর ভালোবাসায় বিরুদ্ধতা ও বৈরভাবটি হ্রাস করা যায়—এটি একটি গুরুতর প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর আজও আমরা জানি না। কয়েকটি কথা অবশ্য বলা যায়। শিশুর কাছ থেকে কী আমরা দাবী করব? প্রথমতঃ বাবা মা'র ভালোবাসা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে মনে মনে তার আপত্তি থাকলে চলবে না। মা বাবা তাকে ভালোবাসবেন, অন্যদেরও ভালোবাসবেন। এতে তার সহজ, এমন কি সানন্দ সম্মতি থাকবে। দ্বিতীয়তঃ তার ভালোবাসার সবখানি মাবাবা ভাই বোনদের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকলে চলবে না। ভালোবাসার একটি বড় অংশ ক্রমে ক্রমে সে যাতে পারিবারিক গণ্ডির বাইরে পাত্রান্তরিত করতে পারে, সেটা দেখা দরকার। সে তার বন্ধু-বান্ধবদের ভালোবাসবে, পাড়াপ্রতিবেশীকে ভালোবাসবে, বড় হলে স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসবে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে।

প্রথমটার কথা নিয়ে এবারে কিছু আলোচনা করব। মা ভাইকে ভালো বাসছেন। আমি যদি মনে করি তদ্বারা আমি বঞ্চিত হচ্ছি, আমার বেলায় কমে যাচ্ছে তবে ঈর্ষায় আমি দগ্ধ হব। মায়ের উপর রাগ হবে, ভাইয়ের উপর রাগ হবে। কিন্তু আমি যদি ঐ চিত্রে মনে মনে কখনও ভাই, কখনও মায়ের স্থান অধিকার

করতে পারি, তার আবেগটি অনেকাংশে অনুভব করতে পারি—তবে ভাইয়ের প্রতি মায়ের ভালোবাসা আমিও অনেকটা ভোগ করতে পারব। অমন ক্ষেত্রে আমার ঈর্ষা থাকবে না, কিছুটা প্রীতিই থাকবে। এই একাত্ম হবার শক্তি শিশুর মধ্যে বাড়ান দরকার।

এ ব্যাপারে পিতামাতার দায়িত্ব অনেকখানি। সন্তানদের একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে প্ররোচিত করা, ছেলেমেয়েদের তুলনামূলক সমালোচনা, এ সব পরিহার্য।

এক কথায় ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি বৈর ও বিরুদ্ধভাবটি যাতে না বাড়ে এটা দেখতে হবে। একাত্মতা তাহলে কঠিন হবে। ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধতাকে পিতামাতাদের কিছুটা সহজচিত্তে নিতে হবে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছুটা ঈর্ষা, কিছুটা বৈরভাব থাকবেই। তার কিছুটা প্রকাশ ও পরিতৃপ্তি দরকার। এ কথাও সত্য, একজনের উপর রাগ করবার স্বাধীনতা একেবারে না থাকলে তাকে ভালোবাসা কঠিন হয়।

দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়, শিশু যাতে পরিবারের বাইরেও কিছুকিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে ও বড়দের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পায়—সেটা দেখা দরকার। শিশুর অমন মেলামেশাকে বাবা মা'কে খুশী মনে নিতে হবে। দেখতে হবে তারা যেন আবার ঈর্ষা বোধ না করেন, শিশুকে একান্তরূপে নিজেদের করে রাখতে না চান। অন্যদের সঙ্গে শিশুর মেলামেশার কথা শুনলে কিছু কিছু মা-বাবা আশঙ্কাগ্রস্ত হন। সেই আশঙ্কা অনেকাংশে অমূলক—বাবা মা'কে এটা বুঝতে হবে। মেলামেশা করবার স্বচ্ছন্দ সুযোগ পেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর আবেগ কিছু পরিমাণে পাত্রান্তরিত হবে।

ন্যায় অন্যায় বোধ, উচিত অনুচিত জ্ঞান, নৈতিক আদর্শ এ সমস্ত একান্ত শৈশবে শিশুদের থাকে না। অন্যায় কাজ থেকে তারা বিরত থাকে শাস্তির ভয়ে, মা'বাবার ভালোবাসা হারাবার আশঙ্কায়। এক বছর বয়সে এ ভয়ও তাদের আছে বলে মনে হয় না। প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের তাড়নাই তাদের জীবনে, তখন প্রায় একমাত্র সত্য। দুবছর বয়সে নৈতিক ভয়ের কিছু প্রভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একটি ঘটনা উল্লেখ করি। মা'বাবার সঙ্গে একটি ছেলে অন্য

নৈতিক বিকাশ*

* নৈতিক বিকাশে সহানুভূতির স্থান সম্বন্ধে—আমরা একাত্মতা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

বাড়ীতে বেড়াতে গেছে। তারা তাকে একটি বল দিয়েছে খেলা করবার জন্য। যাবার সময় শিশুটি বারে বারে উচ্চারণ করছে, "বল নেয় না, বল নেয় না।" কয়েকদিন আগে বল নিয়ে যাবার চেষ্টা করে মা'বাবার কাছে সে বকুনি খেয়েছিল। এইবারে সে তাই ঐ কথা বারম্বার উচ্চারণ করে নিজেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছে।

নৈতিক ভয়টা গোড়াতে বাইরেরই থাকে।

বোধ হয় দু'এক বছর বয়স থেকেই নীতিবোধটা ছেলেমেয়েরা বড়দের কাছ থেকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। চার পাঁচ বছরে এটি একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণরূপ নেয়। শিশুর কাছে যেটা বাইরের অনুশাসন ছিল—সেটা তার অন্তরের অনুশাসন হয়ে দাঁড়ায়।

নীতির অন্তঃক্ষেপ

ছোটদের বড়রা যা মনে করে, ছোটরা নিজেদের প্রধানতঃ তাই মনে করে। বড়রা ভালো বললে ছোটরা নিজেদের ভালো ভাবে। বড়দের নিন্দা শুনলে ছোটরা নিজেদের মন্দ মনে করে। বড়দের চক্ষে কোন কাজ করা উচিত, কোন কাজ করা উচিত নয় তা থেকে ছোটদের উচিত অনুচিতের ধারণা জন্মে। এইভাবে ছোটরা তাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা, উচিত অনুচিত জ্ঞান প্রভৃতি বড়দের কাছ থেকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয়। এই ভিতরে নিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিকে অন্তঃক্ষেপ বলা হয়। মনের যে অংশে এই আবেগ ও ধারণা সঞ্চিত হয় তাকে নৈতিক ভাবগ্রন্থি বা অধিঅহম্ বলা চলে। গোড়াতে মা-বাবার কাছে শুনে শিশু নিজেকে ভালোমন্দ মনে করত। অধিঅহম্ ও বিবেক গড়ে ওঠবার পর, সে বিবেকের কাছ থেকে শোনে সে ভালো কি মন্দ। উচিত অনুচিত সম্বন্ধেও একথা বলা চলে।

মা-বাবার আদর্শ, বড়দের আদর্শ ছোটদের প্রভাবিত করে। তাছাড়া ছোটরা মাবাবা ও বড়দের দেখতে পাচ্ছে। এই দেখার মধ্যেও কিছুটা সত্য, কিছুটা কল্পনা থাকে। মাবাবা ও বড়দের ছোটরা যে ভাবে দেখে, যে ভাবে বোঝে তাকে ভিত্তি করে ছোটদের নৈতিক আদর্শ গড়ে ওঠে। এই যে আদর্শবাদ—মনের নৈতিক অংশের এটিও একটি দিক।

শৈশবের নীতিশিক্ষার দ্বারা শিশুর বিবেক ও অধিঅহম্ গঠিত হয়।*

---

* অধিঅহম্ প্রধানতঃ নির্জ্ঞান। বিবেককে অধিঅহমের সচেতন অংশ বলা হয়েছে। বিবেক মানসিক সংগঠনের অংশ। সেজন্য তাকে সচেতন না বলে বলা যেতে পারে যে সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে বিবেকের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

বিবেকের দুটি রূপ সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষকেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দুই রকম পিতামাতা তাদের শিক্ষার দ্বারা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দুইপ্রকার বিবেক গড়ে তোলেন। এক দল পিতামাতা ছেলেমেয়েদের অন্যায় করতে—করবার সময় কিম্বা করবার আগে—বাধা দেন না। অন্যায় করলে পর তারা ছেলেমেয়েদের শাস্তি দেন। অপর দল মা-বাবা ছেলেমেয়েদের অন্যায় করবার আগেই তাদের সংযত ও বিরত করেন। প্রথম দল ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি নিপীড়ক বিবেক গড়ে ওঠে। অন্যায় থেকে বিরত করা নিপীড়ক বিবেকের লক্ষ্য নয়, শাস্তি দান তার লক্ষ্য। এই জাতীয় বিকৃত বিবেকের দ্বারা যারা চালিত হয়, 'অন্যায় করব, শাস্তি নেব'—এই হয় তাদের জীবনের ছন্দ। দ্বিতীয় দল ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নিবারক বিবেক গড়ে উঠে। তার প্রভাবাধীনে যেখানে সংযম আবশ্যক, সেখানে তারা সংযত আচরণ করে।

ভালোমন্দ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। কাজটা উচিত, কাজটা অনুচিত—নৈতিকবোধের গোড়াকার রূপটা ঐ রকমের। এই উচিত, অনুচিতের মধ্যে কোন 'কেন' নেই। কেন উচিত, কেন অনুচিত এ প্রশ্নটি একটু বড় হলে মনে আসে। সে প্রশ্নের উত্তরও মনে মনে তারা খাড়া করে। এ কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ন্যায়-অন্যায়বোধের যুক্তি অনেক সময় বড়দের কাছেও স্পষ্ট নয়। এমন কি, কেন ন্যায়, কেন অন্যায়, এমন প্রশ্ন করাকেও অনেকে অন্যায় মনে করেন। ন্যায়-অন্যায়বোধ এদের জীবনে আদিম ও সনাতন রূপ নিয়ে এদের ভাব ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

যুক্তি-আশ্রিত নীতিবোধের সঙ্গে জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ছয় থেকে আট বছরের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হল, "নকল করা বা ঠকানো সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?" অল্পশিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ বল্ল, 'ঠকানো খারাপ।' 'ঠকানো মিথ্যেকথা বলা।' 'ঠকানো, নকল করা নিষিদ্ধ।' শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ বলল—'ঠকিয়ে লাভ হয় না।' 'ঠকিয়ে, নকল করে শেখা যায় না।' (৩১)

কেউ অন্যায় করলে তার কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধেও শিশুদের ধারণার ক্রমপরিণতি ঘটে। 'কেউ কারো জিনিস ভাঙ্গলে, কি করা উচিত' এ প্রশ্নের উত্তরে অল্পশিক্ষিত ঘরের ছয় থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশের

উত্তর হল, "তাকে মারা উচিত।" আট থেকে এগারো বছরের বেশীর ভাগই বল্ল, "তার ক্ষতিপূরণ করা উচিত।" শিক্ষিত ঘরের ছয় থেকে এগারো বয়সের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই বল্ল, "ক্ষতিপূরণ করা উচিত।"

বিনে'র ধারণা—স্বাভাবিক বিকাশ যাদের হয়েছে এমন ছেলেমেয়েরা আট বছর বয়সে বলে, কারো জিনিস ভেঙ্গে ফেলে থাকলে আমি কিনে দেব, কিম্বা তার কাছে মাপ চাইব।

শিশুজীবনের কার্যকলাপ প্রধানতঃ সুখ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে ফ্রয়েড মনে করেন।** সে সুখ পেতে চায় এবং কষ্টকে এড়াতে চায়। কোন কিছু করবার ইচ্ছা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। দেহমনের স্বকীয় প্রেরণা বশে এই ইচ্ছা সময় সময় খুব বেড়ে ওঠে। যেমন, ক্ষুধা। উদ্দীপকের উপস্থিতিও এই ইচ্ছাকে অনেক সময় বাড়িয়ে তোলে। উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত ইচ্ছা পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। পরিতৃপ্ত না হলে অপরিতৃপ্ত উত্তেজনা কষ্টের কারণ হয়। অন্য পক্ষে ইচ্ছার পরিতৃপ্তিকে সুখ বলা চলে। যেমন অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা কষ্ট, ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সুখ দেয়।

সুখ ও বাস্তব *

চাওয়া ও না-পাওয়ার এই উত্তেজনাকে কষ্ট এবং উত্তেজনা হ্রাসকে সুখ বলা হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বোধ হয় একটি কথা যোগ করা দরকার। যৌন-আচরণের প্রাথমিক সুখকর কার্যকলাপ (যেমন চুম্বন প্রভৃতি)—যৌন উত্তেজনা বাড়ায়। তবু সে কার্যকলাপ একটি স্তর পর্য্যন্ত সুখকর। খাওয়া পাওয়া যাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকলে অল্প ক্ষুধা মাঝে মাঝে আমরা উপভোগ করি। ইচ্ছা ও উত্তেজনা যখন বেশী হয় এবং পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা যেখানে অনিশ্চিত—কষ্ট সেখানে অনিবার্য।

---

* সহজাত প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লিখিত দুটি অধ্যায় পড়বার পর এ অংশটি পড়লে এটি বোঝা সহজ হবে।

** 'Beyond the Pleasure Principle' বইখানিতে আরেকটি মৌলিক নীতির কথা ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন। জীবের মধ্যে পুনরাবৃত্তির একটি বাধ্যতামূলক প্রেরণা বা নীতি রয়েছে। অসুখকর অতীত অভিজ্ঞতা বারবার মনে ফিরে আসে—স্বপ্নে ও স্মৃতিতে। আচরণেও অমন পুনরাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পুনরাবৃত্তির দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনা হয়। তবু আশ্চার্য ঐ পুনরাবৃত্তিকে এড়ান মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। পুনরাবৃত্তির প্রেরণা অমন ক্ষেত্রে সুখনীতিকে অভিভূত করে স্বপ্রকাশ হয়েছে এমন বলা চলে। (৩২)

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিশুর ধারণা নেই ও অপরিতৃপ্তি সহ্য করবার শক্তি শিশুর অল্প। শিশু এজন্য সুখনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই বাস্তব বোধ তার মধ্যে বাড়ে। সে বুঝতে শেখে, যা চাওয়া যায় তাই তখুনি পাওয়া যায় না। অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া শুধু চাইলেই পাওয়া যায় না। চাওয়া, চেষ্টা করা ও তারপর পাওয়া—এ নীতিও ধীরে ধীরে শিশুকে শিখতে হয়। কিছু কিছু ইচ্ছার পরিতৃপ্তির আশা ত্যাগ করাই ভালো। কোন কোন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি বিপদ ও বেদনাসঙ্কুল। শিশুর বৈর ইচ্ছা সম্বন্ধে ঐ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারো উপর রাগ হলে, কাউকে মারতে চাইলেই তাকে মারা যায় না—বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশু তা শেখে। বলা বাহুল্য বাস্তবনীতি সুখনীতির অস্বীকৃতি নয়, সুখনীতির আবশ্যকীয় সংস্কার।

জীবনের কার্যকলাপের বিভিন্ন মানসিক পরিণতি সম্বন্ধে ম্যাকডুগাল যা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তির দ্বারা সুখ বা আরাম পাওয়া যায়। যে ইচ্ছা এক বা একাধিক ভাবগ্রন্থি থেকে ওঠে, সে ইচ্ছার পরিতৃপ্তি আনন্দ দেয়। সুখ বা আরাম মনের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্পন্দন; আনন্দে মনের একটি বড় অংশ সাড়া দেয়। আরামে যদি তীব্রতা থাকে, আনন্দে তীব্রতা ছাড়াও ব্যাপকতা আছে। আনন্দে একাধিক আবেগ তৃপ্ত হয়। সুখিত্ব কোন সাময়িক ঘটনা বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। এটা গোটা ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জড়িত। এটি একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মনোভাব। নিজের সুখ বা আরাম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সহজ। কিন্তু নিজের সুখিত্বকে নিজের থেকে আলাদা করে দেখা সহজ নয়। সুখিত্বকে ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য বলা চলে। "সুসংগঠিত ও একীভূত একটি ব্যক্তিত্বের সমস্ত ভাবগ্রন্থির পরস্পর সুসঙ্গত (harmonious) কার্যের ফলে সুখিত্বের উদ্ভব হয়।" (৩৩) 'সুসঙ্গত কার্য' কথাটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ব্যক্তিত্বের তিনটি অংশের প্রতি ফ্রয়েড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—অহম, ইদম ও অধিঅহম। অহম হচ্ছে আমি—যে দেখছে-শুনছে, চলছে-ফিরছে। একদিকে রয়েছে আমার নিজের ইচ্ছা ও অপরদিকে বাস্তব পরিবেশ। আমার ইচ্ছা, বিশেষতঃ অসামাজিক ইচ্ছা-সমূহ হচ্ছে ইদম। ইদম বলার কারণ—এসব ইচ্ছা আমাকে প্রভাবিত, সময় সময় অভিভূত করে এ কথা সত্য হলেও এদের নিজের বলে স্বীকার করতে সবসময়ে

সুখ, আনন্দ ও সুখিত্ব

আমি রাজী নই। এর উপর আছে আমার নীতিজ্ঞান ও আদর্শ। অধিঅহম আমার আদর্শ ও নীতিজ্ঞানকে ধরে রেখেছে। এ তিনের বিরোধ কিছু না কিছু সব জীবনেই রয়েছে। যেখানে বিরোধ প্রবল, মন সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত, অসুখী ও দুর্বল। যেখানে মনের এই তিনটি অংশে একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য সম্ভব হয়েছে—সেখানে ব্যক্তিত্ব সুসংগঠিত ও মানুষ সুখী। সে জীবনকে বলা বলে—স্বর্গ ও মর্ত দুইয়ের সঙ্গেই তার মৈত্রী সম্ভব হয়েছে।

—খ—

বয়ঃসন্ধিকাল

বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। দেহ মনের দ্রুত, বহুমুখী বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্তররূপে বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্ব অনেকখানি। কোন কোন দিক দিয়ে এ অতি বিষম কাল। ষ্ট্যানলি হল (১এ) এ বয়সটিকে মানসিক ঝড়ঝাপটার সময় বলে অভিহিত করেছেন। বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে নানা জায়গায় কিছু কিছু উল্লেখ করলেও—শিক্ষার দিক থেকে স্তরটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এর বিভিন্ন দিকগুলিকে গুছিয়ে পাঠক পাঠিকাবর্গের কাছে উপস্থিত করা সমীচীন মনে করছি।

কোন বয়সকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হবে, এ বিষয়ে মনোবিদ্‌গণ সবাই একমত নন। তদুপরি এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যও রয়েছে।

বয়ঃসন্ধিকালের বয়স

ইউরোপে সাধারণতঃ ছেলেদের চোদ্দ-পনেরো থেকে উনিশ, মেয়েদের তেরো-চোদ্দ থেকে আঠারো বছরকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। জননসামর্থ্যের বিকাশকে বয়ঃসন্ধিকাল আরম্ভের চিহ্ন বলা যেতে পারে ; মেয়েদের বেলাতে ঋতু, ছেলেদের বেলাতে লিঙ্গের উপরিভাগে লোম জন্মানো, স্বরভঙ্গ এবং স্বপ্নদোষের সূত্রপাতের দ্বারা ঐ বিকাশ হয়েছে এটা বোঝা যায়। এ দেশে সম্ভবতঃ এক আধ বছর আগে বয়ঃসন্ধিকাল আরম্ভ ও শেষ হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক পরিবর্তনের আগেই প্রাসঙ্গিক মানসিক পরিবর্তন আরম্ভ হয় বলে জোনস (১) চোদ্দ বছরের পরিবর্তে বারো বছরেই বয়ঃসন্ধিকাল সুরু হয় বলে ধরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ সাড়ে তেরো বছরে মেয়েদের ঋতু আরম্ভ হয়।

বয়ঃসন্ধিকালকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে কৈশোর ও নবযৌবন। এদেশের ছেলেদের বারো, তেরো থেকে পনেরো কৈশোর, ষোল থেকে উনিশকে নবযৌবন ধরা যেতে পারে। মেয়েদের বেলাতে একআধ বছর আগে কৈশোর শেষ ও নবযৌবন আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত পার্থক্যের পরিমাণ অনেকখানি—এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বয়ঃসন্ধিকাল কৈশোর ও নবযৌবন

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের দেহমনে জোয়ার আসে। দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি, যৌন শক্তির বিকাশ, আবেগ-জীবনের পরিবর্তন ও বিস্তারকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। এ বয়সে ছেলেমেয়েরা বিশেষভাবে আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে। ঐ আত্মচেতনার সুরটি সবদিক দিয়েই যে খুব প্রীতিকর এমন নয়। এ সময় নিজেদের কাছে এবং অন্যদের কাছেও ছেলেমেয়েরা কিছুটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

বঁয়ঃসন্ধিকালের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

কারো কারো মধ্যে নূতন নূতন আগ্রহ দেখা যায়। এ বয়সে আগ্রহের মধ্যে কিছুটা স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। ছোটদের আগ্রহের মত সেগুলির নিত্য পরিবর্তন ঘটে না। সাধারণতঃ তেরো চোদ্দ বছরে বিশেষ সামর্থ্য ও প্রতিভা বিকশিত হয়, এ কথা আমরা জানি। বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার কে কোন ধারা গ্রহণ করবে—বিজ্ঞান না টেকনিক্যাল, কৃষি না কমার্স—সে জন্যই এই বয়সেই সে সব স্থির করা হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষতঃ নবযৌবনে—প্রেমের, রহস্যের, সৌন্দর্যের ডাক অনেকে বিশেষভাবে শুনতে পায়। ইঁট, কাঠ, লোহা তাদের প্রাণের তাগিদ মেটাতে পারে না। জীবনের গভীর অর্থ কি—এ জিজ্ঞাসা তাদের মনে আসে। ধর্ম সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন কারো কারো মধ্যে দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আদর্শবাদ বা আইডিয়্যালিজমের ঢেউ আসে। আদর্শের জন্য আত্মদান করা এ বয়সে বিরল নয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের অনেকেরই বয়স কুড়ি পেরোয়নি।

'মিস্টিক' অনুভূতি ও আইডিয়্যালিজম

সংঘবোধ, সংঘের সদস্য হবার প্রেরণাটি এ বয়সে বড় হয়। সংঘের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে এক করে দেখা, নিজের স্বার্থ থেকে সংঘের স্বার্থকে বড় করে দেখা—এ বয়সেই বেশী দেখা যায়। নিজেকে যখন একান্ত অকিঞ্চিৎকর

বলে মনে হয়, সংঘের মধ্য দিয়ে নিজের মূল্য উপলব্ধি করার প্রয়োজন তখন দেখা দেয়।

নিজেদের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাসও বয়ঃসন্ধিকালে প্রবল হয়। হীনমন্যতায় এ বয়সেই ছেলেমেয়েরা বেশী ভোগে। আবার এরাই কখনও কখনও নিজেকে অনন্য ও অসাধারণ মনে করে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের অনেকের মানসিক জীবনে ভারসাম্যের গুরুতর অভাব দেখা যায়। বলা যেতে পারে, 'এদের মেজাজ বোঝা ভার'। আজ যে উল্লসিত কাল সে বিষাদাচ্ছন্ন। আপাতদৃষ্টিতে উল্লাস বা বিষাদ দুয়েরই কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুচ্ছ।

বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির কথা কিছু কিছু আমরা বললাম। এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে আসে—বয়ঃসন্ধিকালের মূল কথা কি? মূল কথা—দুটি। প্রথমে বলতে হয়, এই বয়সে ছেলেমেয়েদের যৌনশক্তি পূর্ণতা লাভ করে। দেহের ক্ষেত্রে এবং মনের ক্ষেত্রে। যৌন গ্লাণ্ডসমূহের বিশেষ কাজ আরম্ভ হয়। মেয়েদের ঋতু আরম্ভ হয়, বক্ষঃস্থল স্ফীত হয় এবং গর্ভধারণের ক্ষমতা জন্মায়। ছেলেদের মধ্যে শুক্র নিঃসরণের ক্ষমতা দেখা যায়। গলার স্বর ভারী হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের মূলকথা
(ক) যৌন বিকাশ

দেহের সাধারণ বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে যৌন বিকাশ জড়িত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা লম্বা হয়, এ কথা আমরা জানি। দশ এগারো বছর বয়সে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হারটি কমে আসে। বয়ঃসন্ধিকালে সে হারটি আবার বাড়ে। তবে দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির হার শৈশবের গোড়ার দিকে যতখানি, বয়ঃসন্ধিকালে ততখানি নয়—এ কথাও যোগ করা দরকার। দৈর্ঘ্যের চেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে বাড়ে ছেলেমেয়েদের ওজন। যে সব মেয়েদের ঋতু অপেক্ষাকৃত আগে আরম্ভ হয়, তারা আগে লম্বাও হয়—এমন দেখা গেছে। (৩)

যৌন বিকাশ ও দেহের সাধারণ বৃদ্ধি

যৌন শক্তির মানসিক দিকের কথা এবারে বলি। যৌন ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই মানসিক যৌন জীবন। যৌন ইচ্ছা কথাটিকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে, এ কথা যৌন শিক্ষা ও প্রেম অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি।

শিশুর যৌন জীবনের তিনটি স্তর সম্বন্ধে আমরা পূর্বেকার অধ্যায়ে

আলোচনা করেছি। আত্মকাম, সমকাম ও বিপরীত কাম—শিশুজীবনের যৌন-বিকাশের ঐ তিনটি ধারা বয়ঃসন্ধিকালেও দেখা যায়।

বয়ঃসন্ধিকাল শৈশব জীবনের পুনরাবৃত্তি

আত্মকামের কথা প্রথমে বলি। ছেলেমেয়েরা এ বয়সে নিজেদের দেহ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। আয়নায় নিজেদের দেখতে তারা ভালোবাসে। সাজসজ্জা ও প্রসাধনে নিজেদের রমণীয় করে তোলবার জন্য মেয়েরা চেষ্টা করে। যাতে নিজেদের ভালো দেখায়, ছেলেরাও সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়। ব্যায়াম ও দেহচর্চায় ছেলেরা কেউ কেউ মন দেয়।

আত্মকাম

নিজেদের দৈহিক ক্রটী সম্বন্ধে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা তীব্রভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। 'আমি দেখতে ভালো নই', 'আমি কালো', 'আমি ঢেঙ্গা', 'আমি বেঁটে', এসব ভেবে ভেবে নিজেদের তারা হীন ও পীড়িত বোধ করে। অনেক সময়ই দেখা যায় নিজেদের তারা যতটা কুশ্রী মনে করছে, অন্যেরা তাদের ততখানি কুশ্রী মনে করে না। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে নিজেদের ধারণাটাকেই তারা বড় করে দেখে। অন্যদের কথা, অন্যদের মতামত তাদের অন্তঃস্তলে ঠিক পৌঁছায় না।

আত্মদ্বেষ ও হীনমন্যতা

নিজেদের যৌন অঙ্গের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে এদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা যায়। 'আমার জনন ইন্দ্রিয় অত্যধিক ছোট' এমন পীড়াদায়ক চিন্তা বারে বারে ছেলেমেয়েদের মনে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এদের ধারণা ভ্রান্তিপ্রসূত। কিন্তু এসব ব্যাপারে সত্য কথা জানবার সুযোগ ছেলেমেয়েদের কমই হয়। সাধারণতঃ জনন ইন্দ্রিয় কতটা বড় হয়, এ কথা তাদের বলা হয় না। ফলে ঐ ভ্রান্ত ধারণা চিরদিনই তাদের মনে থেকে যায়। ঐ ব্যাপারে নিজেদের হীন মনে করে তারা কিছুটা কষ্ট পায়।

যৌনশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস হীনমন্যতার একটি কারণ

এ বয়সে ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু হস্তমৈথুন করে। হস্তমৈথুন অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গম ইচ্ছার বিকল্প পরিতৃপ্তি। ছেলেমেয়েদের হস্তমৈথুনের প্রতি মাবাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কি মনোভাব ও আচরণ অবলম্বন করা উচিত—সে সম্বন্ধে যৌন শিক্ষা অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। ছেলেমেয়েদের—যৌন শিক্ষার দরকার সম্বন্ধেও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেবলমাত্র দেহ নয় নিজেদের মানসিক শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধেও এই বয়সে

ছেলেমেয়েরা বিশেষ সচেতন হয়। কারো মধ্যে নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে বড় বেশী উচ্চ ধারণা, কারো মধ্যে হীনমন্যতাটাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য বেশীর ভাগের মধ্যে থাকে একসময়ে অহমিকা ও অন্ধ আত্মবিশ্বাস, অন্য সময়ে হীনতা ও নিজের সম্বন্ধে অবিশ্বাস। হীনমন্যতার একটি দৃষ্টান্ত ভ্যালেন্টিন (৪) উল্লেখ করেছেন। মেয়েটির লেখা থেকে জানা যায়—ঐ বয়সে নিজের নির্বুদ্ধিতা ও হীনতা সম্বন্ধে সে বিশেষ চিন্তামগ্ন থাকত, ব্যর্থতাবোধ তার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু অনতিকাল পরে ঐ মেয়েটিই বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হল। ঐ বয়সে হীনতাবোধ বহুল পরিমাণেই অহেতুক বা কল্পিত।

নিজেদের মানসিক সামর্থ্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও হীনমন্যতা

উপরোক্ত সবটাই আত্মপ্রেমের বর্ণনা নয়। কিছু কিছু বর্ণনায় আত্মদ্বেষেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সব ঘটনাতেই ভাবনার কেন্দ্র প্রধানতঃ নিজে। তবে একথাও যোগ করা দরকার কেবলমাত্র নিজের জন্য মানুষ নিজেকে সাজায় না, অন্যের প্রশংসা লাভ করার জন্য, অন্যকে আকর্ষণ করবার জন্যও মানুষের সাজসজ্জা। সাজসজ্জা ও প্রসাধনের দ্বারা মানুষ নিজেকে ভালোবাসে—তার পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যের প্রশংসা ও ভালোবাসা চায়—তারও পরিচয় তাতে রয়েছে।

সমকাম ও সমপ্রেমের ইচ্ছাটি বয়ঃসন্ধিকালে প্রবল হয়। একথা কিশোর কিশোরীদের বেলাতে বিশেষভাবে সত্য। ঐ বয়সে ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের বিশেষ আমল দেয় না। ছেলেদের প্রতি মেয়েদের এবং মেয়েদের প্রতি ছেলেদের কিছুটা বিদ্বেষই দেখা যায়। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবটাই প্রবল থাকে। এটা কিছু পরিমাণে বিকাশের স্বাভাবিক স্তর হলেও এই ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্ব রয়েছে। যে সব ছেলে বা মেয়ে আলাদা আলাদা বোর্ডিংয়ে থাকে, ছেলেদের এবং মেয়েদের মধ্যে মেশবার সুযোগ যেখানে কম, সমকাম ও সমপ্রেমের আধিক্য সেখানে বেশী দেখা যায়। সহশিক্ষার ব্যবস্থা যে সব জায়গায় রয়েছে, সমপ্রেমের ইচ্ছাটি সে সব ক্ষেত্রে তত প্রবল নয়। ভ্যালেন্টিনের (৫) একটি অনুসন্ধান এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন

সমকাম

সমকামে পরিবেশের প্রভাব

শিক্ষিকাদের প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষণ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু সহশিক্ষালয়ে যারা পড়ত তেমন মেয়েদের শতকরা ২৫ জন ঐ জাতীয় প্রবল আকর্ষণের কথা বলেছে।

মেয়েদের সমকামের বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয়তা

মেয়েরা আকর্ষণ অনুভব করে সাধারণতঃ তাদের কোন একজন শিক্ষিকার প্রতি। উপরের ক্লাসের একটি বড় মেয়ে তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রী হয়েছে—এমনও অনেক সময় দেখা যায়। তাকে দেখবার জন্য তারা আকুল থাকে, তাকে দেখলে তার কথা শুনলে, তার স্পর্শ লাভ করলে তাদের রোমাঞ্চ হয়, তার কথামত কাজ করতে পারলে নিজেদের তারা ধন্য মনে করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমকাম ইচ্ছার রূপটি কিশোরীদের কাছে অস্পষ্ট থাকে। কেবলমাত্র কোন একটি পাত্রীর প্রতি একটি রহস্যময়, দুর্নিবার আকর্ষণ তারা অনুভব করে। তবে বোর্ডিংয়ে যারা থাকে তাদের কারো কারো মধ্যে দৈহিক সমকাম আচরণও ঘটে।

ছেলেদের সমকাম প্রধানতঃ সক্রিয়

মেয়েদের বেলাতে সমকাম ইচ্ছার রূপটি প্রধানতঃ নিষ্ক্রিয় হলেও ছেলেদের মধ্যে সমকাম ইচ্ছার রূপটি সাধারণতঃ সক্রিয় হয়—এরূপ ভ্যালেন্টিনের (৬) অভিজ্ঞতা। মোটামুটি এ কথা ঠিকই। সমকাম অনেকক্ষেত্রে বিপরীত কামের বিকল্প পরিতৃপ্তি। অমন ক্ষেত্রে মেয়েরা নিষ্ক্রিয় সমকাম এবং ছেলেরা সক্রিয় সমকামের পথ বেছে নেবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। তবে ছেলেদের মধ্যেও এ বয়সে কিছু কিছু নিষ্ক্রিয় সমকামের প্রেরণা দেখা যায়। (মেয়েদের মধ্যেও সক্রিয় সমকামের)। রাজনৈতিক দলের দাদাদের প্রতি ছেলেদের অনুরক্তি ও আনুগত্যের কথা আমরা অনেকেই জানি। তাছাড়া এও সত্য যেখানে সক্রিয় সমকাম ইচ্ছা রয়েছে, সেখানে নিষ্ক্রিয় সমকাম ইচ্ছাও রয়েছে। সময় সময় একটি প্রকাশমান থাকে, অপরটি থাকে মনের গভীরে অবদমিত।

বীরপূজা

বীরপূজা বিশেষতঃ এবয়সেরই ধর্ম। মহান কাউকে দেখলে, আরও সঠিক-ভাবে বলতে গেলে, কাউকে মহান মনে হলে, তার প্রতি একটি গভীর আকর্ষণ ছেলেমেয়েরা অনুভব করে। তাকে মনে মনে পূজা, তার প্রতি আনুগত্য ছেলেমেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বীরপূজার ভালো মন্দ দুদিকই আছে। প্রকৃত মহৎ লোকের প্রেরণা কোন কোন ছেলেমেয়েদের জীবনে অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে থাকে। অসাধু লোকের পাল্লায় পড়ে ছেলেমেয়েদের অনেক সময় অনেক ক্ষতি হয় এমনও দেখা গেছে।

বয়ঃসন্ধিকালের শেষের দিকে—নবযৌবনে—মেয়েদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ, ছেলেদের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণের শক্তি কমে আসে। ছেলেরা তখন আকৃষ্ট হয় মেয়েদের প্রতি, মেয়েরা, ছেলেদের প্রতি।

বিপরীত কাম

পাত্রান্তরণ

শৈশবে ছেলেমেয়েরা মাবাবাকেই প্রধানতঃ ভালোবাসে, আপন মনে করে। বয়ঃসন্ধিকালে গৃহের পরিধির বাইরে ভালোবাসার পাত্রপাত্রী খুঁজে বার করবার প্রেরণা তাদের মধ্যে দেখা যায়। বাইরের লোক—কোন বন্ধু বা কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের পরম আপন হয়ে ওঠেন। একে ভালোবাসার পাত্রান্তর বলা যায়। পাত্রান্তরণের প্রেরণা কৈশোর ও নবযৌবনে প্রবল হয়।

ভালোবাসার দেওয়ার প্রেরণা

ভালোবাসার রূপও কিছুটা বদলায়, এ কথা অনেকক্ষেত্রে সত্য। ভালোবাসা চাওয়া ও পাওয়া দিয়ে যে জীবন আরম্ভ —দেওয়ার প্রেরণাও ঐ বয়সে সে কিছুটা অনুভব করে।

পিতামাতার উপর নির্ভরতায় শিশুরা বড় হয়। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুসুলভ নির্ভরতা ঘুচিয়ে, বয়স্করূপে নিজেদের তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বয়ঃসন্ধিকালের এটাই আরেকটি মূলকথা। তারা আর শিশু নয়, তারা বড়। বড়দের স্বাধীনতা ও অধিকার তারা চায়, বয়স্কদের মর্যাদা তারা দাবী করে। একদা যে শিশু ছিল, আজ সে পিতামাতা হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ছেলেমেয়েদের এই নবজাগ্রত মর্যাদাবোধের মর্ম তাদের পিতামাতারা সব সময়ে বুঝতে পারেন না। তাদের মর্যাদালাভের ইচ্ছার গভীরতা অনেক সময়ই মাবাবা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। যাদের তারা একদিন ছোট দেখেছেন, চিরদিনই তাদের তারা ছোট দেখেন। দেখতে চান বলেই দেখেন, এ কথাও বোধ হয় বলা চলে। ছোটরা চিরদিন ছোট থাকুক, তারা আমাদের উপর নির্ভর করুক, তারা আমাদের ভালোবাসা, আদর যত্ন চাক, আমরা তাদের ভালবাসি, আদর যত্ন করি—এমন ধরণের একটি ইচ্ছা বড়দের অনেকের মধ্যে আছে। যে ত্যাগ ও সংযমের শক্তি থাকলে মানুষ সরে দাঁড়িয়ে অন্যের জন্য জায়গা করে দিতে পারে, সে শক্তি সব মানুষের মধ্যে সমভাবে থাকে না। ফলে ঘটে পারিবারিক সংঘর্ষ। ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী রূপান্তরিত হয় বিদ্রোহে। ছেলেমেয়েদের এ বিদ্রোহ

বয়ঃসন্ধির মূলকথা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বয়স্কদের মর্যাদালাভ

সবটাই যে বড়দের বিরুদ্ধে এ কথা সত্য নয়। যে মন স্বাধীনতা চায়, প্রতিষ্ঠা চায়, সেই মনের একাংশই আবার নির্ভরতাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। নিজের মনের বাধা অতিক্রম করে, আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী যখন তারা জানায়, সেই দাবীর স্বরটি তখন উচ্চ ও উত্তেজিত শোনায়। ছেলেদের মর্যাদালাভের দাবীর একটি দৃষ্টান্ত দিই। কলকাতার একটি স্কুল। স্কুলের ইউনিফর্ম ছিল সার্ট ও হাফপ্যান্ট। একাদশ শ্রেণীর ছেলেরা দাবী করলো, আমরা হাফপ্যান্ট পরব না, ফুলপ্যান্ট পরে ইস্কুলে আসব। আমরা বড় হয়েছি। স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা ছোট, কিন্তু একাদশ শ্রেণীর ছেলেরা নিজেদের মনে করে বড়। সুতরাং এমন দাবী তাদের পক্ষে করা খুবই স্বাভাবিক।

যৌনইচ্ছার অপরিতৃপ্তি ও বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা

যৌনশক্তি বঃসান্ধিকালের শেষের দিকে পরিপূর্ণতা লাভ করলেও এ সামাজিক পরিবেশে যৌন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। এ দেশে অল্প বয়সে যখন বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন তা সম্ভব হলেও হতে পারত। কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে বিবাহ-পূর্ব যৌনসঙ্গমে কোন বাধা নেই। ঐ সব সমাজে কিশোর কিশোরী, নবযুবক-যুবতীদের আবেগ জীবন ততখানি সমস্যাসঙ্কুল নয় বলে কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমস্যার অমন সহজ সমাধান আমাদের সমাজে সম্ভব নয়। তবে নিজেদের যৌন ইচ্ছা ও সময় সময় যৌন আচরণের জন্য ছেলেমেয়েরা যেন অপরাধবোধে না ভোগে, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ কথা বলা আবশ্যক—বয়ঃসন্ধিকালের উদ্বেগ, অস্থিরতা ও হীনমন্যতার মূলে অনেক সময় অমন অপরাধবোধ থাকে।

বয়ঃসন্ধিকালে দিবাস্বপ্ন

বঞ্চিত হয় বলেই বোধহয় বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের কল্পনার বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটে। এ বয়সে ছেলেমেয়েরা দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। এ বয়সে অনেকেরই নিজের চোখে নিজের নূতন জন্ম ঘটে।

বয়ঃসন্ধিকালে নূতন জন্ম

"গাছ, পাথর আছে, আমিও ছিলাম। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি—আমি কী! চেতনা ও বেদনার এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। আমি আছি, আমি আছি—প্রতিমুহূর্তে হৃদয়ের সহস্র অনুভূতি এ সত্য আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।" একটি নবযুবকের ডায়েরি থেকে আমরা উদ্ধৃত করলাম।

কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের—বিশেষতঃ নবযৌবনের বিপদের কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পরিসংখ্যান আমরা উল্লেখ করব। (৭) শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সকল বয়সের মধ্যে ১০—১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম। নবযৌবনে সেই মৃত্যুর হার ১০০ গুণ বেড়ে যায়—এমন দেখা গেছে। মানসিক ব্যাধির বেলাতেও সে কথা সত্য। ১০ থেকে ১৫ বছরের বয়সের মানসিক রোগগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা খুবই কম—হাসপাতালের ভর্তির হিসাব থেকে তা অনুমান করা চলে। নিউইয়র্ক হাসপাতালে পাঁচ বছরে ঐ বয়সের ১০,০০০০ জন ছেলে-মেয়ের মাত্র ৪৩ জন প্রথম ভর্তি হয়েছিল, ১৫—১৯ বছর বয়সে ঐ হারের পরিমাণ ছিল ৪০৩, অর্থাৎ প্রায় দশগুণ।

বয়ঃসন্ধিকালে বিপদ

মৃত্যুর হার

দুষ্ক্রিয়া ও সামাজিক অপরাধও অন্যান্য বয়সের তুলনায় এ বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশী করে। (৮)

সামাজিক অপরাধ

যৌন ইচ্ছার অপরিতৃপ্তি যদি মানসিক রোগের কিছুটা কারণ হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মর্যাদালাভে বঞ্চিত হয়েও ছেলে-মেয়েদের কেউ কেউ সামাজিক অপরাধের পথ গ্রহণ করে —এমন কথা বোধ হয় বলা চলে।

মানসিক রোগ ও সামাজিক অপরাধের কারণ

ঐ সব ছেলেমেয়েদের আমাদের বোঝা দরকার। 'আমাদের কেউ বোঝে না, বাবা নয়, মা নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা নয়, কেউ নয়,' এমন ধরণের একটি অভিযোগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে অব্যক্ত থাকে। সত্যি কথা নিজেদের নিজেরাও তারা বোঝে না। সেজন্যই যদি তারা অনুভব করে কেউ তাদের বোঝে—তবে তাঁর প্রতি তারা কৃতজ্ঞ হয়।

ছেলেমেয়েদের বোঝা দরকার

তাদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের বুঝতে আমাদের চেষ্টা করা দরকার। তারা বড় হয়েছে, এ সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তাদের প্রাপ্য মর্যাদা তাদের দিয়ে সে সত্যকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হবে। সহায়ক হিসেবে, পরামর্শদাতা হিসেবে বড়রা থাকবেন। ছেলেমেয়েরা তাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকারের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও গ্রহণ করবে। ছেলেমেয়েদের সংঘবোধ,

মর্যাদা দানের প্রয়োজন

মর্যাদাবোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা স্মরণ করলে মনে হয়—স্কুলে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের এইই বোধহয় সুসময়। স্বায়ত্ত শাসনের দ্বারা একদিকে যেমন তাদের ঐ বয়সের ইচ্ছা ও প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হবে, অন্যদিক দিয়ে স্কুলের স্বায়ত্ত শাসনের অভ্যাসের দ্বারা বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দায়িত্বের জন্য তারা প্রস্তুত হবে।

বড়দের স্বীকৃতি, প্রশংসা ও স্নেহের প্রয়োজন

ছেলেমেয়েরা যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠা দাবী করে, তেমন গভীর ভাবে অন্যদের কাছ থেকে স্বীকৃতি, প্রশংসা ও স্নেহও চায়। ওদের আচরণ থেকে সব সময় সেটা স্পষ্ট না হলেও এ কথা সত্য। ঐ বয়সে ছেলেমেয়েদের অদ্ভুত আচরণ দেখে বড়দের রুষ্ট হলে চলবে না। স্মরণ রাখতে হবে—ঐ বয়সের ধর্মই অমন। বড়রা যদি ছেলেমেয়েদের বুঝতে পারেন, তবে বড়দের সর্তহীন স্নেহ ও শুভেচ্ছার ছায়ায় নিজেদের ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণ বিকাশ ঘটানো ছেলেমেয়েদের পক্ষে সম্ভব হবে।

ব্লেয়ার জোনস এবং সিম্পসন (৯) এই বয়সের ছেলেমেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন চারটি—এরূপ মত প্রকাশ করেছেন ঃ

(ক) মর্যাদা (খ) স্বাধীনতা (গ) সুষ্ঠু প্রীতিকর জীবন দর্শন (ঘ) যৌন বিকাশ

সুষ্ঠু জীবনদর্শনের প্রয়োজন

প্রথম দুটির সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। চতুর্থটির কথা আমাদের অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। জীবন দর্শনের প্রয়োজন সম্বন্ধে দু চার কথা বলা দরকার। এ বয়সটাকে কিছু পরিমাণে নোঙর ছেঁড়া নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নিজের শৈশব থেকে, শৈশবের নির্ভরতা ও আনুগত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার বাসনা এ বয়সে প্রবল হয়। শৈশবের নোঙরে তাদের আরও দৃঢ়ভাবে বাঁধবার চেষ্টা করে আমরা তাদের বড় হবার, পরিণতিলাভ করবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করি। স্বাধীনতা তাদের দিতে হবে। সে স্বাধীনতার যাতে সুষ্ঠু ব্যবহার হয়—সে দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই নিতে হবে। সে দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য কেবলমাত্র নৈতিক অনুশাসন যথেষ্ট নয়। তাদের জীবনের লক্ষ্য কি, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে কোন পথ গ্রহণ করতে হবে, কি নিতে হবে, কি ছাড়তে হবে—এটা তাদের স্থির করতে হবে। এক কথায়, একটি সুস্থ জীবনদর্শন তাদের আবশ্যক। ঐ জীবন দর্শন তারা নিজেরাই রচনা করবে। তবে আমরা কিছু সাহায্য

করতে পারি। এসব জীবন দর্শনে কিছু কিছু পার্থক্য থাকবেই। রামের পক্ষে যা ভালো, শ্যামের পক্ষে তা ভালো নাও হতে পারে। তবে সব কয়টি সুস্থ জীবনদর্শনে এক জায়গায় একটি মিল থাকবে। যে জীবনদর্শনে একের স্বার্থ ও বহুর স্বার্থ সঙ্গত ও সমন্বিত হয়, তাকেই আমরা সুস্থ প্রীতিকর জীবনদর্শন বলি।

বয়ঃসন্ধিকালে সতর্কতা আবশ্যক

এ বয়সের ছেলেমেয়েদের বীর পূজা, আদর্শবাদ, আত্মত্যাগের প্রেরণা, আগ্রহশীলতা ও পরিণত বুদ্ধি—এ সবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তারা পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথে যেন অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে পিতামাতা শিক্ষক শিক্ষিকাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। বলা যেতে পারে বয়ঃসন্ধিকাল জীবনপথের একটি জংশান। এ বয়সে ছেলেমেয়েরা জীবনের পথ বেছে নেয়—সুপথ কিম্বা বিপথ। বড়দের এজন্য এসময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। তাদের অনবধানতার জন্য, তাদের সহানুভূতির অভাবে ছেলেমেয়েরা যেন পথ হারিয়ে না ফেলে, যেন বিপথকে নিজেদের পথ বলে বেছে না নেয়। এ বয়সে আবেগ ও অনুভূতির প্রাবল্য সময় সময় শিক্ষার অন্তরায় হলেও উপযুক্ত সহায়তা পেলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় বিশেষ লাভবান হতে পারে।

অধ্যায় ১১

কল্পনা ও চিন্তা

বস্তু বা ঘটনার অনুপস্থিতিতে তাদের সম্বন্ধে ভাবাকে স্মরণ বলা হয়।* চোখ কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি। চোখ দিয়ে যা দেখছি তা যখন স্মরণ করবার চেষ্টা করি তখন একটা ছবির মতো সেটা যেন আমাদের 'চোখের' সামনে, সঠিক বলতে গেলে, মনের কাছে ফুটে ওঠে। তেমনি আমরা মনে মনে পূর্বশ্রুত গানের সুরটি যেন শুনতে পাই, গোলাপের পরিচিত গন্ধ যেন আঘ্রাণ করতে পারি ইত্যাদি। একে প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ বলা হয়।

কোন একটি রঙের দিকে আমরা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর আমাদের দৃষ্টি ফেরালাম সামনের একটি সাদা পর্দার উপরে। সে রঙটি সাদা পর্দার উপর কয়েক সেকেণ্ড ধরে দেখতে পাচ্ছি এমন মনে হবে। একে প্রত্যক্ষের উত্তর প্রতিরূপ বলা হয়। সময় সময় ঠিক ঐ রঙটি না দেখে আমরা আরেকটি রঙ দেখতে পাই। বিন্দুটি যদি কালোরঙের হয়ে থাকে, খানিক তাকিয়ে দেখে চোখ বুজলে আমি হয়ত সাদা বিন্দু দেখলাম। প্রত্যক্ষ বিন্দু কালো হলে প্রতিরূপ যদি কালো হয় তবে তাকে বলা হয় সবর্ণ উত্তর প্রতিরূপ; প্রতিরূপটি যদি সাদা হয়—তবে তাকে বলা হয় অসবর্ণ উত্তর প্রতিরূপ।

উত্তর প্রতিরূপ—সবর্ণ ও অসবর্ণ

উত্তর প্রতিরূপগুলি সাধারণতঃ অসবর্ণ জাতীয় হয়। সাদা রঙ দেখবার পর আমরা দেখি কালো, কালোর পর দেখি সাদা, সবুজের পর লাল এবং লালের পর সবুজ। চোখ বুজলে দুএকসময় প্রতিরূপগুলি সবর্ণ জাতীয়ও হয়।

মনোবিদ্‌দের কেউ কেউ এগুলিকে প্রতিরূপ বলা পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে, স্মৃতি না বলে এদের প্রত্যক্ষের রেশ বলাই সঙ্গত।

---

* স্মরণ সম্বন্ধে আমরা—১৪ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

কোন একটি দৃশ্য বা বস্তু আধমিনিটকাল মন দিয়ে দেখবার পর চোখ বুজলে ছেলেমেয়েরা অনেকসময় সে বস্তুটিকে 'চোখের সামনে' দেখতে পায়। সে প্রতিরূপ থেকে অনেকসময় তারা প্রত্যক্ষের সময় লক্ষ্য করেনি এমন প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে। প্রতিরূপে দৃশ্যটির কিছু কিছু চেহারা বদলালেও আসল বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্যটি খুব বেশীই থাকে। দেখার অনেক পরেও অমন প্রতিরূপ দর্শন কোন কোন শিশুর পক্ষে সম্ভব। ঐ ক্ষমতা অনেকের মধ্যে প্রায় জীবনের প্রথম পনেরো বছর পর্যন্ত থাকে। অল্পসংখ্যক লোকের ঐ ক্ষমতা সারাজীবন ধরেই থাকে। এই জাতীয় প্রতিরূপকে আইডেটিক প্রতিরূপ বলা হয়।

আইডেটিক প্রতিরূপ

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পাঁচরকম অভিজ্ঞতা লাভ করি। সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঁচরকম প্রতিরূপ সম্ভব। দৃষ্টি আশ্রিত বা দর্শন প্রতিরূপ অধিকাংশ লোকের মধ্যে দেখা যায়। কারো কারো মধ্যে—পাঁচটির যে কোন একজাতীয় প্রতিরূপের আধিক্য দেখা যায়। মনোবিদদের কেউ কেউ তাই প্রতিরূপের ধরণ অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণী বা টাইপে ভাগ করেন। তবে মিশ্রিত টাইপের সংখ্যাই বেশী—যাদের মধ্যে কমবেশী সবরকম প্রতিরূপই দেখা যায়।

অতীতের কথা স্মরণ করে অতীতকে মনে মনে পুনরুজ্জীবিত করা কিম্বা স্মৃতিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে মনে মনে কিছু সৃষ্টি করাকে কল্পনা বলা হয়। কল্পনাতে একাধিক প্রতিরূপ থাকে। আবার স্পষ্ট প্রতিরূপ ছাড়াও কল্পনায় আমরা মনে মনে কথা বলি। কল্পনার রূপ প্রতিরূপ অপেক্ষা জটিল।

এক ব্যক্তি কোন একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। পরে যদি তিনি সেই ঘটনাটিকে যথাযথভাবে স্মরণ করেন তবে তাঁর সেই কল্পনাকে স্মৃতিলব্ধ কল্পনা বলা যাবে। যেমন ঘটেছে তেমনি মোটামুটি স্মরণ করলেন। একে বলা যেতে পারে ঘটনাটিকে স্মরণ করবার জন্য কল্পনার ব্যবহার।

স্মৃতিলব্ধ কল্পনা

সাহিত্যিক গল্প লেখেন। বৈজ্ঞানিক নব নব উদ্ভাবন করেন। ঐ সব কল্পনারই সৃষ্টি। ঐ কল্পনাকে সৃজনাত্মক বা গঠনমূলক কল্পনা বলা যায়। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে সৃজনাত্মক কল্পনাতে স্মৃতিলব্ধ কল্পনাকেই ব্যবহার করা হয়। তাকে ইচ্ছামত ভেঙ্গে চুরে, জোড়া লাগিয়ে একটি রূপ দেওয়া হয়। পাহাড় আমরা দেখেছি। সোনাও

সৃজনাত্মক কল্পনা

আমরা দেখেছি। সোনার পাহাড় আমরা কল্পনা করলাম। এই গঠনমূলক কল্পনাতে দুটি প্রতিরূপের সাহায্য নেওয়া হল—পাহাড় ও সোনা। সংক্ষেপে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার উপাদান নিয়েই গঠনমূলক কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয়।

গঠনমূলক কল্পনার দুটি রূপ আমাদের গোড়াতেই চোখে পড়ে। একটি দিবা-স্বপ্ন, অপরটি স্বপ্ন। যা হয় নি, কিন্তু যা হলে ভালো হত, যা হলে আমরা খুশী হতাম এমন ধরণের কত কল্পনাই না আমরা করি। ছোট ছেলে কল্পনা করে সে বাবার মত বড় হয়েছে, অফিসে গেছে, তাকে কেউ বকছে না, সকলকে সে শাসন করছে। অচিন দেশ থেকে সোনার পাল্কি চড়ে রাজপুত্র এল, তাকে বিয়ে করে অচিন দেশে নিয়ে গেল এমন দিবাস্বপ্ন মেয়েরা দেখে। যে রামকে অপমান করেছে, যার অপমানের প্রত্যুত্তর দেবার সাহস ও শক্তি রামের হয়নি—কল্পনায় সেই নিপীড়কের অশেষ লাঞ্ছনা রাম ঘটায়। আবার এমনও লোকে কল্পনা করে, 'আমি যাকে ভালোবাসলাম—তাকে আমি পেলাম না, তাকে আরেকজন পেল। আমাকে সারাজীবন ব্যর্থপ্রেমিকের বেদনাদায়ক জীবন যাপন করতে হল।' এই ধরণের কল্পনাতে কেউ কেউ একটি বেদনাদায়ক আনন্দ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

দিবাস্বপ্ন

"এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।"

উপরোক্ত কল্পনাসমূহের মূলে থাকে একটি অতৃপ্ত বাসনা। ঐ বাসনাটি কল্পনার সাহায্যে কিছু পরিমাণ তৃপ্ত হয়। উদ্বিগ্নমন অনেক বিপদ ও অসুবিধার কথা কল্পনা করে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়। একে আমরা ঠিক দিবাস্বপ্ন আখ্যা না দিলেও—এর মধ্যে কল্পনার উপাদানটি স্পষ্ট। এজাতীয় উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার মূলেও অবদমিত ইচ্ছা কাজ করে বলে দেখা গেছে।

দিবাস্বপ্ন এবং আমরা ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখি—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? দুটি পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে। এক, দিবাস্বপ্ন আমাদের কল্পনা, সেটা বাস্তব নয়—এ বোধটা স্বাভাবিক অবস্থায় আগাগোড়াই থাকে। কিন্তু আমরা স্বপ্ন যখন দেখি তখন তাকে বাস্তব বলে মনে করি। এটা কল্পনা, সত্য নয়—এ বোধ স্বপ্নে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ স্বপ্নই অর্থহীন, এলোমেলো, অদ্ভুত, এমনকি পরস্পরবিরোধী বলে মনে

স্বপ্ন

হয়। এর মূলে কোন ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতা আছে স্বপ্নদ্রষ্টা অনেক সময় বুঝতে পারেন না।

স্বপ্নের স্বরূপ ব্যাখার ব্যাপারে আমরা সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১) কাছে সর্বাপেক্ষা ঋণী। তাঁর মতে স্বপ্ন ব্যক্তির অতৃপ্ত, অবদমিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি। শিশুদের বেলায় সময় সময় স্বপ্ন অতৃপ্ত ইচ্ছার পরিতৃপ্তিরূপেও দেখা যায়। আমরা ঘুমোলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া কমে আসে। মস্তিষ্কের উচ্চতর বিশ্লেষণকারী অংশ মোটামুটি নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে এটা কল্পনা, বাস্তব নয় এমন সমালোচনা করবার শক্তি আমাদের থাকে না। মনে হয় সত্যি আমরা দেখছি, সত্যি আমরা শুনছি ইত্যাদি। 'অবদমিত ইচ্ছা' বলতে ফ্রয়েড কি বুঝছেন? আমাদের মনে অনেক ইচ্ছা আছে যার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পর্যন্ত আমরা লজ্জিত ও অপরাধী বোধ করি, তাকে কাজে রূপ দেওয়া ত দূরের কথা। এ সব ইচ্ছা আমরা সচেতন মন থেকে দূর করে দিই। অনেক সময় এ সব ইচ্ছা সম্বন্ধে আমরা সচেতনই হই না। এ পদ্ধতিকে 'অবদমন' বলা হয়। মনের নির্জ্ঞানে এ সব অবদমিত ইচ্ছার ঠাঁই হয়। কিন্তু ইচ্ছার রূপটি সক্রিয়। সর্বদাই তা নিজের পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে; স্বপ্নে নিজেকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। কিন্তু মনের যে বিরোধিতার ফলে ইচ্ছা সচেতন হতে পারে নি, ঘুমের সময় সে বিরোধিতা অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় থাকলেও একেবারে অক্ষম হয় না। ফলে স্বপ্নের মধ্যেও অবরুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছাকে তৃপ্ত হতে হয় নানান ছদ্মবেশে।*

শিশুর কল্পনা

শিশু কল্পনা করতে ভালোবাসে। চেয়ারকে সে ট্রেণ বানাল। হাতের লাঠিটা তার বন্দুক হল। তাই নিয়ে তার খেলা চললো। শিশুর ইচ্ছা অনেক, ক্ষমতা কম। কল্পনার সাহায্যে তার অতৃপ্ত ইচ্ছাকে তাই সে পূরণ করে। শিশুর অভিজ্ঞতা কম, বাস্তববোধও দুর্বল। তাই তার খেলা ও কল্পনা অনেক পরিমাণে মুক্ত, বাস্তবের বন্ধনে ততখানি

---

* একজন মনঃসমীক্ষক একটি রোগীকে চিকিৎসা করছিলেন। রোগীটি একদিন স্বপ্ন দেখলেন—'ডাক্তার একটি গহ্বরে পড়ে গেছেন। রোগী তাকে গহ্বর থেকে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।' স্বপ্নটি আপাতদৃষ্টিতে সাধু। ডাক্তারকে গহ্বর থেকে তার তোলবার চেষ্টাটাই প্রধান। কিন্তু ডাক্তারকে গহ্বরে ফেলল কে? রোগীর কল্পনা—রোগীর ইচ্ছা। এ স্বপ্নের মধ্যে ডাক্তারের প্রতি রোগীর বৈর ইচ্ছা পরিতৃপ্তি লাভ করেছে—যে বৈর ইচ্ছা নিজের কাছেও স্বীকার করা তার পক্ষে কঠিন।

বদ্ধ নয়। কিন্তু শিশুর খেলা ও কল্পনা লক্ষ্য করলে দুটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমতঃ তার স্বীয় স্বল্প অভিজ্ঞতাকে সে খেলা ও কল্পনাতে রূপ দিচ্ছে। বাবাকে অফিসে যেতে দেখলে সে বাবা হয়ে অফিসে যায়; মা হয়ে সে বাচ্চাকে খাওয়ায়, স্নান করায় ও শাসন করে। দ্বিতীয়তঃ খেলার মধ্য দিয়ে সে নিজের বহু আবেগকে চরিতার্থ করছে। ছোট ভাই মাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। ছোট পুতুলটাকে মেরে ছোট ভায়ের প্রতি তার বৈরভাবকে সে চরিতার্থ করছে। 'ছোট পুতুলটা দুষ্টুমি করে। তাই তাকে মারা হচ্ছে।' বহির্বাস্তব ও শিশুমনের বাস্তব এই দুইকে আশ্রয় করেই শিশুর কল্পনা রূপলাভ করে।

শিশু বড় হয়। আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষমতা তার বাড়ে, কল্পনার সাহায্যে নিজের ইচ্ছার পরিতৃপ্তির প্রয়োজন কমে। কিন্তু কারো জীবনেই কোন দিন বাস্তবে সকল ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটা সম্ভব নয়। তাই জীবনে কিছু পরিমাণ কল্পনায় পরিতৃপ্তি খোঁজার প্রয়োজন সকলের বেলাতেই থাকে। সে কারণেই মানুষ গল্প শোনে, গল্পের বই পড়ে।

বাস্তবধর্মী কল্পনা

শিশুর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা বাড়ে। তার কল্পনা ক্রমশঃ আরও বেশী করে বাস্তবঘেঁসা হয়ে উঠে। পক্ষীরাজ ঘোড়া ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল—বারো তেরো বছরের ছেলেকে এ কাহিনী সন্তুষ্ট করবে না। এরোপ্লেনে করে নায়ক উড়ে গেল এমন কথা কল্পনা করতে সে রাজী। পূর্বে বলেছি বড়দের জীবনেও কল্পনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অধিকাংশ বয়স্ক লোকই রূপকথায় সন্তুষ্ট হবে না। তারা চাইবে বাস্তবধর্মী উপাখ্যান—ব্যাপারটা কল্পনাই, কিন্তু জীবনে এমন ঘটে, ঘটতে পারে এ জাতীয় কাহিনী।

বাস্তবধর্মী কল্পনা শিক্ষার বাহন

বাস্তবের অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজের খেলা ও কল্পনাকে সমৃদ্ধ ও সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন শিশু অনুভব করে। এ কারণে শিক্ষায় আজকাল শিশুর খেলা ও কল্পনাকে কেন্দ্র করে জ্ঞানদানের রেওয়াজ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা 'চিঠি লেখার খেলা' খেলতে চাইল। ডাকঘরে গিয়ে—ডাক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তার জ্ঞানলাভ করে এল। তাদের খেলায় সে জ্ঞান তারা কাজে লাগাল। তাদের খেলাটি বাস্তবধর্মী হল।

কল্পনাকে আমরা আরেকটি কাজে লাগাই। বাড়ীর গৃহিণীর ইচ্ছা বাইরের ঘরটিকে তিনি অন্যরকম করে সাজান। কেমন করে সাজালে তাঁর মনোমত হবে সেটা বুঝতে গেলে তাঁর পক্ষে দুটি কাজ করা সম্ভব। এক, বিভিন্ন ধরণে ঘরটিকে সাজিয়ে দেখা। চেয়ার, আলমারি, রেডিও প্রভৃতি সবকিছু। অথবা তিনি মনে মনে জিনিসগুলিকে বিভিন্ন জায়গায় রেখে একটি সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করতে পারেন। এ জাতীয় কল্পনাকে কর্মমূলক কল্পনা বলা যেতে পারে। একে অনেক সময় চিন্তাও বলা হয়।

কর্মমূলক কল্পনা

চিন্তা শব্দটিকে আমরা মনোবিদ্যায় সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করি। কোন একটি উদ্দেশ্যকে মনের সামনে স্থির রেখে সেই উদ্দেশ্য কেমন করে সাধন করা যায় যখন আমরা ভাবি তখন সেই ভাবনাকে চিন্তা বলা হয়। চিন্তায় মানসিক ক্রিয়াকে আমরা সচেতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করি। মন যখন আমাদের ছাড়া থাকে তখন মানসিক ক্রিয়ার রূপটি কি হয় সেটি স্মরণ করলে চিন্তার রূপটি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে। মনকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সে পড়ে থাকে না। একটি কল্পনা থেকে আরেকটি কল্পনা, একটি ইচ্ছা থেকে আরেকটি ইচ্ছায় ক্রমাগতই সে বদলে চলে। মন কোনদিনই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। কিন্তু ছাড়া পাওয়া মনের কাছে উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট বা সচেতন নয় এবং একটি উদ্দেশ্য মনকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। মনকে এক হিসেবে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সেই রঙ্গমঞ্চ অধিকার করবার জন্য ভাবনা ও কল্পনাসমূহ অনবরত চেষ্টা করে। মানুষ যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করে, কোন একটি সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপৃত হয়, তাকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয় যাতে অন্য কোন ইচ্ছার টানে, কোন একটি অপ্রাসঙ্গিক কল্পনাস্রোতে মন সমস্যা থেকে দূরে চলে না যায়। মানুষকে অপ্রাসঙ্গিক ইচ্ছা ও কল্পনার ভীড়কে সচেতন মন থেকে অনবরতই সরিয়ে দিতে হয়। মনটিকে একটি দিকে স্থির রাখা, সচেতন মন থেকে বারবার অন্যান্য ইচ্ছা ও কল্পনাকে সরিয়ে দেওয়া—এ সবের জন্য চিন্তা একটি চেষ্টাসাধ্য মানসিক কাজ।

চিন্তা

মানসিক নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কম অবাধ ভাবানুসঙ্গে, সবচেয়ে বেশী চিন্তায়। নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বিচার করলে দিবাস্বপ্নের স্থান অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও চিন্তার মাঝামাঝি।

চিন্তার মধ্যে জ্ঞানের স্থানটি প্রধান। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রধানতঃ চিন্তারই ফল। উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে মানুষের চিন্তার প্রয়োজন হয়। এর জন্য যে চিন্তা আবশ্যক সে সম্বন্ধে যুক্তিবিদ্যায় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানে সে সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভাষা ও চিন্তা

উপরোক্ত বিষয় কয়টি আলোচনার পূর্বে ভাষা ও চিন্তার সম্বন্ধটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। একান্তে শৈশবে যখন শিশুর ভাষা থাকে না তখনও কিছু কিছু কল্পনা সে করে—এমন কথা অনেকে মনে করেন। ভাষা ব্যতীত সময়ে সময়ে অস্পষ্ট চিন্তা বা কল্পনা বোধ হয় বড়দের বেলাতেও ঘটে। কিন্তু সুস্পষ্ট ও সঠিক চিন্তার জন্য ভাষা একান্ত আবশ্যক। ভাষা আমাদের চিন্তার বাহন। আমাদের চিন্তারাশি ভাষার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। কিন্তু তথাপি আমরা দেখতে পাই, ভাষার ক্ষমতা ও চিন্তার ক্ষমতা ঠিক এক নয়। কোন কোন ছেলেমেয়ে আছে যারা অনেক শব্দ জানে, অনেক কথা বলে। এদের কথকী বলা চলে। কিন্তু চিন্তায় এদের সুস্পষ্টতার অভাব, শব্দের সঠিক অর্থ এরা জানে না। শব্দ এদের ভালো লাগে, শব্দ শেখাও এদের পক্ষে সহজ—কিন্তু শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে এদের জ্ঞানের অভাব। বিনে'র দুটি কন্যার একটি ছিল ঐ জাতীয়। বিনে দুজনকে ২০টি শব্দ লিখতে বল্লেন। দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন এক-তৃতীয়াংশ শব্দেরই মানে জানে না; অপরজন ২০টি শব্দের মাত্র ১টি শব্দের মানে জানে না। (২)

ছেলেমেয়েদের শব্দসম্ভার বৃদ্ধি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শব্দ শেখাবার সময় কেমন ভাবে, কোথায় তাদের ব্যবহার হয়, কি তাদের অর্থ তার উপর জোর দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের শব্দ আছে। কোন কোন শব্দের অর্থ বোঝবার জন্য একটি বয়স বা বুদ্ধি ও আবেগজীবনের বিকাশ দরকার। উপযুক্ত বিকাশের স্তরে পৌঁছবার আগে শব্দ শেখালে তোতাপাখীর মত শব্দগুলিই ছেলেমেয়েরা শিখবে, কিন্তু সে শব্দসমূহ কি অর্থ প্রকাশ করছে সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা হবে না।

ধারণা

ঘোড়া শব্দ দ্বারা আমরা ঘোড়া জন্তুটিকে বুঝি। শব্দকে বলা যায় একটি বিশেষ বস্তুর প্রতীক। বস্তু বা কার্য বোঝাবার জন্য অনেক শব্দ আছে। আবার কতগুলি শব্দ দ্বারা বিচ্ছিন্ন গুণ ও বিমূর্ত ধারণা বোঝায়। ধরা যাক নীল রঙ। নীল রঙ বলে কিছু এ পৃথিবীতে

নেই, আছে নীল রঙের জিনিস। রঙটিকে মনের সাহায্যে বস্তু থেকে আলাদা করে আমরা বলি নীল রঙ। তেমনি আমরা বলি ন্যায়পরায়ণতা। কতগুলি কাজ ও আচরণের থেকে ঐ গুণটিকে বিচ্ছিন্ন করেই আমরা তাকে বলি ন্যায়-পরায়ণতা। ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি। এরাও বিমূর্ত ধারণা। বীজগণিতে অনির্দিষ্ট প্রতীক a, b, c, d তো নিশ্চয়ই।

মূর্ত ধারণা

প্রথমে যে সব বস্তুর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাদের কথা আলোচনা করব। ঘোড়ার কথা আমরা বলছিলাম। ধরা যাক, একটি ছোট ছেলেকে ঘোড়া কি, অর্থাৎ ঘোড়া শব্দটি কি অর্থ জ্ঞাপন করে তাই শেখান হচ্ছে। হয় সে ঘোড়া দেখেছে, নইলে দেখেনি। ঘোড়া না দেখলেও গোরু হয়ত সে দেখেছে। কিছুটা গোরুর মতন, তার চারটে পা আছে, বেশ বড় ইত্যাদি বলে, ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে ঘোড়ার চেহারাটা ছেলেটিকে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সে ধারণা যে ছেলেটির কাছে খুব স্পষ্ট হবে না সেটা বলাই বাহুল্য। তাই চেষ্টা করে তাকে একটি ঘোড়া দেখান হল। ঘোড়ার রঙটি সাদা। ঘোড়াটি বেশ বড়, স্বভাবটি তার তেমন সুবিধার নয়। ঘোড়া সম্বন্ধে ছেলেটির যে ধারণা হল তাতে এই সব গুণগুলি মিলেমেশে তার কাছে এক হয়ে রইল। সাদা রঙটা যে ঘোড়ার একটি অপরিহার্য বিশেষত্ব নয় এটি বোঝবার জন্য তার দেখা দরকার (অন্ততঃ জানা দরকার) যে আরও বিভিন্ন রঙের ঘোড়া আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ঘোড়ার চেহারাটাই ঘোড়া নয়। ঘোড়ার অভ্যাস ও আচরণের সঙ্গে যথোপযুক্ত পরিচয়ের দ্বারাই ছেলেটি ঘোড়া বলতে কি বুঝায়—সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারবে। ঘোড়া কি খায়, কখন ঘুমোয়, কেমন করে ঘুমোয়, কি ভাবে ছোটে, ঘোড়া পোষ মানবার আগে কোথায় ছিল, বন্য ঘোড়াদের জীবনযাত্রা, ঘোড়াদের পরস্পরদের মধ্যে সম্বন্ধ ও আচরণ প্রভৃতি বহু তথ্য দ্বারাই ঘোড়াকে বোঝা সম্ভব। ঘোড়া একটি শব্দ। এ শব্দটি প্রায় সকলেই আমরা ব্যবহার করছি। কিন্তু একজনের কাছে এই শব্দটির অনেকখানি অর্থ আছে। ঘোড়া সম্বন্ধে সে বহু তথ্য জানে। আরেকজনের কাছে ঘোড়া একটি সাদা বড় জীব ছাড়া আর কিছু নয়। ঘোড়া শব্দ দুজনেই ব্যবহার করছে। কিন্তু একজনের কাছে শব্দটির ধারণা অস্পষ্ট ও কিছুপরিমাণে ভ্রমাত্মক ও অপরজনের কাছে শব্দটির ধারণা অনেকাংশে পূর্ণ ও নির্ভুল।

এখানে শিশুদের জীবনে প্রাক্-ধারণার স্তর সম্বন্ধে পিয়াজে (৩) যা বলেছেন তা উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঐ স্তরটি সাধারণতঃ ২ থেকে ৪ বৎসরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। শিশুটি সকালবেলায় পথে একটি ঘোড়া দেখতে পেল। বিকালবেলায় সে যখন ঘোড়া শব্দটি ব্যবহার করল—তখন ঐ ঘোড়ার প্রতিরূপটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘোড়া বলতে সে কি ঘোড়া জাতিকে বোঝাচ্ছে—না, ঐ বিশেষ ঘোড়াটির কথাই বলছে এটা তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ, ঘোড়া তার কাছে তখনও পুরোপুরি ধারণায় পরিণত হয়নি। স্মৃতিলব্ধ কল্পনারূপেই বস্তুটি তার মনে প্রধানতঃ রয়েছে।

প্রাক্-ধারণার স্তর

সঠিক ধারণা লাভের জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন আছে, তেমনি শিশুমনের আবশ্যকীয় পরিণতি দরকার। বিনে'র পরীক্ষাবলী থেকে শিশুমনে ধারণার রূপ কোন বয়সে কি জাতীয় হয় সে সম্বন্ধে জানা যায়। ছয় বছর বয়সে শিশুরা ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রধানতঃ নিজেদের প্রয়োজনের দিক থেকেই বোঝে। ঘোড়া তাদের চোখে—দৌড়ায়, গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। ছয় সাত, এমনকি আট বৎসর পর্যন্ত শিশুর মনোভাবে আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল থাকে, আত্মনিরপেক্ষ ধারণা তার পক্ষে তখন কঠিন। (৪)

দশবছর বয়সে তার ধারণা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিকতা দোষমুক্ত হয়। নিজের প্রয়োজনের বাইরে বস্তু কি এটা কিছু কিছু সে বুঝতে পারে। ঘোড়া বলতে সে বোঝে একটি জন্তু। কোন বস্তুকে তার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে তাকে বর্ণনা করে শিশু বস্তুটির ধারণাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে।

শিশুর বিকাশের স্তরটি বিশেষভাবে স্মরণ রেখে শব্দের অর্থ ও ধারণাকে বাড়াবার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নানাপ্রকার সুযোগ তাকে দেওয়া দরকার। নয়া শিক্ষা এ কারণেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়। শব্দ অনেক সময় আমাদের অজ্ঞানতাকে আড়াল করে। প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই অজ্ঞানতা দূর করা সম্ভব। পাহাড় ও সমুদ্র সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের আমরা পড়াই। কিন্তু বাংলাদেশের ক'জন ছেলেমেয়ে পাহাড় বা সমুদ্র দেখেছে? পাহাড়, সমুদ্র যে দেখেনি কোন-মতেই ঐ সব বস্তু সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। তবে ছবি বা মডেলের সাহায্য নিয়ে কিছু কিছু ধারণা দেওয়া সম্ভব।

ধারণালাভে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন

একটি বস্তু সম্বন্ধে ধারণার দুটি দিক আছে। এক, সেটা কি যতদিক দিয়ে সম্ভব তাকে জানতে হবে। অনেকগুলি বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে কোন্ বৈশিষ্ট্য-গুলি সবারই আছে সেটা স্থির করতে হবে। দুই, সমধর্মী বস্তু থেকে ঐ বস্তুটি কোন কোন দিক দিয়ে অন্যরকম সেটি জানার দ্বারা বস্তুটি সম্বন্ধে ধারণার আরও স্পষ্ট হবে। গোরুর সঙ্গে ঘোড়ার পার্থক্য কি এটা জানার দ্বারা ঘোড়া কি বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। লালরঙ ও নীলরঙের পার্থক্যের দ্বারা দুটি রঙকেই আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি।

মূর্ত ধারণা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। যে বস্তু, ঘটনা বা কাজ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি তাদের সম্বন্ধে ধারণাকে মূর্ত ধারণা বলা হয়। বস্তু বা কার্যের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী মনের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়।

বিমূর্ত ধারণা

বস্তুকে বিশ্লেষণ করে তার রঙ, আকৃতি ও আকার প্রভৃতি আমরা জানি। রঙ, আকৃতি, আকার প্রভৃতি ধারণা বিমূর্ত হলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর খুব কাছাকাছি বলে তাদের মনে হয়। এ ধরণের গুণাবলী সম্বন্ধে ধারণা শিশুদের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব। মাদাম মণ্টেসরি ডায়েডেক্টিক বা শিক্ষাসাধক এ্যাপারেটাসের সাহায্যে নার্সারি শিশুদের (২ থেকে ৫ বছর) বস্তুর গুণাবলী শিক্ষার কথা বলেছেন। সংখ্যার ধারণা ও গুণতে পারবার ক্ষমতা শিশুদের ক্রমে ক্রমে হয়। ২ বছরের শিশুরা এক ও বহুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। চার বছরের শিশুরা ৪ পর্যন্ত গুণতে পারে। ছয় বছর বয়সে ১৩টি মুদ্রা গুণে বলতে পারা শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই ভাবে সংখ্যাধারণা ও গুণবার ক্ষমতার বিকাশ হয়। এ সব ব্যাপারে শিক্ষাদানকালে দৃষ্টি রাখতে হবে যে শিক্ষা—শব্দতেই যেন শেষ না হয়, শিক্ষা ধারণাকে যেন আরও স্পষ্ট করতে পারে। সেজন্য দুটি জিনিষ আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখতে হবে শব্দটির অর্থ বোঝবার বয়স শিশুর হয়েছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যা বোঝাবার জন্য বিভিন্ন সংখ্যক বস্তুর সাহায্য নিতে হবে। কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতীত ১, ২, ৩ না শিখিয়ে, ধরা যাক, পর্যায়ক্রমে ১টি বল, ২টি বল, ৩টি বল—প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে, সংখ্যার ধারণা দেবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু সংখ্যা শেখার সময় শিশু কেবল যদি বলই দেখে তবে ১ বলতে সে ১টি বল বুঝবে! সংখ্যা সম্বন্ধে শিশুর সঠিক ধারণা হলে সংখ্যাটি শিশুর মনে বস্তুনিরপেক্ষ রূপ নেবে। সেজন্য হয়ত প্রথমে

আমরা বল দেখালাম, তারপর কড়ি, তারপর পয়সা, তারপর সে আঙুল গুণলো তারপর হয়ত ঘরের জানালা। এইসব নানান জিনিস গোণার মধ্য দিয়ে সংখ্যার ধারণাটা পেলে সংখ্যাকে কোন বিশেষ বস্তুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে সে দেখতে শেখে। মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণা বিকাশের উভয় ক্ষেত্রেই ঐ কথা বলা চলে। বিভিন্ন বর্ণের ঘোড়া দেখবার পর শিশু বুঝতে পারে বর্ণটি ঘোড়ার একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য নয়। সব ঘোড়ার মধ্যেই যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান—ঘোড়া বলতে সেগুলিকেই বুঝতে হবে!

অভিজ্ঞতা যেমন বস্তুর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে, তেমনি কোনটি অপরিহার্য, কোনটি আকস্মিক এটাও বুঝতে সাহায্য করে। সাধারণ ধারণা লাভে বস্তুর অপরিহার্য গুণগুলি জানা দরকার, কিন্তু বস্তুর আকস্মিক গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভেরও মূল্য আছে।

টাকাপয়সা দিয়ে যে কেনাবেচা করবার সুযোগ পেয়েছে, টাকা-পয়সার অর্থ সেই বুঝবে। বাজারের হিসাব যাকে রাখতে হয়, মিশ্র যোগ বিয়োগের প্রয়োজন ও অর্থ তার কাছে বেশী। জ্যামিতির ধারণা কোন কাজের মধ্য দিয়ে লাভ করলে সে ধারণাকে ছেলেমেয়েরা বেশী গ্রহণ করতে পারে, বেশী কাজে লাগাতে পারে এমন দেখা গেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে জ্ঞানলাভে ছেলেমেয়েরা অধিকতর আগ্রহ বোধ করে এ কথা আমরা জানি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা চলে যে সে জ্ঞান ও ধারণার অর্থ-সম্পদ তাদের কাছে বেশী হয়। অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্য দিয়ে যে ধারণা তারা লাভ করে—আলোচনা, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের আরও সঠিক ও সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে এ কথাও অবশ্য যোগ করা দরকার।

মানুষের আচরণ ও কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু বিমূর্ত ভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। যেনম দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি। এ সব শব্দ বুঝতে ছেলেমেয়েদের কিছু দেরী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে 'ন্যায়পরায়ণতা' শব্দটির সংজ্ঞা তেরো বছরের আগে ছেলেমেয়েরা বলতে পারে না।* 'সাহস' শব্দটির সঠিক অর্থ বারো বছরের আগে ছেলেমেয়েরা বলতে পারে না।** যে সব কথা ছেলেমেয়েরা একেবারেই বোঝে না, সে সব কথা

* বার্ট কর্তৃক বিনে অভীক্ষার সংশোধন।

** টারমান মেরিল কর্তৃক বিনে অভীক্ষার সংশোধন।

বইতে থাকলে ছেলেমেয়েদের শুধু মুখস্থই করতে হয়। তদ্বারা তাদের প্রকৃত জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না।

সুস্পষ্ট ও সঠিক চিন্তার জন্য আবশ্যক বস্তু বা কার্য সম্বন্ধে সঠিক ও পূর্ণ ধারণা। জ্ঞানের জন্য এসব ধারণাকে শৃঙ্খলিত করতে হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি এটা স্থির করা আবশ্যক হয়। জগত বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাবলীর সমাবেশ। এ সবের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

সম্বন্ধ বোধ

এ ছাড়া আমাদের মনে অনেক মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণাও রয়েছে। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধসমূহ উপলব্ধি করার একটি সহজ ক্ষমতা মনের রয়েছে।

এ ক্ষমতাকে স্পীয়ারম্যান G বলেছেন। স্পীয়ারম্যান 'বুদ্ধি' শব্দটি ব্যবহার করতে চান নি। কিন্তু G বলতে যা বোঝায় তাকে মোটামুটি বুদ্ধিই বলা চলে। এর মূল কথা হচ্ছে, দুটি বস্তু বা ধারণা আমাদের মনের গোচরে এলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে। যেমন ভালো মন্দ শব্দ দুটি শুনলেই আমাদের মনে হয় এরা বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। আবার একটি শব্দ ও একটি সম্বন্ধ থাকলে সম্বন্ধযুক্ত অপর শব্দটি আমাদের গোচরীভূত হয়। যেমন : 'আলো' ও 'ঐ ধরণের শব্দ'—শুনলেই আমাদের মনে আসে 'দিন'।

সম্বন্ধ অনেক প্রকার আছে। স্থানবাচক ও কালবাচক সম্বন্ধ বলতে বলব উপরে, নীচে, ভিতরে, পিছনে, আগে, পরে ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত : বইটা টেবিলের **উপরে** আছে ; রবি ঘরের **ভিতর** গেল, পাঁচটা বাজবার **পরে** যদু খেলার মাঠে গেল। এর পর উল্লেখ করতে হয় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কথা। ভালো মন্দ, আলো ও অন্ধকার এরা বিপরীত সম্বন্ধ প্রকাশ করছে। আবার ভিজে ও সেঁতসেঁতে, ভালো ও লক্ষী এদের মধ্যে সাদৃশ্যটাই প্রধান। তারপর কার্য-কারণ সম্বন্ধটির কথা বলতে হয়। কলেরা রোগ লোকের মৃত্যু ঘটায়। কলেরা কারণ, মৃত্যু কার্য বা ফল। এসব ছাড়াও আরও নানাবিধ সম্বন্ধ আছে।

পাঠকপাঠিকাবর্গ লক্ষ্য করে থাকবেন যে 'সাধারণ ধারণা' বিকাশেও মনের সম্বন্ধবোধের ক্ষমতা কাজ করে। বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি ঘোড়ার সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে, তাদের আমরা এক করে দেখি। যেসব বৈশিষ্ট্য তাদের সবার মধ্যে রয়েছে—'সাদৃশ্য দেখবার ক্ষমতা' বলে সেগুলি দেখি। যেসব দিক দিয়ে বস্তু বা ধারণাসমূহের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে সেগুলিও মনের নজরে আসে।

সাধারণ ধারণা লাভ করবার পর ধারণাসমূহকে সম্বন্ধযুক্ত করার প্রয়োজন হয়। দুটি সম্বন্ধযুক্ত ধারণাকে বাক্য বলা হয়। ন্যায়শাস্ত্রে একে 'প্রতিজ্ঞা' বলা হয়। দৃষ্টান্ত: পিতা ও পুত্রে কিছু মিল দেখা যায়। পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটি সম্বন্ধ উল্লেখ করা হল।

যুক্তিবিচারে একাধিক সম্বন্ধ ও সম্বন্ধযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা হয়। যেমন:

যুক্তিবিচার

ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের যে সম্বন্ধ, বাবার সঙ্গে সে সম্বন্ধ কার? এখানে প্রথম শব্দদ্বয়ের সম্বন্ধটি বার করে পরের শব্দের বেলাতে সে সম্বন্ধটি কি হবে স্থির করা হল। ন্যায়শাস্ত্রের অনুমিতি এক-প্রকার যুক্তিবিচার। দৃষ্টান্ত:

মানুষ মরণশীল—প্রতিজ্ঞা (১)
রাজারা মানুষ—প্রতিজ্ঞা (২)
অতএব রাজারা মরণশীল।—সিদ্ধান্ত

অনুমিতিতে দুটি বাক্য বা প্রতিজ্ঞা দেওয়া আছে। সেই বাক্য দুটি থেকে রাজারা 'মরণশীল' এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল। প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞায় দুটি সম্বন্ধযুক্ত ধারণা রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি ধারণা দুটি বাক্যেই রয়েছে। দুটি বাক্যেই যে ধারণাটি বিদ্যমান সেটি হচ্ছে 'মানুষ'। এই ধারণাটির সাহায্যেই সিদ্ধান্তে অপর দুটি ধারণাকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যে ধারণাটি উভয় বাক্যেই রয়েছে তাকে মধ্যপদ বলা হয়। অনেক সময় শব্দের বদলে চিত্রের সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ। এই অনুমিতিটিকে নীচে চিত্রাঙ্কিত করা হল:



মরণশীল (জীব) সবচেয়ে বড় বৃত্তটি প্রকাশ করছে। মানুষ মরণশীল জীবের একাংশ। মাঝারি বৃত্তটি মানুষ প্রকাশ করছে। আবার যেহেতু রাজারা মানুষের মধ্যে একাংশ—মানুষ বৃত্তটির মাঝখানে অঙ্কিত ছোট বৃত্তটি 'রাজাদে'র প্রকাশ করছে। ঐ চিত্র থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মরণশীল জীবের মধ্যে রাজারাও পড়ছে।

উপরের অনুমিতিতে মানুষ ও রাজাদের মরণশীলতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। প্রতিজ্ঞায় মানুষের মরণশীলতা ও সিদ্ধান্তে রাজাদের মরণশীলতা। 'রাজারা মরণশীল' এই উক্তিতে যে সংখ্যক লোক মরণশীল বলা হয়েছে, এ উক্তিতে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক মরণশীল এ কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা বেশী থেকে কমে যাচ্ছি, ব্যাপকতর জ্ঞান থেকে অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক জ্ঞানে পৌছান হচ্ছে। যুক্তিবিচারে কম থেকে বেশীতে পৌঁছবারও চেষ্টা করা হয়। কোন একটি ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে। তেমন বহু ঘটনা দেখার পর আমরা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। একে অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ বলা হয়। দেখলাম রাম মরে, শ্যাম মরে, যদু মরে ইত্যাদি। এরা সবাই মানুষ। অতএব বললাম মানুষ মাত্রেই মরে। অথবা মানুষ মরণশীল।

কার্য-কারণ সম্বন্ধ

কার্য-কারণ সম্বন্ধটি জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত: মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। এনোফিলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। বুদ্ধি কম থাকলে লেখাপড়া সম্ভব নয়। বিচার করলে দেখা যায় যে কোন কার্য বা ফলের একাধিক কারণ আছে। ঐ কারণগুলির এক আধটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন চার বছর বয়সেই অনেক ছেলেমেয়ে 'কেন' শব্দটি বহুবার জিজ্ঞাসা করে। বহুবিষয় তারা জানতে চায়। 'কেন বৃষ্টি পড়ে?' 'কেন এখন অন্ধকার?', 'কেন মা চলে গেছে' ইত্যাদি। এসব 'কেন'র দ্বারা তারা অনেক কিছু জানতে চায়। ছোটদের 'কেন'র অর্থ বুঝতে গেলে দু' একটি জিনিষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছোটরা অস্পষ্টভাবে প্রায় প্রত্যেক ঘটনাকেই উদ্দেশ্যমূলক মনে করে। কারো কারো চক্ষে উদ্দেশ্যটি অভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনাবলী সম্বন্ধে ছোটদের মনে কিছুটা উদ্বেগ আছে। 'বৃষ্টি হচ্ছে কেন?' যখন তারা বলে অনেক সময় তার মানে হচ্ছে 'ব্যাপারটা কি,

এত বৃষ্টি হচ্ছে ! কে বৃষ্টি ফেলছে, কি হবে শেষ পর্যন্ত ?' 'কেন'র মধ্যে উদ্দেশ্যটি কি সেটাই সে জানতে চাইছে। একটি ঘটনা নৈর্ব্যক্তিক কারণসমূহের ফল এ ধারণাটি গোড়াতে শিশুদের থাকে না। ধীরে ধীরে যত সে বড় হয়, যত সে অভিজ্ঞতা লাভ করে, বড়দের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যত সে পরিচিত হয় তত কার্যকারণ সম্বন্ধে সে সচেতন হতে থাকে। অবশ্য চারপাঁচ বছরের ছেলেমেয়ে দু'একটি প্রশ্নের দ্বারা কারণ জানতে চাইছে এমনও দেখা গেছে।

সম্বন্ধকে দু'ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে। ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটি আপনা থেকেই মনে আসে। হাসি ও আনন্দ জানা থাকলে দুটি শব্দ শোনা মাত্র আমরা বোধকরি যে তারা দুটি কাছাকাছি অর্থসম্পন্ন শব্দ। কিন্তু দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে হয়। এই আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান দরকার। অভিজ্ঞতা আহরণের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি পদ্ধতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতিটি কি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করব। ধরা যাক ম্যালেরিয়ার কারণ আমরা জানিনা, ম্যালেরিয়ার কারণ বার করবার আমরা চেষ্টা করছি। প্রথমতঃ লক্ষ্য করা গেল যেসব জায়গায় ম্যালেরিয়া আছে, সে সব জায়গায় মশা আছে, মাছি আছে, আর অনেক দাঁড়কাক আছে। আরও বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা আমরা আহরণ করলাম। দেখলাম দাঁড়কাক যত জায়গায় আছে, ম্যালেরিয়া তত জায়গায় নেই। মাছির বেলাতেও সে কথা দেখা গেল। কিন্তু ম্যালেরিয়া যেখানেই আছে, মশা সেখানেই আছে। অতএব মশা ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে এটা আমরা অনুমান করলাম। এই জাতীয় অনুমানকে প্রকল্প বলা হয়। প্রকল্পের স্বপক্ষে আরও বহু যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহের পর প্রকল্পটিকে মতবাদ বলা চলে।

মানুষ কিভাবে চিন্তা করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে এ কথা সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু সবসময়ে মানুষের পক্ষে কি নির্ভুলভাবে চিন্তা করা সম্ভব? চিন্তার ক্ষমতার জন্য বুদ্ধি দরকার। তেমনি এও দেখা দরকার ইচ্ছা ও আবেগ যেন মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে। ইচ্ছা ও আবেগ যেখানে প্রবল, নিজের আবেগ ও

চিন্তায় পক্ষপাতিত্ব দোষ

ইচ্ছার উপর অহমের যেখানে কর্তৃত্ব কম—চিন্তায় সেখানে বারম্বার ভুল ঘটে। প্রকৃত যুক্তির স্থলে আমরা সেখানে যুক্তি উদ্ভাবন করি। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ গোড়াতেই তার ইচ্ছানুযায়ী কোন মতবাদকে সত্য বলে মেনে নেয়। সেই মতবাদকে সমর্থন করবার জন্য সে তারপর নানা যুক্তির অবতারণা করে। এসব যুক্তি যে সে কেবল অন্যের কাছেই বলে তা নয়, অনেক সময় নিজেও অমন বিশ্বাস করে। এই সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে ঐ মতবাদটির মধ্যে অনেক ভুল আছে এবং যুক্তিগুলিও আংশিক ও ভ্রমাত্মক। এই ধরণের যুক্তিকেই উদ্ভাবিত যুক্তি বা মনগড়া যুক্তি বলা হয়।

আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন

যে ইচ্ছা ও আবেগ নিরপেক্ষ চিন্তায় বাধা জন্মায়, ক্ষেত্র বিশেষে নির্ভুলভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাকে নষ্ট করে সে সব ইচ্ছা ও আবেগ সম্বন্ধে ব্যক্তি অধিকাংশ সময়েই সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন নয়। অস্পষ্ট ও নির্জ্ঞান ইচ্ছা যদি শক্তিশালী হয়—তবে ইচ্ছা মনের উপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, প্রবলভাবে মনকে নিয়ন্ত্রিত করে এমন দেখা গেছে। ঐ ইচ্ছা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সচেতন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলে পর নির্জ্ঞান ইচ্ছার ঐ প্রবল ও রহস্যজনক প্রভাব থেকে মন মুক্ত হতে পারে। এ কারণেই ফ্রয়েড বলেছিলেন—চিন্তশীল ও বিজ্ঞানসাধক সকলেই স্বীয় মনঃসমীক্ষার দ্বারা লাভবান হবেন, চিন্তাজগতে পক্ষপাতিত্ব দোষ কিছুটা দূর হবে। মনঃসমীক্ষা সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষা মানুষকে সাহায্য করতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অধ্যায় ১২

মনোযোগ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান

মানসিক জীবনকে আমরা পূর্বে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছি—চাওয়া ও পারা। চাওয়া সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পারাকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে।

কাজের জন্য প্রথমতঃ জীব তার কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্য নেয়। স্থূলভাবে বলতে গেলে তার হাত পা ইত্যাদি ও সূক্ষ্মভাবে, তার মাংসপেশী ও গ্রাণ্ড কাজের দ্বারা নিজেকে ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে তাকে সাহায্য করে। বাঁচবার জন্য পরিবেশের বৈর অংশের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে। পরিবেশ থেকে আবার সে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে। নিজের ও পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য সাধনের জন্য সে অবিরাম চেষ্ট করে চলে।

কিন্তু সুষ্ঠু সামঞ্জস্য সাধন করতে হলে পরিবেশকে তার জানা দরকার হয়। পরিবেশকে জানবার জন্য মানুষের প্রথমতঃ আছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা। জ্ঞানেন্দ্রিয়দের সাহায্যে মানুষ দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ নেয় ও আস্বাদন করে। বহির্জগত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য হচ্ছে প্রথম সোপান।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

নিজের মনের তরঙ্গ—আবেগ ও ইচ্ছা প্রভৃতিকে আমরা সোজাসুজি উপলব্ধি করি। একে অন্তর্দর্শন বা অন্তরোপলব্ধি বলা যেতে পারে। নিজের মনকে জানবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য দরকার হয় না। যদিও অন্যকে জানবার জন্য তা দরকার হয়। অন্যের মনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই। তাদের কথাবার্তা, হাবভাব ও আচরণ থেকে তাদের ইচ্ছা ও আবেগকে আমরা অনুমান করি। সময় সময় মনে মনে তাদের সঙ্গে এক হয়েও আমরা তাদের বুঝি।

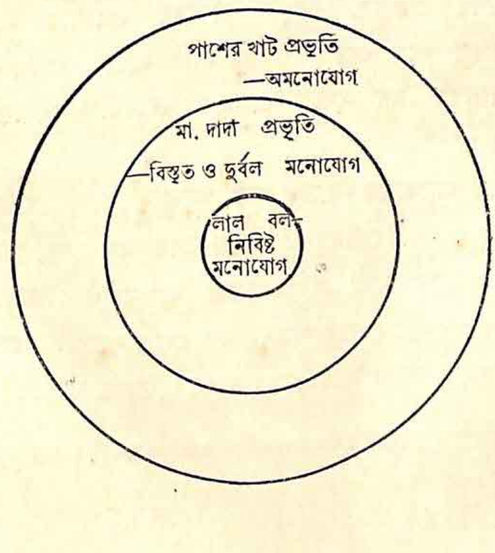
বহির্জগত ও মনকে জানতে হলে মনোযোগ দরকার। পরিবেশে কত

কিছুই আছে। সব জিনিস আমরা দেখি না, জানি না। পরিবেশের যে অংশটুকুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই—সেটুকুকেই আমরা জানি। মনোযোগ একটি ক্রিয়া—মনঃসংযোগ করা। কোন ঘটনা, যেমন মেঘের গর্জন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেখানে আমরা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। কিন্তু একখানি কঠিন বই পড়তে হলে বার বার পড়ে তার অর্থ উদ্ধার করতে হয়। সেখানে মন প্রবল ভাবে সক্রিয়। একথা স্মরণ রাখা দরকার মনোযোগ ব্যাপারে মন কখনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নয়। তবে মনের সক্রিয়তার তারতম্য আছে।

মনোযোগ

পরিবেশের একটি অংশকে মন নির্বাচন করে—তাতে মনঃসংযোগ করে। লেখক এই মুহূর্তে মনোযোগ অধ্যায়টি লেখার মধ্যে নিজের মনকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। কিন্তু টেবিলের উপর ছাইদানি, জাতীয় পতাকা ও টেবল ল্যাম্পটিকেও তিনি অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন। রাস্তার মোটরের শব্দও তাঁর কানে ভেসে আসছে। এসব ঘটনা মনোযোগের কেন্দ্রে নেই, কিন্তু মনোযোগের ক্ষেত্রে বা পরিধির মধ্যে রয়েছে। কেন্দ্রীভূত ও নিবিষ্ট মনোযোগের দ্বারা বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। যেখানে মনোযোগ দুর্বল ও আংশিক—সেখানে জ্ঞান অস্পষ্ট। নীচের রেখাচিত্রের দ্বারা একটি শিশুর মনোযোগ একই মুহূর্তে কোথায় নিবিষ্ট কোথায় বিস্তৃত—কোনখানে একেবারেই পৌঁছচ্ছে না—তা দেখান হয়েছে।

নিবিষ্ট ও বিস্তৃত মনোযোগ



শিশুর মা ও দাদা ঘরে রয়েছে। শিশুকে একটি লাল বল দেখান হচ্ছে। সে মন দিয়ে তা দেখছে। ধরবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। দাদা ও মার উপস্থিতি সম্বন্ধে সে অস্পষ্ট ভাবে সচেতন রয়েছে। কিন্তু পাশের খাটটা ঐ মুহূর্তে তার মনের সম্পূর্ণ অগোচরে রয়েছে। সে ঐটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। বলের প্রতি তার মনোযোগ নিবিষ্ট, মা ও দাদার প্রতি বিস্তৃত। *

মনোযোগ আকর্ষণ

পরিবেশের কোন তথ্য বা ঘটনার সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটানোকে মনোযোগ বলা যায়। কি জাতীয় উদ্দীপক বিশেষ করে মনোযোগ আকর্ষণ করে—এ সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে।

(১) উদ্দীপকের তীব্রতা। তীব্র আলো, উচ্চ শব্দ প্রভৃতি স্বতঃই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(২) পরিবেশ বা উদ্দীপকের পরিবর্তন। শব্দ বা নৈঃশব্দ কিছুক্ষণ একটানা হবার পর তার প্রতি আমরা আর মন দিই না। কিন্তু শব্দ হতে হতে হঠাৎ থেমে গেলে, ঘরটি নূতন করে সাজালে—ঐসব পরিবর্তন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মনোযোগে দুটি জিনিসের পার্থক্য আমাদের মনকে আকর্ষণ করে।

(৩) নিকষ কালো পটভূমির উপর একটি সাদা বিন্দু আমাদের চোখে পড়ে।

মনোযোগ দেওয়া বা না-দেওয়া ব্যাপারে মনের নিজস্ব ধর্ম আছে। কিছুটা পরিবেশের প্রভাবে, কিছুটা অন্তরের প্রেরণায় মনে আমাদের নানারকম ভাবগ্রন্থি গড়ে ওঠে। শিশুর প্রতি মায়ের, রোগ ও রোগী সম্বন্ধে ডাক্তারের, মানুষের মন সম্বন্ধে একজন মনঃসমীক্ষকের বিশেষ ধরণের মনোভাব রয়েছে।

শিশুর সামান্য ভালোমন্দ মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রোগীর হৃদপিণ্ডের চলাচলের ন্যূনতম পরিবর্তনের প্রতি ডাক্তার মন দেন, মানসিক রোগীর আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন কথা মনঃসমীক্ষক মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এ সমস্তকে কিছুটা মনোযোগ দেবার অভ্যাস বলা যেতে পারে। প্রধান কারণ, ঐ সব ব্যক্তি বা বিষয়কে আশ্রয় করে এদের মনের বিশেষ ভাবগ্রন্থি ও জ্ঞানগ্রন্থি

* নিবিষ্ট মনোযোগকে ইংরেজীতে Focussed attention ও বিস্তৃত মনোযোগকে marginal attention বলা হয়।

গড়ে উঠেছে। তারই ফলে, আপাতদৃষ্টিতে যা সামান্য—এঁদের কাছে তা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং ঐসব তথ্য এদের মনকে আকর্ষণ করে।

অনেকসময়ে কোন ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাময়িক প্রয়োজনে। ভাবগ্রন্থিদের মত সে সব সাময়িক প্রয়োজন মনের স্থায়ী অংশ নয়। পূজার ছুটি সামনে, কোথাও বেড়াতে যাব ভাবছি। খবরের কাগজে বিভিন্ন জায়গার হোটেলের বিজ্ঞাপন—যা অন্যসময় চোখে পড়ে না—এখন বিশেষভাবে চোখে পড়ছে।

স্বতঃস্ফূর্ত ও ঐচ্ছিক মনোযোগ

একটি উচ্চ শব্দের প্রতি মানুষের মনোযোগকে স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ বলা হয়। একটি ছেলে যখন পড়ে তখন চেষ্টা করে সে মনোনিবেশ করে। তাকে ঐচ্ছিক মনোযোগ বলা চলে। শৈশব জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের স্থানই বেশী। নিজের দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি শিশুর কর্তৃত্ব কম। তেমনি নিজের মনও তার অধীন নয়। ইচ্ছা করে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে কঠিন, প্রায়ই অসম্ভব। শিশুকে যে সব বিষয় ও বস্তু স্বভাবতঃই আকর্ষণ করে—ঐ কারণে নার্সারি স্কুলে সে সবের ব্যবস্থা হয়েছে। শিশু যত বড় হয় তার কাছ থেকে সে পরিমাণে ঐচ্ছিক মনোযোগ দাবী করা হয়। কারণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে অধিকতর সম্ভব।

আগ্রহ ও মনোযোগ

আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গতা রয়েছে। ম্যাক্‌ডুগালের (১) ধারণা আগ্রহ ও মনোযোগ একটি মানসিক সত্যের দুটি দিকমাত্র। মনোযোগ হচ্ছে কার্যে রূপায়িত আগ্রহ, আগ্রহ হচ্ছে মনোযোগের সম্ভাবনা।

আগ্রহের মূল—প্রবৃত্তি ও ভাবগ্রন্থি

আগ্রহ ও মনোযোগের কারণ শেষ পর্যন্ত জীবের প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ইঁদুরের প্রতি বিড়ালের আগ্রহ ও মনোযোগের কারণ—বিড়ালের প্রকৃতি, বিড়ালের শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি। উচ্চ শব্দের প্রতি শিশুর মনোযোগের কারণ—তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন। উচ্চ শব্দকে সে বিপদের সঙ্কেত বলে অনুভব করে। জীবের কাছে উদ্দীপকের অর্থ বা তাৎপর্য কি তা স্থির করে জীবের প্রবৃত্তি, প্রেরণা, ভাবগ্রন্থি ও জ্ঞানগ্রন্থি।

শিক্ষা শিশুকে আকর্ষণ করবে, শিক্ষা শিশুর আগ্রহকে জাগ্রত করবে—আধুনিক শিক্ষাবিদরা এমন চেষ্টা করেন। শিক্ষার এই আগ্রহ-উদ্দীপক গুণটি কি? যা শিশুর মনোরঞ্জন করে, শিশুকে আমোদ ও আনন্দ দেয়, কেবলমাত্র তাকেই আগ্রহ-উদ্দীপক বলে কারো কারো ধারণা। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। যে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া শিশু উপযুক্ত মনে করে, যে বিষয়টি তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয়—সেটাই তার আগ্রহকে জাগ্রত করে। কোন বিষয় তার কাছে অর্থপূর্ণ বা মনোযোগের উপযুক্ত বলে মনে হবে—সেটা নির্ভর করে শিশুর মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতার উপর। খেলা শিশুর কাছে গভীর ভাবে অর্থপূর্ণ। খেলাতে তার আগ্রহের শেষ নেই। সেই আগ্রহকে মূলধন করে শিশুকে বহু জিনিস শেখান সম্ভব। আগ্রহ জাগ্রত হলে কঠিন দৈহিক ও মানসিক শ্রমে শিশু পশ্চাদপদ হয় না।

আগ্রহের স্বরূপ

একটি লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি পথ বা উপায় আছে। লক্ষ্যে পৌঁছবার আগ্রহ যদি শিশুর থাকে—তবে অনেক সময় পথ বা উপায়টিতেও শিশুর আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। দূরবর্তী লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলবার শক্তি শিশুর কম, বয়স্কদের মধ্যেও খুব বেশী আছে বলে মনে করবার কারণ নেই। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা প্রায় যখন এসে পড়ে তখন পড়াশোনা করে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা তাদের লক্ষ্য। কিন্তু পরীক্ষা কাছাকাছি আসা না পর্যন্ত পড়াশোনা করবার তেমন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। ছোট শিশু প্রধানতঃ বর্তমানে বাস করে। শিক্ষামূলক কর্মে নগদ মূল্য না পেলে—তাতে তার আগ্রহ ও আনন্দের অভাব ঘটে। কিছু বড় হলে বর্তমান জীবনের বাইরে তাকাবার ক্ষমতা তার জন্মায়। কোন একটি উদ্দেশ্যকে যদি নিজের বলে গ্রহণ করে, তবে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পন্থা অবলম্বন আবশ্যক—সে পথেও তার আগ্রহ জন্মায়।

লক্ষ্য থেকে উপায়ে আগ্রহের সঞ্চারণ

লিখতে সব ছেলেমেয়ে ভালোবাসে না। কিন্তু তাদের অভিনয়ে তারা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করবে। সেজন্য চিঠি লেখা দরকার। দেখা যায়—লেখার প্রতি যাদের স্বাভাবিক অনুরাগ নেই তারাও অনেকে চিঠি লেখবার জন্য এগিয়ে আসে। অভিনয় করে সকলকে তারা দেখাতে চায়। এটি লক্ষ্য। চিঠি লিখে সকলকে আহ্বান করা—এটা পন্থা। লক্ষ্য থেকে আগ্রহ পথে সঞ্চারিত হয়।

গোড়াতে লেখাতে এভাবে আগ্রহ সঞ্চারিত হবার পর সময় সময় সে বিষয়ে একটি স্থায়ী আগ্রহ জন্মায়। উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, লেখাই তখন কিছু পরিমাণে উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সকলের বেলাতে না হলেও—কারো কারো বেলাতে এমন হয়। আগ্রহের বিষয়ান্তরণ সম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। দিল্লীতে বেড়াতে যাওয়া উপলক্ষে একটি ছেলে টাইম টেবেল দেখতে শিখল—কখন কোন ট্রেন ছাড়বে, কখন গন্তব্য স্থলে পৌছবে, দিল্লীর কত ভাড়া ইত্যাদি। তারপর থেকে দেখা গেল টাইম টেবল সম্বন্ধে তার একটা স্থায়ী আগ্রহ জন্মেছে। সে প্রায়ই টাইম টেবল দেখত। কোথায় কোন ট্রেন যায়, কতগুলি মেল ও এক্সপ্রেস আছে, বিভিন্ন জায়গায় যেতে কত সময় লাগে, ভাড়া কত ইত্যাদি। সঞ্চারিত আগ্রহের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

এখানে একটি কথা যোগ করা দরকার। অনেক সময় বাইরে থেকে বিষয়টি নীরস মনে হলেও ভিতরে প্রবেশ করলে পর বিষয়টি শিশুর ভালো লাগে। চেষ্টার দ্বারা গোড়াতে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তারপর বিষয়টির যথার্থ মূল্য শিশু বুঝতে পারে। চিঠি লেখবার প্রেরণায় শিশু লেখা কিছু আয়ত্ত করে, তারপর থেকে সে লিখতে ভালোবাসে। ঐ ক্ষেত্রে লেখা সম্বন্ধে শিশুর আগ্রহকে—আগ্রহের বিষয়ান্তরণ বল্লেই শেষ হয় না। লিখতে গিয়ে লিখতে পেরে শিশু লেখাকে আত্মপ্রকাশের একটি সুচারু অভিব্যক্তিরূপে আবিষ্কার করে। লেখার সম্বন্ধে তার সুপ্ত আগ্রহ জাগ্রত হয়।

এসব কাজকে আমরা স্বৈচ্ছিক মনোযোগের দৃষ্টান্ত বলি। মনের উপর ঐসব ক্ষেত্রে অহমের কর্তৃত্ব আছে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সম্বন্ধ অহম বোঝে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায়ের প্রতি স্বেচ্ছায় অহম মনোযোগ দেয়।

নীরস কাজ কি শিক্ষামূলক ?

জীবনে নীরস ও কঠিন কাজ মানুষকে অনেক করতে হয়। শৈশবে নীরস ও কঠিন কাজ করেই পরবর্তী কালে ঐ জাতীয় কাজে মনোযোগ দেবার যোগ্যতা মানুষ লাভ করতে পারে এমন অনেকে মনে করেন। কঠিন কাজ ও নীরস কাজ—দুটি এক নয় গোড়াতে এ কথা বলা দরকার! শিক্ষায় কঠিন কাজের স্থান আছে। কিন্তু সে কাজের অর্থটি শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হবে, সে কাজে শিক্ষার্থীর অগ্রহ থাকবে

—শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে এটি দাবী করা সঙ্গত হবে। কিন্তু যে কাজ শিশুর একেবারেই ভালো লাগে না, যাতে তার কোন উৎসাহই নেই সে কাজ করলে কাজের প্রতি শিশুর অধিকতর বিতৃষ্ণা জন্মাবে, আগ্রহ নয়।

শিক্ষায় একাগ্রতা ও অধ্যবসায়

একটি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী স্বেচ্ছাকৃত নিবিষ্ট মনোযোগকে একাগ্রতা বলা চলে। শিক্ষার সাফল্যের জন্য দীর্ঘদিনের একাগ্র সাধনা আবশ্যক—এ কথা আমরা জানি। একাগ্র সাধনার ক্ষমতা বা অধ্যবসায় সকলের সমান নয়। এ সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগৎকে জানি। 'কলেজের ঘণ্টা কানে আসে। এগরোটা বাজলো। এবার শিক্ষানীতির লেকচার।' প্রশ্ন এই, এর মধ্যে কতটুকু আমরা শুনলাম—আর কতটুকু মন থেকে, পূর্ব অভিজ্ঞতা

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

থেকে যোগ করলাম। এগারোটার ঘণ্টা, শিক্ষানীতির ক্লাস, এসব শোনবার ব্যাপার নয়। সুতরাং এদের বাদ দেওয়া যেতে পারে। শুনলাম কতটুকু? কলেজের ঘণ্টা? না তাও নয়। ঘণ্টা? শব্দটি যে ঘণ্টার—তাও তো শোনবার ব্যাপার নয়। কেবল মাত্র শব্দ? কিন্তু একে যে শব্দ বলে—সেও আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি। সুতরাং বলা যেতে পারে শব্দ আমাদের কানে কেবলমাত্র একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। শব্দ সম্বন্ধে নবজাত শিশুর অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। ঐ আলোড়ন থেকে আমরা বল্লাম—কলেজের ঘণ্টা। এগারোটা বাজল। এবার শিক্ষানীতির লেকচার।

ঐ আলোড়নটুকুই ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য। ঐ তথ্যে অর্থযোগ করে পরিবেশ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। ঐ অর্থ এল কোথা থেকে? উত্তরে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা প্রথমে বলতে হয়। দেখে, শুনে, অভিজ্ঞতা লাভ করে আমরা শিখি। সে অভিজ্ঞতা মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য মনের দুয়ারে ঘা দেওয়া মাত্র—পূর্ব অভিজ্ঞতার সহায়তায় তার অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। এ ব্যাপারে মনের কিছু ক্রিয়াও আছে। অতীতের অভিজ্ঞতা ও বর্তমানের ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের মধ্যে যোগসাধন মনই করে। পাঠক বা পাঠিকা বই পড়ছেন। কি দেখছেন? কতগুলি কালো কালো চিহ্ন। সেগুলি যে কালো, সেগুলি যে চিহ্ন —সেটুকুও তিনি লক্ষ্য করছেন না। কালোচিহ্নগুলি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি

তার অর্থ বুঝতে পারছেন। এই জন্যেই ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যকে আমরা বাস্তব সত্যের চিহ্ন বা সঙ্কেত বলতে পারি।

ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও জ্ঞানগ্রন্থি

ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের—পার্থক্য প্রথমতঃ স্মরণ রাখা আবশ্যক। একটি জিনিষকে দেখামাত্র শিশু 'বল' বলে। বল দেখা মাত্র সেটা খেলার বস্তু সে বুঝতে পারে। একে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বলব। এ জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য থেকে শিশু পেয়েছে। একে আমরা পূর্বে বাস্তব সত্যের চিহ্ন বলেছি। কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য কতখানি অর্থজ্ঞাপক এটি নির্ভর করে একজনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর। দেহের উত্তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হলে তাকে আমরা জ্বর বলি। কিন্তু জ্বর কি জাতীয়, ঐ জ্বর দেহযন্ত্রের কোন ধরণের বিকারের চিহ্ন, এটা ডাক্তার বোঝেন। যে বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা এমনটি সম্ভব তাকে জ্ঞানগ্রন্থি বলা চলতে পারে।

আমরা দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু অনুভব করছি তাকেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বলব। শিশু বল দেখছে, ছাত্রছাত্রীরা ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে। বিচার করলে দেখা যায়—এই দেখা ও শোনার মধ্যে চিহ্ন ও তার অর্থ দুইই রয়েছে। কিন্তু ঐ পার্থক্য আমাদের মনের কাছে স্পষ্ট নয়। দেখা ও শোনাকে ছাড়িয়ে সচেতন ভাবে যখন আমরা এগুলি অন্য কোন ঘটনার সঙ্কেত রূপে মনে করি—যেমন ঘণ্টা কি জ্ঞাপন করছে—তখন তাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান না বলে জ্ঞানগ্রন্থি বলাই সঙ্গত হবে।

প্রত্যক্ষের সীমা

ট্যাচিস্‌টোস্কোপের সাহায্যে একসঙ্গে এক-দশমাংশ কি এক-পঞ্চমাংশ সেকেণ্ড কাল ধরে কার্ডে আঁকা কতগুলি বিন্দু পরীক্ষার্থীদের দেখান হল। লক্ষ্য করা গেছে ৪টি বিন্দু পর্যন্ত দেখতে পরীক্ষার্থীরা ভুল করেন না। ৫টি বিন্দুর বেলাতে দু এক বার ভুল হয়। বিন্দুর সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভুলের পরিমাণও বেড়ে যায়। ১২টির বেশী বিন্দু থাকলে দেখাটা অনুমানের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। কেউ বেশী পারেন—কেউ কম পারেন। একজন ব্যক্তি সব সময়ে সমান পারেন না। বিন্দুর সংখ্যা বেশী হলে পরীক্ষার্থী কয়েকটি গ্রুপে ফেলে বিন্দুগুলিকে গুণবার চেষ্টা করেন। ৩।৪ টি পর্যন্ত একটি গ্রুপ, ৭।৮ টি হলে দুটি গ্রুপ ইত্যাদি। তখন একেকটি গ্রুপই তার কাছে একেকটি একক বা ইউনিট হয়।

অক্ষর পড়ার ব্যাপারেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। পরীক্ষার্থী কয়েকটি অক্ষরকে একেকটি গ্রুপভুক্ত করে দেখেন। কয়েকটি শব্দ—যেমন কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পড়তে দিলে দুটি তিনটি শব্দ পর্যন্ত তিনি একসঙ্গে পড়তে পারেন। শব্দগুলি যদি একটি বাক্য কিম্বা বাক্যাংশ রচনা করে—তবে ২০টি অক্ষরযুক্ত একটি বাক্য বা বাক্যাংশ পরীক্ষার্থী এক সঙ্গে পড়তে পারেন। (১)

১২টি বিন্দু একসঙ্গে পড়তে গেলে পরীক্ষার্থী ভুল করেন। উত্তরে হয়ত ৯ থেকে ১৩'র মধ্যে একটি সংখ্যা তিনি বলেন। এ ভুলকে 'চঞ্চল বিক্ষেপ' বলা যেতে পারে। যদি অধিকাংশ সময় তিনি বেশী না বলে কম বলেন (কিম্বা কম না বলে বেশী বলেন) তবে ঐ ধরণের ভুলকে 'ধ্রুব বিক্ষেপ' বলা হয়। ১২কে কেন্দ্র করেই ভুল বিক্ষিপ্ত হয়। এ কারণেই এ জাতীয় ভুলকে বিক্ষেপ বলাই সঙ্গত। চঞ্চল বিক্ষেপে পরীক্ষার্থী সঠিক সংখ্যার চেয়ে কমও বলতে পারেন, বেশীও বলতে পারেন। এ জাতীয় বিক্ষেপের গতিমুখের কোন স্থিরতা নেই। ধ্রুব বিক্ষেপের গতিমুখ একদিকে—এক হলে বেশী, নইলে কম।

পরীক্ষার্থী যদি তার ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে অভ্যাসের দ্বারা ধ্রুব বিক্ষেপ কাটিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু চঞ্চল বিক্ষেপের হাত হতে মুক্তি পাওয়া কঠিন। অমন বিক্ষেপের কারণ জীব প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে। বহু অভ্যাসের দ্বারা 'চঞ্চল বিক্ষেপের' পরিমাণ কিছুটা কমান যেতে পারে। (২)

ওয়েবারের নিয়ম

চঞ্চল বিক্ষেপ সম্বন্ধে ওয়েবার (৩) একটি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। যা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়—তার পরিমাণের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত চঞ্চল বিক্ষেপের পরিমাণ হয়। একটি ১৫ ফুট লম্বা বাঁশের দৈর্ঘ্য অনুমান করতে পরীক্ষার্থীর কয়েক ফুট ভুল হবার সম্ভাবনা। ১৫ ইঞ্চি একটি লাইনের দৈর্ঘ্য অনুমানে হয়ত তিনি কয়েক ইঞ্চি ভুল করবেন (কয়েক ফুট নিশ্চয়ই নয়)। এ নিয়মটি মোটামুটি সত্য। তবে নির্ধারণ সাপেক্ষ পরিমাণ যখন খুব কম—যথা ১/৮ ইঞ্চি তখন ভুলের পরিমাণের অনুপাতটি আবার বেড়ে যায় দেখা গেছে।

এ নিয়মটিকে আরেকভাবে প্রকাশ করা চলে। দুটি দৈর্ঘ্য কিম্বা দুটি ওজনের পার্থক্য কি পরিমাণ হলে আমরা বুঝতে পারি? ধরা যাক—২ সের ওজন ও ২ সের ১ তোলা ওজন। পর পর দুটি ওজন কোন এক হাতে কিম্বা একই সঙ্গে ওজন দুটিকে দুই হাতে আমি তুললাম। দুটি ওজনের পার্থক্য খুব সম্ভবতঃ

আমার বোধগম্য হবে না। কিন্তু এক তোলা ওজন এবং দুই তোলা ওজনের পার্থক্য বুঝতে কারো একটুও দেরী হয় না। পার্থক্য বোঝবার দিক থেকে —পরিমাণদ্বয়ের আনুপাতিক পার্থক্যটাই প্রধান কথা। অনুপাতটি একটি সীমা পর্যন্ত মোটামুটি এক এমন দেখা গেছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে 'ন্যূনতম বোধগম্য পার্থক্য' মোট পরিমাণের এক ধ্রুব ভগ্নাংশ।

গেষ্টাল্ট বা সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ

যা-কিছু আমরা দেখি, শুনি সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, আলাদা আলাদা —কোন কোন মনোবিদ্‌দের লেখা থেকে এরূপ ধারণা হয়। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ফলে ঐ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এ সব অনুসন্ধানে অগ্রণী ছিলেন ভারথাইমার, কফকা ও কোয়েলারের প্রভৃতি গেষ্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ। একটি পটভূমি ও কয়েকটি অঙ্কন যদি প্রত্যক্ষ করা হয় তবে দেখা যায়—পটভূমি অঙ্কনকে, অঙ্কন পটভূমিকে ও অঙ্কনগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। দেখা শোনা প্রভৃতিতে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ের বিভিন্ন অংশাবলী মিলে মিশে একটি সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করে। অংশগুলির গাণিতিক যোগ ফলের থেকে ঐ সমগ্রতা বেশী। (৪) তিনটি লাল বাক্স পাশাপাশি সাজান। একটি গাঢ় লাল, আরেকটি একপোঁচ কম লাল; শেষটির লাল রং দ্বিতীয়টির চেয়েও ফিকে। মাঝামাঝি রঙের লাল বাক্সটিতে কলা থাকে। একটি শিম্পাঞ্জী এসে রোজ তার থেকে কলা নেয়। একদিন গাঢ় লাল বাক্সটি সরিয়ে তৃতীয়টির চেয়েও ফিকে লাল একটি বাক্স সেখানে রাখা হল। শিম্পাঞ্জীটি এসে কলার খোঁজ করল ঐ বাক্স তিনটির মাঝের লাল বাক্সটিতে। সেটা আগের সারিতে সব চেয়ে কম লাল ছিল। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনটে লাল বাক্স ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ শিম্পাঞ্জীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাক্সগুলিকে আলাদা আলাদা করে সে দেখে নি। রঙের সম্বন্ধকে ভিত্তি করে কলার অনুসন্ধান সে করেছিল বলেই দ্বিতীয়বার সে অমন ভুল করল।

পরের পাতায় দুটি অঙ্কন রয়েছে। (ক) অঙ্কনটিকে আমরা দেখি— উপর থেকে নীচে; (খ) অঙ্কনটিকে দেখি পাশাপাশি। অঙ্কনগুলির পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আমাদের প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

| × | ×   × × × ×

| × | × | | | |

—ক—   —খ—

গেষ্টাল্ট মনোবিদরা মনে করেন উদ্দীপকসমূহকে একটা প্যাটার্ণে সাজিয়ে দেখবার পদ্ধতি কিছুটা সহজাত। তবে শিক্ষারও ঐ বিষয়ে কিছু স্থান আছে। ইচ্ছা, মনোভাব, আশা, প্রস্তুতি—এসবের দ্বারাও আমাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হয়।

রজ্জুকে সর্পভ্রম, শুক্তিকে মুক্তাভ্রম করার কথা আমরা জানি। এ জাতীয় ভুলকে আরোপ ভ্রম বা সংক্ষেপে ভ্রম বলা যেতে পারে। আরোপ ভ্রম বলার কারণ—রজ্জুতে সর্পের গুণাবলী, শুক্তিতে মুক্তার গুণাবলী আরোপ করার দরুণ ভ্রম সৃষ্টি হচ্ছে। এ জাতীয় ভ্রমের মূলে ব্যক্তির আবেগ বা ইচ্ছার শক্তি রয়েছে। সাপের ভয় যার বেশী—দড়ি দেখলে তার সাপ মনে হয়। ডুবুরি মুক্তার সন্ধানে ডুব দেয়; মুক্তা সে পেতে চায়। শুক্তি দেখে সেটিকে ক্ষণেকের জন্য তার মুক্তা বলে ভ্রম হয়। স্বাভাবিক লোকের পক্ষে এ জাতীয় ভ্রম সাময়িক। ভালো করে প্রত্যক্ষ করবার পরে তাদের ভ্রম অপনীত হয়।

প্রত্যক্ষে ভ্রম অথবা আরোপ ভ্রম

কিন্তু কোন কোন মানসিক রোগী ঐ জাতীয় ভ্রমকে সংশোধন করতে পারে না। কোন একটি শব্দ সে শুনল। তার ধারণা হল তাকে গুলি করে মারবার জন্য কেউ বন্দুক ছুঁড়ছে। নিজের অস্বাভাবিক ভয়, তার ব্যাধিজনিত ভ্রান্তি* তাকে এতখানি অভিভূত করে রেখেছে যে সত্যকে স্বচ্ছ চোখে দেখবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

অভ্যাস বশতঃ ভ্রম

ভুল লেখা আছে। আমরা ঠিক পড়ে গেলাম। এসব ব্যাপারে অভ্যাসকে দায়ী মনে করা যেতে পারে। যেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি আমরা আশা করেছি—তেমন আমরা পড়েছি।

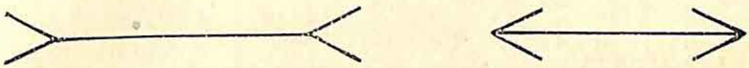
পরের পৃষ্ঠায় রেখাঙ্কন দেখুন। (ক) পাশাপাশি দুটি রেখার মধ্যে বাঁ

* ভ্রান্তি বলতে আমরা বুঝি 'ভ্রান্ত বিশ্বাস' কিম্বা 'অমূল প্রত্যয়'। অস্বাভাবিক শিশু অধ্যায়ে ভ্রান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

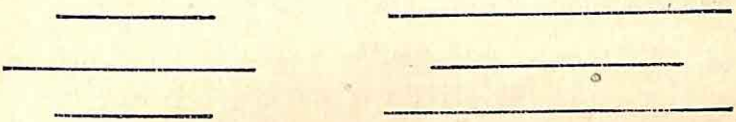
দিকেরটিকে বড় মনে হয়। কিন্তু আসলে এগুলি সমান। (খ) তিনটি তিনটি করে ছয়টি রেখা পাশাপাশি আঁকা। তাদের মাঝখানের দুইটি রেখা অসমান মনে হলেও সেটা সত্য নয়। এই ভ্রান্তির কারণ কি? যে রেখাগুলির দৈর্ঘ্য আমরা বিচার

কতকগুলি কৌতূকজনক ভ্রম

(ক)



(খ)



করব—অন্যান্য রেখা থেকে তাদের আলাদা করে আমরা দেখতে পারছি না। অন্যান্য রেখার সঙ্গে উভয় ক্ষেত্রেই ঐ রেখাদ্বয়ের একটি সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের ফলে তাদের একটিকে ছোট, অপরটিকে বড় দেখাচ্ছে। সম্বন্ধযুক্ত সমস্ত ড্রয়িংটাকেই আমরা দেখছি।

অমূল প্রত্যক্ষ

ঘরে পাঁচজন লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি কালো বিড়াল চেয়ারের পাশে বসে আছে বলে দেখল। বাকি চারজন সেখানে কোন বিড়াল দেখছে না। কোন শব্দ নেই—তবু কেউ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এ ধরনের ভুলকে অমূল প্রত্যক্ষ বলে। অমূল প্রত্যক্ষের সঙ্গে আরোপ ভ্রমের পার্থক্য এই যে ভ্রমে একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস বলে ভুল হয়। দুই বা ততোধিক জিনিসের সম্বন্ধ বোঝার ভুলকেও ভ্রম মনে করা হয়। কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষের কোন উদ্দীপক বা মূল নেই—তবু প্রত্যক্ষ করছি—তেমন মিথ্যা প্রত্যক্ষ হচ্ছে অমূল প্রত্যক্ষ। অমূল প্রত্যক্ষ সবখানিই ব্যাধিগ্রস্ত মনের প্রক্ষেপ।

অধ্যায় ১৩

ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি*

যে কোন দুটি মানুষের দিকে যদি আমরা তাকাই, যে কোন দুটি শিশুকে যদি আমরা দেখি—তবে দেখব তারা একরকম নয়। যে কোন বিষয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পার্থক্য আছে। বুদ্ধির কথাই ধরা যাক। রামের যতখানি বুদ্ধি, শ্যামের ততখানি বুদ্ধি নয়। শ্যাম আবার হরির চেয়ে বুদ্ধিমান। মালতী মেয়েটি মিষ্টি কিন্তু সাদাসিদে, বুদ্ধি ব্যাপারে চতুর—এমন কথা কেউ বলবে না।

বুদ্ধি কাকে বলে?

বেশী, কম, খুব অল্প এসব বিশেষণের সাহায্যে সঠিক কিছু বোঝায়না। মনোবিদ্‌রা তাই বুদ্ধির ঠিক আঙ্কিক পরিমাপ করবার চেষ্টা করেছেন।

নতুন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন হচ্ছে বুদ্ধি

কিন্তু বুদ্ধি কি? প্রশ্নটি কঠিন। নতুন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন হল বুদ্ধি। পিন্‌ট্‌নার (১) নতুন কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলেছেন। নতুন কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ান ব্যাপারে জ্ঞানগত ক্ষমতা ও আবেগজনিত ক্ষমতা দুইয়েরই দরকার হয়। এখানে জ্ঞানগত ক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে।

আবার অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হবার ক্ষমতাকেও বুদ্ধি বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে বুদ্ধির এই দুটি সংজ্ঞা একই ব্যাপারকে দেখবার দুটি দিক।

অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হওয়াই বুদ্ধি

মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সে শেখে। সেই শিক্ষা ভবিষ্যতে সে কাজে লাগায়। তার লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা নতুন একটি পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তাকে সাহায্য করে। দ্বিতীয় সংজ্ঞাতে অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বুঝতে পারার

---

* এ অধ্যায়টির বিষয়বস্তু বোঝবার জন্য 'পরিসংখ্যান' অধ্যায়টি থেকে—পারম্পর্য ও ঐক্যাঙ্ক কি, প্রাকৃতিক বিন্যাস কাকে বলে—জেনে নিলে সুবিধা হবে।

উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংজ্ঞায় সে ক্ষমতাকে কাজে লাগানর কথা বলা হয়েছে। শেখবার ক্ষমতা বুদ্ধি একথা নিশ্চয়ই সত্য। (২) শেখবার ক্ষমতা, বিশেষতঃ লেখাপড়া শেখবার ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলা চলে। শিক্ষার সঙ্গে, বিশেষতঃ লেখাপড়া শেখার সঙ্গে বুদ্ধির একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধি অত্যন্ত কম থাকলে লেখাপড়া শেখা সম্ভব নয়। মাঝারি ধরণের বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কিছু লেখাপড়া শিখতে পারে। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ বুদ্ধি থাকা দরকার। এই উক্তিগুলির সঠিক অর্থ পরে আলোচনা করা হবে।

শেখবার ক্ষমতা বুদ্ধি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুদ্ধি থাকলে কি হয় এটা কিছুটা বোঝা গেলেও বুদ্ধি কি—এটা স্পষ্ট হল না। বুদ্ধি থাকলে শিশু শেখে। কিন্তু কেন, কি ভাবে? একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। তিনটি দুবছরের ছেলে। ক বিশেষ বুদ্ধিমান, খ মাঝারি ও গ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনজনকে আলাদা করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। একটা হ্যারিকেনের লণ্ঠন। প্রত্যেকে তাতে হাত দিল। হাতে গরম লাগা মাত্র প্রত্যেকে হাত সরিয়ে নিল। পরদিন হ্যারিকেনটা গ'র কাছে দেওয়া মাত্র আবার হাত দিল। আবার সে হাত পোড়াল। প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে সে কিছু শেখেনি। ক ও খ'র সামনে লণ্ঠনটি আবার ধরাতে তারা সভয়ে তাকাল, কিন্তু কেউ হাত দিল না। ক ও খ'র কাছে একটা জ্বালানো মোমবাতি দেওয়া হল। খ হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। লণ্ঠন ও জ্বালানো মোমবাতির সাদৃশ্য সে ধরতে পারেনি। ক হাত বাড়াল না। লণ্ঠন ও জ্বালানো মোমবাতির সাদৃশ্য সে ধরতে পেরেছে।

একটি লণ্ঠন পর পর দিলেও সে দুটি যে এক বা একরকম—বুদ্ধি খুব কম থাকায় গ ধরতে পারল না। খ'র বুদ্ধি কিছু বেশী। তাই সেটা সে বুঝতে পারল। কিন্তু লণ্ঠন ও মোমবাতির সাদৃশ্য সে ধরতে পারল না। ক'র বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী। তাই লণ্ঠন ও মোমবাতির সাদৃশ্য তার চোখে ধরা পড়ল।

জগৎ (বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ) সম্বন্ধে জ্ঞানকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের তথ্য আহরণ করি। মনের সাহায্যে অন্তর্জগতের। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, ত্বক দিয়ে স্পর্শ করি, জিহ্বা ও নাক দিয়ে আমরা যথাক্রমে আস্বাদ ও ঘ্রাণ গ্রহণ করি। নিজের মনে যে সব ভাবনা

সম্বন্ধ বোঝাবার ক্ষমতা বুদ্ধি

চিন্তা, ইচ্ছা ও আবেগের উদয় হয় সেগুলিকে আমরা সোজাসুজি জানি। এই ভাবে ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা কিম্বা সে সবের বিভিন্ন গুণাবলী সম্বন্ধে আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করি। এসব অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের তথ্যের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। তথ্যসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বোঝা জ্ঞানের আরেকটি দিক। সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত ঃ দুটি বল—একটি অপরটির চেয়ে বড়। ভালো মন্দ—শব্দ দুটি বিপরীত অর্থবাচক। তথ্যসমূহের সম্বন্ধকে জানবার ও বোঝবার ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলে। যার বুদ্ধি বেশী, তথ্যসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ অনেক বেশী সে ধরতে পারে। যার বুদ্ধি কম, সম্বন্ধের অল্পই তার কাছে ধরা পড়ে। অতীতের অভিজ্ঞতা ও বর্তমানের ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধকে বুঝে যে কাজ করতে পারে—তার সম্বন্ধে বলা চলে যে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে সে লাভবান হয়েছে কিম্বা বর্তমানে সে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে। লভেল (৩) লিখেছেন, বুদ্ধি কি এ সম্বন্ধে বৃটিশ মনোবিদ্‌রা মোটামুটি একমত হয়েছেন। (ক) বস্তু ও ধারণার মধ্যে-প্রাসঙ্গিক সম্বন্ধ দেখবার সামর্থ্য ও (খ) এই সম্বন্ধগুলিকে নূতন অথচ সদৃশ অবস্থায় প্রয়োগ করবার সামর্থ্যকে বুদ্ধি বলা হয়।

স্পীয়ারম্যান (৪) সম্বন্ধ ও সম্বন্ধযুক্ত তথ্যকে বোঝবার ক্ষমতাকে G বা সহজাত সাধারণ সামর্থ্য বলেছেন। * দুটি তথ্য আমাদের গোচর হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় তাদের এক কিম্বা একাধিক সম্বন্ধও আমাদের গোচর হয়। অন্ধকার, আলো শব্দ দুটি শোনামাত্র আমাদের বোধ হবে তারা উল্টো। আপেল ও কমলালেবু শব্দদুটি পরপর শুনলে আমরা বলব—দুটি ফল। আবার একটি সম্বন্ধ দেওয়া থাকলে সম্বন্ধযুক্ত অপর তথ্যটি কি হবে আমরা বুঝতে পারি। অন্ধকার ও তার উল্টো—এই দুটি শব্দ বললেই 'আলো' এ শব্দটি আমাদের মনে আসে।

স্পীয়ারম্যানের 'G'

স্পীয়ারম্যানের গোড়াতে ধারণা ছিল যে কোন কর্ম সম্পাদনে দুই জাতীয় ক্ষমতা আবশ্যক হয়। একটি হচ্ছে সহজাত সাধারণ সামর্থ্য। এ সামর্থ্য কম বেশী সব কাজেই দরকার হয়। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ কর্মের জন্য রয়েছে বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য। ঐ বিশেষ সামর্থ্য দ্বারা কেবল মাত্র কোন এক জাতীয় কাজ করা সম্ভব। প্রথমটিকে

'G' ও 'S' ফ্যাক্টর

---

* যা বুদ্ধিরই নামান্তর। বুদ্ধি শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য স্পীয়ারম্যান বুদ্ধি শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্পীয়ারম্যান 'G' বলেছেন ও অপরটিকে 'S'। G এক; ব্যক্তি ও কর্ম বিশেষে তার পরিমাণগত তারতম্য হয়। কিন্তু S বহু; দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে—সঙ্গীত শিখতে হলে আবশ্যক কিছু বুদ্ধি বা G এবং সঙ্গীত শেখবার বিশেষ ক্ষমতা। কোন হাতের কাজ শিখতে হলে দরকার কিছু পরিমাণ 'G' ও ঐ জাতীয় হাতের কাজ আয়ত্ত করবার বিশেষ ক্ষমতা। পরবর্তী কালে স্পীয়ারম্যান আরেক জাতীয় সামর্থ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এ জাতীয় সামর্থ্যকে গ্রুপ সামর্থ্য বলা যায়। গ্রুপ সামর্থ্য সব কাজে আবশ্যক না হলেও কতগুলি কাজের জন্য দরকার হয়। বাচনিক সামর্থ্য, আঙ্কিক সামর্থ্য প্রভৃতি গ্রুপ সামর্থ্যের দৃষ্টান্ত। আঙ্কিক সামর্থ্যের কথা ধরা যাক। গণিত, বিজ্ঞান, যান্ত্রিক কাজ প্রভৃতি বহু ব্যাপারেই এই সামর্থ্যের দরকার। সাহিত্য বা সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য অবশ্য এই সামর্থ্যটির বিশেষ দরকার হয় না। এ সামর্থ্য সাধারণ বা সার্বজনীন সামর্থ্য নয়—কারণ সব রকম কাজ সম্পাদনের জন্য এর দরকার হয় না। আবার একে বিশেষ সামর্থ্য বললে ভুল হবে। কারণ কেবল মাত্র একটি নয়, কয়েকটি বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য এ সামর্থ্য আবশ্যক।

গ্রুপ ফ্যাক্টর

থারষ্টোনের (৫) ধারণা কয়েকটি গ্রুপ সামর্থ্যের সাহায্যে মানুষের সবকিছু পারদর্শিতাকে ব্যাখ্যা করা চলে। ওঁর মতে G বা সাধারণ ক্ষমতা আছে বলে মনে করবার দরকার নেই। বিভিন্ন কাজের সাফল্যের মধ্যে যে পজেটিভ পারম্পর্য আছে তা ব্যাখ্যা করতে হলে নীচের গ্রুপ সামর্থ্য কয়টির অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। এ সামর্থ্যগুলি সার্বজনীন ও সাধারণ নয় কিম্বা একান্তরূপে বিশেষও নয়।

থারষ্টোনের মতবাদ

থারষ্টোনের তালিকা

১। স্থানিক সামর্থ্য (S)*

২। আঙ্কিক সামর্থ্য (N)

৩। বাচনিক সামর্থ্য (V)

৪। শব্দ-স্ফূর্তি সামর্থ্য (W)

৫। স্মৃতি অথবা মুখস্থ করবার সামর্থ্য (M)

---

* S, N প্রভৃতি প্রতীকের দ্বারা ঐ সামর্থ্যগুলিকে অভিহিত করা হয়।

৬। আরোহ বিচার
৭। অবরোহ বিচার } (R)

৮। প্রত্যক্ষের দ্রুতি

ফ্যাক্টর এ্যানালিসিসের সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন কার্যের সাফল্যকে বিশ্লেষণ করে থারষ্টোন উপরোক্ত ফ্যাক্টর বা সামর্থ্যসমূহের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন বলে মনে করেন। ঐ সম্বন্ধে কেলি'র অনুসন্ধানও উল্লেখযোগ্য।

গ্রুপ ফ্যাক্টর বা প্রাথমিক সামর্থ্যসমূহ

পরবর্তীকালে সার্টল, গুইলফোর্ড প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ আরও কয়েকটি ফ্যাক্টরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এ সব গ্রুপ ফ্যাক্টরকে এঁরা প্রাথমিক সামর্থ্যসমূহ বলে অভিহিত করেছেন। তিনটি সামর্থ্য সম্বন্ধে নীচে কিছু আলোচনা করা হল।

বাচনিক সামর্থ্য ঃ শব্দস্ফূর্তি ও বাচনিক সামর্থ্য দুটি আলাদা সামর্থ্য। শব্দস্ফূর্তিতে জোরটা শব্দের উপর, বাচনিক সামর্থ্যে জোরটা শব্দার্থের উপর। একজন অনর্গল কথা বলতে পারে, শব্দোচ্চারণ তার ঠিক হচ্ছে কিনা—এ সব শব্দস্ফূর্তি ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। কোন ধারণাকে শব্দের সাহায্যে বোঝা ও প্রকাশ করবার সামর্থ্যকে বাচনিক সামর্থ্য বলা হয়। কিছু কিছু কথকী ছেলে মেয়ে আছে। এরা বহু শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু অনেক শব্দের অর্থই এদের জানা নেই। এদের শব্দস্ফূর্তি সামর্থ্য বেশী, বাচনিক সামর্থ্য কম।

শব্দের উপর শিশুর কতখানি প্রকৃত অধিকার—বাচনিক সামর্থ্যের দ্বারা সেটা নির্ণয় করা হয়। শিশু কত শব্দ জানে, শব্দের মানে বোঝে কিনা, একটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে সে সম্পূর্ণ করতে পারে কিনা—বাচনিক সামর্থ্য নির্ধারণের জন্য এ সবের পরীক্ষা হয়।

আঙ্কিক সামর্থ্য ঃ সংখ্যা ও তাদের সম্পর্কে জ্ঞান এবং যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের দক্ষতাকে আঙ্কিক সামর্থ্য বলা হয়। বুদ্ধির অঙ্ক সমাধান আঙ্কিক সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আঙ্কিক সামর্থ্য নির্ণয়ে শিশুকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে দেওয়া হয়। সংখ্যা ও তাদের সম্বন্ধ সে বোঝে কিনা জানবার জন্য তাকে অসম্পূর্ণ সংখ্যা-বীথি পূরণ করতে বলা হয়। যথা ঃ—

২	৪	৬	৮	১০—
১	৩	৬	৮	১১—
	৫	১০	১২	২৪—

স্থানিক সামর্থ্য ঃ জ্যামিতিক আকার ও আকৃতি, বস্তু অধিকৃত স্থান প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করবার, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝবার ক্ষমতাকে স্থানিক সামর্থ্য বলা হয়। ডান বাঁ জ্ঞান, দিক জ্ঞান স্থানিক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বোঝায়—এমন ড্রয়িংএর সাহায্যে পরীক্ষার্থী স্থানিক সম্বন্ধ বোঝে কিনা পরীক্ষা করা হয়। নিম্নোক্ত ধরণের প্রশ্ন দ্বারা স্থানিক সামর্থ্য আছে কিনা বুঝতে পারা যায়। শব্দের সাহায্যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়। সুতরাং বাচনিক সামর্থ্যও কিছু পরিমাণে এর মধ্যে পরীক্ষিত হচ্ছে।

১। দক্ষিণ দিকে এক মাইল যাবার পর আমি পূব দিকে এক মাইল গেলাম। গন্তব্যস্থল থেকে আমি কোন দিকে আছি?

২। চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ঘড়ির মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটা ঠিক কখন পরস্পরের বিপরীত দিকে থাকবে?

মূলতঃ মানুষের সামর্থ্য বিভিন্ন ফ্যাক্টরে বিভক্ত না মানুষের বুদ্ধি নামক একটি সাধারণ সামর্থ্যও আছে—এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা আজও হয় নি। তবে দ্বিতীয়োক্ত মত যারা পোষণ করেন—তারা আমাদের কাজের উপযোগী বুদ্ধি অভীক্ষা প্রস্তুত করেছেন। শিক্ষা ও বৃত্তি গ্রহণ বিষয়ে পরামর্শে তার সুফল আমরা পাচ্ছি। মানুষের ক্ষমতাকে বিভিন্ন গ্রূপ ফ্যাক্টরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় বলে যারা মনে করেন, তারা প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরকে সন্তোষজনক ভাবে পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রশ্নাবলী রচিত হয় নি।

G'র অস্তিত্ব আছে কি না?

আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করা গেছে। শিশুদের বেলাতে তাদের গ্রূপ বা প্রাথমিক ক্ষমতাসমূহের মধ্যে উচ্চ পজিটিভ পারম্পর্য্য রয়েছে। উডওয়ার্থের (৬) ধারণা—একটি সাধারণ সার্বজনীন ক্ষমতার অস্তিত্বের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পজিটিভ ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ হ্রাস পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের বাচনিক সামর্থ্য ও আঙ্কিক সামর্থ্যের ঐক্যাঙ্ক পাওয়া গেছে +·৮৩; প্রাপ্ত বয়স্কদের বেলাতে ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ মাত্র +·২৬ (৭)। সুতরাং স্কুলে, বিশেষতঃ নীচের দিকে সাধারণ বুদ্ধি পরীক্ষা দ্বারা শিশুর ক্ষমতা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানলাভে বাধা থাকতে পারে না। *

* প্রাথমিক সামর্থ্য সমূহের পারম্পর্য সম্বন্ধে থারষ্টোন অনুসন্ধান করেছেন। ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ নীচের সারণীতে লিপিবদ্ধ করা হল।

শিক্ষায় GV সামর্থ্যের গুরুত্ব

একটি কথা এখানে আরও যোগ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হচ্ছে প্রথমতঃ G, দ্বিতীয়তঃ V N'র (বাচনিক ও আঙ্কিক সামর্থ্য) সঙ্গে। বিদ্যালয়ে প্র্যাকটিক্যাল ও টেকনিকাল শিক্ষার জন্য আবশ্যক G এবং S (স্থানিক সামর্থ্য) ও K (যান্ত্রিক সামর্থ্য)। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উচ্চতর টেকনিক্যাল কোর্সের জন্য অবশ্য G V N ই প্রধানতঃ আবশ্যক ; S ও K* থাকলে ভালো হয়। অল্পবুদ্ধি যুক্ত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও হাতে কাজের জন্য ডানকান (৯) GV সামর্থ্যের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগের সুপারিশ করেছেন। তাঁর মতে হাতের কাজ করবার সময়—শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের G ও F বা প্র্যাকটিক্যাল সামর্থ্যানুযায়ী ছোটছোট দলে ভাগ করে নিলেই চলবে। আসল কথা—শিক্ষা ব্যাপারে G'র পরেই V'র স্থান। এ সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডারের (১০) অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ও ম্যাথেমেটিক্‌সে গণিত ও জ্যামিতি) কোন সামর্থ্য কি পরিমানে দরকার হয়—নীচে তা উল্লেখ করা হল :

ইংরেজীতে G ১০ V ৬৩ X ২৭ ; ম্যাথেমেটিক্সে (গণিত ও জ্যামিতি) G ৩১ V ১৯ X ৪৯। X সম্ভবতঃ একটি চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একে 'অধ্যবসায়' বলে মনে করা যেতে পারে। উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়—ইংরেজি শিক্ষায়

সারণী ৮

	N	W	V	S	M	R
N		·৪৭	·৩৮	·২৬	·১৯	৫৪
W			·৫১	·১৭	·৩৯	·৪৮
V				·১৭	·৩৯	·৫৫
S					·১৫	·৩৯
M						·৩৫

ঐ তথ্য অনুধাবন করে ক্রনব্যাক (৮) মন্তব্য করেন, "মাল্টিপল (Multiple) ফ্যাক্টর এ্যানলিসিসের দ্বারা সাধারণ সামর্থ্যের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয়নি। বরঞ্চ দেখা গেল থারষ্টোনের ফ্যাক্টর বা সামর্থ্যসমূহ পরস্পর পারম্পর্য-সম্বন্ধযুক্ত।"

---

* K হচ্ছে যান্ত্রিক সামর্থ্য। ঐ সামর্থ্যটি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সয়েন্স কলেজের অনুসন্ধানে দেখা গেছে—আমাদের দেশের ছেলেদের যান্ত্রিক সামর্থ্য ইউরোপীয় ছেলেদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। তার প্রধান কারণ যন্ত্র নিয়ে খেলা ও কাজ করার সুযোগ এ দেশের ছেলেদের অপেক্ষাকৃত অল্প।

বাচনিক সামর্থ্যের স্থান সবচেয়ে বেশী ; ম্যাথেমেটিক্সেও বাচনিক সামর্থ্য উল্লেখ-যোগ্য। ম্যাথেমেটিক্সে অধ্যবসায় বিশেষ দরকার।

বিনে অভীক্ষা দ্বারা (যে অভীক্ষা সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি)—GV উভয় সামর্থ্যই পরীক্ষিত হয়। বিনের একটি সংশোধন টারম্যান করেন। স্ট্যানফোর্ড সংশোধন নামে তা পরিচিত। আলেকজাণ্ডার দেখেছেন ঐ অভীক্ষা দ্বারা G ৪০ %, V ২৭%, F ৪% পরীক্ষিত হয়। এই কারণেই শিক্ষা সম্ভাবনা নির্ণয়ে বিনের অভীক্ষা একটি মূল্যবান অবদান। একটি দল—যাদের মধ্যে সামর্থ্যের পার্থক্য অনেকখানি—তাদের পার্থক্যের ৪০ ভাগ কারণ হচ্ছে—তাদের G সামর্থ্যের পার্থক্য, আর VN ও KM মিলে পার্থক্যের কারণ ১৫-২০ ভাগ—লোভেল (১১)।

বুদ্ধি ও জ্ঞান

বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ কি এটা বোঝা দরকার। বুদ্ধি শেখবার ক্ষমতা, জানবার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আমরা জ্ঞান অর্জন করি। বুদ্ধি সম্ভাবনা, জ্ঞান বাস্তব। কিন্তু কেবলমাত্র সম্ভাবনার পরিমাপ কেমন করে সম্ভব? উত্তরে বলা চলে কেউ জ্ঞান অর্জন করেছে দেখতে পেলে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে তার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য ছিল বলেই সে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। কি সে পারে বুঝতে গেলে অনেক সময় জানতে হয় কি সে পেরেছে। কিন্তু জ্ঞানার্জনের সম্ভাবনা বা ক্ষমতা থাকলেই একজন বাস্তবিক জ্ঞানার্জন করবে—এ কথা অবশ্য সব সময় বলা চলে না। জ্ঞানার্জনের জন্য সুযোগ দরকার, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করবে তার মধ্যে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা দরকার। কেউ জ্ঞান অর্জন করেনি—একমাত্র এ তথ্য থেকে কোন মতেই বলা সম্ভব নয় যে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা ছিল না।

একটি বিষয় শেখবার সুযোগ সকলকে দেওয়া হল। ধরা যাক সকলের মধ্যেই শেখবার চেষ্টা ও ইচ্ছা রয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কয়েকজন সেটা না শিখতে পারে—তবে বলা চলে তাদের শেখবার সামর্থ্য কম, সেজন্য তারা শিখতে পারল না। পরীক্ষাটা জ্ঞানেরই হল, কিন্তু সে পরীক্ষার সাহায্যে কার কতখানি সামর্থ্য আছে সেটাই বিচার করা হল। প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ঘটে। একটি ৩ বৎসরের শিশু চাবি ও ছুরি বার বার দেখবার সুযোগ পায়। জিনিসগুলির নামও সে শোনে। তা সত্ত্বেও যদি সে

চাবি চিনতে না পারে, ছুরি দেখে সেটা কি না বলতে পারে, তবে কালা বোবা বা অন্ধ না হলে নিশ্চয়ই সে বোকা। লেখাপড়া শেখবার সুযোগ সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুরা ৫।৬ বছর থেকেই পায়। ৬।৭ বছর বয়সে "ছোট মিনুকে দেখ" এ লেখাটি তারা না পড়তে পারলে বুঝতে হবে লেখাপড়া শেখবার সামর্থ্য বা বুদ্ধি তাদের কম। লেখাপড়া শেখবার সুযোগ যারা পায় নি ঐ পরীক্ষা দ্বারা তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করা যাবে না—এ কথা বলাই বাহুল্য।

বুদ্ধির সঠিক পরিমাপের জন্য যারা চেষ্টা করছেন—তাদের মধ্যে ফরাসী মনোবিদ আল্‌ফ্রেড বিনে'র নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি সিমোঁ'র সহ-যোগিতায় প্যারীর ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি-পরীক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। দুটি জিনিস তারা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমতঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের বুদ্ধি বাড়ে। এক বৎসরের শিশুদের শেখবার ও বোঝবার ক্ষমতার চেয়ে দুই বৎসরের শিশুদের শেখবার ও বোঝবার ক্ষমতা বেশী। আবার তিন বৎসরের শিশুরা দুই বৎসরের শিশুদের চেয়ে বেশী বুঝতে ও শিখতে পারে। বুদ্ধির বিকাশ বা বৃদ্ধি এটা অবশ্য সারাজীবন ধরে হয় না। কিন্তু সেটা বিনে ও সিমোঁ বুদ্ধি পরীক্ষা করবার পর বুঝতে পারলেন। দ্বিতীয়তঃ একবয়সী হলেও ছেলেমেয়েদের সবার বুদ্ধি সমান নয়। কারো বুদ্ধি বেশী, কারো বুদ্ধি কম এবং অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন। বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের দৈর্ঘ্যের সুন্দর তুলনা করা চলে। বাংলা ভাষাভাষী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের গড় উচ্চতা আনুমানিক ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি।* যদি সকলকে মাপা যায়, দেখা যাবে শতকরা প্রায় ৫০ জনের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৫ ইঞ্চির কাছাকাছি। যাদের লম্বা বলা চলে তাদের সংখ্যা ১৫% মতন হবে। খর্বাকৃতিদের বেলাতেও অনুরূপ কথা বলা যায়। খুব লম্বা কিম্বা খুব বেঁটে—তাদের সংখ্যা শতকরা একভাগেরও কম।

বিনে'র বুদ্ধি পরীক্ষা

---

* শ্রীতারকচন্দ্র রায়চৌধুরী (১২) একটি ছোট নমুনাকে পরীক্ষা করে যে ফলাফল পেয়েছেন তা নীচে উল্লেখ করা হল। যে ৭৮৫ জনের পরীক্ষার ফল নিয়ে তিনি আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন তার মধ্যে ১৬৭ জন ব্রাহ্মণ, ১০০জন বৈদ্য, ১১৮ জন কায়স্থ, ১০০ জন গোয়ালা, ১০০ জন পোদ, ১০০ জন নমশূদ্র ও ১০০ জন বাগ্দী ছিল।

ঐ দুটি সত্যের সাহায্য নিয়ে বিনে বুদ্ধি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী তৈরি করবার চেষ্টা করলেন। যে সব ছেলেমেয়ে ইস্কুলে যাবার ও লেখাপড়া শেখবার মোটামুটি সুযোগ পেয়েছে তাদের জন্যই বুদ্ধি-পরীক্ষাপত্রটি তিনি প্রস্তুত করলেন। ছেলে-মেয়েদের সাধারণ জ্ঞান, অবিলম্ব স্মরণশক্তি, সম্বন্ধ নির্ণয়, সহজ বিষয় লেখা ও পড়া, সমস্যা সমাধান, আজগুবি আবিষ্কার, বিমূর্ত শব্দের অর্থ বলা প্রভৃতি সম্বন্ধে তার প্রশ্নাবলী রচিত হয়। প্রত্যেক বয়সের জন্য কয়েকটি করে প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট হয়। কোন্ প্রশ্ন কোন্ বয়সের উপযোগী এটা বার করবার জন্য বিভিন্ন বয়সের বহু ছেলেমেয়েদের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হল। কোন একটি প্রশ্ন কোন একটি বয়সের ছেলেমেয়েরা শতকরা ৫০ থেকে ৭০ জন উত্তর দিতে পারলে সে প্রশ্নটি সে বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী প্রশ্ন বলে ধরা হয়। যদি দেখা যায় দশ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৯০ জন কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে—তবে সে প্রশ্নটি দশ বছরের পক্ষে অতি সহজ বলে বুঝতে হবে। নয় বছরের ছেলেমেয়েদের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে দেখা যেতে পারে। তাদের—৫০ থেকে ৭০ জন উত্তর দিতে পারলে—বুঝতে হবে সে প্রশ্নটি নয় বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী।

নীচে কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল। প্রশ্নগুলি বিনে'র একটি আধুনিক সংশোধনের বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত করা হল।

সারণী ৯

উচ্চতা		সংখ্যা
অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি	৫′ ১১″'র ঊর্ধ্বে	·১
দীর্ঘাকৃতি	৫′ ৭″—৫′ ১১″	১৪·৫
মধ্যম ধরণের	৫′ ৩″—৫′ ৭″	৪৬·৬
খর্বাকৃতি	৪′ ১১″—৫′ ৩″	২৩ ৩
অত্যন্ত খর্বাকৃতি	৪′ ১১″'র নীচে	৩ ৩

ডাক্তার এ, এন, চ্যাটার্জি মুসলমানদের উচ্চতার গড় ও ৫′ ৫″'র কাছাকাছি পেয়েছেন। উপরোক্ত সারণী থেকে মনে হয় উচ্চতার গড়টি ৫′ ৫″'র সামান্য কিছু কম হবে। আরও বহু-সংখ্যক বিভিন্ন ধরণের লোককে মাপলে লম্বা, বেঁটে ও অত্যন্ত লম্বা, অত্যন্ত বেঁটেদের সংখ্যার মধ্যে আরও সমতা দেখা যেত।

১। নাক চোখ মুখ দেখাতে বলা : যেমন—তোমার নাক দেখাও। তোমার চোখ দেখাও। তোমার মুখ দেখাও। (৩ বছর)*

২। অবিলম্ব সংখ্যা স্মরণ : যেমন—আমি কতগুলি সংখ্যা বলছি, শোন। আমার বলা হয়ে গেলে পর তুমি বলবে :

৩ ৭	(দুটি সংখ্যা, ৩ বছর)
৬ ৪ ১	(তিনটি সংখ্যা, ৪ বছর)
৫ ১ ৩ ৭	(চারটি সংখ্যা, ৫ বছর)
৯ ২ ৫ ৮ ৩	(পাঁচটি সংখ্যা, ৬ বছর)
৪ ১ ৩ ৭ ২ ৫	(ছয়টি সংখ্যা, ৮ বছর)
৩ ৮ ৬ ২ ৪ ৭ ১	(সাতটি সংখ্যা, ১১ বছর)

৩। টেবিলের উপর এলোমেলো ছড়ানো চারটি পয়সাকে গুণতে বলা। (৪ বছর)

৪। বিনে'র দেওয়া দুটি মুখের মধ্যে কোনটি সুন্দর বলা। (৪ বছর)

৫। দেখে কাগজের উপর দেড় ইঞ্চি বাহুযুক্ত একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন। (৫ বছর)

৬। পরীক্ষার্থীর নিজের বয়স বলা। (৫ বছর)

৭। লাল, হলুদ, নীল ও সবুজ রং চেনা। (৫ বছর)

৮। হাতের দশটি আঙ্গুল গোনা। (৬ বছর)

৯। সপ্তাহের দিনগুলির নাম জানা। (৬ বছর)

১০। ঘোড়া, চেয়ার, মা প্রভৃতি কাকে বলে তা বলা।

উত্তর : নিজেদের প্রয়োজনের দিক থেকে বর্ণনা (৬ বছর)

শ্রেণীগত বর্ণনা (১০ বছর)

১১। ডান বাঁ জ্ঞান (৬ বছর)

---

* প্রশ্নাবলীর জন্য বয়সের মান—বার্ট ও টারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত মানের উপর ভিত্তি করেই করা হল। বার্ট লণ্ডনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরীক্ষাটির প্রমাণ বিধান করেছেন। টারম্যান করেছেন—যুক্তরাষ্ট্রে। লেখক লেখিকা বিনে'র একটি বাঙলা সংস্করণ প্রস্তুত করে ২০০ ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের ধারণা—স্থানে স্থানে প্রশ্নগুলি আমাদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে কিছু কঠিন। কিছু কিছু প্রশ্নে বয়সের মান হয়ত ১ বছর বেশী হবে। তবে পরীক্ষার্থীদের স্বল্পতার জন্য এ বিষয় সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সঙ্গত হবে না।

১২। বস্তুদ্বয়ের পার্থক্য বলা :

যেমন—প্রজাপতি ও মাছির মধ্যে পার্থক্য কি ? (৭ বছর)

১৩। একটি লেখা পড়ে সে সম্বন্ধে বলা। (৮ বছর)

১৪। সহজ প্রশ্নোত্তর : যেমন—অন্যের জিনিস যদি তুমি ভেঙ্গে ফেলে থাক তবে তোমার কি করা উচিত ? (৮ বছর)

১৫। মাসের নাম বলা। (৯ বছর)

১৬। বাক্য রচনা : যেমন—কলিকাতা, টাকা, নদী তিনটি শব্দই থাকবে এমন একটি বাক্য রচনা কর। (১০ বছর)

১৭। আজগুবি বোধ : যেমন—আমার তিন ভাই, মণ্টু, টুলু আর আমি নিজে। এ কথার মধ্যে বোকামি কি আছে ? (১১ বছর)

১৮। তিন মিনিটের মধ্যে ৬০টি শব্দ বলা। (১১ বছর)

১৯। বিশৃঙ্খল বাক্যকে ঠিকমত সাজান। (১২ বছর)

২০। সমস্যা সমাধান : যেমন—পাশের জমিদার বাড়ীতে গতকাল প্রথম এল ডাক্তার, তারপরে এল উকিল। সেখানে কি ঘটেছিল মনে কর ? (১৩ বছর)

২১। বিমূর্ত শব্দের অর্থ বলা : যেমন—ন্যায়পরায়ণতা বলতে তুমি কি বোঝ ? (১৪ বছর)

২২। বিমূর্ত শব্দের মধ্যে পার্থক্য বলা : যেমন—সুখ ও শান্তির মধ্যে পার্থক্য কি ? (১৫ বছর)

২৩। সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা : যেমন—রাষ্ট্রপতি ও রাজার মধ্যে পার্থক্য কি বল ? (১৬ বছর)

বিনে'র বার্ট ও টারম্যান সংস্করণ

১৯০০সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বিনে বুদ্ধি অভীক্ষার কাজে ব্রতী ছিলেন। তিনি দুইবার তার প্রশ্নাবলী সংশোধন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার বুদ্ধি-পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন দেশে কাজ হয়। ইংলণ্ডের সিরিল বার্ট বিনের প্রশ্নাবলী লণ্ডনের ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগ করে প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান (অর্থাৎ, প্রশ্নটি কোন বয়সের উপযোগী) নির্ণয় করেন। আমেরিকাতে টারম্যান বিনে অভীক্ষার দুইটি সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। প্রথমটি ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে —ষ্ট্যানফোর্ড সংশোধন রূপে পরিচিত। ১৯১৬ সালে সেটি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি ১৯৩৭ সালে টারম্যান ও মড মেরিলের সহযোগিতায় সম্পন্ন

হওয়ায়—সাধারণতঃ টারম্যান-মেরিল সংশোধন নামে পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ ঐ সংশোধনটিকে বাঙলায় অনুবাদ ও আবশ্যকানুযায়ী সংশোধন করে কাজ করছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ

ধরা যাক ৩ বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বয়সের উপযোগী ৬টি করে প্রশ্ন আছে। আট বছর বয়সে একটি ছেলে ৭ বছরের উপযোগী সব প্রশ্ন (সে ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব—৬৷৫ প্রভৃতি নীচের সব বয়সের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর সে দিতে পারবে) উত্তর দিতে পারল, ৮ বছরের ৬টার মধ্যে ৫টা প্রশ্ন, ৯ বছরের ৬টার মধ্যে ৪টা প্রশ্ন এবং ১০ বছরের ৬টার মধ্যে মাত্র ১টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে—তবে সে বুদ্ধিতে কোন বয়সের সাধারণ ছেলেদের মতন অথবা বিনে'র ভাষায়, তার মনের (সঠিকরূপে বলতে গেলে বুদ্ধিগত) বয়স অথবা মনোবয়স কত? এ প্রশ্নটির উত্তর নীচে দেওয়া হল।

শিশুর বুদ্ধির বয়স বা মনোবয়স নির্ণয়

মনোবয়স নির্ধারণের পদ্ধতি

কোন্ বয়সের উপযোগী প্রশ্ন	মোট প্রশ্নের সংখ্যা	নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা	নম্বর (বছর ও মাসে)
৭ বছর	৬	৬	৭ বছর (আগের বয়সের সব প্রশ্নোত্তর যে পারবে ধরে নেওয়া হচ্ছে)
৮	৬	৫	৫ × ২ = ১০ মাস (যেহেতু ৬ প্রশ্নের সঠিক উত্তরের মান ১২ মাস, ১ উত্তরের মান ২ মাস ; সুতরাং ৫ উত্তরের মান ৫ × ২ = ১০ মাস)
৯ ”	৬	৪	৪ × ২ = ৮ মাস
১০ ”	৬	১	২ মাস
			মোট ৮ বছর ৮ মাস

ছেলেটির বয়স ৮ বছর, কিন্তু বুদ্ধিতে সে একটি সাধারণ ৮ বছর ৮ মাসের ছেলের মতন, অর্থাৎ, তার মনোবয়স ৮ বছর ৮ মাস।

টারম্যান-মেরিল যে সংশোধনটি প্রকাশ করেছেন তাতে ৪ মাস বয়স থেকে ১৪ বছর ও তারপর চার পর্যায়ের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রশ্নাবলী রয়েছে।

বুদ্ধির বিকাশ কত বয়স পর্যন্ত হয়

উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহের ফলে একটি জিনিস জানা গেছে। শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু কোন বয়স পর্যন্ত? সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি ১৩ বছরেও সামান্য বাড়ে। ১৫।১৬ বছরের পর সাধারণতঃ বুদ্ধির আর কোন বৃদ্ধি ঘটে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্যতিক্রমের কথা পরে আমরা উল্লেখ করছি।

বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q

একটি মেয়ের বয়স ৪ বছর। সে বুদ্ধিমতী। পরীক্ষা করে দেখা গেল—তার মনোবয়স (অর্থাৎ বুদ্ধির বয়স) ৬ বছর। ৮ বছর বয়সে মেয়েটির মনো-বয়স কত হবে—আগে থেকে কি কিছু বলা যায়? এ সম্বন্ধ স্টার্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় এক ব্যক্তির মনোবয়স ও তার প্রকৃত বয়সের আনুপাতিক সম্বন্ধটি মোটামুটি এক থাকে। ঐ মেয়েটির কথাই ধরা যাক। তার মনোবয়স ও প্রকৃত বয়সের আনুপাতিক সম্বন্ধ হবে ৬ : ৪। অতএব তার ৮ বছর বয়সে তার মনোবয়স আশা করব ১২। কারণ ৬ : ৪ :: ১২ : ৮। মনোবয়স ও বয়সের ভগ্নাংশটিকে সাধারণতঃ ধ্রুব ১০০ দিয়ে গুণ করে প্রকাশ করা হয়। $\frac{\text{মনোবয়স}}{\text{প্রকৃতবয়স}} \times ১০০$ একে বলা হয় বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q। ১৬ বছরের পর সাধারণতঃ আর বুদ্ধি বাড়ে না। সেজন্য ১৬ বছরের বেশী যাদের বয়স—তাদের প্রকৃত বয়স ১৬ বছর ধরে নিয়ে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা হয়। ভেকলার অবশ্য একটি বয়সের পরে ঐ পদ্ধতিটির সংশোধনের কথা বলেছেন।

বুদ্ধ্যঙ্ক কি ধ্রুব?

বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ সাধারণতঃ একজনের জীবনে মোটামুটি এক থাকে। আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় দীর্ঘদিনের ব্যবধানে বুদ্ধ্যঙ্ক গড়ে ৫ থেকে ১০ পয়েণ্ট পর্যন্ত বাড়ে বা কমে। দু একটি ক্ষেত্রে ২০।২৫ পয়েণ্ট পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্ক বাড়তে বা কমতে দেখা গেছে। ছয় বছরের বয়সের অনধিক শিশুদের বুদ্ধি পরীক্ষার উপর বেশী নির্ভর করা কঠিন। বুদ্ধ্যঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পরিবেশের কোন

প্রভাব নেই এ কথা বলা ঠিক নয়। বুদ্ধি যদিও প্রধানতঃ সহজাত, কিন্তু অত্যন্ত অনুকূল ও অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের ফলে তার কিছু পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।*

অনেক ক্ষেত্রে আবেগজনিত বাধা ও বিকৃতি বুদ্ধির সহজ প্রকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিছুকাল মনঃসমীক্ষার পরে আবেগ জীবনে সুস্থতা ফিরে আসার ফলে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক বেড়ে গেছে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। ঐ ক্ষেত্রে বোধহয় বলা সঙ্গত বুদ্ধি শিশুটির আগাগোড়াই ছিল, কিন্তু বুদ্ধি একসময়ে আচ্ছন্ন ছিল। যে ব্যাধি বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল, সে ব্যাধি দূর হওয়ায় শিশু বুদ্ধি পরীক্ষায় বুদ্ধি প্রয়োগ করতে সমর্থ হল।

বুদ্ধিকে দুইভাবে দেখা দরকার—কানাডিয়ান নিউরোলজিষ্ট হেব এমন কথা বলেছেন। বুদ্ধি A এবং বুদ্ধি B। বুদ্ধি A হ'ল সহজাত সম্ভাবনা। ঐ সম্ভাবনাকে স্নায়ুতন্ত্রেরই একটি বৈশিষ্ট বলা চলে। জিনস্ বা বংশপরমানুর দ্বারা ঐ বৈশিষ্টাটি নির্ধারিত হয়। স্ফুরিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিকে মানুষ তার কাজেকর্মে লাগায়, যে বুদ্ধিকে মনোবিদগণ পরিমাপ করবার চেষ্টা করেন—সেটি হল বুদ্ধি B। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা (বুদ্ধি A) এবং তার পরিবেশের ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারাই বুদ্ধি B'র সৃষ্টি হয়। পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাবে সময় সময় সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না—এ কথা বলা যায়।

বুদ্ধি A'র পরিমাপ সম্ভব নয়। এর অস্তিত্ব ও পরিমাণ কিছুটা অনুমান করা চলে।

বুদ্ধি A সহজাত হলেও বুদ্ধি B'র উপর স্বভাব ও পরিবেশ দুইয়েরই প্রভাব রয়েছে। বিদ্যা বা কৃতিত্বের সঙ্গে এইদিক দিয়ে বুদ্ধি B'র অনেকখানি মিল রয়েছে—ভার্ণন এমন মনে করেন। দুইয়ের পার্থক্য হল এই যে বিদ্যা বিশেষ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় এবং বই পড়ে লোকে বিদ্যা অর্জন করে। বিদ্যা বা কৃতিত্ব থাকে কারো কোনো বিষয়ে। বুদ্ধি B'র বিকাশ পরিবেশের প্রভাবে, কোন বিশেষ শিক্ষা ছাড়াই ঘটে। বুদ্ধির রূপটিও অপেক্ষাকৃত সাধারণ। কোন কিছু বোঝা, যুক্তি বিচার ও অনুমিতির সামর্থ্য প্রভৃতিকে আমরা বুদ্ধি বলি। সুযোগ পেলে, চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে যে কতখানি শিখতে পারবে—তারও ইঙ্গিত একজনের বুদ্ধি B'র পরিমাণ থেকে, সঠিকরূপে বলতে গেলে বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ থেকে পাওয়া যায়।

একটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক কত? ১০০। তার মনোবয়স ও প্রকৃত বয়স সমান হওয়ায় তাদের আনুপাতিক সম্বন্ধ ১ ও সেটিকে ধ্রুব ১০০ দিয়ে গুণ করলে হবে ১০০। মনোবয়স ও প্রকৃত বয়সে সামান্য তারতম্য ঘটলেও তাকে সাধারণই বলা চলে। টারম্যানের মতে, প্রকৃত বয়সের দশ ভাগের নয়

* এ সম্পর্কে বংশগতি ও পরিবেশ' অধ্যায়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি।

ভাগ থেকে এগারো ভাগ পর্যন্ত যাদের মনোবয়স তাদের সবাইকেই 'সাধারণ' বলা চলতে পারে —অর্থাৎ, যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০। বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ অনুযায়ী কাদের কোন দলে ফেলা যায়—মেরিল তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। ২ থেকে ১৮ বছরের ২৯০০ আমেরিকান ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করা হয়। শতকরা কতজন কোন দলে পড়ে তারও একটা হিসাবে নীচে দেওয়া হল (১৩)

সারণী—১০

শ্রেণী	বুদ্ধ্যঙ্ক	শতকরা ছেলেমেয়েদের সংখ্যা
প্রতিভাসম্পন্ন	১৪০ ও তার উপর	১·৩
উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন	১৩০—১৩৯	৩·১
	১২০—১২৯	৮·২
উচ্চ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন	১১০—১১৯	১৮·১
স্বাভাবিক বা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন	৯০—১০৯	৪৬·৫
নিম্ন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন	৮০— ৮৯	১৩·৫
প্রান্তিক উনমানস বা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন	৭০— ৭৯	৫·৬
শিক্ষাযোগ্য উনমানস	৫০— ৬৯	২·৪
শিক্ষার অযোগ্য উনমানস	৫০ এর নীচে	·২

এখানে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে সম্ভাবনা ও বাস্তব এক নয়। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে গেছেন, মানব জাতি যাঁদের কাছে বহুরূপে ঋণী—তাঁদের অধিকাংশের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০'র কম নয়। কিন্তু ১৪০ বুদ্ধ্যঙ্ক, তবু সুযোগ সুবিধার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারেননি, সাধারণের একজন হয়ে জীবনযাপন করে গেছেন—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এঁরা সুযোগ পেলে হয়ত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতেন। এ ছাড়াও আরেকটি কথা আছে। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কেবলমাত্র সুযোগ ও বুদ্ধিই একমাত্র কথা নয়। অন্তরের প্রেরণা থাকাও দরকার। সুযোগ সুবিধা আছে, বুদ্ধি আছে—কিন্তু ইচ্ছার অভাবে, চেষ্টার অভাবে বিশেষ কিছু করতে পারলেন না কিম্বা

করলেন না এমন দৃষ্টান্তও আছে। বুদ্ধি কতখানি কাজে লাগবে সেটা কেবল মাত্র বুদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না—সেটা প্রধানতঃ নির্ভর করে ব্যক্তির চরিত্র ও আবেগ জীবনের প্রকৃতির উপর। সকল পর্যায়ের বুদ্ধির বেলাতেই ঐ কথা খাটে। দেখা গেছে নিম্ন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়তে একেবারে অপারগ হয় না। সুস্থ আবেগ জীবন থাকার ফলে তারা বুদ্ধির প্রায় সবটুকু লেখাপড়া শেখার কাজে লাগাতে পারে। বুদ্ধিস্বল্পতার সঙ্গে আবেগ জীবনের ত্রুটী যুক্ত হলে সে ক্ষেত্রে লেখা পড়া শেখা অসাধ্য হয়। বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিতে কোন শ্রেণী কতটুকু কাজ করতে পারবে মোটামুটি ভাবে বলা চলে। তলার থেকে আরম্ভ করা যাক্। ৫০'র নীচে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক—অর্থাৎ, যাদের মনোবয়স তাদের প্রকৃত বয়সের অর্ধেকের কম—তাদের পক্ষে লেখাপড়া লেখা সম্ভব নয়। ঐ শ্রেণীর উপরের দিকে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক, কায়িক পরিশ্রম কিম্বা খুব সরল হাতের কাজ তারা শিখতে ও করতে পারে। * ৫০ থেকে ৬৯ পর্য্যন্ত যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক—তারা সামান্য কিছু শেখাপড়া শিখতে পারে। ৭০ বুদ্ধ্যঙ্কের ছেলেমেয়েরা চেষ্টা করলে চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারে। অষ্টম শ্রেণীর পাঠ আয়ত্ত করবার জন্য ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক দরকার। হাইস্কুলের পাঠ সফলভাবে শেষ করতে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ক দরকার। কলেজে যারা পড়বে—তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক অন্তত ১১৫ থাকা দরকার (অনেকে মনে করেন, ১২০)। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাটি ডিয়ার-বোর্ন (১৪) সন্নিবিষ্ট করেছেন।

একথা এখানে বলা দরকার যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষার মান বিভিন্ন রকমের। সুতরাং ঐ মতামতটি সব রাজ্যে সমভাবে প্রযোজ্য না হবারই কথা।

আমেরিকায় স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ক্রমশঃ সার্বজনীন হবার ফলে জ্ঞানগত শিক্ষার মান আগের থেকে কিছুটা নেমেছে। বিভিন্ন মনোবিদদের অনুসন্ধানের ফলাফল সংগ্রহ করে আমেরিকায় বর্তমান শিক্ষার কোন স্তরে কি পরিমাণ বুদ্ধ্যঙ্ক আবশ্যক ক্রণ্‌ব্যাক (২৫) তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

---

* অস্বাভাবিক শিশু অধ্যায়ে—ভিনল্যাণ্ড ইনডাষ্ট্রীয়াল শ্রেণীবিন্যাসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণী—১১

বুদ্ধ্যঙ্ক	
১২০	প্রথম শ্রেণীর কলেজে মোটামুটি ভালোভাবে পড়াশোনার জন্য দরকার
১০৭	হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক
১০৪	হাইস্কুলের আকাডেমিক কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক
৯০	দু একবার ফেল করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উঠতে পারে ; অধ্যবসায়ী হলে কোন মতে হাইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ করতে পারে।
৭০	কৃষি প্রভৃতি কাজ করতে পারে।

ক্ষমতানুযায়ী ছাত্রছাত্রী-দের শ্রেণী বিভাগ

একটি শ্রেণী সমবুদ্ধি বা কাছাকাছি বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের নিয়ে গঠিত হবে—না, সবরকম বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরাই তাতে থাকবে —শিক্ষাবিদদের কাছে এটি একটি প্রশ্ন। ইংলণ্ডে প্রথম নীতির দিকেই ঝোঁক বেশী, ডেনমার্কে দ্বিতীয়োক্ত নীতিই অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে।

অল্পবুদ্ধিসম্পন্নরা উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়বার সুযোগ পেলে তারা প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করবে, পড়াশোনায় তারা অধিকতর সচেষ্ট ও মনোযোগী হবে—এমন অনেকে মনে করেন। এ সম্বন্ধে বার্টের একটি পরীক্ষার ফল প্রণিধানযোগ্য।

বার্টের পরীক্ষার ফলটি আলোচনা করতে গেলে দু একটি পরিভাষার পূর্ব-ব্যাখ্যা দরকার। মনোবয়স কাকে বলে আমরা জানি। বুদ্ধি পরীক্ষায় একজনের সাফল্য দেখেই তার মনোবয়স নির্ণয় করা হয়। তেমনি শিক্ষাবয়স কথাটি

শিক্ষাবয়স

ব্যবহার করা চলে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে কোন একটি বয়সে—ধরা যাক, আট বছর বয়সে—যতটুকু লেখাপড়া শেখে, একজন ছেলে যদি সেটুকু লেখাপড়া শিখে থাকে—আমরা বলব ঐ ছেলেটির শিক্ষাবয়স, আট।

বুদ্ধ্যঙ্কের সূত্র হচ্ছে : $\frac{\text{মনোবয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$

তেমনি শিক্ষাঙ্ক হচ্ছে : $\frac{\text{শিক্ষাবয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$

আমরা গোড়াতেই বলেছি বুদ্ধি হচ্ছে শিক্ষালাভের সামর্থ্য। একটি ছেলে বা মেয়ে সুযোগ পেলে ও সচেষ্ট হলে কতটুকু শিখতে পারবে সেটা নির্ভর করে তার কতখানি বুদ্ধি আছে তার উপর। সুতরাং শিক্ষাবয়স ও প্রকৃত বয়সের সম্বন্ধের চেয়েও নিকটতর সম্বন্ধ রয়েছে মনোবয়স ও শিক্ষাবয়সের মধ্যে। সাধারণ ভাবে শিক্ষার সুযোগ রয়েছে এমন একটি পরিবেশে একটি সাধারণ শিশুর মনোবয়স ও শিক্ষাবয়স এক হয়। শিক্ষাবয়স ও মনোবয়সের সম্বন্ধটিকে অনুপাতে প্রকাশ করা হয়। অনুপাতটির সম্বন্ধকে আমরা বলব সাফল্যাঙ্ক।

$$\text{সাফল্যাঙ্ক} = \frac{\text{শিক্ষাবয়স}}{\text{মনোবয়স}} \times ১০০$$

সাধারণতঃ একটি শিক্ষার্থীর সাফল্যাঙ্ক ১০০ বা তার কাছাকাছি হবে এমন মনে করা চলে। অর্থাৎ দশ বছর মনোবয়সের শিশু দশ বছর বয়সের শিশুদের মত লেখাপড়া শিখবে এটা আমরা আশা করব।

একটি ছেলে বা একটি মেয়ে যতখানি সে শিখতে পারে ততখানি সে শিখছে কিনা—সাফল্যাঙ্কের পরিমাণ দিয়ে সেটি বোঝা যায়। কারো মনোবয়স ১০ হলে তার শিক্ষারবয়সও ১০ হবে এমন আশা করা চলে, আমরা আগে বলেছি। ধরা যাক মানসিক বয়স ১০ হওয়া সত্বেও একটি ছেলে ১০ বছরের পাঠ আয়ত্ত করতে পারছে না, ৮ বছরের ছেলেমেয়েদের মত তার বিদ্যাবুদ্ধি। ঐ ক্ষেত্রে সে তার বুদ্ধির যথোচিত ব্যবহার করছে না, তার শিক্ষা-সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাচ্ছে না—এ কথা মনে করা যেতে পারে। এর মধ্যে অবশ্যি একটি কথা আছে। কে কতখানি পড়াশোনা করতে পারবে সেটা শুধুমাত্র বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে না। পরিবেশের আনুকূল্য আছে, সুযোগ-সুবিধা আছে। কারো ব্যক্তিত্ব ও আবেগ জীবনেও এমন অনেক ত্রুটী থাকতে পারে যার ফলে বুদ্ধিকে কাজে লাগান তার পক্ষে অসম্ভব হয়। সঠিক বিচারে—একজন কি পারবে, সেটা তার বুদ্ধি ও চরিত্র দুইয়ের উপরেই নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ পরিবেশ মোটামুটি অনুকূল থাকলে ও শিক্ষার্থীর চরিত্রে কোন বৈকল্য না থাকলে, মনোবয়স ও শিক্ষাবয়স এক হবে আমরা আশা করি। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাবয়স মনোবয়সকে কিছু ছাড়িয়ে গেছে এমনও দেখা যায়। হয়ত মনোবয়স

তার ১০, শিক্ষাবয়স ১১। এটা কেমন করে সম্ভব হল? সম্ভাবনাকে বাস্তব কেমন করে ছাড়িয়ে যায়? এটার উত্তর বোধ হয় এই যে সাধারণতঃ ১০ বছরের মনোবয়সের ছেলেমেয়েরা মোটামুটি সাধারণ ভাবে পরিশ্রম করে যতটুকু লেখাপড়া শেখে সেটাকে ১০ বছরের স্বাভাবিক শিক্ষামান বলা হয়। বিশেষ পরিশ্রম করলে, মনোযোগের ক্ষমতা অসাধারণ থাকলে শিক্ষামান তার চেয়ে নিশ্চয়ই কিছু বেশী হবে। ঐ ক্ষেত্রে সাফল্যাঙ্কের পরিমাণ ১০০'র চেয়ে বেশী হয়।

বার্টের অনুসন্ধান: সাফল্যাঙ্ক কোন ক্ষেত্রে ১০০'র বেশী, কোন ক্ষেত্রে ১০০'র কম

কয়েকটি অনুসন্ধানে বার্ট লক্ষ্য করেছেন যে বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের ৮৫—১০০'র মধ্যে এবং বুদ্ধ্যঙ্কের গড় ৯৩.৭—তারা সাধারণ স্কুলে অনেকসময় প্রায় তাদের সমবয়সী স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের অনুরূপ সাফল্য লাভ করেছে। ঐ সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের গড় শিক্ষাঙ্ক ৯৫.৮। অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের সাফল্যাঙ্কের পরিমাণ ১০০'র বেশী, আনুমানিক ১০২.২। বুদ্ধির স্বল্পতার অক্ষমতা তারা অতিরিক্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা কিছুটা পূরণ করেছে।

যে সব ছেলেমেয়ের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫'র নীচে, তাদের সাফল্যাঙ্ক দেখা গেল ১০০'র নীচে। অর্থাৎ, তাদের শিক্ষাবয়স তাদের মনোবয়সের চেয়ে কম। সহজ ভাষায়, তাদের ক্ষমতানুযায়ী লেখাপড়া তারা শিখতে পারেনি। সাধারণ শ্রেণীর শিক্ষাদানের ধারা সম্ভবতঃ তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর পরিবেশ তাদের শিক্ষার অনুকূল হয়নি। ফলে যেটুকু তারা শিখতে পারত—সেটুকুও তারা শিখতে পারেনি। ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশেও অত্যন্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য আলাদা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বল্প বুদ্ধির ছেলেমেয়েরা সেখানে একই সঙ্গে পড়ে—একথা সত্য নয়। উচ্চবুদ্ধি সম্পন্নদের ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে শিক্ষা দিলে প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে অবজ্ঞা করতে শিখবে, মানুষের সম্পূর্ণ মর্যাদা দেবে না—এমন একটি আশঙ্কা সত্যই রয়েছে। এ জন্যই সব বিষয় এক সঙ্গে না পড়ালেও কোন কোন বিষয় একসঙ্গে শেখবার ও কাজ করবার, খেলাধূলা করবার সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। প্রত্যেকেই আমরা মানুষ, সমমর্যাদার অধিকারী—জীবনে এটি একটি মহত্তম শিক্ষা। শ্রেণীতে যেখানে প্রত্যেকের প্রতি আলাদা মনোযোগ দেওয়া সম্ভব, যেখানে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে পড়ানো হচ্ছে, একই পরীক্ষা দ্বারা যেখানে শ্রেণীর সকল

শিশুকে সমভাবে বিচার করার চেষ্টা হয় না—সেখানে অবশ্য বিভিন্ন বুদ্ধির ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ানো চলতে পারে।

বুদ্ধির সঙ্গে স্কুল ও কলেজের পাঠে সাফল্যের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধটি স্কুলে, বিশেষতঃ নীচের দিকে নিকটতর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ ও বুদ্ধির ঐক্যাঙ্ক ·৭৫, হাই স্কুলে ·৬০—·৬৫ এবং কলেজে ·৫০'র কাছাকাছি। (১৭) কলেজে ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ হ্রাসের একটি কারণ—অকৃতকার্যতা হেতু অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের অনেকে কলেজে পড়তে পারে না। ঐক্যাঙ্ক নির্ণয়ে তারা বাদ পড়ার দরুণ ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ স্বভাবতঃই কিছু হ্রাস পাবে। কোন একটি পাঠ আয়ত্ত করতে গেলে সাধারণভাবে একটি ন্যূনতম বুদ্ধ্যঙ্ক দরকার। সে বুদ্ধিটুকু যাদের রয়েছে—তাদের পড়াশোনায় ভাল মন্দ করা নির্ভর করে প্রধানতঃ তাদের আগ্রহ ও চেষ্টার উপর। স্কুলের নীচের দিকে অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের মধ্যে চেষ্টা ও আগ্রহের যতখানি পার্থক্য—স্কুলের উপর দিকে, বিশেষতঃ কলেজে ঐ পার্থক্যটি আরও বেশী ও আরও স্পষ্ট। কলেজের পাঠ ও বুদ্ধ্যঙ্কের ঐক্যাঙ্কের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতার এটিও একটি কারণ।

বুদ্ধি ও স্কুল ও কলেজের পাঠ

বিদ্যালয়ে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন বিষয়ের সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ বা পারম্পর্য বেশী, কোন বিষয়ের সঙ্গে পারম্পর্য অপেক্ষাকৃত কম। স্কুলপাঠ্য বিষয়ের কোনটার সঙ্গে বুদ্ধির কতখানি যোগ—এ বিষয়ে সিরিল বার্ট লণ্ডনের কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। (১৮) নিম্নে তার ফলাফল উল্লেখ করা হল।

বুদ্ধি ও স্কুলপাঠ্য বিষয়

সারণী ১২
বুদ্ধি ও স্কুলপাঠ্য বিষয়ের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক

বুদ্ধি ও রচনা	·৬৩
বুদ্ধি ও পঠন	·৫৬
বুদ্ধি ও প্রশ্নের অঙ্ক	·৫৫
বুদ্ধি ও বানান	·৫৫
বুদ্ধি ও লেখা	·২১
বুদ্ধি ও হাতের কাজ	·১৮
বুদ্ধি ও ড্রইং	·১৫

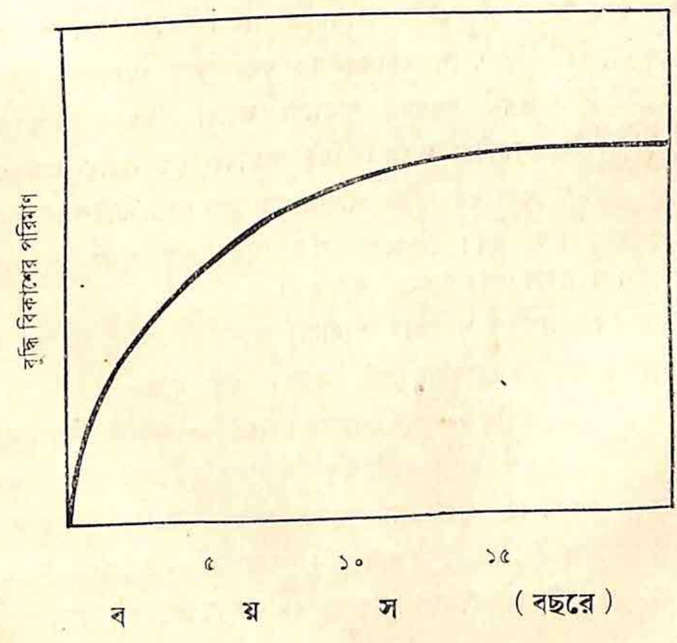
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে। চোদ্দ থেকে ষোল বছরে সাধারণতঃ একজনের বুদ্ধির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে এ কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বুদ্ধির চূড়ান্ত বিকাশের বয়স

১৯১৭ সালে আমেরিকান সৈন্যদের বুদ্ধি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে একজন বয়স্ক লোকের গড় মনোবয়স হচ্ছে সাড়ে তেরো। অর্থাৎ সাড়ে তেরো বছরের পর আর তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বেলাতে দেখা গেছে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। ভার্ণনের ধারণা (১৯) জ্ঞান লাভ ও চিন্তাশক্তির ব্যবহারের দ্বারা বুদ্ধি পুষ্টি লাভ করে বলেই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির বিকাশ বেশীদিন পর্যন্ত হয়।

ভেকলারের ধারণা (২০) ১৬ থেকে ২৫ কি ৩০ বছর পর্যন্ত বুদ্ধি একরকম থাকে, তার পর ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়। প্রথম দিকে হ্রাসের হারটি খুবই সামান্য। অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের বুদ্ধি, কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ বছর বয়স থেকেই হ্রাস পায়। (২১)

চোদ্দ বা ষোল বছর পর্যন্ত বুদ্ধির যে বিকাশ হয়, বিভিন্ন বয়সে তার পরিমাণ সমান নয় এমন মনে করবার হেতু আছে। প্রথম পাঁচ বছর অতি দ্রুত বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, দ্বিতীয় পাঁচ বছরে



বৃদ্ধির হার কিছু হ্রাস পেলেও প্রতি বছর শিশুর বুদ্ধির সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটেছে বোঝা যায়। তৃতীয় পাঁচ বছরে বুদ্ধি বিকাশের পরিমাণ এত কম যে বারো তেরো বছরে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে কিনা বোঝা পর্যন্ত কঠিন হয়। আগের পাতার লেখ থেকে বয়সের-সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বিকাশের গতির একটা ধারণা পাওয়া যাবে। প্রথম পাঁচ বছরে লেখটি কিছুটা খাড়া উপরের দিকে উঠে গেছে, দ্বিতীয় পাঁচ বছরেরর ঊর্ধ্বগতি স্পষ্ট বজায় আছে, তৃতীয় পাঁচ বছরে লেখটি প্রায় ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে গেছে। লেখাটি আমরা পিন্টনারের বুদ্ধি পরীক্ষা বই থেকে নিয়েছি।

বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধি বিকাশের গতি

বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির বিকাশের হার যদি বিভিন্ন হয়—তবে মানসিক বয়সের স্কেলটিকে সমান ইউনিটে বিভক্ত বলা চলে না।

এর সঙ্গে তুলনা করা চলে দৌড়ের। একটি ছেলে প্রথম মিনিটে ৪০০ গজ গেল, দ্বিতীয় মিনিটে ৩৭৫ গজ গেল, তৃতীয় মিনিটে ৩২৫ গজ গেল, ও চতুর্থ মিনিটে ২৫০ গেল। দৌড়ের দূরত্ব মাপের জন্য যদি মিনিটকে স্কেল করা হয়—তবে গোড়ার দিকে ১ মিনিটের যা অর্থ, পরের দিকে ১ মিনিটের অর্থ তা নয়। এক বছরের সাধারণ একটি শিশুর দুই বছর বয়স হল। তার মনোবয়স ১ বছর বাড়ল। সেই শিশুটি বারো বছর বয়সের পর তেরো বছরে পড়ল। সেখানেও তার এক বছর মনোবয়স বাড়ল। কিন্তু এ দুটি 'এক বছর মনোবয়স' এক নয়। প্রথম বয়সে মনোবয়স দ্রুত বাড়ে, পরে মন্থর হয়। সুতরাং প্রথম দিকে মনোবয়সের বিকাশ পরবর্তীকালের ১ বছর মনোবয়সের বিকাশের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী।

বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে মনোবয়স ও প্রকৃত বয়সের অনুপাত। মনোবয়স শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কিন্তু ষোল বছরের পর যখন আর মনোবয়স বাড়ে না তখন বুদ্ধ্যঙ্কের সাহায্যে কারো বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ে অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রাপ্ত-বয়স্কদের বুদ্ধির পরিমাপের জন্য পার্সেন্টাইল কিম্বা প্রমাণ স্কোর ব্যবহার করা হয়। শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপের জন্যও সময় সময় পার্সেন্টাইল ও প্রমাণ স্কোর ব্যবহার করা হয়।

পার্সেন্টাইল ও প্রমাণ স্কোর

স্কুলের একটি সাধারণ পরীক্ষার সাহায্যে আমরা পার্সেন্টাইল ও প্রমাণ স্কোর নির্ণয়ের পদ্ধতিটি বোঝবার চেষ্টা করব। ধরা যাক—বাঙলা পরীক্ষায় সমীর ৬০ নম্বর পেয়েছে। এই ৬০ নম্বরটি কি? ভালো, মন্দ না মাঝামাঝি? সাধারণতঃ মোট কত নম্বরের মধ্যে সে ৬০ পেয়েছে তাই দিয়ে আমরা নম্বরের তাৎপর্য বিচার করবার চেষ্টা করি। কিন্তু ঐ বিচার খুবই অসম্পূর্ণ। বাঙলায় ৬০ পাওয়ার মানে যা, অঙ্কে তা নয়। উপরের ক্লাশে বাঙলায় ৬০ কম ছেলেমেয়েই পায়, অঙ্কে ৬০

পার্সেন্টাইল

একটা বেশী নম্বর নয়। যারা ভালো তাদের পক্ষে ৯০ কিম্বা ১০০ পাওয়া আশ্চর্য নয়। মোট কথা সমীরের ৬০ নম্বরের তাৎপর্য বুঝতে হলে ঐ বিষয়ে শ্রেণীর ছেলেরা কে কত নম্বর পেয়েছে জানা দরকার। সর্বোচ্চ নম্বর থেকে সর্বনিম্ন নম্বরগুলি পর পর সাজিয়ে সমীরের স্থান কোথায় এটা জানলে সমীর শ্রেণীতে ভালো, মন্দ না মাঝামাঝি—সেটা বোঝা যাবে। ধরা যাক সমীরদের ক্লাশে ৫০টি ছেলে আছে। তাদের কয়েকজনের নম্বর পর পর দেওয়া হল :—

রাম	৭২
হরি	৭১
শ্যাম	৭০
শ্যামল	৬৫
অনুপম	৬৪
বীরেন	৬৩
সুশীল	৬১
সমীর	৬০

৫০ জনের মধ্যে সমীরের ক্রম অষ্টম। পার্সেণ্টাইল হিসাবে মোট সংখ্যা ১০০ ধরে নেওয়া হয় এবং যে সর্বপ্রথম তাকে উপরের থেকে (নীচের থেকে মনে না করে) গোনা হয়। এই হিসাবে রামের ক্রম ৯৮ পার্সেণ্টাইল অর্থাৎ ৯৮% ছেলে রামের নীচে।* সমীরের ক্রম কি? ঐ নিয়মে সমীরের পার্সেণ্টাইল ক্রম ৮৪ অর্থাৎ সে শতকরা ৮৪ জনের উপরে। ১০০ জনের মধ্যে কোন একজনের ক্রম কি, কতজনের সে উপরে—সংক্ষেপে পার্সেণ্টাইল দিয়ে ক্রম বুঝবার এই হচ্ছে তাৎপর্য।

সমীরের নম্বরের তাৎপর্য বোঝবার আরেকটি উপায় আছে। পূর্বে আমরা বলেছি সমীর যে ৬০'র নম্বর পেয়েছে তার অর্থ বুঝতে গেলে অন্যান্য ছেলেরা কে কি পেয়েছে জানা দরকার। অন্যান্য ছেলেদের প্রত্যেকের নম্বর আলাদা আলাদা না দেখে যদি সব নম্বর-গুলি যোগ করে মোট ছাত্রসংখ্যা দিয়ে সে যোগফলকে ভাগ করা যায়—তবে আমরা শ্রেণীর গড় নম্বর পাই। ধরা যাক শ্রেণীর গড় পাওয়া গেল ৪৫।

স্ট্যাণ্ডার্ড বা প্রমাণ স্কোর

* পার্সেণ্টাইল নির্ণয়ের করমূলা পরিসংখ্যান অধ্যায়ে দেখুন।

শ্রেণীর সাধারণ ছেলেরা ৪৫ বা তার কাছাকাছি নম্বর পাবে। সমীর শ্রেণীর সাধারণ ছেলেদের চেয়ে ভালো—সে ৬০ পেয়েছে অর্থাৎ গড় থেকে ১৫ বেশী। এই ১৫ দিয়ে সে কতটুকু ভালো কেমন করে বোঝা যাবে? এটা বুঝতে হলে জানা দরকার গড় থেকে অন্যান্য ছেলেরা কম বেশী কত নম্বর পেয়েছে। গড় থেকে ছেলেদের নম্বরের পার্থক্যের সমষ্টিকে ছাত্রসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যা পাওয়া যায়—তা হল গড় পার্থক্য বা গড় ব্যত্যয়। গড় ব্যত্যয় নির্ণয়ে পজিটিভ ও নেগেটিভ চিহ্নকে উপেক্ষা করে সব কিছুকেই যোগ করা হয় বলে একটা আপত্তি হতে পারে। এই কারণে (এ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে) গড় ব্যত্যয়ের পরিবর্তে প্রমাণ ব্যত্যয় সাধারণতঃ উপরোক্ত কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রমাণ ব্যত্যয় নির্ণয়ে—গড় থেকে প্রত্যেক ছাত্রের নম্বরের পার্থক্যটি নিয়ে তাকে বর্গ করা হয় (বর্গ করলে পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ সব নম্বরই পজিটিভ হবে) এবং বর্গীভূত সমস্ত ব্যত্যয়কে যোগ করে ছাত্রসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে—ভাগফলের বর্গমূল বার করলে যা পাওয়া যায় তাকে প্রমাণ ব্যত্যয় অথবা σ* বলা হয়। ধরা যাক সমীরের ক্লাসের ছেলেদের যা নম্বর—গড় থেকে তাদের পার্থক্য নিয়ে সে সবের বর্গফল বার করে ছাত্র সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে—ভাগফলের বর্গমূল বার করলে যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে ১০। সংক্ষেপে প্রমাণ ব্যত্যয় হল ১০। গড় থেকে সমীরের পার্থক্য হচ্ছে +১৫। প্রমাণ ব্যত্যয়ের সাহায্যে গড় থেকে সমীরের নম্বরের পার্থক্যকে বুঝতে হলে আমরা বলব

$$\frac{\text{গড় থেকে সমীরের পার্থক্য}}{\text{প্রমাণ ব্যত্যয়}} = \frac{১৫}{১০} = ১{\cdot}৫$$

। সংক্ষেপে, সমীরের স্ট্যাণ্ডার্ড বা প্রমাণ স্কোর হচ্ছে +১·৫।

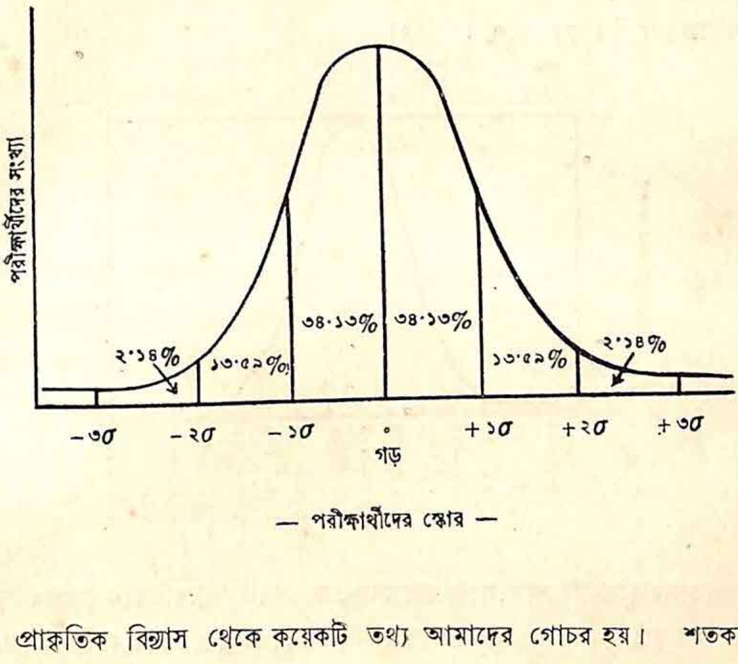
প্রাকৃতিক বিন্যাস

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে মানুষের দৈর্ঘ্য, বুদ্ধি প্রভৃতি বহু দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের বিন্যাসের একটি বিশেষ গাণিতিক নিয়ম আছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের একটি ঠিকঠাক নমুনা* নিয়ে, তাদের একটি উপযুক্ত অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষা

σ গ্রীক অক্ষর সিগমা। ঐ প্রতীকটি প্রমাণ ব্যত্যয় বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

* ধরা যাক আমরা বয়স্ক পুরুষের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করছি। যদি সমস্ত পুরুষদের মাপ নেওয়া সম্ভব না হয়—তবে আমরা তাদের একটি নমুনা নিয়ে নমুনার লোকদের মাপ নেব। সেই নমুনায় ঢেঙা, বেঁটে মাঝামাঝি সবরকম লোক থাকলেই নমুনাটি ঠিক বলা যাবে। সমস্ত পুরুষদের মধ্যে ঢেঙা, বেঁটে ও মাঝামাঝিদের যে অনুপাত আছে, নমুনাতে সেই অনুপাতটি থাকা দরকার। এ

করে তারা যা নম্বর পাবে সেই নম্বরগুলি একটি লেখেতে প্রকাশ করলে নীচের লেখার মতন সেটির রূপ হবে। নম্বরগুলি সাজালে যে বিন্যাস পাওয়া যায় তার নাম "প্রাকৃতিক বিন্যাস" ও লেখটির নাম "প্রাকৃতিক বিন্যাসের লেখ।" এই লেখটিকে 'গসিয়ান লেখ'ও বলা হয়।



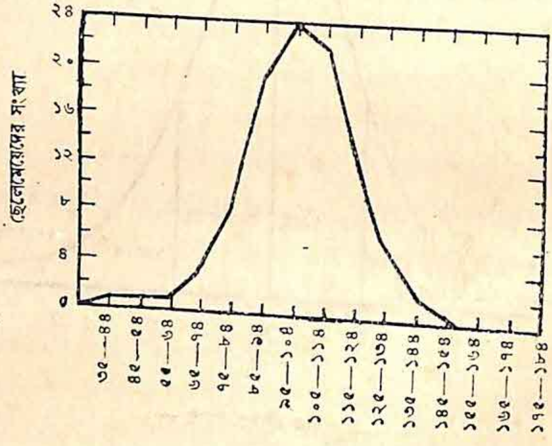
— পরীক্ষার্থীদের স্কোর —

প্রাকৃতিক বিন্যাস থেকে কয়েকটি তথ্য আমাদের গোচর হয়। শতকরা ৯৯·৭২ লোকদের স্কোর গড় থেকে ±৩ σ'র মধ্যে পাওয়া যায়। গড়ের± ১ σ'র মধ্যে ৬৮·২৬% লোকদের স্কোর। গড় থেকে যতদূরে যাওয়া যায়—ততই স্কোরের সংখ্যা কমে আসতে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে "প্রাকৃতিক বিন্যাসের" সঙ্গে σ'র একটি ধ্রুব সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ গড় থেকে ±১ σ'র

জাতীয় নমুনাকে উপযুক্ত নমুনা বলা হয়। একে অনেকসময় যদৃচ্ছ নমুনাও (**Random Sample**) বলে। যদৃচ্ছ নমুনায় লোক বাছাই করা ব্যাপারে কোন স্থান বা শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। নমুনায় লোকদের প্রত্যেকের স্থান পাবার সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই যদৃচ্ছ নমুনা লোকদের উপযুক্ত প্রতিভূ বা প্রকৃত নমুনা।

মধে যাদের স্কোর—তারা সাধারণ। $+1\sigma$ থেকে $+2\sigma$'র মধ্যে যাদের স্কোর—তারা ভালো। $+2\sigma$ থেকে $+3\sigma$'র মধ্যে যাদের স্কোর—তারা বিশেষ ভালোর দলে। সমীর সেই হিসাবে ভালোর পর্যায়ে পড়ছে।

টারমান-মেরিলের বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে ২ থেকে ১৮ বছরের ২৯০৪টি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করা হয়। নমুনাটি ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রকৃত নমুনা এমন মনে করবার কারণ আছে। যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তাকে নীচের লেখটিতে রূপায়িত করা হলো। (২২)

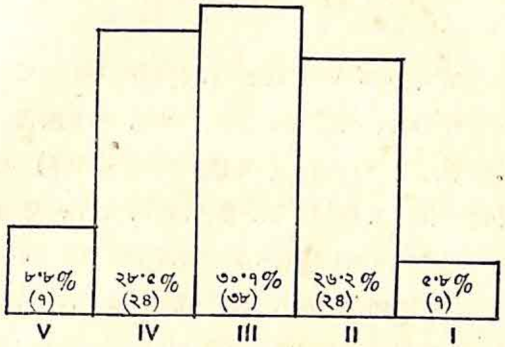


গত মহাযুদ্ধে বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে এক কোটি আমেরিকান সৈন্যের বুদ্ধি পরীক্ষিত হয়েছিল। একেবারে অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের এবং সেনাবাহিনীর স্থায়ী অফিসার, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের এ পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল। কোন শ্রেণীতে শতকরা কতজন ছিল—লেখের সাহাযে পরের পাতায় তা দেখান হল। প্রাকৃতিক বিন্যাসে কোন শ্রেণীতে কত % হবে—ব্রাকেটের মধ্যে তা উল্লেখ করা হল। (২৩)

যে সব বুদ্ধি অভীক্ষা প্রচলিত আছে—তাদের নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :

বুদ্ধি অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

(১) বাচনিক ব্যষ্টিগত বুদ্ধি অভীক্ষা। ভাষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের একে একে বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয়। বিনে সিমো অভীক্ষা—এ জাতীয় অভীক্ষার দৃষ্টান্ত।



(বিংহামের তথ্য থেকে)

(২) বাচনিক সমষ্টিগত বুদ্ধি অভীক্ষা। ভাষার সাহায্যে এই জাতীয় অভীক্ষার দ্বারা অনেককে এক সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়। আমেরিকান সেনাবাহিনীর বুদ্ধি অভীক্ষা এর দৃষ্টান্ত।

(৩) অ-বাচনিক ব্যষ্টিগত বুদ্ধি অভীক্ষা। কাজ ও চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের একে একে বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয়। (ক) কাজের দ্বারা যে অভীক্ষায় ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয়—তাকে করণ বুদ্ধি অভীক্ষা বলা হয়। পাস-অ্যালং (Pass-Along) অভীক্ষা, ফর্ম বোর্ড—করণ অভীক্ষার দৃষ্টান্ত। পাস-এ্যালং অভীক্ষায় বিভিন্ন সংখ্যার লাল ও নীল কাঠের ব্লক চিত্র অনুযায়ী সাজাতে হয়। ফর্ম বোর্ড অভীক্ষায় বৃত্ত, ত্রিভুজাকৃতি প্রভৃতি জ্যামিতিক আকৃতির কাঠের তৈয়েরী জিনিসকে তাদের উপযুক্ত খাপে সন্নিবেশ করতে হয়। (খ) চিত্র ও প্যাটার্ণের সাহায্যে বুদ্ধি অভীক্ষার দৃষ্টান্ত—প্রটিয়াস উদ্ভাবিত গোলক ধাঁধার পরীক্ষা ও র‍্যাভেন উদ্ভাবিত মেট্রিসেস। গোলক ধাঁধা পরীক্ষাটি গোলক ধাঁধা খেলারই অনুরূপ। কোন বয়সে কতখানি কঠিন গোলক ধাঁধা থেকে পরীক্ষার্থী পথ খুঁজে বার করতে পারে—এটা দেখা হয়। মেট্রিসেসে প্রত্যেকটি অভীক্ষায় সাধারণতঃ পাতার উপরের দিকে তিনটি প্যাটার্ণ অঙ্কিত থাকে (এমন অনেকগুলি অভীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষিত হয়)। চতুর্থটি কি হবে—পাতার নীচের দিকে অঙ্কিত কয়েকটি প্যাটার্ণ থেকে পরীক্ষার্থীকে খুঁজে বার করতে হয়।

(৪) অ-বাচনিক সমষ্টিগত বুদ্ধি অভীক্ষায় কাজ ও চিত্রের সাহায্যে

একসঙ্গে অনেকের বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয়। দৃষ্টান্ত ঃ ডেট্রোয়েট ফার্ষ্টগ্রেড বুদ্ধি পরীক্ষা।

বাচনিক বুদ্ধি অভীক্ষাকে GV অভীক্ষা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ পরীক্ষায় Nও কিছু পরীমাণে পরীক্ষিত হয়। করণ অভীক্ষায় (পাস-এ্যালং ও ফর্ম বোর্ড অভীক্ষায়) G ও F (প্র্যাক্‌টিক্যাল সামর্থ্য) এবং মেট্রিসেসে প্রধানতঃ G ও কিছু পরিমাণে S 'র (স্থানিক সামর্থ্য) পরীক্ষা হয়।

বুদ্ধি পরীক্ষার সমালোচনা

বিদেশে বহু বুদ্ধি অভীক্ষা প্রচলিত আছে। কিন্তু বিভিন্ন অভীক্ষায় পরীক্ষার ফলাফল এক নয়—বুদ্ধি পরীক্ষার বিপক্ষে এটি একটি জোরালো সমালোচনা। ফুট গজ ইঞ্চি দিয়ে মাপতে গিয়ে যদি একেকটি ফিতায় একেকরকম ফল পাওয়া যার—তবে মাপক সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ঘটে।

উত্তরে প্রথমেই বলা উচিত বিভিন্ন অভীক্ষার ফলাফল এক না হলেও ফলাফলে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। তবু বুদ্ধি পরীক্ষার অসম্পূর্ণতা রয়েছে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। এজন্যই মনোবিদ্‌রা একটি বুদ্ধি পরীক্ষার ফলাফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা সঙ্গত মনে করেন না। একাধিক অভীক্ষার দ্বারাই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা করা উচিত।

বুদ্ধি পরীক্ষার ফলাফলে বিভিন্নতার কারণ প্রধানতঃ ছুটি। মন বিভিন্ন জাতীয় সামর্থ্যের সমাবেশ। বিভিন্ন বুদ্ধি অভীক্ষার দ্বারা 'G' পরীক্ষিত হয়, তেমনি V, N, S, F প্রভৃতি বিভিন্ন সামর্থ্যের কিছু পরিমাণে পরীক্ষা হয়। এ সব সামর্থ্যের অনুপাত বিভিন্ন অভীক্ষায় বিভিন্ন। গোড়া থেকেই সামর্থ্যসমূহের অনুপাত নির্ণয় করে বুদ্ধি অভীক্ষা প্রস্তুত করা আজও সম্ভব হয়নি। এ কারণেই বুদ্ধি পরীক্ষার ফলাফলে অনেকখানি সাদৃশ্য থাকলেও তারা সম্পূর্ণরূপে এক নয়।

করণ অভীক্ষা ও বাচনিক অভীক্ষায় সাদৃশ্যটি খুব বেশী হবে আমরা আশা করি না। কারণ একটি উপাদান (অর্থাৎ G) এক হলেও ছুটিতে ছুটি ভিন্ন উপাদানেরও অনেকখানি স্থান রয়েছে (যেমন V ও F)।

দ্বিতীয়তঃ, সবক্ষেত্রে বিভিন্ন বুদ্ধি অভীক্ষায় মাপকের 'একক' এক নয়। মাপকের 'একক' বলতে আমরা σ বা প্রমান ব্যত্যয়কে বুঝি। σ যদি এক না হয় তবে বিভিন্ন অভীক্ষার স্কোর বা বুদ্ধ্যঙ্ক এক হলেও তাদের অর্থ এক হবে না।

ছেলে ও মেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড়ে কিম্বা বুদ্ধ্যঙ্কের বিস্তারে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। উভয়ের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ এবং বিস্তারও এক। বুদ্ধি অভীক্ষায় বাচনিক অংশটিতে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অধিক কৃতিত্ব দেখায়, অপর পক্ষে যান্ত্রিক ও আঙ্কিক সম্বন্ধে ছেলেদের ক্ষমতা বেশী। ভাষায় মেয়েদের দখল ছেলেদের চেয়ে বেশী। ছেলেদের চেয়ে গড়ে একমাস আগে তারা কথা বলতে আরম্ভ করে, শব্দ সঞ্চয়ে, পাঠ ও বাক্য ব্যবহারেও তারা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ছেলেদের মধ্যে তোতলামি, কথা আটকে যাওয়া যতটা দেখা যায়, মেয়েদের মধ্যে ততটা নয়।

ছেলে ও মেয়েদের বুদ্ধির পার্থক্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েরা ভাষায় ভালো ফল করে, ছেলেরা অঙ্কে। মেয়েদের ভাষায় শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু জ্যামিতি, অঙ্ক বা বিজ্ঞানে, ছেলেদের মত তারা কৃতিত্ব দেখাতে পারে না।

বুদ্ধি অভীক্ষায়, রঙ চেনা ব্যাপারে বা মুখের সৌন্দর্য নির্ণয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী কৃতিত্ব দেখায়। স্থানিক সামর্থ্যের অভীক্ষায় ছেলেদের সাফল্যের পরিমাণ বেশী।

এসব অবশ্য গড়ের কথা। অর্থাৎ, ছেলে ও মেয়েদের সম্বন্ধে ঐ উক্তি সাধারণভাবে সত্য। ছেলে ও মেয়ে উভয় দলের মধ্যেই প্রচুর ব্যক্তিগত পার্থক্যও আছে। অঙ্কে দক্ষ এমন মেয়েও বিরল নয়, অপর পক্ষে এমন ছেলেও আছে যারা ভাষা ব্যবহারে বিশেষ নিপুণ।

গ্রাম ও সহরের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিতে কোন পার্থক্য আছে কিনা—এটা জিজ্ঞাসা করা চলে। সাধারণতঃ সহরের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় পাওয়া যায় ১০০ বা কিছু বেশী, গ্রামের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০—৯৫'র মধ্যে। উপরোক্ত ফলটি স্কটল্যাণ্ডে একটি পরীক্ষায় (২৪) পাওয়া গেছে। কিন্তু যে সব গ্রামে ভাল স্কুল আছে—সেখানকার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় প্রায় সহরের ছেলেমেয়েদেরই সমান।

গ্রাম ও সহর

ঐ পার্থক্য কিছুটা সত্য—এমন ভাবা চলে। পার্থক্যের কারণ বোধ হয় যে যাদের বুদ্ধি বেশী—তারা গ্রাম ছেড়ে সহরে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তাদের সন্তানসন্ততিরও বুদ্ধি কিছু বেশী হবে—বংশগতির নিয়ম অনুসারে একথা সত্য। সহরের আবহাওয়া গ্রামের আবহাওয়ার চেয়ে বুদ্ধি

বিকাশের অনুকূল—এ কথা মনে করবার বোধহয় কারণ নেই। শিক্ষার সুযোগ সুবিধার কথা অবশ্য আলদা।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কিছু চেষ্টা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায়, নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয়েছে। সাধারণতঃ শ্বেতকায়দের গড় হয়েছে ১০০, নিগ্রো কিম্বা রেড ইণ্ডিয়ানদের গড় ৯০'র চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু শ্বেতকায়দের তুলনায় নিগ্রো বা রেড ইণ্ডিয়ানরা লেখাপড়ার সুযোগ কম পেয়েছে। শিক্ষা বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে অনুকূল একথা আমরা জানি। সুতরাং বুদ্ধ্যঙ্কের গড়ের ঐ পার্থক্যের কারণ একমাত্র পরিবেশ না পরিবেশ ও বংশগতি উভয়ই এ কথা বলা কঠিন। নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের কোন কোন অংশের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় আবার পাওয়া গেছে ১০০। তাদের বংশগতি অন্যান্য নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে উন্নততর কিনা, কিম্বা উন্নততর পরিবেশই তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের উচ্চতার কারণ—এ প্রশ্নের উত্তর আজও আমরা জানি না।

জাতিগত পার্থক্য

হাওয়াই দ্বীপে শ্বেত আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, চীনা, জাপানী, ফিলিপিনো প্রভৃতি বহু জাতি আছে। এ জায়গাটিতে জাতিবৈষম্য ও বিদ্বেষ খুবই কম ও শিক্ষার সুযোগ মোটামুটি সকলেই পাচ্ছে। এখানে দেখা গেছে, বাচনিক ও করণ উভয় প্রকার অভীক্ষাতেই চীনা, জাপানী ও কোরিয়ান ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরীক্ষার ফলাফল অন্যদের তুলনায় ভালো।

বাস্তবিকই বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধির কোন বংশানুক্রমিক পার্থক্য আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজও সম্ভব নয়। শিক্ষা দীক্ষা, উন্নততর পরিবেশের সুযোগ যেদিন সমভাবে বণ্টিত হবে—সেদিনই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে। তবে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে—তার থেকে উডওয়ার্থ নিম্নোক্ত দুটি সিদ্ধান্ত করেছেন।

(১) বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহজাত বুদ্ধির যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে তার পরিমাণ—আগে যা মনে করা হত—তার চেয়ে অনেক কম।

* বংশগতি ও পরিবেশ অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

(২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে গড় বুদ্ধির পার্থক্য যদি থেকেও থাকে বিভিন্ন জাতিভুক্ত বহু লোক আছে—যাদের পরস্পরের বুদ্ধি সমান। অনেক নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের বুদ্ধি শ্বেতকায়দের গড় বুদ্ধির চেয়ে বেশী। অনেক হাওয়াই ও ফিলিপিনোদের বুদ্ধি চীনাদের গড় বুদ্ধির চেয়ে বেশী। (২৬)

অধ্যায় ১৪

স্মরণ

জীবন ও শিক্ষার দিক থেকে স্মরণশক্তির মূল্য সহজেই অনুমান করা যায়। জগত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শিশু জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও বস্তুকে দেখে, শোনে এবং মনে রাখে। মা'কে দেখা মাত্র তার স্মৃতির দরজায় ধাক্কা লাগে। মা'কে সে চিনতে পারে, মা'কে দেখে হাসি ও আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মা'র সম্পর্কে মা শব্দটি সে শোনে। মা শব্দ শোনা মাত্র তাই মা'কে সে খোঁজে, মা কাছে থাকলে তার দিকে সে তাকায়। পুরাতন সঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে মানুষ আয়ত্ত করে। স্মৃতিশক্তি সে জ্ঞান লাভে মানুষের একটি প্রধান সহায়ক।

লেখাপড়া শেখা ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বুদ্ধির পরেই স্মৃতিশক্তির স্থান। অর্থাৎ বোঝার পরেই মনে রাখা। স্মৃতি ও বুদ্ধি পরস্পর নির্ভরশীল। ছুটি ক্ষমতাকে মানসিক বিশ্লেষণের সাহায্য আলাদা করলেও ঐ কথা যেন আমরা না ভুলি। কবিতার ছুটি লাইন পড়ার কথা ধরা যাক্। প্রথম লাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের সম্পর্ক বোঝা জ্ঞান ও বুদ্ধির কাজ। কিন্তু সে সম্পর্কটি বুঝতে হলে দ্বিতীয় লাইনটি পড়বার সময় প্রথম লাইনের কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে না পারলে বুদ্ধি সেখানে কাজ করতে পারবে না। আবার তেমনি দেখা গেছে যে জিনিস শিশু বোঝে, সে জিনিস সহজে সে মনে রাখতে পারে। ছুর্বোধ্য ও অবোধ্য জিনিষ মনে রাখা খুবই কঠিন।

উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কোন কোন ক্ষেত্রে লেখা পড়ায় কাঁচা, এমন কি অনগ্রসর দেখা যায়। সে সবক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি ছুর্বল এমন অনেক সময়ে দেখা যায়।

স্মরণ কি এইবারে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব। শিশু তার বাবাকে দেখল।

বাবার চেহারা সচেতন ভাবে না হোক, অচেতন ভাবে অন্ততঃ তার মনে রইল। বাবা অফিস থেকে ফিরে শিশুর কাছে আসা মাত্র বাবাকে সে চিনতে পারল। সূত্রে প্রকাশ করলে বলা যায়ঃ

স্মরণ

অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা	[ধৃতি বা মনে রাখা]	চেনা
(বাবাকে দেখা)	(বাবার চেহারা মনে রাখা)	(বাবাকে চেনা)

আরেকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শিশুকে একটি বল দেখিয়ে বলা হল "বল"। শিশুও বললো "বল।" পরদিন বলটিকে সামনে হাজির করা মাত্র শিশু বললো—"বল।" সূত্রে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়—

অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা (বল দেখা ও বল শব্দটি শুনে বলা)	[ধৃতি বা মনে রাখা]	অনুস্মরণ করা (বল দেখে বল শব্দটি অনুস্মরণ করা অর্থাৎ মনে করে বলা

দুমাসের শিশু মা'কে দেখলে হাসে, মা'কে সে চিনতে পারে। কুকুর তার প্রভুকে দেখলে ছুটে গিয়ে তার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়—প্রভুকে সে চিনতে পেরেছে। নতুন একটি পথ ধরে লেকে গেলাম। পরদিন সে রাস্তাটি দেখামাত্র মনে হল—"হ্যাঁ, এই সেই রাস্তা—যে পথ দিয়ে কাল আমি গিয়েছিলাম।" প্রথম দুটি 'চেনা' ও শেষের 'চেনা'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। শেষের চেনাটির মধ্যে প্রথম অভিজ্ঞতাটি কবে ঘটেছিল, তার স্থান ও কালের নির্দেশ আছে। প্রথম দুটিতে সে সমস্ত কিছুই নেই। কেবল মাত্র 'পরিচিত বোধ' ছাড়া।

চেনা, চিনতে পারা

চেনা বা চিনতে পারায়—যে বস্তু বা ঘটনাকে স্মরণে আনা হল তার উপস্থিতি আবশ্যক। তাকে দেখে বা শুনে আমরা চিনতে পারি। কোন বস্তু বা ঘটনার অনুপস্থিতিতে সে বস্তু বা ঘটনা মনে করাকে অনুস্মরণ বলা হয়। আমি ঘরে বসে লিখছি। আর আমি লেকের কথা মনে করছি। এটা অনুস্মরণের একটি দৃষ্টান্ত।

চেনা ও অনুস্মরণের সংজ্ঞা

স্মরণের বিভিন্ন রূপ নীচের সারণীতে দেখানো হোল ঃ

- স্মরণ
  - অনুস্মরণ
  - চেনা
    - পরিচিত বোধ
    - অতীত অভিজ্ঞতাটি স্মরণে এনে চেনা

মানুষেতর জীবের স্মরণের স্বরূপটি 'পরিচিত বোধ' এমন মনে করা যেতে পারে। স্মরণের মধ্যে 'পরিচিত বোধ' সবচেয়ে আদিম। অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণে এনে চেনার মধ্যে অনুস্মরণের সামান্য উপাদান আছে। মানুষেতর জীব বা ছোট শিশু—যাদের ভাষা নেই—তাদের পক্ষে এমন চেনা কঠিন। কারণ ঘটনার স্থান কাল নির্দেশের জন্য ভাষা আবশ্যক।

আম দেখামাত্র আম বলে তাকে চিনতে পারি। আম কবে দেখেছি, আম শব্দটি কবে শুনেছি, শিখেছি এ কথা মনে আসে না, মনে করার চেষ্টাও করি না। এতবার দেখেছি, এতবার ঐ শব্দটি শুনেছি যে ঐ বহু অভিজ্ঞতা মিলে মনের মধ্যে যেন একটি কম্পোজিট ফটোগ্রাফ সৃষ্টি হয়েছে। ঐ চেনার জন্য একটি বিশেষ দিনের অভিজ্ঞতা স্মরণের প্রয়োজন অনুভব করি না। আদিম 'পরিচিত বোধে'র সঙ্গে এ জাতীয় চেনার সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। ঐ 'পরিচিত বোধে' জীবের পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতা অনুস্মরণের ক্ষমতা নেই। সেজন্য আদিম 'পরিচিত বোধে'র কারণটা জীবের কাছে অজ্ঞাত, অবোধ্য। 'পরিচিত বোধ' যেখানে বহু অভিজ্ঞতার উপর আশ্রিত—'পরিচিত বোধে'র কারণ সেখানে জীব জানে। দরকার হলে অতীত অভিজ্ঞতাকে কিছু কিছু সে স্মরণ করতে পারে।

অবিলম্ব অনুস্মরণ

অভিজ্ঞতা লাভ এবং অনুস্মরন বা চেনা'র মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে। আবার সময়ের ব্যবধান খুব কম হতে পারে। যেমন—পরীক্ষক পর পর চারটি শব্দ বলে পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বললাম—বলত।" এই পরীক্ষায় মনে রাখার স্থান সামান্য। অমন ক্ষেত্রে একসঙ্গে মনে কতটুকু ধরে রাখা যায়, স্মৃতি-প্রসর বা স্মৃতির বিস্তার কতটুকু সেটাই প্রধান কথা। শব্দ ও সংখ্যার

সাহায্যে স্মৃতির প্রসর পরীক্ষা করে দেখা গেছে। জানা গেছে যে একটা বয়স পর্যন্ত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-প্রসর বাড়ে। স্মৃতি-প্রসরের সঙ্গে বুদ্ধির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বিনে তার বুদ্ধি অভীক্ষায় শব্দ ও সংখ্যার সাহায্যে স্মৃতি-প্রসর পরীক্ষার প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করেন। অধিকাংশ মৌখিক বুদ্ধি পরীক্ষায় অমন ধরণের প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা নীচে দেওয়া হল।* পরীক্ষার্থীকে বলা হয়, "আমি কতগুলি সংখ্যা বলছি, শোন। আমার বলা হলে পর তুমি বলবে।"

স্মৃতি-প্রসর

৩ ৭ ১

৪ ৭ ৫ ২

৯ ৬ ৪ ২ ৯

২ ৫ ১ ৬ ৪ ৩

১ ৭ ৪ ২ ৫ ১ ৮ ইত্যাদি

পাঁচ বছরের শিশুরা সাধারণতঃ চারটি সংখ্যা পর পর বলতে পারে। আঠারো বছর পর্যন্ত মনের সংখ্যা ধরে রাখবার ক্ষমতা বাড়ে। সাধারণতঃ আঠারো বছর বয়সে আটটি সংখ্যা পর্যন্ত লোকে বলতে পারে। (২)

দূর স্মৃতি

দূরের ঘটনা মনে রাখা, চেনা কিংবা অনুস্মরণ বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাই—তাতে তিনটি ভাগ আছে: (১) শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা (২) ধৃতি বা মনে রাখা (৩) অনুস্মরণ।

শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা: লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন

শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাক। কোন কিছুকে মনে রাখতে গেলে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা বা অনুশীলন সাহায্য করে। একটি কবিতা মুখস্থ করতে হলে একবার পড়লে হয়না, বার বার পড়তে হয়। কিন্তু কি আমি শিখতে চাইছি, কি উত্তর আমাকে দিতে হবে—এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান থাকা দরকার। সংক্ষেপে, শিক্ষা প্রচেষ্টার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার সচেতন হওয়া আবশ্যক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন পরীক্ষার্থীকে যুগ্ম-শব্দের একটি তালিকা দিয়ে বলা হল—প্রতি যুগ্মের প্রথম শব্দটি পরীক্ষক বললে পর পরীক্ষার্থীকে দ্বিতীয় শব্দটি বলতে হবে। তালিকাটি ধরা যাক—নিম্নোক্ত ধরণের।

আকাশ	গাছ
দূর	ঘাস
পাহাড়	নীল প্রভৃতি

এমন ২০টি যুগ্ম শব্দ

কয়েকবার তালিকাটি পড়বার পর পর পরীক্ষার্থী মোটামুটি প্রশ্নোত্তরের ক্ষমতা অর্জন করে। যুগলের প্রথম শব্দটি পরীক্ষক বললে—দেখা যায়—দ্বিতীয়টি সে বলতে পারে। সে সময়ে হঠাৎ যদি তাকে বলা হয়—"তালিকাটি প্রথম থেকে বলে যাও ত।" দেখা যাবে অমন প্রশ্নোত্তরের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত নয়। তার উত্তর অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হবে। তালিকাটি শেখবার সময় সমস্ত তালিকাটি মুখস্থ করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং ঐ প্রশ্নোত্তরের ক্ষমতা সে অর্জন করে নি। (৩)

পাঠের অর্থ বা সম্বন্ধ বোঝার প্রয়োজন

শেখা বা মুখস্থ করা একটি বিশেষ সক্রিয় মানসিক কাজ। যে কোন বুদ্ধি-সম্পন্ন পরীক্ষার্থী কিছু মুখস্থ করবার সময় কেবলমাত্র বারে বারে পড়েই ক্ষান্ত হয় না—পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে দুই বা বহু শব্দ পরীক্ষার্থীর চোখে একটি সমগ্ররূপে ধরা পড়ে। বিচ্ছিন্ন বহু অপেক্ষা একটি সমগ্র জিনিসকে আয়ত্ত করা—পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অনেক সহজ। কবিতায় ছন্দ ও মিল দুটি লাইনের মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ কারণে গদ্যের দু'লাইন অপেক্ষা কবিতার দু'লাইন মুখস্থ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বাক্যে একাধিক শব্দ মিলে একটি মূল অর্থ প্রকাশ করে। সে অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করলে শিশুর পক্ষে বাক্যটি আয়ত্ত করা সহজ হয়। এই কারণে দেখা গেছে—অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করা অত্যন্ত কঠিন। বহু চেষ্টা দ্বারা কতগুলি অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করলেও তাদের ভুলতে বেশী সময় লাগে না।

এ সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার। অনেকসময় ছেলেমেয়েরা পাঠ্যবস্তুর মানে ভালোরকম না বুঝেই মুখস্থ করবার চেষ্টা করে। মানে বুঝতে পারলে মুখস্থ করা তাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে। একটি জিনিস ভালোভাবে না বুঝলে তা সত্যিকারের শেখা হয় না। তদুপরি মুখস্থ করবার জন্যও মানে বোঝা দরকার। 'আগে মুখস্থ কর, পরে মানে বুঝবে' এ যুক্তি ঠিক নয়।

কোন একটি পাঠ মুখস্থ করতে হলে দু'একবার সেটা প'ড়ে যদি নিজে নিজে আবৃত্তি অর্থাৎ বলবার চেষ্টা করা যায়, বলতে না পারলে যেখানটায় আটকাচ্ছে সেটা দেখে নিয়ে আবার চেষ্টা করা যায়, তবে মুখস্থ করতে সময় কম লাগে এবং পাঠটি পরে মনে থাকেও বেশী। ঐ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানের ফল নীচে সন্নিবেশ করা হল। (৪) অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঐ পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। মুখস্থ করার জন্য ৯ মিনিটকাল সময় দেওয়া হয়েছিল।

আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা

সারণী ১৩

মুখস্থের বিষয়ঃ	১৬টি অর্থহীন শব্দ		৫টি সংক্ষিপ্ত জীবনী—মোট ১৭০টি শব্দ।	
সময় বণ্টনের তালিকা	স্মরণের পরিমাণ %		স্মরণের পরিমাণ %	
	পাঠের ঠিক পরে	৪ ঘণ্টা পরে	পাঠের ঠিক পরে	৪ ঘণ্টা পরে
পড়তে সমস্ত সময় ব্যয়ঃ	৩৫	১৫	৩৫	১৬
১/৫ সময় আবৃত্তিতে ব্যয়ঃ	৫০	২৬	৩৭	১৯
২/৫ সময় আবৃত্তিতে ব্যয়ঃ	৫৪	২৮	৪১	২৫
৩/৫ সময় আবৃত্তিতে ব্যয়ঃ	৫৭	৩৭	৪২	২৬
৪/৫ সময় আবৃত্তিতে ব্যয়ঃ	৭৪	৪৮	৪২	২৬

ঐ পরীক্ষাটি বয়স্কদের নিয়ে করেও প্রায় অনুরূপ ফল পাওয়া গেছে। পুরো ৯ মিনিট সময় ব্যয় করে যতটা মুখস্থ হয়—কিছু সময় আবৃত্তিতে ব্যয় করাতে তার চেয়ে বেশী মুখস্থ করা সম্ভব। পড়ার ৪ ঘণ্টা পরে অনুস্মরণের বেলাতেও ঐ কথা সত্য বলে দেখা গেছে।

মুখস্থে আবৃত্তির সহায়তার সুফলের কারণ বোঝা কঠিন নয়। আবৃত্তি নিজেকে পরীক্ষা—নিজের ক্ষমতার পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষা মানুষ ভালোবাসে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তির থেকে ঐ প্রেরণা আসে। কিছুটা মুখস্থ হয়েছে, কিছুটা সে পারছে জেনে পরীক্ষার্থী খুশী হয়। সম্পূর্ণ ও সঠিকতর ভাবে পারবার জন্য সে

উৎসাহিত ও সচেষ্ট হয়। কোথায় কোন জায়গায়—দুর্বলতা, কোনখানটায় বার বার ভুল হচ্ছে, কোন জায়গায় জোর দিতে হবে—এ সবও পরীক্ষার্থীর চোখে ধরা পড়ে। সাফল্য ও ব্যর্থতার উদ্দীপনা পাঠটিকে সহজে আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীকে বারম্বার সাহায্য করে। আবৃত্তিহীন বারম্বার পাঠে ঐসব প্রেরণা নেই। তাই পাঠ প্রাণহীন। সে কারণে সময়ও তাতে বেশী লাগে।

যদি টাইপরাইটিং শেখবার জন্য ৭ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়, তবে ঐ সময়কে কি ভাবে কাজে লাগালে 'অল্প সময়ে বেশী শেখা যাবে'। একই সঙ্গে বসে ৭ ঘণ্টা কাজ করলে সে বেশী শিখবে, না প্রতিদিন আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা করে ৭ দিন বা ১৪ দিন ধরে কাজ করলে সে বেশী শিখতে পারবে? এ বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান হয়েছে। কিন্তু খুব জোর করে বলার মত ফলাফল পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন ধরণের কাজে একই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথাও স্মরণ করতে হয়। রামের বেলাতে যে কথা বলা চলে—শ্যামের বেলাতে সে কথা সবটা খাটে না। রামের হয়ত কোন কাজে মন দিতে সময় লাগে। কিন্তু কাজটিতে একবার তার মন বসলে পর অনেকক্ষণ ধরে সে কাজ সে করে, কাজ করতে তার ভালো লাগে। মন বসার সমস্যা শ্যামের নেই। কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে সে মন দিতে পারে। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে সে ক্লান্ত বোধ করে, সে পরিবর্তন চায়। আয়নায় প্রতিবিম্বিত ড্রয়িং দেখে ড্রয়িং আঁকবার চেষ্টায় সময় কিভাবে বণ্টন করলে অধিকতর সুফল পাওয়া যায় সে বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান হয়েছে। প্রথম দিকে ঘনঘন অবসর দিয়ে বারবার অল্পসময়কাল ধরে চেষ্টা করলে—চেষ্টা অধিকতর ফলবতী হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার্থী যখন কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করেছে—তখন একসঙ্গে অনেকক্ষণ বসে কাজ করাতে বেশী ফল পাওয়া গেছে। এ কথা অবশ্য ঠিকই যে একই ধরণের কাজ ৭ ঘণ্টা একসঙ্গে বসে করলে সুফল পাওয়া যাবে না। তাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা দরকার। কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ কতটুকু সময়ের হবে? এ বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা উল্লেখ করে গেটস্, জারসিল্ড প্রভৃতি বলছেন (৫) যে প্রত্যেকটি অংশ যদি আধঘণ্টা হয় এবং বিভিন্ন অংশের ব্যবধান যদি আধঘণ্টা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়, তবে সময়ের ঐ বণ্টন শিক্ষার সহায়তা করে।

সময় বণ্টন সমস্যা

একটি বড় কবিতা মুখস্থ করতে হবে। এক হলো কবিতাটির একেকটি করে পংক্তি পড়ে মুখস্থ করা যেতে পারে—অথবা গোটা কবিতাটি একসঙ্গে পড়ে মুখস্থ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কোন পদ্ধতিতে কম সময় লাগে? এ বিষয়ে কয়েকটি অনুসন্ধানের ফল হল—গোটা কবিতাটি একসঙ্গে পড়লে মুখস্থ করতে কম সময় লাগে। উডওয়ার্থ (৬) একটি অনুসন্ধানের ফলাফল উল্লেখ করেছেন। নীচে তা দেওয়া হল।

সমগ্র না অংশ পদ্ধতিতে শিক্ষা

২৪০ লাইন মুখস্থে

মুখস্থের পদ্ধতি (প্রতিদিন ৩৫ মিনিট সময় ব্যয়)	**কতদিন লেগেছিল**	**মোট কত মিনিট লেগেছিল**
৩০ লাইন করে মুখস্থ করা	১২	৪৩১
সমস্ত কবিতাটি ৩ বার করে পড়া	১০	৩৪৮

গোটা কবিতাটি প্রতিদিন পড়ে—দেখা গেল—অংশ পদ্ধতির তুলনায় ৮৩ মিনিট কম সময়ে কবিতাটি মুখস্থ হল। কিন্তু সব অবস্থাতেই যে অংশ-পদ্ধতির চেয়ে সমগ্র-পদ্ধতিতে সুবিধা হয় এ কথা ঠিক নয়। অর্থহীন শব্দের তালিকা ছোট ছোট ভাগ করে পড়াতে মুখস্থের সময় সংক্ষেপে হয়েছে বলে একটি পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। গোটা বা সমগ্র বলতে কেবল অনেকখানি বোঝায় না। সেই 'অনেক' মিলে যখন একটি মূল বা প্রধান অর্থ প্রকাশ করে তখনই তাকে আমরা 'সমগ্র' বলি। বিষয়বস্তুর মধ্যে যে ক্ষেত্রে সমগ্রতা থাকে—সমগ্র পদ্ধতি সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অধিকতর কার্যকরী। গোটা পাঠ্য বা শিক্ষণীয় বস্তুটি অত্যন্ত দীর্ঘ বা জটীল হলে সমগ্র-পদ্ধতিতে সুবিধা হবে কিনা সন্দেহ। অমন ক্ষেত্রে বোধহয় জিনিসটাকে কিছু ভাগ করে নিলেই মুখস্থের সুবিধা হয়। সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সমগ্র পদ্ধতিতে শিখতে বেশী সুবিধা হয়। কোন কিছু শিখতে 'অংশ পদ্ধতি' ব্যবহার দরকার মনে করলেও গোড়াতে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়টিকে এক আধবার পড়ে নেওয়া কিম্বা জেনে নেওয়া উচিত। সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধটা জানলে শিক্ষণীয় বস্তুটি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হয় বলে দেখা গেছে।

রাম রাত্রিতে একটি কবিতা পড়ে মুখস্থ করল—মনে রাখল—পরদিন স্কুলে গিয়ে সে তার পড়া দিল। বই না দেখে কবিতাটি সে আগাগোড়া বলে গেল। এই মনে রাখা ব্যাপারটি কি? রাম তো সারা রাত কিম্বা সারা সকাল বসে মনে মনে কবিতাটা আওড়ায়নি। সারা রাত কিম্বা সারা সকালে কবিতটির কথা সে একবার ভাবেও নি। তবু কবিতাটি নিশ্চয়ই তার 'মনে' ছিল। নইলে ইস্কুলে গিয়ে সে বললো কি করে? বলা যেতে পারে—কবিতাটি তার অবচেতন মনে ছিল। কিন্তু কোন রূপে? অবচেতন মনে কি সারাক্ষণ ধরে সে কবিতাটি আবৃত্তি করছিল? এমন কথা ভাববার দরকার নেই। যে শব্দসম্ভার কবিতাটি রচনা করেছে সে শব্দসম্ভারের সম্ভাবনা রূপে কবিতাটি তার মনে ছিল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে। বলা যেতে পারে অভিজ্ঞতাটি তার মনের উপর 'স্মৃতির দাগ' রেখে গেছে। মনের কাঠামো ও মানসিক ক্রিয়ার কাজের পার্থক্য কি একথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। স্মৃতির দাগ মনের কাঠামোতে অঙ্কিত হয়ে যায়। সেই দাগ থাকে বলে—আবশ্যকমত সেই ঘটনা বা বস্তুকে আমরা মনে করতে পারি।

ধৃতি বা মনে রাখার স্বরূপ

'স্মৃতির দাগের' সঠিক রূপটি কি বলা কঠিন। সম্ভবতঃ মস্তিষ্কে কোন পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কি জাতীয় পরিবর্তন সে বিষয়ে আমরা জানি না।

একটি ঘটনা বা বস্তু শিশুর মনে ছিল তা কেমন করে জানা যায়? শিশু যখন ঘটনাটি বর্ণনা করে কিম্বা বস্তুটিকে চিনতে পারে তখন বোঝা যায় ঘটনা বা বস্তুটি তার মনে ছিল। আরেকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। রাম তিন বছর আগে একটি কবিতা মুখস্থ করেছিল। আজ কবিতাটির একটি লাইনও সে মনে করতে পারছে না। কবিতাটি আবার তাকে পড়তে দেওয়া হল। দেখা গেল তার প্রথমবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এবার সে কবিতাটি মুখস্থ করে ফেলল। তার মানে, মনে করতে না পারলেও কবিতাটি তার মনে ছিল। এ কথায় একটি আপত্তি হতে পারে। কারণ এও মনে করা যেতে পারে তিন বছরের ব্যবধানে তার মুখস্থ করবার শক্তি বেড়েছে। আপত্তি ঠিক কিনা জানবার জন্য তাকে ঐ ধরণের আরেকটি নতুন কবিতা মুখস্থ করতে দেওয়া হল। দেখা গেল নতুন কবিতার তুলনায় পুরণো কবিতাটি (যে কবিতা সে আগে একবার মুখস্থ করেছিল, এখন 'ভুলে' গেছে)

ধৃতি বা 'মনে রাখা'র পরিমাণের পরিমাপ

সময় সংক্ষেপ পদ্ধতি

মুখস্থ করতে তার কম সময় লাগছে। কি মনে আছে জানবার এবং সঠিক পরিমাপের জন্য (১) চেনা (২) অনুস্মরণ এবং (৩) পুনরায় শিক্ষায় সময় সংক্ষেপ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

স্মৃতির কথা আলোচনা করতে গেলে বিস্মৃতির কথাও এসে পড়ে। শেখবার পর—শেখা বিষয়টি আমরা কতখানি ভুলি ও কত সময়ে ভুলি—এ বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান হয়েছে। ভুলে যাওয়া ব্যাপারে ব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে। সকলে সমান ভোলে না। একই সময়ে বীথি ভোলে কম, কেতকী ভোলে বেশী। দ্বিতীয়তঃ, অর্থপূর্ণ শব্দ অপেক্ষা অর্থহীন শব্দ ভুলতে কম সময় লাগে। তৃতীয়তঃ, যে সব জিনিস অতিরিক্ত শেখা হয়েছে সে সব লোকে খুব ধীরে ধীরে ভোলে। একটি অর্থসম্বলিত পাঠ—ধরা যাক একটি কবিতা, মুখস্থ হবার পরও আরও বহুবার পড়লে পর কবিতাটি—পরবর্তী কালে আর না পড়ে—সারাজীবন মনে রাখা ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব নয়।

বিস্মৃতির পরিমাণ

অনুশীলনের অভাবে, ধীরে ধীরে শেখা জিনিস লোকে ভুলে যায় এটা সকলেই জানেন। এই ভুলে যাওয়ার বেশীটা ঘটে শেখার অনতিকাল পরেই, এমন কি শেখার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

সময়ের ব্যবধানে স্মৃতি ম্লান হয়। যা এককালে মানুষ জানত—তা সে ভুলে যায়। কিন্তু কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানই কি ভোলবার কারণ? একজন যদি দশ বছর ঘুমিয়ে কাটায়—তবে ঘুমোবার আগে তার যা স্মৃতি ছিল—ঘুম থেকে উঠেও কি স্মৃতি তাই থাকবে না? ভোলবার আসল কারণ সময়ের ব্যবধান নয়। মানুষ প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা লাভ করছে। একটি অভিজ্ঞতার দাগ মনের উপরে পড়তে না পড়তে—আরেকটি অভিজ্ঞতা সে লাভ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটি স্মৃতি অপর স্মৃতিকে বাধা দেয় ও দুর্বল করে। ভোলবার একটি প্রধান কারণ—নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন স্মৃতি। লোকে যখন ঘুমোয়—তখন তার মানসিক ক্রিয়া কম হয়। নতুন অভিজ্ঞতা সে বিশেষ লাভ করে না। ফলে জাগ্রত অবস্থায় তার ভুলের পরিমাণ যতখানি—ঘুমে তার চেয়ে ভুলের পরিমাণ কম। একটি অনুসন্ধানের ফলে যা পাওয়া গেছে—তার একটি সারণী নীচে দেওয়া হল।

বিস্মৃতির কারণ

ঘুম ও জাগ্রত অবস্থায় ধ্বতির পরিমাণ

(ভ্যান ওরমার ই বি'র অনুসন্ধান থেকে)

অর্থহীন শব্দের তালিকা মুখস্থের পর	জাগ্রত অবস্থা % (আনুমানিক)	ঘুম (ঘুমের পরে জাগলে পরীক্ষা করা হয়) % (আনুমানিক)
১ ঘণ্টা পরে	৪২ ৫	৪৪ (আধো ঘুম আধো জাগরণের পর)
২ ঘণ্টা পরে	৩৮·৫	৪২·৫
৩ ঘণ্টা পরে	৩৬	৪২
৪ ঘণ্টা পরে	৩৩ ৫	৪১·৭
৫ ঘণ্টা পরে	৩১	৪১·৪
৬ ঘণ্টা পরে	২৮·৫	৪১·১
৭ ঘণ্টা পরে	২৬	৪০ ৮
৮ ঘণ্টা পরে	২৪	৪০·৫

কিন্তু অন্যান্য অভিজ্ঞতার বাধা ছাড়াও—ভোলবার একটি দেহগত কারণ আছে ভাবা চলে। শরীরের একটি পেশীকে একবারে ব্যবহার না করলে ক্রমে সে অকর্মণ্য হয়ে যায়। দেহমনের উপর স্মৃতির দাগকে বারবার স্মরণ করে কাজে না লাগালে ক্রমশঃ তা ম্লান হয়ে যাবে এমন মনে করা চলে।

মনে রাখা ব্যাপারে অন্য অভিজ্ঞতার বাধা সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা হয়েছে। উডওয়ার্থ সে সব পরীক্ষার একটি আনুমানিক বিবরণ দিয়েছেন। একটি ছেলেকে যুগ্ম শব্দের একটি তালিকা দেখান হল। নির্দেশ রইল—প্রথম শব্দটি যখন পরীক্ষক বলবেন, তখন পরীক্ষার্থী প্রতি যুগ্মের দ্বিতীয় শব্দটি বলবে। ধরা যাক তালিকাটি এমন ধরণের :

অন্য অভিজ্ঞতার বাধা

আকাশ	গাছ
বাঘ	জল
দূর	ঘাস
পাহাড়	নীল ইত্যাদি

কয়েকবার এমন দেখানর পর তাকে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল ২০টি প্রশ্নের ১৬টির সঠিক উত্তর সে দিতে পারে। তারপর তাকে মিনিট পনেরো বিশ্রাম করতে দেওয়া হল। কতগুলি ছবি তাকে দিয়ে বলা হল, এগুলি বিশ্রাম করতে করতে সে দেখতে পারে। পনেরো মিনিট বাদে আবার তাকে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল ১২টি শব্দের সঠিক উত্তর সে দিতে পেরেছে। অর্থাৎ, প্রথম বারের শতকরা ৭৫ ভাগ উত্তর তার মনে আছে।

অনুসন্ধানটি আরেকভাবে করা যেতে পারে। প্রথম পরীক্ষার পর পনেরো মিনিটকাল তাকে বিশ্রাম না দিয়ে যুগ্ম শব্দের একটি নূতন তালিকা পরীক্ষার্থীকে দেখান হল। সে কয়েকবার তালিকাটি দেখল। শব্দের তালিকাটি অনেকটা নীচের ধরণের ঃ

আকাশ	মাছ
বাঘ	সাধু
দূর	পাতা
পাহাড়	সবুজ ইত্যাদি।

দেখান হলে খানিকটা বিশ্রামের পর (নূতন তালিকা শেখা ও বিশ্রাম মিলিয়ে মোট পনেরো মিনিট পর) পরীক্ষার্থীকে প্রথম তালিকা সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল ৮টির সঠিক উত্তর সে দিতে পেরেছে। অর্থাৎ, প্রথম বারের শতকরা ৫০ ভাগ। দ্বিতীয় তালিকাটি প্রথম তালিকাটির অনুরূপ হওয়াতে বিশেষ বাধা সৃষ্টি হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে পরীক্ষার্থী গোলমাল করে ফেলে। প্রথম তালিকায় আকাশের উত্তরে বলতে হবে গাছ, দ্বিতীয়টিতে আকাশের যুগল শব্দ হচ্ছে মাটি। গাছ না বলে সে বলছে মাটি। তালিকা দুটি খুব ভালো করে শেখা থাকলে অবশ্য একটি অপরটির স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে না। ভালো করে না শেখা থাকলেই বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। একটি ভাষা মোটামুটি আয়ত্ত করার আগে অপর একটি ভাষা শিখতে চেষ্টা করলে অনুরূপ বাধা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ভাষা দুটি অনুরূপ হলে বাধা অধিক হয়। যে কোন অভিজ্ঞতাই অন্য অভিজ্ঞতাকে মনে রাখার ব্যাপারে কিছু বাধা সৃষ্টি করে এমন দেখা গেছে।

বিশ্রামে, বিশেষতঃ ঘুমের দ্বারা বিস্মৃতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়। রাত্রিতে

ঘুমোবার আগে পড়লে সকাল বেলায় পড়ার অনেকটাই মনে থাকে। কিন্তু কেউ কেউ সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত বোধ করে। সক্রিয় মানসিক কাজ তারা সকালে করতে চায়। তাদের পক্ষে 'মনে রাখার' সুবিধার চেয়ে 'মনোযোগ দেবার সুবিধাই' স্বভাবতঃ বড় বলে মনে হয়। আসল কথা এ সব বিষয়ে কার পক্ষে কোনটা ভালো—সেটা তাকে নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে। কেবল একটি কথা সকলের বেলাতেই সত্য। মনে রাখতে হলে বিষয়টি মোটামুটি মুখস্থ হবার পরও আরও বহুবার পড়া দরকার।

ফ্রয়েডের সক্রিয় বিস্মৃতি

জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমাদের কাছে মনোরম নয়, যা স্মরণ করলে নিজেদের আমাদের হীন ও অপরাধী বলে মনে হয়। এইসব ঘটনা আমরা ভুলতে চাই এবং ভুলি! এই ভোলার আরেকটি নাম—'অবদমন'। সচেতন মনে সে সব স্মৃতির স্থান হয় না—নির্জ্ঞানে গিয়ে (অবচেতনে নয়) তারা আশ্রয় নেয়। একমাত্র মনঃসমীক্ষার সাহায্যে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব। এই ধরণের বিস্মৃতিকে ফ্রয়েড 'সক্রিয় বিস্মৃতি' বলেছেন।

শৈশবের স্মৃতি

জীবনের প্রথম তিন চার বছরের স্মৃতি বিস্মৃতির আড়ালে থাকে কেন—এটা একটা প্রশ্ন। আমরা যাকে স্মরণ বলি—তার সঙ্গে ভাষা অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। হয়ত কিছু দৃশ্যমান, শ্রুতিমান কল্পনাও তার সঙ্গে থাকে। কিন্তু ভাষা ঐ কল্পনাকে একটি ঘটনার স্মৃতি বলে বুঝতে সাহায্য করে। অতি শৈশবে শিশুর ভাষার উপর দখল থাকে না। যে ঘটনা ঘটে, তাকে ভাষা দিয়ে ধরে রাখবার শক্তি তার থাকে না। ফলে শৈশবের অভিজ্ঞতাকে 'স্মৃতিরূপে' আমরা ঠিক ধরতে পারি না। কল্পনারূপে কিছু হয়ত মাঝে মাঝে মনে আসে—কিন্তু সে কল্পনা যে কোন ঘটনার অস্পষ্ট স্মৃতি তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না।

অধ্যায় ১৫

সৌন্দর্যবোধ ও শিক্ষা

সৌন্দর্য কি—এ কথা বলা সহজ নয়। সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আজও স্পষ্ট নয়। তবু আকাশের রামধনুকে আমরা সুন্দর বলি। প্রতিভাবান শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র, সুকণ্ঠে গীত মধুর সঙ্গীতের মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য-পিপাসু মনের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবেদন অনেকখানি। সৌন্দর্য কি তা বুঝি আর নাই বুঝি, সৌন্দর্য উপলব্ধি আমাদের জীবনে বারংবার ঘটে।

সৌন্দর্য কি একথা বোঝবার চেষ্টা না করে সৌন্দর্য উপলব্ধিকে বরং বোঝবার চেষ্টা করা যাক। ভ্যালেন্টিনের (১) মতে—সৌন্দর্য উপলব্ধিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ঃ (ক) ঐ উপলব্ধিতে কোন আবেগ বা অন্তত কোন অনুভূতি জাগ্রত হয়। (খ) অনুভূতিটি ভালো লাগে। যা ভালো লাগে তাকেই অবশ্য সুন্দর বলা চলে না। বেদনা ও দুঃখও সময় সময় অমন অনুভূতির অংশরূপে দেখা যায়। তবে সে বেদনা ও দুঃখের মধ্যে একপ্রকার পরিতৃপ্তি আছে। তাদের আমরা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত বলতে পারি না। (গ) সৌন্দর্য উপলব্ধির আবেগ বলে কোন একটি পৃথক আবেগ নেই। বিভিন্ন আবেগের সুসঙ্গত সমাবেশ ও একটি বিশেষ মনোভাব সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য আবশ্যক হয়।

সৌন্দর্য উপলব্ধির উপাদান

সুসঙ্গতি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা যেতে পারে। কয়েকটি বিভিন্ন সুর মিলে-মিশে একটি সুসঙ্গতি রচনা করে। আমরা অনুভব করি সুরগুলি পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। বিভিন্নতার মধ্যে একটি মনোরম ঐক্য প্রতিষ্ঠা সুসঙ্গতির মূল কথা। সুরের কথাই হোক, রেখার কথাই হোক—সুসঙ্গতির স্থান শেষ পর্যন্ত মানুষের মনে। মনের উপর সুর বা রেখা কি প্রভাব বিস্তার করে তা দ্বারাই সুর বা রেখার সঙ্গতি আমরা বিচার করি। অতএব বলা যেতে পারে সুসঙ্গতির মধ্যে একাধিক

আবেগ থাকে। (ঘ) সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সুন্দরের প্রতি আমাদের মনোভাবে কামনাবাসনা, হিসাবনিকাশের স্থান নেই। কিছু পরিমাণে এ মনোভাব নিস্পৃহ। রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী কবিতায় এ সত্যটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। স্নানরতা সুন্দরী রমণীকে মদন কামনার শরে বিদ্ধ করবে বলে অলক্ষ্যে অপেক্ষা করছিল। সে নারী যখন মদনের সামনে এসে দাঁড়াল, রমণীর অসামান্য রূপে মদন বিস্মিত ও মুগ্ধ হল। তার আর শর নিক্ষেপ করা হল না।

"জানুপাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি।"

জীব জগতের দিকে তাকালে যৌন জীবনের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যৌন আকর্ষণের জন্যই যেন সুন্দরের সৃষ্টি। কিন্তু সৌন্দর্য অনুভূতির পরম মুহূর্তে বাসনা কামনার উর্দ্ধে মন ওঠে এও আমরা দেখি। সৌন্দর্য উপলব্ধিতে মন কিছুটা নিরাসক্ত। শিক্ষা সংস্কৃতি কতটা এর জন্য দায়ী, অবদমন ও ঊর্ধ্বায়ন কতটা এর কারণ—সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না।

আমরা তিন প্রকার সুন্দরের সম্বন্ধে আলোচনা করব। এক, দৃশ্যমান সৌন্দর্য। প্রকৃতি, চিত্র, ভাস্কর্য প্রধানতঃ দৃশ্যমান সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। দুই, সঙ্গীত—যা আমরা শুনি। তিন, কবিতার সৌন্দর্য। কবিতা পাঠ করে, কল্পনা করে তার সৌন্দর্য আমরা অনুভব করি। সৌন্দর্য উপলব্ধির একটি সাধারণ ফ্যাক্টর বা ক্ষমতা আছে যা বার্ট, আইসেন্‌ক (২) প্রভৃতি মনোবিদ্‌দের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে। এই সাধারণ ফ্যাক্টরের স্বরূপটি কি? সুসঙ্গতি যদি সৌন্দর্যের মূল কথা হয়, তবে সুসঙ্গতিকে অনুভব করবার ক্ষমতাই বোধহয় ওই ফ্যাক্টর। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে সুসঙ্গতি আছে, অসঙ্গতিও আছে। এরই মধ্যে সুসঙ্গতি কারো কারো চোখে বেশী পড়ে, সুসঙ্গতি তাদের মনকে বেশী আকর্ষণ করে। এদের মুখেই কীট্‌সের বাণী ধ্বনিত হয়, "The poetry of Earth is never dead"। প্রকৃতি, সঙ্গীত কিম্বা কবিতা প্রভৃতি সব কিছু উপভোগ করবার জন্য ঐ ক্ষমতার সহায়তা দরকার। বিভিন্ন বিষয়ের সৌন্দর্য উপলব্ধির মধ্যে পজিটিভ পারস্পর্য

সৌন্দর্যবোধের সাধারণ ফ্যাক্টর

রয়েছে। সৌন্দর্য উপভোগের সাধারণ ক্ষমতা ছাড়া সৌন্দর্য উপলব্ধিতে জ্ঞান ও বুদ্ধি কম বেশি আবশ্যক হয়।

উইলিয়ামস্, উইণ্টার, ও উড (৩) প্রভৃতির একটি অনুসন্ধান থেকে জানা যায় কবিতা উপভোগ ও বুদ্ধির পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ ·৬৩, চিত্র উপভোগ ও বুদ্ধির পারম্পর্য ·৩১ এবং সঙ্গীত ও বুদ্ধির পারম্পর্য ·২২। কবিতা উপভোগের জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকা দরকার, সঙ্গীত ও চিত্র উপভোগের জন্য সে পরিমাণ বুদ্ধি না থাকলেও চলে। কিন্তু সৌন্দর্য উপলব্ধি কেবল মাত্র বুদ্ধি থাকলেই হয় না। কোন কোন উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরও সৌন্দর্য অনুভূতির ক্ষমতা কম হতে পারে, ঐ অনুসন্ধান থেকে তা দেখা গেছে।

সৌন্দর্যবোধের বিকাশে শিক্ষা ও পরিবেশের স্থান আছে কিনা এটি একটি প্রশ্ন। মার্গ সঙ্গীত, ভালো ছবি ও কবিতা প্রথম পরিচয়েই সব মানুষ সমান ভাবে বুঝতে পারে না, উপভোগ করতে পারে না। পরিচয়ের দ্বারা, সময় সময় ব্যাখ্যার ফলে উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়, অধিকারী ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। পূর্ণ উপলব্ধির জন্য সুন্দরকে অনেক সময় বুঝতে হয়। এই বোঝাটা অবশ্য সৌন্দর্য উপলব্ধি নয়। সেটা জ্ঞানেরই ব্যাপার। কিন্তু সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য এ জ্ঞান দরকার।

সৌন্দর্যবোধে পরিবেশের প্রভাব

পরিচয়ের দ্বারা সৌন্দর্যবোধ উন্নীত হয় তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাঁচজন লোককে ভালোমন্দ ৫০ খানা চিত্র পর পর ছয়দিন দেখান হল। আবার একমাস ও তিনমাস পরে ছবিগুলি দেখবার সুযোগ তাদের দেওয়া হল। বার বার পরিচয়ের ফলে উৎকৃষ্ট চিত্রগুলিকে তারা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট বলে বুঝতে ও অনুভব করতে শিখল (৪)। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও কবিতা উপভোগের বেলাতেও ঐ কথা সত্য। মার্গ সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সিমফোনির মাধুর্য ও মহত্ত্ব অনুভব করতে হলে সে সঙ্গীত বার বার শুনতে হয়। শোনার দ্বারা আমরা সঙ্গীতের মর্মোদ্ধার করি, আবার আমাদের উপলব্ধির ক্ষমতারও বিকাশ হয়।

সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সহজাত উপাদান আছে কিনা এটি আরেকটি প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে দুটি তথ্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা কোন কোন লোকের মধ্যে খুব ছোট বেলাতেই দেখা যায়। ৪ বছর ১ মাসের

একটি ছেলে পাহাড়ের চূড়ায় আকাশে চাঁদ দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"কী সুন্দর, কী সুন্দর"! সোনালি রোদ এসে গাছের উপর পড়েছে। তাই দেখে সে বল্লে—"মা

সৌন্দর্যবোধে সহজাত উপাদান

ছ্যাখো, বাগানের গাছের উপর রোদ এসে পড়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে।" ৪ বছর ৯ মাসের একটি মেয়ের মুখে শোনা গেল "নীল আকাশে সাদা আর লাল মেঘ, কী সুন্দর লাগছে।" (৫)

দ্বিতীয়তঃ, সৌন্দর্য উপলব্ধির ব্যাপারে গুরুতর ব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে। সৌন্দর্য বোধ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে কিছুটা অন্তরঙ্গতা আছে। এ দুটি ক্ষমতাই মানুষের আবেগ জীবনের সংহতির স্বরূপের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যৌন প্রবৃত্তির সঙ্গে সৌন্দর্য-

ব্যক্তিগত পার্থক্য

বোধের ক্ষমতার সম্বন্ধের কথা পূর্বে বলেছি। এখানে একথা যোগ করা যেতে পারে যৌন ইচ্ছা কিছু পরিমাণ অপরিতৃপ্ত থাকলে এবং কিছুটা রূপান্তরিত হলেই সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য অনুভূতি সম্ভব হয়।* এই উর্ধ্বায়নের ক্ষমতা সকলের সমান নয়।

সৌন্দর্য উপলব্ধিকে এডওয়ার্ড বুলো (৬) চারটি শ্রেণীভুক্ত করেছেন। রঙের বেলাতেই—ঐ শ্রেণীবিভাগ প্রধানতঃ সত্য। রঙের কথা নিয়েই আলোচনা করা যাক।

বিষয়মুখী দিক ঃ উপভোগে কোন কোন লোকের মনোযোগ রঙের প্রকৃতির দিকে নিবদ্ধ হয়। 'ভাল লাগে, কেননা রঙটি উজ্জ্বল', 'রঙটি বিশুদ্ধ' ইত্যাদি কথা এঁদের মুখ থেকে শোনা যায়।

দৈহিক দিক ঃ "এ রঙটি মনকে প্রফুল্ল করে,' 'এ রঙটি দেখলে মনে শান্তি পাওয়া যায়', 'ঐ রঙটি ক্লান্ত ও বিষণ্ণ লাগে'—রঙ ভালো লাগা না লাগা সম্বন্ধে এমন কথা কেউ কেউ বলেন। দেহ-মনের উপর রঙের প্রভাব দিয়েই রঙকে তাঁরা বিচার করেন।

অনুষঙ্গের দিক ঃ রঙ এঁদের পূর্বস্মৃতিকে ডেকে আনে। 'মা লাল রঙের শাড়ি পরতেন', 'কাকা বাবুকে দেখতাম নীল টাই বাঁধতে', 'যাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারতাম না এমন একটি লোক ঘি রঙের পাঞ্জাবী পরত'। কোন্ স্মৃতির সঙ্গে কোন্ রঙ জড়িত—রঙের প্রতি এঁদের মনোভাব তার উপরই নির্ভর করে।

* ওয়াগনার লিখেছিলেন, "জীবন থাকলে আমাদের আর আর্টের দরকার হত না।"

চারিত্রিক দিক: রঙ এঁদের চক্ষে প্রায় সজীব, প্রায় প্রত্যেকটি রঙেরই একটি চরিত্র আছে। প্রফুল্ল, নির্ভীক, প্রাণবন্ত, সত্যভাষী, সমবেদনশীল প্রভৃতি বিশেষণের সাহায্যে এঁরা বিভিন্ন রঙকে বোঝেন। রঙগুলি যেন এককেটি জীবন্ত অভিব্যক্তি।

সঙ্গীতের বেলাতেও দেখা গেছে ঐ চারিটি শ্রেণী বিভাগ সম্ভব।

কোন কোন পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরে কোন একটি ধরণ বেশি দেখা যায়। বিষয়মুখী দিকটা যাঁদের উত্তরে বেশী, জ্ঞান ও সমালোচনার দৃষ্টিতে সাধারণতঃ তাঁরা জীবনকে দেখেন। রঙে যাঁরা চরিত্র আরোপ করেন, তাঁদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু এঁদের সৌন্দর্যানুভূতি সর্বাধিক বিকাশপ্রাপ্ত। বুলো'র মতে সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা এঁদের পরেই হল বিষয়মুখী দলের।

সৌন্দর্যের ধারণার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত পার্থক্যটি প্রথমেই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। এক জাতির লোকদের চোখে যা সুন্দর, আরেক জাতির লোকেরা তাকে সুন্দর বিবেচনা করে না। একটি দেশের মধ্যেও সুন্দর সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা রয়েছে। তবে পার্থক্য থাকলেও সৌন্দর্যের ধারণায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মিল অনেকখানি এ কথাও সত্য। সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য অনেক সময় সুন্দরকে বুঝতে হয়, জানতে হয় একথা আমরা উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্য সঙ্গীত আমাদের অনেকের ভালো লাগে না। কারণ তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, ঐ সঙ্গীতের পটভূমিও আমাদের জানা নেই। এ কারণে সঙ্গীতের অর্থও আমরা ভালো বুঝতে পারি না। কোন কোন জিনিস নিজে ঠিক সুন্দর নয়, তার সৌন্দর্যটা আরোপিত। সুন্দরের অনুষঙ্গের ফলে বস্তুটি কারো চোখে সুন্দর বলে বোধ হয়। অমন ক্ষেত্রে একজন যা সুন্দর দেখবে, আরেকজন তা সুন্দর দেখবে না—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সৌন্দর্যোপলব্ধিতে উন্নত এমন কয়েকজনকে নিয়ে বার্ট (৭) একটি অনুসন্ধান করেন। পঞ্চাশটি ভালো মন্দ ছবি তাদের দেখান হয়। সৌন্দর্য অনুযায়ী ছবিগুলিকে পর পর সাজাতে তাদের বলা হয়। ঐ ক্রমের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ ·৯ দেখা যায়। সুন্দর তাদের প্রায় সবার চোখেই সুন্দর।

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগই সম্ভবতঃ সবচেয়ে আদিম। কিছু কিছু শিশুর মধ্যে এই ক্ষমতাটি দেখা যায়। বয়ঃসন্ধিকালে ক্ষমতাটি অনেকের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ে। প্রকৃতি এ বয়সে কিছু ছেলেমেয়েদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠে। মানবীয় মনোভাব প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করা হয়।* গাছপালা, পাহাড় পর্বত, নদী সমুদ্রের সঙ্গে সৌন্দর্য উপলব্ধির চরম মুহূর্তে সৌন্দর্য্যপিপাসু মন একাত্মবোধ করে। বায়রণের ভাষায়—'আমি যখন পর্বত দেখি, তখন আমি পর্বত হয়ে যাই।' সমুদ্রের ঢেউ বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে। দেখে মনে হয় কী জানি তার বেদনা, কত না তার বিক্ষোভ!

দৃশ্যমান বস্তু উপভোগ

মিষ্টিক অনুভূতিকে সৌন্দর্য অনুভূতির এক চরম ও পরম অনুভূতি বলা যেতে পারে। এ অনুভূতি দুর্লভ হলেও কোন কোন মুহূর্তে, কারো কারো জীবনে ঘটে। সহজ, নিরুদ্বিগ্ন মন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর। চারিদিকে সবুজ গাছপালা। কয়েকটি গরু ঘাস খাচ্ছে। একটি রাখাল গাছের তলায় বসে আছে। অকস্মাৎ মনে হল—গাছপালা, আকাশমাটি, গরু, রাখাল ও আমি—এ সবার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সত্তা মিলেমিশে একটি সত্তায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটি চেতনা অন্তরঙ্গ হয়ে একটি চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই মুহূর্তটি আমার কাছে পরম ও পরিপূর্ণ। ঐ একাত্মতা প্রসন্ন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত।

মিষ্টিক অনুভূতি

প্রকৃতির সৌন্দর্য হয়ত অনেকে উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু চিত্র ভাস্কর্য উপভোগের ক্ষমতা মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা যাদের বেশী, মানুষের সৃষ্টির সৌন্দর্য তাদের পক্ষেই উপভোগ করা সম্ভব এমন অনেকে মনে করেন।

চিত্র ভাস্কর্য উপভোগ

চিত্র ও ভাস্কর্য উপভোগে মনের কাছে রঙ ও ফর্মের আবেদন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রঙ সম্বন্ধে দুচার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। ফর্মের সৌন্দর্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

রঙে আমরা সৌন্দর্য দেখি, তেমনি দেখি ফর্মে। ভাস্কর্যের সৌন্দর্য মূখ্যতঃ ফর্মের, চিত্রে ফর্ম ও রং দুইই আছে। মানুষের সৌন্দর্যেও রঙ ও গড়ন দুইই আমরা দেখি। বেশির ভাগ লোকের চোখে রঙের চেয়ে বোধহয় গড়ন বড়। মোট কথা রঙের প্রতি

ফর্মের সৌন্দর্য

---

* এঁরা বলবেন মনোভাব আরোপ করা নয়, আবিষ্কার করা হয়। প্রকৃতি অনুভব করে উপলব্ধি করার ক্ষমতা যার আছে—সে ঐ সত্যউপলব্ধি করে।

কারো আকর্ষণ বেশী, কারো আকর্ষণ ফর্মের প্রতি। একটি অনুসন্ধানে (৮) দেখা গেছে রঙ মেয়েদের বেশী মনে থাকে, ফর্ম পুরুষদের। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য বহু আছে।

একটি রেখা ভাল লাগা না লাগা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। একটি তির্যক রেখার তুলনায় সাধারণতঃ একটি লম্বকে আমরা বেশী পছন্দ করি। রেখাটি সূক্ষ্ম হলে ভালো লাগে, খুব চওড়া রেখাও ভালো লাগে, মাঝামাঝি হলে তত ভালো লাগে না। একটি রেখাকে আমরা কিভাবে দেখি—সেটাও আমাদের ভালো লাগা না লাগাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। একটি তির্যক রেখার কথা ধরা যাক। যদি ভাবি তির্যক রেখাটি ক্রমশঃ লম্ব হচ্ছে, তবে ভালো লাগে। যদি ভাবি, যে রেখাটি লম্ব ছিল সেটি তির্যক হয়েছে, তবে খারাপ লাগে।

কতগুলি রেখার সমাবেশে একটি সমগ্রতা রচিত হয়। রেখাগুলির অর্থ ও আকর্ষণের কারণ খুঁজতে হলে তাকাতে হয় সমগ্র ফর্মটির দিকে। রেখাগুলির সুসঙ্গতি ও ভারসাম্য আমাদের মনকে খুশী করে, দেখে আমরা একপ্রকার তৃপ্তি বোধ করি। সঙ্গতি বা ভারসাম্যের অভাব ঘটলে মন পীড়িত বোধ করে। সরু, দুর্বল স্তম্ভের উপর একটি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে দেখলে আমাদের অস্বস্তি বোধ হয়। সবল, সুঠাম স্তম্ভের উপর অট্টালিকা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে ভালো লাগে। সহজেই তেমন একটি অট্টালিকার সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটে। এই একাত্মতা অট্টালিকার সৌন্দর্য অনুভব করতে আমাদের সাহায্য করে। দেহের সুঠাম গড়ন, একটি সমগ্রতার অংশসমূহের সুসঙ্গতি ও প্রতিসাম্য দেখে আমরা খুশী হই। প্রতিসাম্য ও সুসঙ্গতিতে একটি অংশ অপর একটি অংশকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে, একটি অংশ যেন অপরটির উপর নির্ভরশীল। তারা সবাই মিলেমিশে একটি শোভন ঐক্য রচনা করে। ঐ ঐক্য আমাদের চোখে সুন্দর।

ছোটরা ছবি কি ভাবে দেখে ?

মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ছবিকে বোঝা ও উপভোগ করবার ধরণটি বিভিন্ন। বিনে'র অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে তিন চার বছর বয়সে একটি ছবির বিভিন্ন অংশকে শিশু আলাদা আলাদা করে দেখে। একটি ছবির মধ্যে ক'টি মানুষ আছে, ক'টি জিনিস আছে ছবিটি দেখতে বললে তাই সে গণনা করে।

ছয় বছর বয়সে ছবির সমগ্ররূপটি তার চোখে ধরা পড়ে। ছবিটিকে সে

যথাযথ বর্ণনা করে। বারো বছর বয়সে ছবিটিতে যা আঁকা আছে তার চেয়েও বেশী কিছু সে দেখে। ঐটুকু দেখবার জন্য কিম্বা কিছু আরোপ করবার জন্য, তার অভিজ্ঞতা, তার কল্পনা তাকে সাহায্য করে।

ছোটদের ছবি ভালো লাগা ব্যাপারে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করা গেছে: (ক) বস্তুবাদ ঃ ছবিটি বাস্তব জিনিসের মত হলে সেটি তারা পছন্দ করে ; না হ'লে সেটা তাদের মতে ভুল। 'এ ছবিটা ঠিক বিড়ালের মত হয়েছে।' 'ওটা ঠিক মানুষের মত হয়নি'। বাস্তব সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভ করেছে—এমন শিশুদের মধ্যেই বস্তুবাদ দেখা যায়। সেটা সম্ভবতঃ পাঁচ ছয় বছরের আগে নয়।

ছবি আঁকার ব্যাপারে ছোটরা বস্তুটি যেমন তেমন আঁকে। প্রোফাইল একটু বড় বয়স না হলে ছেলেমেয়েরা আঁকে না। মানুষের যদি দু হাত, দু পা থাকে তবে তার ছবিতেও সেটা আঁকা দরকার। এক পাশ থেকে দেখলে মানুষের দু হাত দেখা যায় না—একথা ছোটরা ঠিক ধরতে পারে না।

(খ) স্পষ্টতা ঃ কি আঁকা হয়েছে স্পষ্ট না বোঝা গেলে ছবিটি ছোটদের মনঃপূত হয় না। তাদের মতে ছবি স্পষ্ট হওয়া দরকার। উজ্জল রঙের প্রতিও ছোটদের আকর্ষণ রয়েছে।

(গ) বাস্তবে যা তাদের ভালো লাগে, বাস্তবে যা তাদের চোখে সুন্দর—ছবিতে সে জিনিসই তাদের ভালো লাগে, সুন্দর মনে হয়। কুশ্রী মানুষের সুন্দর ছবি হওয়া সম্ভব—এটা তারা বিশ্বাস করে না।

বড়দের মধ্যেও কিছু কিছু অমন মনোভাব দেখা যায়। গ্রীকভাস্কর্যও ঐ ধারণা দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। গ্রীক ভাস্কর্যে সুন্দরকে নিপুনভাবে রূপায়িত করা হত।

আর্ট উপভোগের দুটি দিক আছে। এক, আর্টের বিষয়বস্তু। দুই, আর্টিষ্টের শিল্পনৈপুণ্য। একখানা ছবি যখন আমরা ভালো করে দেখি, তখন ঐ দুটি দিকের কথাই স্মরণ করি। ভালো ছবি হলে ছবিটি দেখে আনন্দ পাই, আর্টিষ্টের শিল্পনৈপুণ্য কতখানি তা অনুভব করে আমরা বিস্ময় ও আনন্দ বোধ করি। তবে এ কথা ঠিক যে আর্টিষ্টের শিল্পনৈপুণ্য অনুভবে সৌন্দর্যবোধের চেয়ে জ্ঞানের আনন্দ, বোঝবার আনন্দই বেশি। কুশ্রী কিছুর চিত্রাঙ্কন উপভোগে দর্শকদের ভাগ্যে ঐ জ্ঞানের অংশটুকুই জোটে—এমন অনেকে মনে করেন। এ কথা সবটা সত্য নয়। বাস্তবের কুশ্রীতা আমাদের পীড়িত করে। তাকে কিছুটা আমরা ভয় পাই, ঘৃণা করি। তাই তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই। রূপায়িত কুশ্রীতাকে যদি আমরা ভয় না পাই (যে

ভয়টা শিশুরা সাধারণতঃ পায়), তাকে যদি আমরা বুঝতে পারি তবে সৌন্দর্যোপলব্ধির পরম মুহূর্তে তার সঙ্গে হয়ত আমরা এক হতে পারি। কুশ্রীতার মধ্যেও যে সৌন্দর্য আছে সেটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

কুশ্রীতাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে শিল্পী রেখাগুলির শোভন ও সুসঙ্গত সমাবেশ করেন। ঐ শোভন ও সুসঙ্গতি বাস্তবিকই সুন্দর। বাস্তবের কুশ্রীতা আর চিত্রাঙ্কিত কুশ্রীতা এক নয়।

সঙ্গীত

সঙ্গীতের আবেদন অপেক্ষাকৃত সার্বজনীন। চিত্র ও কবিতা উপভোগে আমাদের কিছুটা মনোযোগ দিতে হয়। সঙ্গীত অনেকটা আপনা থেকেই আমাদের মনকে টেনে নেয়।

সঙ্গীতের প্রধানতঃ তিনটি অংশ রয়েছে। সুর, তাল ও সঙ্গতি। তাল বা ছন্দের বোধ শিশুদের মধ্যে খুব ছোটবেলা থেকেই দেখা যায়। ছড়া শুনতে তারা ভালোবাসে। কারণ ছড়ার মধ্যে প্রীতিকর ছন্দ আছে। "৭ থেকে ৯ বছরের ছেলেমেয়েদের কাছে সুরের চেয়ে ছন্দের আবেদন বেশি, আবার সুসঙ্গতির চেয়ে সুরকে তারা বেশি পছন্দ করে। (৯)"

সঙ্গীত উপভোগে ব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে। এমন লোকও আছেন – যারা সঙ্গীত একেবারেই উপভোগ করতে পারেন না। যারা করেন তাদের কারো কাছে তালের আবেদন বড়, কারো কাছে সুরই প্রায় সবখানি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে, বিশেষতঃ ওসব দেশের যন্ত্রসঙ্গীতে সুসঙ্গতির একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সুর আমাদের সঙ্গীতে বড়।

কবিতা

কবিতা অপেক্ষাকৃত কম লোক উপভোগ করে। ছোটবেলাতে ছেলেমেয়েরা যদি বা কবিতা পড়ে (কিম্বা তাদের পড়তে হয়), বড়দের মধ্যে কবিতা পড়ে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। বয়ঃসন্ধিকালে কিছু ছেলেমেয়েদের মধ্যে কবিতা লেখা ও কবিতা পড়ার ইচ্ছা বাড়লেও, বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে তার তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ওয়ালের (১০) একটি অনুসন্ধান থেকে জানা যায় চোদ্দ থেকে সতেরো বছরের মোট ১৯৬ ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৯% ছেলে ও ২৩% মেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে কবিতার প্রতি তাদের অনুরাগবৃদ্ধির কথা বলেছিল।

বড়দের জীবনে বলা যায়—"the world is too much with us." কবিতার সুন্দর রহস্যময় জগৎ থেকে তাই আমাদের নির্বাসন ঘটে। ঐ রহস্য-ঘেরা জগতের সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলি। সংখ্যা

অল্প হলেও কিছু লোক আছেন কবিতার সৌন্দর্য যাদের মনকে চিরদিন মুগ্ধ করে। ঐ ক্ষমতার দ্বারা জীবনকে তারা বেশি ভাল করে উপভোগ করেন এ কথা সত্য।

ছোটদের কবিতা উপভোগে ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কবিতা না বুঝলেও ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারের জন্য তারা কবিতা শুনতে ভালোবাসে, পড়তে ভালোবাসে। কবিতার মধ্যে কাহিনী থাকলে অমন কবিতা সহজেই শিশুদের মনোরঞ্জন করে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি সুন্দরের সঙ্গে বারম্বার পরিচয়ের দ্বারা সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। ভালো ছবি দেখবার, ভালো কবিতা পড়বার সুযোগ ছেলেমেয়েদের পাওয়া দরকার। ভালো জিনিসকে বুঝতে, উপলব্ধি করতে কিছুটা সময়ের দরকার হয়।

সৌন্দর্যবোধে শিক্ষার স্থান

একটি শিল্পসৃষ্টির মূল কাহিনী বা কল্পনার প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকা ছেলে-মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। ঐ কাহিনী বা কল্পনাই শিল্প নয়। কিন্তু কাহিনী বা কল্পনাটি বুঝলে দর্শকের পক্ষে সৌন্দর্য উপলব্ধি অনেক সময় সহজ হয়। বীটোফেনের পঞ্চম সিমফনির 'Fate knocks at the door' শোনবার পূর্বে একটি বন্ধু সিমফনিটির পটভূমিটি আমাকে বলে দিলেন। বিটোফেন জীবনের মধ্যাহ্নে বধির হয়ে গিয়েছিলেন। তার পূর্বরাগ অনিশ্চয়তার ঝড়ের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। সেই অভিশাপ ও অনিশ্চয়তা রূপায়িত হয়েছে—'দুর্ভাগ্য জীবনের দ্বারে এসে করাঘাত করছে' এই সিমফনিতে। সিমফনিটি নিশ্চয় সামান্যই আমি বুঝতে পেরেছি। তবু যা শুনেছি তাই আমার মনে হয়েছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সিমফনিটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। এ ভালো লাগার মধ্যে অনেকখানি আরোপ, অনেকখানি কল্পনার স্থান রয়েছে—এ কথা সত্য। কিন্তু সব মিলিয়ে ভালো যে লেগেছে সেত মিথ্যা নয়। শিল্প ও শিল্পীজীবনের পটভূমি আর্টকে বুঝতে অনেক সময় সাহায্য করে।

একটু বড় বয়সে কবিতার অর্থ বুঝতে না পারলে ছেলেমেয়েদের কবিতা উপভোগে বাধা জন্মায়। কিন্তু কবিতা পড়তে গিয়ে আমরা যদি একটি একটি করে দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ করতে আরম্ভ করি তবে কবিতার অর্থ হয়ত ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে, কিন্তু কবিতাটি তারা উপভোগ করতে পারবেনা। কবিতার সৌন্দর্য-উপলব্ধি যদি কবিতা পড়বার ও পড়াবার

প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে দুর্বোধ্য কবিতা ছেলেমেয়েদের না পড়ানোই উচিত। বলা বাহুল্য, একটি বয়সে যে কবিতা দুর্বোধ্য, আরেকটি বয়সে সে কবিতা বুঝতে ছেলেমেয়েদের কঠিন বোধ হয় না। দুর্বোধ্য শব্দ ছেলেমেয়েদের অন্য সময়ে, অন্য প্রসঙ্গে পড়ানো যেতে পারে। কিন্তু কবিতা পাঠের সময় কবিতার অর্থ ও সৌন্দর্য যেন ছেলেমেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে। এ সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষিকা কর্তৃক কবিতাপাঠের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা দরকার। পাঠে তাদের উচ্চারণ সুস্পষ্ট হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা আবেগ ও অনুভূতি সহকারে কবিতাটি পড়বেন। কবিতাটি তাদের নিজেদের ভালো লাগা চাই। তাদের ভালো লাগলে তাদের আবেগ ও অনুভূতি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। কবিতাটি ছেলেমেয়েরা উপভোগ করতে পারবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি শিল্পকে সত্যি ভালোবাসেন, উপভোগ করেন, তবে তাদের কিছু অনুভূতি ছেলেমেয়েদের মধ্যে বরাবর সঞ্চারিত হয়। অরসিকের পক্ষে রসসৃষ্টি সম্ভব নয়।

সৌন্দর্য উপলব্ধিতে অভিভাবনের কিছু স্থান আছে। জিনিসটি সুন্দর, উপভোগ্য এ বিশ্বাস শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে নিয়ে তারা অগ্রসর হলে সৌন্দর্যের মন্দির তাদের অনেকের কাছে উন্মুক্ত হবে।

অধ্যায় ১৬

শেখা*

শিক্ষা শব্দটি আমরা দুই অর্থে ব্যবহার করি—শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ। শিক্ষালাভ কথাটির অর্থ শেখা বলা চলতে পারে। শেখা শব্দটি ক্রিয়াবাচক এবং এই শব্দটির মধ্যে সক্রিয় মনোভাবটি স্পষ্ট, শিক্ষালাভে যেটি নেই। শেখা (বা শিক্ষালাভ), বিশেষতঃ যে শেখা বিদ্যালয়ে ঘটে—বাস্তবিকই সেটি একটি সক্রিয় কর্ম। শিক্ষা কথাটিও সময় সময় ঐ একই অর্থে আমরা ব্যবহার করেছি।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে শেখা'র অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শেখার স্বরূপ কি, শেখা কেমন করে ঘটে, কি কি উপায়ে এবং কি কি অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজে শেখা যায়—এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিদ্‌রা তাদের অনুসন্ধানের দ্বারা কিছু জ্ঞানলাভ করেছেন। সে সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করব।

শিশু লেখাপড়া শেখে। একটি ছেলে সাইকেল চালাতে শিখল। একটি মেয়ে গান গাইতে শিখল। একটি শিশু প্রদীপের শিখায় হাত পুড়িয়ে আগুনকে ভয় করতে শিখল। এ সবই মানুষের শেখবার দৃষ্টান্ত।

শেখা কি?

তাহলে শেখা কি? উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শিক্ষার্থী কতগুলি অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং সেই অভিজ্ঞতার ফলে তার আচরণে কিছু পরিবর্তন ঘটে। এ কথা বলা চলতে পারে অভিজ্ঞতার ফল সে দেহ-মনে সঞ্চয় করে বলেই ভবিষ্যত আচরণে শিক্ষার্থী তার পরিচয় দেয়। অতএব অভিজ্ঞতার দ্বারা আচরণের পরিবর্তনকে শেখা বলা চলে।

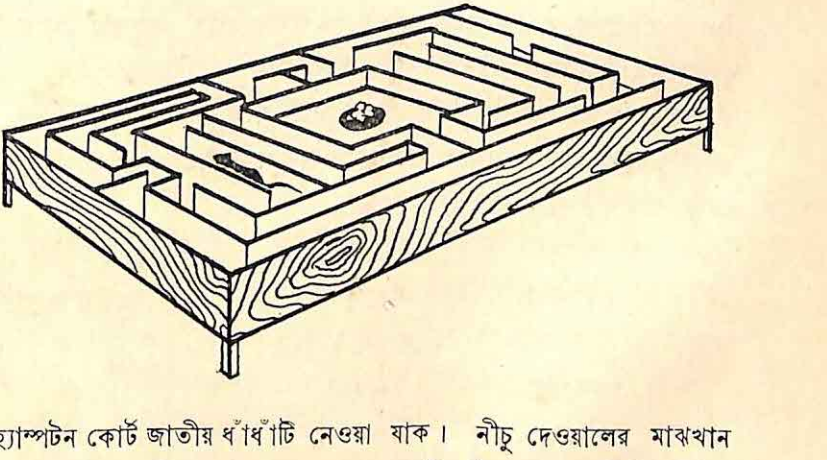
মনের তিনটি ভাগই শিক্ষালাভ করে। ভাগ তিনটি হল জ্ঞান, আবেগ, কর্ম ও ইচ্ছা। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা শেখাকে চার ভাগ

* 'শেখা'র ইংরেজী প্রতিশব্দ হবে **'to learn'** অথবা **learning.**

করতে পারি। (ক) জ্ঞান অর্জন (খ) কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন (গ) ইচ্ছা ও আবেগের শিক্ষা (ঘ) অভ্যাস (যেমন সকালে ওঠা, দাঁতমাজা ইত্যাদি)।

জীব কিভাবে শেখে এ বিষয় কিছু পরীক্ষা হয়েছে। মানুষেতর জীবকে নিয়ে যত সহজে পরীক্ষা চালান সম্ভব—মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা করা তত সহজ নয়। তাছাড়া মনের অধিক বিকাশের ফলে মানুষের আচরণে জটিলতা বেশী। শেখার সহজ ও সার্বজনীন নিয়মগুলি মানুষের আচরণ থেকে খুঁজে বার করা সময় সময় কঠিন হয়। এজন্য শেখার ব্যাপারে অধিকাংশ গবেষণাই নিম্নতর জীবদের নিয়ে হয়েছে। এ সম্পর্কে সাদা ইঁদুরের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং এদের ল্যাবরেটরিতে রাখা ও এদের নিয়ে কাজ করা সহজ। শেখায় এদের উৎসাহ আছে। মাছ, বিড়াল, কুকুর, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি নিয়েও কিছু কিছু পরীক্ষা হয়েছে। এধরণের পরীক্ষা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে থর্ণডাইকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাদা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা ব্যাপারে সাধারণতঃ যে ধরণের গোলক ধাঁধাঁ ব্যবহার করা হয়—তার ছবি নীচে দেওয়া হয়েছে।



হ্যাম্পটন কোর্ট জাতীয় ধাঁধাঁটি নেওয়া যাক। নীচু দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। কিছু দূর যাবার পর পথটি বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। তার কয়েকটি শাখা ধরে এগিয়ে গেলে দেখা যায়—অধিকাংশ

পথ দেয়াল দিয়ে বন্ধ। একটি মাত্র পথ ঘুরে ফিরে চলে গেছে ঠিক মাঝখানটিতে—যেখানে ইঁদুরের জন্য খাবার রয়েছে। যেখান থেকে ইঁদুরটিকে ছাড়া হচ্ছে সেখান থেকে ইঁদুর খাবার দেখতে পাচ্ছে না। ইঁদুরকে ছেড়ে দিলে প্রথমে হয়ত জড়সড় হয়ে আশঙ্কা ও ভয়ে চুপ করে বসে থাকে। কিছুটা সময় অমনভাবে থাকার পর ভয়টা কিছু কমলে—ইঁদুর ঘুরে ফিরে, শুঁকে শুঁকে জায়গাটি দেখে। এই ঘোরাঘুরিতে তার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। ঘুরতে ঘুরতে সে অকস্মাৎ হাজির হয় খাবারের জায়গায়। খাবারটি দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ খাবারটি সে খায়। এর পরে তাকে তুলে নিয়ে এসে তার পূর্বেকার যাত্রাস্থলে আবার ছেড়ে দিলে দেখা যায় প্রথম বারের মত গতিবেগ তার ঢিলে নয়। তার চলাতে একটি লক্ষ্য আছে, তার গতিবেগ দ্রুত, অন্ধ গলিগুলিকে সে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। বার কয়েক যদি সাদা ইঁদুরটিকে নিয়ে এসে তার যাত্রাস্থলে ছেড়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে—ক্রমশই তার ভুলের সংখ্যা কমে আসছে (অর্থাৎ অন্ধ গলিতে যাওয়া)। একটি সময় আসে যখন তাকে যাত্রাস্থলে ছাড়া মাত্র একবারও বিপথে না গিয়ে সোজা সে খাবারের জায়গায় হাজির হয়। ইঁদুরটি বার বার চেষ্টা দ্বারা, বহুবার ভুল করে ঠিক পথটিকে আয়ত্ত করেছে। একে বলা হয় 'বারংবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা শিক্ষা'। সময়ের দিক দিয়েও দেখা যায়—ইঁদুরটি ক্রমশই কম সময়ে তার যাত্রাস্থল থেকে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোচ্ছে। একটি পরীক্ষার ফলাফল স্যাণ্ডিফোর্ড (১) উল্লেখ করেছেন। পাঁচটি ইঁদুরের প্রতি বারের চেষ্টায় গড়ে কত সময় লেগেছিল, কি পরিমাণ ভুল হয়েছিল (ঠিক পথ ছেড়ে অন্ধ গলিতে ঢোকাকে একটি ভুল বলে গোনা হয়েছে) নীচে তা দেওয়া হল—

বারংবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা শিক্ষা

চেষ্টার ক্রম	সময় (সেকেণ্ড)	ভুলের সংখ্যা
প্রথম বার	১,৮০৪	১৪·৯
দ্বিতীয় বার	৯৬৬	১১·৯
তৃতীয় বার	৫৪২	১০·৪
চতুর্থ বার	৮৪৭	৭·৪

পঞ্চম বার	২৩৩	৪.১
ষষ্ঠ বার	১৯৩	৩.৫
সপ্তম বার	৬৩	১.৬
অষ্টম বার	৪৯	১.৬
নবম বার	৩৭	১.৫
দশম বার	৩৩	১.১

প্রশ্ন এই যে, কেমন করে ইঁদুরেরা ঠিক পথটি আয়ত্ত করে। কি তারা শেখে? পর পর বিভিন্ন দিশাভিমুখী কতগুলি গতিপথ কিংবা কেবল বাঁধাধরা একটি পথের নিশানা মাত্রই কি তারা আয়ত্ত করে? উত্তর হবে —না। অন্যান্য আরও কতগুলি পরীক্ষা দ্বারা ইঁদুরেরা সঠিক কি শেখে—তার একটা হদিশ পাওয়া গেছে। মারকুইস ও উড্ওয়ার্থের (২) ভাষায়—"ইঁদুরটি গোলক ধাঁধাঁটিকেই শেখে।" গোলক ধাঁধাঁর দেয়াল, কোণ, বন্ধগলি, সঠিক পথ সব কিছুই ইঁদুর দেখে। গোটা গোলকধাঁধাঁর মধ্যে কোথায় কোনটা আছে সেটা সে চিনতে শেখে। খাওয়ার জায়গাটি সে আবিষ্কার করে। কোথায় সেটা মোটামুটি তার জানা থাকে। ঐ সমস্ত সে প্রত্যক্ষ করে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার মনে সঞ্চিত থাকে। সমগ্র গোলকধাঁধাঁটি ক্রমশঃই তার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ইঁদুর কি শেখে

নিম্নতর জীবেরা হাত বা পায়ের সাহায্যে কোন কোন জিনিসকে আয়ত্তে এনে নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে—এমন দেখা গেছে। ঐ ব্যাপারে তারা কেমন করে শেখে, কতটা শিখতে পারে—সেই নিয়ে কিছু অনুসন্ধান হয়েছে। একটি খাঁচার মধ্যে একটি বিড়ালকে রাখা হল এবং খাঁচার বাইরে এক খণ্ড মাছ। বিড়ালটি খাঁচা থেকে মাছ দেখতে পাচ্ছে। খাঁচার ফাঁক দিয়ে মাছ ধরবার জন্য বিড়াল থাবা বাড়ায় কিন্তু মাছটির নাগাল পায় না। খাঁচার রেলিংএর ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে সে বার হবার চেষ্টা করে, পারেনা। রেলিংগুলি বারবার সে কামড়াতে থাকে, ধাক্কা দিতে থাকে, নাড়তে থাকে—কিছুতেই কিছু হয় না। বিড়ালের যত কিছু আক্রমণ—মাছের কাছাকাছি দিকটাতেই হয়। কিছুক্ষণ এমন ব্যর্থ চেষ্টার পরে খাঁচার দরজার হুকটার

বারংবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা শেখার আরেকটি দৃষ্টান্ত

প্রতি বিড়ালের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওটা নিয়ে সে টানাটানি আরম্ভ করে। হঠাৎ হুকটা সরে যায়, দরজা খুলে যায়, বিড়াল দ্রুত গিয়ে মাছটিকে আত্মসাৎ করে। বিড়ালটিকে পুনরায় খাঁচায় বন্ধ করলে, আর এক টুকরো মাছের আকর্ষণে সে প্রথম বারের চেয়ে কম সময়ে হুকটি সরিয়ে দরজা খুলতে সক্ষম হয়। তৃতীয় বার সময় আরও কম লাগে। দেখা যায় কয়েকদিন ধরে মোট দশ থেকে কুড়ি বারের চেষ্টায় বিড়ালটি হুকটি সরিয়ে দরজা খোলবার কৌশলটি আয়ত্ত করে। হুক নামিয়ে খাঁচার দরজা খুলতে বিড়ালের আর ভুল হয় না।

বিড়াল কি শিখে

বিড়াল দুটি জিনিস শিখল (ক) একটি জায়গায় একটি জিনিষ আছে—সে জানল (খ) জিনিসটা কোন একভাবে নাড়িয়ে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়--এটি সে বুঝল।

এই শিক্ষালাভে দরকার হয় (ক) তার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ও (খ) কোন জিনিস ইচ্ছামত সঞ্চালনের ক্ষমতা।

সমগ্র দৃষ্টি বা অন্বয় দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষা

বারংবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা শিক্ষা কিছু পরিমাণে অন্ধ। ভুল করে করেই ভুল শোধরাবার পথ অমন শিক্ষায় খুঁজে পেতে হয়। কফ্‌কা, কোয়েলার প্রভৃতি গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ শিম্পাঞ্জি ও গরিলা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তাঁদের মতে শিম্পাঞ্জি ও গরিলার শেখার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন। একটি খাঁচা। ছাদ থেকে এক কাঁদি কলা ঝুলছে। নীচে একটি শিম্পাঞ্জি। হাত বাড়িয়ে কলা সে নাগাল পায় না। লাফিয়েও নয়। শিম্পাঞ্জিটি কয়েকবার লাফিয়ে কলাটিকে ধরতে না পেরে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল একটা লাঠির দিকে। লাঠিটা খাঁচার এক পাশে পড়ে আছে। একবার লাঠি, একবার কলার দিকে তাকিয়ে সে লাঠিটা নিয়ে তার সাহায্যে কলা নীচে নামিয়ে আনল। পরীক্ষাটিকে এর পরে আরও জটীল করা হল। কলার কাঁদিকে আরও উঁচুতে রাখা হল। একখানা লাঠি দিয়েও তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। দু'খানা লাঠি রাখা হল। তাদের একটাকে অপরটার মধ্যে ঢোকান যায়। শিম্পাঞ্জি একখানা লাঠি দিয়ে কলার কাঁদিকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথাই। এক ঘণ্টা চেষ্টার পর এটুকু সে বুঝল—লাঠিটা ছোট, ঐটি দিয়ে কলা পাড়া সম্ভব নয়। খাঁচার এক পাশে লাঠি দুটো নিয়ে খেলতে খেলতে একটাকে সে অপরটার মধ্যে কিছুটা ঢুকিয়ে দিল। দুটো মিলে একটা লম্বা লাঠি হবার সঙ্গে সঙ্গে

সে ছুটে গিয়ে তারি সাহায্যে কলার কাঁদি পেড়ে আনল। পরের দিন কয়েক সেকেণ্ড নিরর্থক চেষ্টার পর সে লাঠি দুটোকে জোড়া লাগিয়ে কলার কাঁদি পাড়ল।

গেস্টাল্ট মনোবিদগণ এই শেখাকে 'সমগ্র দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষা' বলে অভিহিত করেন। একে অন্বয় দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষাও বলা যেতে পারে। এই শেখার মধ্যে চেষ্টা ও ভুলের স্থান একেবারে নেই—এ কথা সত্য নয়। তবু 'বারংবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা' শিক্ষা এবং 'সমগ্র দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষা'র মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। সমগ্র দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষায় সমাধানটি হঠাৎ এক মুহূর্তে হয়ে যায়। সমস্যার সমাধানও হয় দ্রুত—তার কারণ সমস্ত ব্যাপারটি এক সঙ্গে চোখে পড়ে। কলা, মোটা লাঠি, সরু লাঠি —এসব উদ্দেশ্যপূরণের জন্য পরস্পর অন্বিত ও যুক্ত হয়ে চোখের সামনে একসঙ্গে ভেসে উঠে।

চেষ্টার দ্বারা, ভুলের দ্বারা সমস্যা সমাধানের পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমাধান সম্বন্ধে একটি 'সমগ্র দৃষ্টি' লাভ করা সম্ভব। জ্যামিতির একটি সমস্যা নেওয়া যাক। সমস্যাটি শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছু কঠিন। বার-বার চেষ্টা ও ভুল করার পর—ঠিক সমাধানটি অবশেষে তার গোচর হল। চকিতে ব্যাপারটি সে বুঝে ফেলল। সমস্যা সমাধানের সমগ্র রূপটি তার কাছে ধরা পড়ল। এর পরে আর তার কখনও ভুল হবে না। এ জাতীয় সমগ্র দৃষ্টিকে বলা হয়—"পশ্চাৎ দৃষ্টি"। জ্যামিতির আরেকটি সমস্যা তাকে দেওয়া হল। সেটা অতি সহজ। দেখামাত্রই সমাধান কি হবে সে বুঝে ফেলল। এই জাতীয় সমগ্র দৃষ্টিকে বলা হয়—"সম্মুখ দৃষ্টি"।

সমগ্র দৃষ্টি : পশ্চাৎ দৃষ্টি ও সম্মুখ দৃষ্টি

মানুষের শেখার মধ্যে আমরা উভয় প্রকারের শিক্ষারই পরিচয় পাই। সমস্যা যেখানে অত্যন্ত দুরূহ—বারবার চেষ্টা করে, বার বার ভুল সংশোধন করেই ঠিক সমাধানটি সেখানে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে মানুষের ভাষা ও চিন্তাশক্তি আছে। বার বার চেষ্টা সে অনেক ক্ষেত্রে মনে মনে করে। সমগ্র দৃষ্টিতে—সমস্যা ও সমাধানটিকে একসঙ্গে দেখেও মানুষ অনেক শেখে। তবে জটিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে মানুষের সাফল্যলাভে অনেক ক্ষেত্রেই পশ্চাৎ দৃষ্টির ফল। সমস্যাটি সমাধান হবার পর তার সমগ্র রূপটি একসঙ্গে বিজ্ঞানীর চোখে ধরা পড়ে।

শেখার কয়েকটি রূপ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। প্রধানতঃ বারংবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা শিক্ষার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে আমেরিকান মনোবিদ থর্নডাইক শেখার তিনটি প্রধান সূত্র প্রণয়ন করেন : (ক) অনুশীলনের সূত্র (খ) সুখকর ও ক্লেশকর প্রভাবের সূত্র ও (গ) প্রস্তুতির সূত্র।* সূত্রগুলিকে পর পর উল্লেখ করে তাদের ব্যাখ্যা করা হল।

শেখার সূত্র—থর্নডাইক কর্তৃক প্রণয়ন

(ক) অনুশীলনের সূত্র : কোন উদ্দীপক ও আচরণের মধ্যে যদি বার বার (পরিবর্তনসাধ্য) সংযোগ ঘটে তবে, অন্যান্য অবস্থা এক থাকলে, সম্পর্কটি ক্রমে দৃঢ়তর হয়। যদি কিছুকাল ধরে উদ্দীপক ও আচরণের মধ্যে সংযোগটি না ঘটে —তবে সম্পর্কটি দুর্বল হয়। কোন একটি পড়া বার বার পড়লে তা মুখস্থ হয়, মনে থাকে। বিষয়টির সঙ্গে আচরণের সম্পর্কটি ক্রমেই দৃঢ়তর হয়। অনুশীলনের এই নিয়ম। বিষয়টি অনেকদিন ধরে না পড়লে বিষয়টি মনে থাকে না। বিষয়টির সঙ্গে আচরণের সংযোগ শিথিল হয়।

মানুষের বেলায় উদ্দীপক ও আচরণের মধ্যে কিছু কিছু অপরিবর্তনীয় সম্পর্ক আছে। যেমন, নাকের মধ্যে কিছু ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি আসে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, পরিপাক ইত্যাদিও ঐ জাতীয় আচরণ। এদের রিফ্লেক্স বলা হয়। এই ধরণের সম্পর্ক শিক্ষার আওতায় আসে না। পরিবর্তনসাধ্য সম্পর্ক কথাটি ঐ কারণেই থর্নডাইকের নিয়মে বলা হয়েছে। 'অন্যান্য অবস্থা এক থাকলে' কথাটির তাৎপর্য থর্নডাইকের দ্বিতীয় নিয়মটির আলোচনা করবার সময় আমরা বুঝতে পারব।

উদ্দীপক ও আচরণের অপরিবর্তনীয় সম্পর্ক বা রিফ্লেক্স

ঘটনাটি যদি হালে ঘটে থাকে তবে তা বেশী মনে থাকে। দূরের ঘটনার স্মৃতি ম্লান হয়, সে আমরা জানি। ঘটনাটির তীব্রতার কম বেশীর সঙ্গে মনে রাখার একটি সম্বন্ধ আছে। উজ্জ্বল আলো, উচ্চ শব্দ কয়েকবার প্রত্যক্ষ করলেও তা আমরা মনে রাখি।

অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থী ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করে। শিক্ষায় ধীরে ধীরে তার উন্নতি হয়। এই উন্নতির ধারাটি কেমন, কখন উন্নতি বেশী

* ইংরেজিতে এদের বলা হয়—(1) Law of Exercise (2) Law of Effect—satisfaction & annoyance (3) Law of Readiness এগুলি ছাড়াও শেখার কতগুলি গৌণ সূত্র আছে।

হয়, কখন কম হয়, উন্নতির শেষ সীমা বলে কিছু আছে কিনা এসব বিষয়ে কিছু কিছু জানা গিয়েছে। নৈপুণ্য অর্জনের দিকটা নিয়েই প্রধানতঃ অনুসন্ধানগুলি করা হয়েছে।

টাইপরাইটিং ও টেলিগ্রাফি দুটিই অর্জিত নৈপুণ্য। নৈপুণ্যলাভে উন্নতির পরিমাপে দুটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার ঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ে কতটা কাজ শিক্ষার্থী করতে পারে এবং কাজটা কতখানি নির্ভুল হল।

অনুশীলনের ফলে শিক্ষার ক্রম উন্নতির ধারা

টাইপরাইটিং শেখার উন্নতির হার সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানের কথা বলা যাক (৩)। প্রতিদিন পরীক্ষার্থী গড়ে মিনিটে কটি শব্দ নির্ভুল ভাবে টাইপ করল। তার হিসাব রাখা হল। প্রথম দিকে টাইপিংয়ে তার দ্রুত উন্নতি দেখা গেল। কিছুদিন যাবার পর উন্নতির হার কমে আসতে লাগল। সঠিক রূপে বলতে গেলে, প্রথম ৪২ দিনে সে দ্রুত উন্নতি লাভ করল। তার পরের ৩০ দিন শিক্ষার্থীর উন্নতি প্রায় একই পর্যায়ে রইল। অর্থাৎ, ৪২ দিনের শেষে উন্নতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল—প্রায় সেখানেই তা আবদ্ধ রইল। ৩০ দিন একই অবস্থায় থাকবার পর আবার তার শিক্ষায় উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু সে উন্নতির হার প্রথম ৪২ দিনের তুলনায় অনেক কম।

টেলিগ্রাফি শেখার বেলাতেও অনুরূপ একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই। গোড়াতে ত্বরিত উন্নতি হয়, কিন্তু—একেকটা সময় আসে যখন কোন উন্নতিই দেখা যায় না—তারপর আবার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সে উন্নতি মন্দীভূত। শেষ পর্যন্ত হয়ত একটা সময় আসে যখন কার্যতঃ আর কোন উন্নতিই ঘটে না।

মুখস্থ করা সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানের ফল নীচে উল্লেখ করা হল (৪)।

দশটি শব্দ। দেখা গেল বারো বার পুনরাবৃত্তির পর পরীক্ষার্থী ১০টি শব্দই নির্ভুলভাবে স্মরণ করতে পারল। প্রতিবার পড়বার পর কতটুকু সে পারছে তার একটি হিসাব রাখা হয়েছিল। নীচে সে হিসাবটি দেওয়া হল ঃ

দশটি শব্দ মুখস্থ করতে—

যখন আবৃত্তির সংখ্যা	শব্দ স্মরণের সংখ্যা
২	৩
৩	৪

যখন আবৃত্তির সংখ্যা	শব্দ স্মরণের সংখ্যা
৪	৫
৫	৪
৬	৭
৭	৭
৮	৮
৯	৯
১০	৭
১১	৯
১২	১০

মাঝে মাঝে উন্নতি সাময়িক ভাবে মন্দীভূত হলেও মোটের উপর ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে একথা বলা চলে। শেষের দিকের তুলনায় অবশ্য প্রথম দিকের উন্নতির গতির স্থিরতা বেশী।

টাইপরাইটিং ও টেলিগ্রাফি প্রভৃতিতে নৈপুণ্যলাভে গোড়ার দিকে উন্নতিটি ত্বরিত হয়ে থাকে, ক্রমশঃ উন্নতির পরিমাণ হ্রাস পায়। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শব্দ শেখা, পড়তে শেখা—এসব একেবারে গোড়াতে ধীরে ধীরে হয়, ক্রমশঃ উন্নতির হার বাড়ে, তারপর হয়ত একটা সময় আসে যখন উন্নতির হার কমে আসে।

উন্নতি অর্জনের দৈহিক সীমা

নৈপুণ্য অর্জনের দৈহিক ক্ষমতার কোন শেষ আছে কিনা এটি একটি প্রশ্ন। উন্নতিলাভের একটি পর্যায়ে পৌঁছবার পর সাধারণতঃ আর কোন উন্নতি দেখা যায় না। কিন্তু বিশেষ উদ্দীপনার ব্যবস্থা করলে তারপরেও উন্নতি ঘটে এমন দেখা গেছে। সেজন্যই ঐ পর্যায়কে শিক্ষার শেষ সীমা বলা কঠিন। তবে তত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষার উন্নতির দৈহিক ক্ষমতার শেষ সীমা আছে মনে করা অসমীচীন হবে না। ঐ উন্নতির স্তরে পৌঁছাবার পরে শত চেষ্টাতেও আর উন্নতি সম্ভব হবে না। কিন্তু কার্যতঃ নৈপুণ্যের যে পর্যায়ে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শেষ হয়—সেটি ঐ সীমা নয়।

টাইপরাইটিং শেখার দৃষ্টান্তটি আবার নেওয়া যাক। ৪২ দিন শেখবার পর

প্রায় ৩০ দিন আর কোন উন্নতি দেখা গেল না। এ সময়টতে শিক্ষায় উন্নতি রুদ্ধ হয়ে রইল। একে শিক্ষার মালভূমি বলা হয়। ৩০ দিনের পর শিক্ষায় আবার কিছু কিছু উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং বলা চলে না যে শিক্ষার্থী শিক্ষার দৈহিক ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছেছিল বলেই শিক্ষার গতিরোধ হয়েছিল। তবে এ উন্নতি রোধের কারণ কি? এ প্রসঙ্গে এ কথা বলে নেওয়া ভাল, শিক্ষায় মাঝে মাঝে অমন উন্নতিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

শিক্ষায় সাময়িক উন্নতিরোধ

টাইপরাইটিং যখন কেউ প্রথম শেখে তখন তার মনোযোগটি থাকে অক্ষরের উপর। কিছুদিন ধরে টাইপ করার পর অক্ষর টাইপে সে অভ্যস্ত হয়। অক্ষর টাইপে অভ্যস্ত হবার পর টাইপিংয়ে একেকটি শব্দের প্রতি সে মনোযোগ দেয়। অর্থাৎ অক্ষরের পরিবর্তে শব্দকে সে টাইপিংয়ের একক বা ইউনিট রূপে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। শব্দ-অভ্যাস অক্ষর-অভ্যাসের স্থল গ্রহণ করে। একটি অভ্যাসের স্থলে আরেকটি অভ্যাস প্রতিষ্ঠার সময়টিতে আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষার কোন উন্নতি হচ্ছে না বলে মনে হয়। পুরানো অভ্যাস কাজে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে, কাজের নূতন অভ্যাস তখনও ভালো করে গড়ে ওঠে নি। শিক্ষার সাময়িক রোধের এগুলি কিছুটা কারণ। পড়তে শেখার বেলাতেও অনুরূপ কথা বলা চলে। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শিশু গোড়াতে অক্ষর চিনতে শেখে। ক্রমে বানান করে, অক্ষর ধরে ধরে শব্দ পড়তে তারা শেখে। তারপর একটা সময় আসে যখন একেকটি শব্দ, এমন কি একেকটি বাক্যাংশ একসঙ্গে পড়বার অভ্যাসটি তারা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করে। অক্ষর পড়া থেকে শব্দ (বা বাক্যাংশ) পড়বার উন্নততর অভ্যাসটিকে অর্জন করবার সময় পড়বার গতি কিছু মন্থর হয়। শব্দ পড়বার অভ্যাসটি মোটামুটি আয়ত্ত করবার পর আবার উন্নতি দেখা যায়।

পাঠে শিক্ষার সাময়িক রোধ ও তার কারণ: (ক) পুরানো অভ্যাস ত্যাগ ও নূতন অভ্যাস গঠন

সাময়িক উন্নতি রোধের আরও কারণ থাকতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে গোড়াতে উৎসাহভরে শিক্ষার্থী শিখতে আরম্ভ করে। উৎসাহের বেগে শিক্ষা দ্রুত এগিয়ে চলে। কাজটির সঙ্গে যখন কিছু পরিচয় ঘটে, কৌতূহল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহেও অনেক সময় তখন ভাটা পড়ে। শিক্ষার্থীকে তবু হয়ত কাজ করতে হয়, কিন্তু শিক্ষায়

(খ) কৌতূহল হ্রাস

সে উন্নতি লাভ করে না। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতি রোধের কারণ শিক্ষায় উৎসাহ ও প্রেরণার অভাব।

(গ) বিষয়ের দুরূহতা

শিক্ষার্থী কোন একটি বিষয় শিখছে। শিখতে শিখতে বিষয়টির কোন দুরূহ অংশে সে হাজির হল। তখন ঐ দুরূহ অংশটি আয়ত্ত করতে তাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। এইজন্য মনে হতে পারে তার শিক্ষার উন্নতি যেন রুদ্ধ হয়ে আছে।

মোট কথা মাঝে মাঝে শিক্ষার উন্নতি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। তাতে হতাশ হবার কারণ নেই। চেষ্টা ও উদ্দীপনার সাহায্যে বাধাকে অতিক্রম করলে পর আবার উন্নতি হয় এমন দেখা গেছে।

(খ) সুখকর ও ক্লেশকর প্রভাবের সূত্র ঃ কোন উদ্দীপক ও আচরণের (পরিবর্তনসাধ্য) সংযোগে যদি সুখ বা তৃপ্তি পাওয়া যায়, তবে সংযোগটির দৃঢ়তা বাড়ে; যদি সে সংযোগে বিরক্তি বা ক্লেশ বোধ হয়, তবে সংযোগটির দৃঢ়তা কমে।

অনুশীলনের দ্বারা মানুষ শেখে—একথা বললেই শেখা সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। সুখ বা ক্লেশ শিক্ষাকার্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। একটি

সুখ ও ক্লেশকর প্রভাবে শিক্ষার দৃষ্টান্ত

ছেলে একবার চুরি করে। চুরি করে আশাতীত ভাবে সে লাভবান হয়। ফলে চুরি তার একটি দৃঢ়মূল অভ্যাসে পরিণত হয়। বার্টের (৫) ভাষায়, "একবার কৃতকার্য হলে চেষ্টা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। চেষ্টা করে একশবার ব্যর্থকাম হলে কোন অভ্যাস গড়ে ওঠে না।" বহুবার বিরক্তি ও ক্লেশকর কাজ করে কেমন করে একটি দৃঢ়মূল অভ্যাসকে দূর করা যায় এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল। এক ভদ্রলোক টাইপ করতে গিয়ে প্রায়ই 'The' কে ভুল করে টাইপ করতেন 'HTe'। এই অভ্যাসটি দূর করার জন্য তিনি একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। The টাইপ করবার চেষ্টা না করে বহুবার ইচ্ছা করে তিনি HTe টাইপ করেন। প্রতিবারই শব্দটি টাইপ করে—আমার ভুল হয়েছে—কথাটি উচ্চারণ করেন। এ ভাবে ভুলের সঙ্গে বিরক্তির বারম্বার যোগাযোগ ঘটে। দেখা গেল তারপর থেকে ঐ ভুলটি তাঁর আর হত না। অনুশীলন শেখার একমাত্র নিয়ম হলে বহুবার HTe টাইপ করবার দরুণ তাঁর ভুল টাইপ করবার অভ্যাসটি আরও দৃঢ়তর হত। কিন্তু দেখা গেল তা হয়নি।

সুখ ও ক্লেশকর প্রভাবের সূত্রানুযায়ী সংযোগটি দুর্বল হল এবং কার্যতঃ ছিন্ন হল।

নাইট্ ডানলপের (৬) শিক্ষার বিটা থিয়োরী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কোন একটি কু-অভ্যাসকে দূর করার একটি পদ্ধতি হল—সচেতন ভাবে সে অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করা। এটিকে নেগেটিভ অনুশীলন বলা হয়। অভ্যাসটি যে কু—শিক্ষার্থীর এটি অবশ্য বোঝা চাই। অভ্যাসটিকে দূর করবার জন্য ইচ্ছা ও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে শিক্ষার্থীকে অগ্রসর হতে হবে। তোতলামির কথা নেওয়া যাক। কোন কোন লোকের কথা বলতে গেলে আটকে যায়, বার বার চেষ্টা করে কথা বলতে হয়। এই অভ্যাসটি কাটাবার জন্য কিছুকাল স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে তোতলামি অনুশীলন করতে হয়। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতে হয়—ঐ নেগেটিভ অনুশীলনের ফলে তোতলামি না করে শিক্ষার্থী কথা বলতে পারে কিনা। যদি দেখা যায় সে তাই পারে তখন থেকে ঐ নেগেটিভ অনুশীলনের আর দরকার হয় না। তিন মাস অমন চেষ্টার পর কয়েকটি কিশোরের তোতলামি সেরেছে—ডানলপ এমন কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন। এ ধরণের চিকিৎসা অবশ্য সুদক্ষ মনোবৈজ্ঞানিকের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নাইট্ ডানলপের বিটা থিয়োরী

শিক্ষা সম্বন্ধে ডানলপের থিয়োরী তিনটি নীচে দেওয়া হল:

নাইট্ ডানলপের তিনটি থিয়োরী

১। আলফা থিয়োরী: কোন আচরণ ঘটলে পরে ঐ উদ্দীপকের উপস্থিতিতে অমন আচরণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বাড়ে। ২। বিটা থিয়োরী: কোন আচরণ ঘটলে পর এ উদ্দীপকের উপস্থিতিতে অমন আচরণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমে। ৩। গামা থিয়োরী: কোন আচরণ ঘটে ভবিষ্যতে ঐ আচরণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমায় বা বাড়ায় না।

শিক্ষায় থর্নডাইকের সুখকর ও ক্লেশকর অনুভূতির প্রভাবের সূত্রে ফেরা যাক। আচরণ ও অনুভূতির নৈকট্য দরকার একথা মনে রাখা আবশ্যক। একটি ছেলে চুরি করত। একদিন ধরা পড়বার পর সে শাস্তি পেল। শাস্তিটা তার চুরি করবার জন্য হল, না ধরা পড়বার জন্য হল—ছেলেটির কাছে নিশ্চয়ই এটি প্রশ্ন। যদি প্রথমটি সে মনে করে তবে হয়ত চুরি করার অভ্যাসের উপর শাস্তি নেগেটিভ প্রভাব বিস্তার করবে। যদি সে মনে করে ধরা পড়বার জন্যই তার

আচরণ ও অনুভূতির নৈকট্য আবশ্যক

শাস্তি হল তাহলে ভবিষ্যতে সে আরও সাবধান হবে যাতে চুরি করে সে ধরা না পড়ে।*

আচরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি কারো কষ্টকর অনুভূতিটি হয় তবেই উদ্দীপক ও আচরণের সংযোগটি সম্ভবতঃ শিথিল হবে। চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে যদি সে ধরা পড়ে ও শাস্তি পায় তবেই ঐ শাস্তির দ্বারা ফললাভের আশা করা চলে। চুরি ও শাস্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান শাস্তির কার্যকারিতা হ্রাস করে।

১৯২৮ সালে থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত থর্নডাইক আরো অনেকগুলি অনুসন্ধান করেন। শিক্ষায় পুরস্কার ও শাস্তির প্রভাব কি সেটা দেখা তার অভিপ্রায় ছিল।

থর্নডাইকের সংশোধিত মতবাদ: শিক্ষায় ক্লেশকর প্রভাবের স্থান নেই

মুরগির ছানা নিয়ে একটি অনুসন্ধান করা হয়। ছয়টি খাঁচা। প্রত্যেকটি খাঁচা থেকে বেরবার তিনটি পথ। তিনটির একটি পথের বাইরে ছিল খাদ্য, স্বাধীনতা অথবা অন্যান্য মুরগির ছানার সঙ্গ। এককথায়, সুখকর পরিণতি বা পুরস্কার। আর দুটি পথ দিয়ে বেরবার চেষ্টা করলে মুরগির ছানাটিকে ৩০ সেকেণ্ড কাল আটকে থাকতে হত অথবা খাঁচা থেকে মুক্তি লাভে সে বাধা পেত। এককথায়, ঐ দুটি পথ গ্রহণ করলে তাদের ভাগ্যে জুটত কষ্টকর অনুভূতি কিম্বা শাস্তি। মুরগির ছানাদের দশ হাজার বার আচরণের রেকর্ড নিয়ে দেখা যায় যে শিক্ষায় পুরস্কারের স্থান আছে, কিন্তু শাস্তির কোন স্থান নেই। যে পথে পুরস্কার পাওয়া যায় সেই পথে যাবার প্রেরণা মুরগির ছানাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাস্তির ভয় মুরগির ছানাদের ভবিষ্যতের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে না। যে পথে গেলে কষ্ট হয় সে সব পথকে এড়াবার চেষ্টা মুরগির ছানাদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না।

এ জাতীয় কয়েকটি অনুসন্ধানের পর থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন—"পুরস্কার সংযোজিত প্রেরণাকে দৃঢ় করে, কিন্তু শাস্তি প্রেরণাকে শিথিল করে না" (৭) থর্নডাইকের সংশোধিত মতবাদে শিক্ষায় ক্লেশকর প্রভাবের স্থান নেই।

এমনও দেখা গেছে শাস্তি পাবার জন্য শিশুরা সময় সময় অন্যায় করে।

* ব্যাপারটি অবশ্য আরও গভীর। মা বাবার প্রতি শিশুর মনোভাব, মা বাবার নীতি-শিক্ষার প্রকৃতি ও শিশুর বিবেকের ধরণের উপর শাস্তি ও চুরির সম্বন্ধে শিশুর ধারণা কি হবে—সেটা নির্ভর করে। ঐ সম্বন্ধে ১০ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

কলকাতার শিশুভবঘুরেদের এক আশ্রমে একটি নয় দশ বৎসরের ছেলে আশ্রম সচিবকে এসে বললো সে বিড়ি খেয়েছে। আশ্রমে বিড়ি খাওয়া নিষেধ। ছেলেটির শাস্তি হল। আবার কয়েকদিন পরে সচিবের কাছে এসে নিজের বিরুদ্ধে সে ঐ একই অভিযোগ করল। ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয় বলে আশ্রম সচিবের সন্দেহ হল। তিনি ভালো করে অনুসন্ধান করে জানলেন যে অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা। তবে? ছেলেটি মার খেতে চায় বলেই সে এই অভিযোগ করছে। ঐ ধরণের শাস্তিলোভের পিছনে অনেক সময় থাকে 'আমি দোষী, আমার শাস্তি পাওয়া উচিত'—এ ধরণের একটা মনোভাব। কেন দোষী এটা প্রায়ই মনের কাছে স্পষ্ট থাকে না। কিন্তু শাস্তি পাওয়া দরকার, শাস্তি পেলেই কিছুটা যেন প্রায়শ্চিত্ত হয় ও সাময়িক ভাবে মনে শান্তি পাওয়া যায়। শাস্তি ও ভালোবাসা অনেকের মনে মিলেমিশে এক হয়ে আছে দেখা যায়। যে শাস্তি দেয় (বিশেষতঃ দৈহিক শাস্তি) সে আমাকে ভালোবাসে। প্রবাদ আছে—বহু পূর্বে কোন এক দেশের চাষীদের স্ত্রীরা স্বামীর হাতে একদিন মার না খেলে বলতো—স্বামী তাকে আর ভালোবাসে না। একাধিক কারণে মানুষের মধ্যে যন্ত্রণার প্রতি, কষ্টের প্রতি একটা লোভ জন্মে।* শেলী লিখেছেন—

শাস্তিলিপ্সা অন্যায় আচরণের কারণ

"Our sweetest songs are those
that tell of saddest thought".

শাস্তিকে শিক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা—এ বিষয়ে বিবেচনা করতে গেলে ঐ তথ্যসমূহের তাৎপর্য ভালো করে বোঝা দরকার। কোন কাজ থেকে শিশুকে নিবৃত্ত করতে হলে অনেক সময় তাকে শাস্তি দিতে হয়। শাস্তি শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, সুষ্ঠু আত্মমর্যাদা গড়ে তোলবার পথে বিঘ্ন হয়—শাস্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে এটা সবচেয়ে বড় আপত্তি।

---

* গিরীন্দ্রশেখর বোস কিন্তু এ কথা স্বীকার করেন না। একটি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন আপাতদৃষ্টিতে যা ক্লেশকর তার প্রতি আমাদের লোভ থাকতে পারে। আসলে কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে প্রীতিকর, কষ্টকর নয়। অল্প দৈহিক কষ্ট ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের কাছে প্রীতিকর। কিন্তু তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা পেলে তাকে আমরা নিশ্চয়ই চাইব না।

তদুপরি শাস্তি যদি নিবৃত্ত না করে, অন্যায় কাজের প্রতি লোভ ও শাস্তি লিপ্সা যদি ক্ষেত্রবিশেষে জড়িত হয়ে নিষিদ্ধ ফলকে আরও লোভনীয় করে তোলে—তবে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

মোট কথা, বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষণা দরকার। ক্লেশকর অনুভূতিগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা—যাদের একটি হয়ত শিক্ষার সহায়তা করে, অপরটি করে না—এ সবও দেখা দরকার। শিক্ষায়, বিশেষতঃ ভুল সংশোধনের শিক্ষায় ব্যক্তির সচেতন মনোভাব সম্ভবতঃ বড় কথা। ক্লেশকর অনুভূতিটি বাইরেরর থেকে না এসে যদি নিজের ভিতর থেকে ওঠে তবে প্রেরণা কিম্বা অভ্যাস দুর্বল হয়—এমন দেখা গেছে।

(গ) প্রস্তুতির সূত্র: যখন কোন কাজ করবার বা কোন বিষয় শেখবার জন্য মন প্রস্তুত হয়—তখন কাজ করবার বা শেখবার সুযোগ পেলে মনে সুখকর অনুভূতির উদয় হয়; সুযোগ না পেলে বিরক্তি বা ক্লেশ বোধ হয়। মন প্রস্তুত নয়—সে সময় কাজ করতে হলে বা শিখতে হলে মনে ক্লেশকর অনুভূতি হয়।

সুখকর অনুভূতি শেখবার সহায়তা করে—আগেকার নিয়মটিতে এটি আমরা দেখেছি। কি অবস্থায় মনে সুখকর ও ক্লেশকর অনুভূতির উদয় হয়—প্রস্তুতির নিয়মে সেটা আমরা দেখতে পাই।

মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপ

এই মানসিক প্রস্তুতিটির স্বরূপ কি? একে শিক্ষালাভে আগ্রহ ও ইচ্ছা বলা যেতে পারে। ইচ্ছা ও আগ্রহ শিক্ষার্থীর মনকে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে, ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে শিক্ষালাভের জন্য মন উন্মুখ হয়।

জগৎ ও জীবনের কোন কোন ঘটনা শিশু মনকে কৌতূহলী করে। শিশু সে সব সম্বন্ধে জানতে চায়। শিশুমনের এই জাগ্রত কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করা নিশ্চয়ই শিক্ষার কর্তব্য। কিন্তু শিশু কখন কি জানতে চাইবে—সেজন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই কি শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ হবে? কিছু পরিমাণে তেমন সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করা সঙ্গত হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভূগোলের মৌসুমী বায়ু বোঝাতে বাস্তবকে যদি পাঠের সঙ্গে যুক্ত করা হয়—তবে ব্যাপারটি সঠিক ও স্পষ্টভাবে বোঝা শিশুর পক্ষে সম্ভব হবে, বিষয়টি জানবার আগ্রহও তার বেশী হবে। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে

জানবার ইচ্ছা বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যাবে এটা স্বাভাবিক। সে সুযোগ শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি নেন—তবে শিক্ষা সুগম হবে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভ করা শিশুদের পক্ষে সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কথাবার্তা, আলোচনা এবং উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে শিশুর জিজ্ঞাসাকে, শিশুর মধ্যে জানবার ও কাজ করবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। শিক্ষালাভের জন্য শিশু মনকে প্রস্তুত করতে পারেন।

সংযোজিত আচরণের তত্ত্ব

কোন উদ্দীপকের সঙ্গে কোন একটি আচরণের একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—খাবার মুখে দিলে লালা নিঃসৃত হয়; উজ্জ্বল আলো চোখে পড়লে চোখের পাতা তক্ষনি বন্ধ হয়; নাকের মধ্যে কিছু ঢুকলে হাঁচি আসে। উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে এ জাতীয় আচরণকে ইংরেজীতে রিফ্লেক্স বলা হয়। এ জাতীয় আচরণ আপনা থেকেই ঘটে, এগুলি জীবের ইচ্ছাধীন নয়। এ জাতীয় আচরণ বহুলাংশে অপরিবর্তনীয়।

আচরণের সংযোজনা বা সংযোজিত আচরণ

উদ্দীপক ও আচণের স্বাভাবিক সম্পর্কের সহায়তায় বিভিন্ন উদ্দীপকের সঙ্গে ঐ আচরণের সংযোজনা সম্ভব, পাভলভ পরীক্ষা দ্বারা তা দেখিয়েছেন। এই সংযোজনাকে শিক্ষা বলা চলে। পাভলভ একজন রাশিয়ান দেহতত্ত্ববিদ। কুকুরের সাহায্যে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন।

খাবার মুখে দিলে স্বাভাবিক নিয়মে মুখ থেকে লালা বার হয়। কুকুরের মুখ থেকে কি পরিমাণ লালা বার হল—পাভলভ মাপকের সাহায্যে সঠিক ভাবে তা মাপবার ব্যবস্থা করেন। মাপকটি কুকুরের মুখের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হল। লক্ষ্য রাখা হল যাতে লালা বার হয়ে তার মধ্যে গিয়ে পড়ে। কুকুরটিকে খাবার দেবার একটু আগে কিছুক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজান হয়।

ঘণ্টা—খাবার—লালা, পরপর তিনটি ঘটনা ঘটে। কয়েকবার এমন ঘটাবার পর (অর্থাৎ ঘণ্টা বাজান হল—খাবার দেওয়া হল—লালা বার হল) দেখা গেল, ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মুখ থেকে লালা বার হল। ঘণ্টা ও লালা--দুটির মধ্যে একটি সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। ঘণ্টা একটি উদ্দীপক, তার

সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ হচ্ছে 'শোনা'র। শোনাকে আচরণ বা প্রতিক্রিয়া বলা চলতে পারে। খাবার একটি উদ্দীপক তার সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ হচ্ছে 'লালা নিঃসরণের আচরণ'। দুইটি উদ্দীপক ও আচরণ কয়েকবার একসঙ্গে বা পরপর ঘটবার ফলে প্রথমটির উদ্দীপকের সঙ্গে দ্বিতীয়টির আচরণ সংযোজিত হল। ব্যাপারটি সূত্রাকারে এভাবে দেখা যায়—

উ$_1$ (ঘণ্টা)——আ$_1$ (শোনা)
উ$_2$ (খাবার)——আ$_2$ (লালা নিঃসরণ)
উ$_1$ + উ$_2$ (পর পর কয়েকবার দেওয়া হল) ——আ$_1$ + আ$_2$
উ$_1$ (ঘণ্টা)——আ$_2$ (লালা নিঃসরণ)

খাবার হচ্ছে লালা নিঃসরণের স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং লালা নিঃসরণ হচ্ছে খাবারের স্বাভাবিক আচরণ। ঘণ্টা ও লালা নিঃসরণের মধ্যে যে নূতন সম্বন্ধটি গড়ে উঠল—তাকে বলা চলে সংযোজন। ঘণ্টা লালার সংযোজিত উদ্দীপক, লালা নিঃসরণ ঘণ্টার সংযোজিত আচরণ। ঘণ্টা—খাবার—লালা এই তিনটি বার বার পরপর বা একসঙ্গে উপস্থিত হলে ঘণ্টা ও লালা নিঃসরণ সংযোজিত হয়। ঐ সংযোজন খাবার দেওয়া বন্ধ করলেও কিছুদিন থাকে। এ কথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে খাবারের উদ্দীপনায় যতখানি লালা নিঃসৃত হয়, ঘণ্টা শুনে কোন সময়েই ততখানি লালা নিঃসৃত হয় না।

দুটি উদ্দীপকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান

দুটি উদ্দীপকের উপস্থিতি একই সঙ্গে কিম্বা পরপর ঘটে। দুটি উদ্দীপকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশী হলে সংযোজনা হয় না। মানুষেতর জীব নিয়ে কোন কোন পরীক্ষায় দেখা গেছে, সময়ের ব্যবধান কম হলে সংযোজিত প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বেশী হয়। দুটি উদ্দীপকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৩০ সেকেণ্ডের বেশী হলে সংযোজনা ঘটে না (৮)।

এ কথা বলা যেতে পারে যে ঘণ্টা ও খাদ্য বারম্বার একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করবার ফলে কুকুর ঘণ্টাকে খাদ্যের সঙ্কেত বলে মনে করতে শেখে। তার একটি প্রমাণ যে খাবার দেবার পর ঘণ্টা বাজালে ঘণ্টার সঙ্গে লালা নিঃসরণের সংযোজন হয় না। ঘণ্টা ও লালা নিঃসরণ সংযোজিত হবার পরে বারকয়েক ঘণ্টা বাজিয়ে যদি খাবার দেওয়া না হয় তবে কী হয়? দেখা যায়—ক্রমে ক্রমে লালা নিঃসরণ কমে আসে এবং অবশেষে লালা নিঃসরণই হয় না।

পাভলভের একটি পরীক্ষায় কেমন করে ঘণ্টা বাজিয়ে খাবার না দেওয়ার ফলে সম্বন্ধটি (যেটি কয়েকদিনের ঘণ্টা—খাবার—লালার পরপর অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে উঠেছিল) বিলুপ্ত বা বিয়োজিত হল—নীচে তা দেওয়া হল (৯) :

মেট্রোনমের সাহায্যে ঘণ্টা বাজাবার সময়	লালার পরিমাণ ফোঁটা
১২·০৭ মিনিট	১৩
১২·১০ "	৭
১২.১৩ "	৫
১২.১৬ "	৬
১২·১৯ "	৩
১২·২২ "	২·৫
১২.২৫ "	০
১২·২৮ "	•

কিছুদিন পর আবার যদি ঘণ্টা বাজাবার পর খাবার দেওয়া হয় তবে অল্প কয়েকবার পুনরাবৃত্তির পরেই আবার কিছু লালা বার হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় 'বিয়োজন ও বিলুপ্তি' আরও তাড়াতাড়ি ঘটবে। সম্বন্ধটি বাহ্য আচরণে বিলুপ্ত হলেও স্মৃতিতে কিছু থাকে। তার প্রমাণ হল ঘণ্টা খাদ্য—লালাকে পরপর উপস্থিত করে ঘণ্টা—লালার সম্পর্কটি পুনরায় গড়ে তুলতে কম সময় দরকার হয়।

কোন একটি আচরণের একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক উপস্থিত থেকে স্বভাবতঃ সম্পর্ক রহিত একটি উদ্দীপকের সঙ্গে ঐ আচরণটির সংযোজন ঘটায়। স্বাভাবিক উদ্দীপকটির শক্তি ও সহায়তায় ঐ সংযোজনটি ঘটেছে বলা চলে। সংযোজিত উদ্দীপকটির মধ্যেও নূতন সংযোজন ঘটাবার শক্তি কিছু পরিমাণে সঞ্চারিত হয়, এমন দেখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। খাদ্যের উপস্থিতির ফলে, অথবা বলতে হয় খাদ্যের সহায়তায় ঘণ্টা ও লালা নিঃসরণ সংযোজিত হয়। অর্থাৎ ঘণ্টা শুনলেই কুকুরটির লালা নিঃসরণ হয়। সম্বন্ধটি বেশ পাকাপাকি স্থাপিত হবার পর কুকুরটিকে নিয়ে আর একটি পরীক্ষা করা হল। একটি লাল আলো

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সহায়ক

দশ সেকেণ্ড কাল কুকুরটি দেখল। তারপর আলোটিকে নিভিয়ে দিয়ে তিরিশ সেকেণ্ড ধরে ঘণ্টাটি বাজান হল, কিন্তু কোন খাবার দেওয়া হল না। ঘণ্টা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটির লালা নিঃসরণ হল। কয়েকবার পরপর অমন অভিজ্ঞতা লাভ করবার পর কেবলমাত্র লাল আলোটি জ্বালানো হল, ঘণ্টা বাজান হল না কিম্বা খাবার দেওয়া হল না। তবু দেখা গেল লাল আলো দেখা মাত্র কুকুরটির লালা নিঃসরণ হচ্ছে। অমন ক্ষেত্রে বলতে হয় ঘণ্টার সহায়তায় লাল আলো ও লালা নিঃসরণ সংযোজিত হয়েছে। সি, এল, হাল (১০) খাদ্যকে প্রাথমিক সহায়ক এবং ঘণ্টাকে মাধ্যমিক সহায়ক বলে উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষাকে পাভেলভের দৃষ্টিতে দেখলে তাকে আচরণের সংযোজনা বলা যায়। এ মতবাদকে সংযোজিত আচরণের তত্ত্ব বলা হয়।*

জন ওয়াট্‌সন শিশু শিক্ষায়, বিশেষতঃ আবেগের শিক্ষা ব্যাপারে সংযোজনার নিয়মটি প্রয়োগ করেছেন। তার দুই একটি দৃষ্টান্ত নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

ওয়াট্‌সনের গবেষণা ঃ আবেগের ক্ষেত্রে সংযোজনা

আলবার্ট। এগারো মাস তার বয়স। শিশুটি খুবঠাণ্ডা, মোটেই কান্নাকাটি করে না। লক্ষ্য করা গেল—উচ্চ শব্দ শুনলে কিম্বা ব্যথা পেলে শিশুটি ভয় পায় এবং যেটার উপর সে ভর করে আছে সেটা সরিয়ে নিতে গেলে সে ভয় পায়। ঐ তিনটি ব্যাপারকেই সে কেবলমাত্র ভয় করে। তার বারো ইঞ্চির মধ্যে যা কিছু সে দেখতে পায় তাকেই হাত দিয়ে ধরে সে খেলা করে। একটা সাদা ইঁদুর নিয়ে মাঝে মাঝে সে খেলত। একদিন একটি বাক্স থেকে সাদা ইঁদুরটাকে বার করা হল। আলবার্ট ইঁদুরটাকে হাত বাড়িয়ে যেই ছুঁয়েছে —তার পিছন থেকে একটা হাতুড়ি দিয়ে লোহাকে আঘাত করে তীক্ষ্ণ উচ্চশব্দ করা হল। শিশুটি চমকে লাফিয়ে তোশকের উপর শুয়ে পড়ে মুখ লুকোল। একটু পরে পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করা হল। শিশুটি আবার সভয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে গেল।

এক সপ্তাহ পরে ইঁদুরটিকে শিশুর কাছে আবার হাজির করা হল। ইঁদুরটির দিকে আলবার্ট তাকিয়ে রইল, কিন্তু ধরবার চেষ্টা করল না। ইঁদুরটিকে আরও তার কাছে নিয়ে এলে সে ধরবার একটু চেষ্টা করেই হাত সরিয়ে নিল। সাহস

* ইংরেজিতে একে Theory of Conditioned Response বলা হয়।

করে যেই একবার ইঁদুরটিকে সে স্পর্শ করেছে—তীক্ষ্ণ উচ্চশব্দটি আবার সে শুনতে পেল। শিশুটি চমকে লাফিয়ে উঠে পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগল। বারকয়েক এই দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটবার পর ইঁদুরটিকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের সবরকম চিহ্ন শিশুটির মধ্যে লক্ষ্য করা গেল।

আগেকার মত এ ব্যাপারটিকে নীচের সূত্রে প্রকাশ করা যায়।

উ$_1$ (তীক্ষ্ণ উচ্চ শব্দ)——আ$_1$ (ভয় ও কান্না)
উ$_2$ (সাদা ইঁদুর)——আ$_2$ (ধরা ও খেলা)
উ$_1$ + উ$_2$ ——আ$_1$ (কয়েকবার ঘটল)
উ$_2$ (সাদা ইঁদুর)——আ$_1$ (ভয় ও কান্না)

তীক্ষ্ণ, উচ্চশব্দের সঙ্গে সাদা ইঁদুরটি জড়িত হওয়ায় শিশু সাদা ইঁদুরটিকে ভয় করতে শেখে। কিন্তু দেখা গেল—কেবল মাত্র সাদা ইঁদুর নয়, যা কিছু সাদা ইঁদুরের মত কমবেশী দেখতে—সবই শিশুর ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। একটি খরগোসকে দেখামাত্র শিশুটি চমকে সরে যাবার চেষ্টা করল। অবশেষে সে কেঁদে ফেলল। একটি কুকুরকে তার সামনে হাজির করা হল। তাকে সাদা ইঁদুর বা খরগোসের মত ভয় না করলেও, সে তার দিকে কিছুটা শঙ্কিত ভাবে তাকিয়ে রইল। কুকুরটি কাছে আসতে সে সরে যাবার চেষ্টা করল। কুকুরটি চলে যাওয়াতে সে নিশ্চিন্ত হল। তাকে কিছু কাঠের ব্লক দেওয়া হল। কাঠের ব্লকে তার ভয় নেই। সাগ্রহে সেগুলি নিয়ে সে খেলতে লাগল। একটা লোমশ কোট তার দিকে এগিয়ে দেওয়া মাত্র সে ভয় পেল। দেখা গেল তুলোকেও সে ভয় করে—যদিও সে ভয়ের পরিমাণ খুব বেশী নয়। ওয়াট্‌সনের ধারণা একান্ত শৈশবে শিশু দু একটি জিনিষকেই ভয় করে।* সেই ভয় তার ক্রমে—বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে—বিভিন্ন ঘটনা বা বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। ভয়ের মূল বস্তুর সঙ্গে নতুন বস্তুর অনুষঙ্গ বা সম্বন্ধ শিশু যে সব সময়ে সুচেতন ভাবে অনুভব করে, তা নয়। রুষ্ট পিতার রুদ্র মূর্তি যেন যে দেখতে পায় একটি সরব কুকুর কিম্বা একটি তেজী ঘোড়ার মধ্যে। কুকুর ও ঘোড়াকে সে ভয় করতে শেখে। কেবল মাত্র ভয় নয়, অন্যান্য আবেগও এমন ভাবে বিষয়ান্তরিত হয়।

সংযোজিত আবেগের বিস্তার বা সঞ্চারণ

রাগ, ভয় প্রভৃতি কতগুলি আবেগ আছে, যেগুলি শিশু জীবনের শান্তিকে

* এ বিষয়ে শিশুর বিকাশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধানতঃ বিঘ্নিত করে। প্রশ্ন—এই জাতীয় সংযোজিত আবেগকে কেমন করে দূর করা যায়। বিয়োজনের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল। পিটার। একটি তিন বছরের ছেলে। পিটার ইঁদুর, লোমশ কম্বল, লোমশ কোট, তুলো এসবকে ভয় করে। একদিন একটা কুকুর তাকে ঘেউ ঘেউ করে আক্রমণ করে। সেই থেকে এসব ভয় ও জন্তুভীতি তার মধ্যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পিটার একদিন খাচ্ছে—এমন সময় খাঁচায় বন্ধ একটা খরগোস ঘরে এনে রাখা হল; অবশ্য বেশ কিছুটা দূরে—যাতে পিটার ভয় না পায়। পরের দিন খরগোসটাকে পিটারের আরেকটু কাছে রাখা হল। দেখা গেল পিটার খরগোসকে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করেছে। পর পর আরও কয়েকদিন খরগোসটাকে এনে ঐ জায়গায়ই রাখা হল। পিটার খরগোসের ঐ সান্নিধ্যে অভ্যস্ত হবার পর খরগোসটিকে আরও কাছে নিয়ে আসা হল। অবশেষে একদিন খরগোসটিকে হাজির করা হল টেবিলের উপর। তারপর পিটারের কোলে। পিটার একহাতে খেতে লাগল ও অপর হাতে খরগোসটিকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। খরগোসের প্রতি সে শিশুসুলভ স্বাভাবিক আচরণ করছে। ইঁদুর, লোমশ কম্বল, লোমশ কোট, তুলো ও পালক সম্বন্ধে পিটারের তখনও ভয় আছে কিনা—পরীক্ষা করে দেখা হল। দেখা গেল তুলো, পালক, লোমশ কোট ও কম্বল সম্বন্ধে তার আর কোন ভয় নেই। ইঁদুরের প্রতি ভয়ও তার অতি সামান্য।

আচরণের বিয়োজন

সূত্রাকারে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়—

উ$_{1}$ (জন্তু ও লোমশ বস্তু)——আ$_{1}$ (সংযোজিত ও সঞ্চারিত ভয়)
উ$_{1}$ (খাদ্য)——আ$_{2}$ (খাওয়া ও খাওয়ার আনন্দ)
উ$_{1}$ + উ$_{2}$ (কয়েকবার দেখবার পর)——আ$_{1}$ (,,)
উ$_{1}$ (জন্তু ও লোমশ বস্তু)——আ$_{1}$ (ধরা ও খেলা)

পিটারের খাবার সময় খরগোসকে হাজির করবার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। খাওয়ার আনন্দে খরগোসের ভয়কে জয় করা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল। আলবার্টের বেলায় কিন্তু ঠিক উল্টোটাই ঘটেছিল। তীক্ষ্ণ উচ্চ শব্দের ভয়ে খরগোস নিয়ে তার খেলার আনন্দ নষ্ট হয়েছিল এবং সে ভয় খরগোসের প্রতি বিস্তৃত হয়েছিল। কারণ খেলার আনন্দ থেকে ভয় তার প্রবলতর ছিল। পিটারের ক্ষেত্রে সেটি না ঘটার

বিয়োজনের ব্যাখ্যা

কারণ (খরগোসের) ভয় ও (খাওয়ার) আনন্দের মধ্যে আনন্দটি ছিল অধিক প্রবল। যদি ভয় প্রবলতর হত তবে খাওয়ার আনন্দ তার নষ্ট হত। আরও লক্ষ্য করা দরকার যে খরগোসটি একবারে প্রথমেই পিটারের কাছে নিয়ে আসা হয় নি। ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে ভয়ের সম্মুখীন হওয়াতে ভয়কে জয় করা তার পক্ষে সহজ হয়েছে। একে বলা যেতে পারে—পরিচয় স্থাপনের দ্বারা ভয় জয়। আরেকটি কথা এখানে যোগ করা দরকার। আলবার্টের বয়সে উচ্চ তীক্ষ্ণ শব্দ ও খরগোস—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়নি। দুটোই তার মনে এক হয়ে দেখা দিয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে শিশুরা দুটি ঘটনাকে আলাদা করে দেখতে পারে সে সব ক্ষেত্রে ঐ ধরণের 'যান্ত্রিক সম্বন্ধ' ঘটে না।

উপরোক্ত পন্থাতে সবসময়ে শিশুর অনাকাঙ্ক্ষিত আবেগ, বিশেষতঃ ভয় দূর করা সম্ভব এমন মনে করা চলে না। একটি দৃষ্টান্ত নীচে উল্লেখ করা

নির্জ্ঞান মনের সঙ্গে পরিচয়

হল (১১)। একজন ডাক্তার। কোন সঙ্কীর্ণ জায়গায় থাকতে হলে তিনি অস্বস্তি ও উদ্বেগ বোধ করতেন। সময় সময় অস্পষ্ট উদ্বেগ ভয়ে পরিণত হত। যুদ্ধের সময় তাঁকে সৈনিক হতে হয়েছিল। ঐ সময় তার মানসিক অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হতে লাগল। অনিদ্রা রোগ, মাথাধরা, দুঃস্বপ্ন, তোতলামি—এসব রোগ তাকে পুরোপুরি পেয়ে বসল। বন্ধ জায়গার ভয়ত আছেই। ডাক্তার রিভার্সের তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। নিজের স্বপ্ন তাঁকে লিখে রাখতে বলা হল। স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত শৈশবের স্মৃতি উদ্ধার করবার জন্য রোগী সচেষ্ট হলেন। তাঁর কাছে থেকে উদ্ধার করা গেল যে তাঁর ৪ বছর বয়সের সময় একটা সঙ্কীর্ণ গলির মুখে একটা কুকুর তাঁকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল। গলির আরেকটা মুখ বন্ধ ছিল। সে অবস্থায় তিনি ভয়ানক ভয় পান। ঘটনাটি তারপর বিস্মৃত হন। কিন্তু বন্ধ জায়গায় থাকলেই একটা 'অহেতুক' ভয় তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করত। সমস্ত ঘটনাটি আবেগের সঙ্গে স্মরণ করবার পর তাঁর বন্ধ জায়গার ভয় অনেকাংশে দূর হল। ভয়ের আসল কারণটি যখন নির্জ্ঞানে চলে যায় তখন কেবল মাত্র বস্তুটির সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের দ্বারা ভয়কে জয় করা সম্ভব নয়। নির্জ্ঞান থেকে মূল কারণটিকে উদ্ধার করে সচেতন ভাবে সেই অবস্থাটিকে উপলব্ধি করার তখন দরকার হয়ে পড়ে।

সংযোজিত আচরণের নিয়মটি মূল্যবান। শিক্ষার কিছু অংশ ঐ নিয়মের

সাহায্যে বোঝা সম্ভব। তবে ঐ নিয়মের দ্বারা শিক্ষার সব কিছু আমাদের বোঝা সম্ভব হয়েছে, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই।

উপরোক্ত শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও নিয়মগুলি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। পর পর সে সত্যগুলি আমরা উল্লেখ করছি।

শেখার জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক শিক্ষার্থীর ইচ্ছা বা প্রেরণা। শিক্ষার্থী যদি শিখতে চায় তবেই সে শিখতে পারে। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হলে শিক্ষা অগ্রসর হয় না। ইঁদুর, বিড়াল ও শিম্পাঞ্জী সকলেরই চেষ্টার মূলে ছিল তাদের স্বীয় উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সাধন।

উদ্দেশ্য বা প্রেরণা

শিক্ষালাভের এই যে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য—এগুলির মূল সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেরণায় থাকলেও এরা কিছু পরিমাণে পরিবেশলব্ধ বা অর্জিত বলা চলে। পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে শিশুর প্রাথমিক বা জৈবিক প্রয়োজনগুলি সামাজিক প্রয়োজনের রূপ নেয়। 'আমি অঙ্ক শিখব', 'পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তুলো জন্মায়, কি রকম তুলো জন্মায়, কেন জন্মায়—এসব আমি শিখব' এগুলির কোনটাকেই বিশুদ্ধ জৈবিক প্রেরণা বলা চলে না।

শেখবার জন্য পুনরাবৃত্তির দরকার আছে, অনুশীলনের নিয়মে একথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তি শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। বন্দুক চালনা ও লক্ষ্যভেদ ব্যাপারটি নেওয়া যাক। শিক্ষার্থী বন্দুক চালনায় লক্ষ্য ভেদ করছে কি না কিম্বা লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছোচ্ছে কিনা—শিক্ষার্থী যদি এ কথা জানবার সুযোগ না পায় তবে অনুশীলনের দ্বারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষায় কোন উন্নতি হয় না।

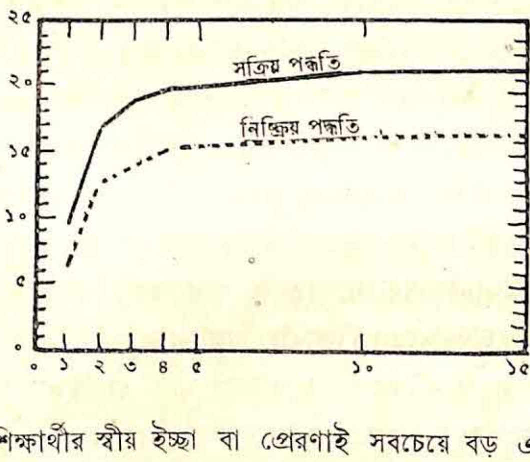
কি শিখতে হবে, শিখছি কি না, কতটুকু শিখছি—এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট, সচেতন ধারণা থাকা দরকার। মুখস্থের ব্যাপারে অভীষ্ট ও লক্ষ্যের গুরুত্ব আমরা স্মরণ অধ্যায়ে দেখেছি।

শিক্ষক শিক্ষিকারা পড়ান, শিশু শোনে। ধরা যাক, পাঠটি চিত্তাকর্ষকরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শিশু মন দিয়ে শুনছে। তবু বলব এজাতীয় শোনায় শিশুর অংশটি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। দেখা গেছে শিক্ষায় শিশু আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পেলে শিক্ষা দ্বারা সে অধিকতর লাভবান হয়।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ

সেনাবাহিনীর নিরক্ষর সৈন্যদের অক্ষর পরিচয় সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানের

দ্বারা উপরোক্ত সত্যটি সমর্থিত হয়েছে। (১২) কতগুলি শব্দ ও প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর, যেমন A for Able প্রভৃতি ফিল্মের পর্দায় দেখান হল। শিক্ষক শব্দ ও অক্ষরগুলি উচ্চারণ করে শোনালেন ; সৈন্যরা দেখল ও শুনল। তারপর সক্রিয় পদ্ধতিতে কতগুলি শব্দ শেখান হল। শিক্ষকের পরিবর্তে অক্ষরগুলি পর্দায় দেখামাত্র সৈন্যরা নিজেরাই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে লাগল। সক্রিয় পদ্ধতিতে সৈন্যদের শেখার পরিমাণ বেশী দেখা গেল। কোন পদ্ধতির দ্বারা সৈন্যরা গড়ে কতটুকু শিখল নীচে লেখে তা দেখানো হল।



শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বীয় ইচ্ছা বা প্রেরণাই সবচেয়ে বড় এ কথা আমরা বলেছি। সক্রিয় শিক্ষাতেই ঐ ইচ্ছা বা প্রেরণা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। সক্রিয় শিক্ষার সুযোগ যাতে শিশু পায়—তাই দেখা দরকার। লেখবার, পড়বার, কাজ করবার জন্য আবশ্যকীয় বস্তু সে যাতে হাতের কাছে পায়—তার ব্যবস্থা করতে হবে। শেখবার পদ্ধতিটি কি হবে সে সম্বন্ধে তাকে বলতে হবে। প্রয়োজন মত শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু শেখবার জন্য সক্রিয় চেষ্টা শিক্ষার্থীকেই করতে হবে।

থর্নডাইকের আবিষ্কৃত নিয়ম থেকে আমরা দেখেছি সুখকর অনুভূতি শিক্ষা কার্যটিকে সহজ ও সুগম করে, পুরস্কার পুরস্কৃতের মনে একটি সুখকর অনুভূতি সৃষ্টি করে। শিক্ষায় পুরস্কারটি কি ? বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যারা প্রথম কয়েকটি স্থান অধিকার করে তারা পুরস্কার লাভ করে। শিক্ষার দিক থেকে এই পুরস্কারের মূল্য মাত্র কয়েকটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—প্রথমতঃ এ কথা বলতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ পুরস্কারের আশা

শিক্ষায় পুরস্কার

ঠিক কতখানি পরীক্ষার্থীদের পাঠে উৎসাহিত করে—এটা একটি প্রশ্ন। দূরবর্তী পুরস্কারের আশার দ্বারা ছোটরা বিশেষ প্রভাবিত হয় না এমন দেখা গেছে। পাঠে উৎসাহ ও উদ্যম জাগ্রত করতে হলে পুরস্কার সময়ের দিক থেকে শিক্ষা প্রচেষ্টার নিকটবর্তী হওয়া আবশ্যক।

পুরস্কারকে আরও ব্যপক অর্থে নিয়ে তাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একজাতীয় পুরস্কার শিক্ষা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। অঙ্ক করে শিক্ষার্থী আনন্দ পায়, সে অঙ্ক করতে পারছে—এতে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই যে আত্মপ্রসাদ ও তৃপ্তি—এটা শিক্ষার অন্তর্নিহিত পুরস্কার। আরেকজাতীয় পুরস্কার বাইরের থেকে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়—সুন্দর একটি রচনা লেখবার জন্য ছাত্রী শিক্ষিকার প্রশংসা পেল।

শিক্ষায় প্রশংসা ও নিন্দাকে কাজে লাগান হয়। শিক্ষাকার্যে প্রশংসা ও নিন্দা কতখানি সহায়তা করে—সে সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানের বিবরণ নীচে দেওয়া হল। একটি শ্রেণীর ছাত্রদের যোগ করতে দেওয়া হয়। তাদের বলা হয়—"অঙ্কগুলি তোমরা যত তাড়াতাড়ি পার কর। কিন্তু অঙ্কগুলি নির্ভুল হওয়া চাই।" পাঁচদিন ধরে পরীক্ষার্থীরা অঙ্ক করল।

শ্রেণীর ছাত্রদের তিনটি সমকক্ষ দলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দলের পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য (যেটুকু সাফল্য তারা লাভ করেছে) অন্যান্য ছেলেদের সামনে প্রশংসা করা হল। দ্বিতীয় দলের পরীক্ষার্থীদের ভুল ত্রুটীর জন্য (যেটুকু তাদের ভুল ত্রুটী হয়েছে) তিরস্কার করা হল। তৃতীয় দল হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ দল। তাদের প্রশংসাও করা হল না, তিরস্কারও করা হল না। নীচের সারণীতে (১) কোন দলের কতটুকু উন্নতি হল তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সারণী ১৪
প্রশংসা বা তিরস্কারের প্রভাব
অঙ্কে গড় নম্বর

	প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন	চতুর্থ দিন	পঞ্চম দিন
"প্রশংসিত"	১১·৮১	১৬·৫৯	১৮·৮৫	১৮·৮১	২০·২২
"তিরস্কৃত"	১১·৮৫	১৬·৫৯	১৪·৩০	১৩·২৬	১৪·১৯
"নিয়ন্ত্রণ" দল	১১·৮১	১২·৩৪	১১.৬৫	১১·৫০	১১·৩৫

অঙ্কে "তিরস্কৃত" দলের প্রথমে কিছুটা উন্নতি হলেও সে উন্নতিকে বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। "প্রশংসিত" দল আগাগোড়াই তাদের উন্নতি বজায় রেখেছে। শিক্ষার প্ররোচক হিসেবে প্রশংসার স্থানটিই সর্বোচ্চ দেখা গেল। প্রশংসার দ্বারা শিক্ষার্থী অনুপ্রাণিত হয়, তার চেষ্টা বাড়ে—এ আমরা দেখলাম। সুস্থ অহমবোধ ও চরিত্রবিকাশেও প্রশংসার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। 'শিশুর বিকাশ' অধ্যায়ে সেটি আলোচনা করেছি।

বিদ্যায়তনে প্রতিযোগিতাকে শিক্ষার প্ররোচক রূপে কাজে লাগান হয়। এর সবটা ফল ভাল নয়। প্রতিযোগিতা কিছু পরিমাণে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। অন্যপক্ষ হয়ত বলবেন মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ ও বিকর্ষণের শক্তি আছে। প্রতিযোগিতা বিরোধ সৃষ্টি করে না, মনের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক বিরোধ তারি মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও কিছুটা সত্য সে বিষয় সন্দেহ নেই। উপরন্তু বলা চলে যে প্রতিযোগিতায় বিরোধকে কল্যাণকর কাজে লাগান হয়। প্রতিযোগিতার প্রেরণায় মানুষ বেশী শেখে, বেশী কাজ করে। সহযোগিতার দ্বারা ঐ কল্যাণটুকু লাভ করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে অনেকে ভাবছেন। প্রকৃতিকে জয় করবার কাজে মানুষের যোধন প্রবৃত্তির শক্তিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায় কিনা এটিও একটি প্রশ্ন। সম্ভবতঃ নয়। তবু অনেকের চোখে ঐটি একটি আদর্শ হয়ে রয়েছে।

শিক্ষায় প্রতিযোগিতার স্থান

কোন্ জাতীয় প্রতিযোগিতায় কতটুকু উন্নতিলাভ করা সম্ভব সে সম্বন্ধে নীচে একটি অনুসন্ধানের ফলাফল উল্লেখ করা হল।

প্রতিযোগিতার ফলে পাঠে কতখানি উন্নতি লাভ করা যায় প্রথম পরীক্ষা দ্বারা তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সামনে কতগুলি কার্ড রাখা হয়। হাতে তাদের কিছু কার্ড থাকে। একটি নিয়ম অনুসারে হাতের কার্ডটি বদলে অন্য একটি কার্ড তাদের নিতে হয়। নির্ভুল-ভাবে কত দ্রুত তারা কার্ড বদলে নিতে পারে—পরীক্ষার দ্বারা সেটাই দেখা হয়।

পরীক্ষার্থীদের তিনটি সমকক্ষ দলে ভাগ করা হল। তিনটি সমকক্ষ দল ছাড়াও শ্রেণীতে আরেকটি দল ছিল। সেটিকে আমরা চতুর্থ দল বলব। প্রারম্ভিক পরীক্ষা দ্বারা তিনটি দলের পঠন ক্ষমতা ও কার্ড বদলাবার ক্ষমতার

পরিমাণটি নিরূপণ করা হল। তারপর প্রথম দলটিকে ঐ দুটি কাজে চতুর্থ দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বলা হল। অর্থাৎ, দলগত প্রতিযোগিতায় প্রথম সমকক্ষ দলটি উদ্বুদ্ধ হল। দ্বিতীয় দলের পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে আরেকটি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আহ্বান করা হল। একে বলা যায় ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্ররোচনা। প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা ছাড়া তৃতীয় দল ঐ কাজদুটি করল।

প্রতিযোগিতার উদ্দীপনায় কোন দলের কি পরিমাণ উন্নতি হল—নীচের সারণীতে (১৪) তা দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১৫

	কার্ড বদলাবার কাজে শতকরা উন্নতির পরিমাণ	পঠনে শতকরা উন্নতির পরিমাণ
দলগত প্রতিযোগিতায়	১০৯·৯	১৪·৫
ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায়	১৫৭·৭	৩৪·৭
নিয়ন্ত্রণ দলের (প্রতিযোগিতাশূন্য)	১০২·২	৮·৭

উপরে যে সারণী দেওয়া হলো তা থেকে দেখা যাচ্ছে—উন্নতিলাভের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রেরণাই সবচেয়ে প্রবল। দলগত প্রতিযোগিতাও শিক্ষায় উন্নতি লাভে কিছু পরিমাণ সহায়তা করে।

শিক্ষার জন্য ইচ্ছা দরকার। শিক্ষার জন্য দেহ মনের ক্ষমতা দরকার। সে ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে শিক্ষার জন্য দেহমনের প্রস্তুতি বলা চলে। শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি শিশু প্রধানতঃ স্বাভাবিক বিকাশের ফলে লাভ করে। 'শিশুর বিকাশ' এবং 'ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি' অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি।

অধ্যায় ১৭

শিক্ষার সঞ্চারণ

গ্রীক দার্শনিকেরা মনকে একটি অবিভাজ্য একীভূত বস্তু বলে মনে করতেন। সে ধারণা ক্রমে কিছু পরিবর্তিত হয়। মনের নানা বিভাগ আছে—এ কথা মেনে নেওয়া হয়। মনকে কতগুলি মানসিক বৃত্তির সমষ্টি মনে করা হয়। স্মৃতি, যুক্তি, প্রত্যক্ষ ইত্যাদি মানসিক বৃত্তির বিভিন্ন দৃষ্টান্ত।

মন এক ও অবিভাজ্য হলে শিক্ষার কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। যেদিক দিয়েই মনকে শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন সমগ্র মনেরই তাতে পরিপুষ্টি ঘটবে। একজন ছবি আঁকুক, গানই শিখুক কিম্বা দর্শন পড়ুক—সবটাতেই তার গোটা মনের উৎকর্ষ সাধিত হবে।

এ ধারণার মধ্যে আতিশয্য আছে। গান শিখে লোকে গায়ক হয়, ছবি আঁকতে গিয়ে আঁকবার ক্ষমতা সে অর্জন করে, দর্শন পড়ে সে দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এটাই প্রধান কথা।

মনকে সেখানে মানসিক বৃত্তির সমষ্টি বলে মনে করা হয়েছে—শিক্ষার ধারণাটা সেখানে নিম্নোক্ত প্রকারের। মনের স্মৃতিবৃত্তির কথা ধরা যাক।

বৃত্তিবাদ ও শিক্ষা

মানুষের স্মৃতিশক্তি যদি একটি বৃত্তি হয় তবে যাই মুখস্থ করা যাক না কেন, মুখস্থ করার শক্তি বাড়বে। কবিতা মুখস্থ করলে কবিতা মুখস্থ করবার শক্তি বাড়বে। সংখ্যা বা অর্থহীন কতগুলি শব্দ মুখস্থ করলেও কবিতা মুখস্থ করবার শক্তি অনুরূপভাবে বাড়বে। যুক্তি-বিচারেরর কথা ধরা যাক। কেউ জ্যামিতির উপপাদ্যই পড়ুক, আর ন্যায় কিম্বা আইনই পড়ুক—এসব পাঠের ফলে যুক্তিবিচারের ক্ষমতা সবদিক দিয়ে বৃদ্ধি পাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের লাটিন কিম্বা সংস্কৃত পড়াবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখান। ভাষা হিসাবে লাটিন বা সংস্কৃত শেখবার দরকার আছে—এটা এক কথা—আর লাটিন বা সংস্কৃত পড়লে মনের যুক্তি

বিচারের দিক, স্মৃতির দিক পুষ্টতা ও দক্ষতা লাভ করবে এইটে অন্য কথা। এই ধরণের ধারণা যারা পোষণ করেন তাদের মতে বিষয় হিসেবে একটি বিষয়ের মূল্য কম বেশী যাই থাক না, মনের এক কিম্বা একাধিক বৃত্তির বিকাশ ও পরি-পুষ্টির জন্য বিষয়টিকে পড়াবার যুক্তি আছে।

এই ধরণের মতবাদকে মনকে সুসংস্কৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার তত্ত্ব বলা হয়। ইংরেজিতে Theory of formal Discipline নামে এ তত্ত্ব পরিচিত। এই মতবাদ যদি সত্য হয় তবে এক বিষয়ে কেউ কোন পারদর্শিতা লাভ করলে, অন্য বিষয়ে সে সামর্থ্য সঞ্চারিত হবে।

মনকে সুসংস্কৃত করার তত্ত্ব

শিক্ষার সঞ্চরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান

এই মতবাদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়েছে। যাদের সাহায্যে অনুসন্ধানটি করা হয়েছে—তাদের দুই দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দলকে বলা হয় এক্সপেরিমেণ্টাল বা পরীক্ষাধীন দল, দ্বিতীয়টিকে নিয়ন্ত্রণ দল। প্রত্যেকটি দলেই বহু পরীক্ষার্থী থাকে। বয়স ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে সমান এমন ভাবে দল দুটিকে গঠন করা হয়। অনুসন্ধানটির আধুনিক ধরণ নিম্নপ্রকারের :

পরীক্ষাধীন দল

(১) ক বিষয়ে সামর্থ্যের প্রারম্ভিক পরীক্ষা

(২) খ বিষয়ে শিক্ষালাভ

(৩) ক বিষয় সামর্থ্যের পুনরায় পরীক্ষা

নিয়ন্ত্রণ দল

(১) ক বিষয়ে সামর্থ্যের প্রারম্ভিক পরীক্ষা

(২) খ বিষয়ে কোন শিক্ষা না দেওয়া

(৩) ক বিষয়ে সামর্থ্যের পুনরায় পরীক্ষা

শেষ পরীক্ষায় নিয়ন্ত্রণ দলের তুলনায় এক্সপেরিমেণ্টাল দল যদি ক বিষয়ে অধিকতর নৈপুণ্য দেখায়—তবে খ বিষয়ে তাদের শিক্ষালাভই তার কারণ এমন মনে করা চলে।

বাঁ হাতে (কিম্বা ডান হাতে) একটি ক্ষমতা অর্জন করলে ডান হাতে

(কিম্বা বাঁ হাতে) সে ক্ষমতা সঞ্চারিত হয় কিনা এ বিষয়ে জানবার জন্য কিছু অনুসন্ধান হয়েছে (১)। একটি বোর্ডকে দ্রুত লঘু আঘাত করা, আয়নাতে প্রতিফলিত একটি অঙ্কন দেখে সেটি আঁকা—এসব ব্যাপারে বাঁ হাত দিয়ে অনুশীলন করে একজন কিছু দক্ষতা অর্জন করল। তারপর ডান হাত দিয়ে ঐ কাজ করতে গেলে সরাসরি বাঁ হাতের দক্ষতা তাতে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে বাঁ হাত ব্যবহারের ফলে ডান হাতে কাজটি শিখতে হয়ত কম সময় লাগে। বিভিন্ন অনুসন্ধানের ফলাফলে কিছু পার্থক্য দেখা গেছে। কোন অনুসন্ধানে বাঁ হাতের নৈপুণ্য অর্জনের ফলে ডান হাতে শেখবার সময় সামান্যই সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কোন অনুসন্ধানে শেখবার সময় প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে।

এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল

কাজটি যদি জটিল ও সূক্ষ্ম ধরণের হয়—তবে অবশ্য সঞ্চারণ কম হয় বা প্রায় হয়ই না।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতা যে প্রকৃতই সঞ্চারিত হয় এ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। ডান হাতই ব্যবহার করি আর বাঁ হাতই ব্যবহার করি—চোখের সহায়তা (বিশেষতঃ অঙ্কন ব্যাপারে) আমাদের দরকার হয়। চোখ দুক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে দক্ষতা আয়ত্তে যেমন চোখ শিক্ষালাভ করছে, ডান হাত দিয়ে শিক্ষালাভেও চোখ তার লব্ধ শিক্ষাকে নিশ্চয়ই কাজে লাগায়।

ডান হাতের শিক্ষালাভের ফলে বাঁ হাতে নৈপুণ্য অর্জন করা যদি সহজতর হয় তবে আমরা বলব, ডান হাতের শিক্ষা দ্বারা বাঁ হাতও লাভবান হয়েছে। একে শিক্ষার পজিটিভ সঞ্চারণ বা কেবল সঞ্চারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু সময় সময় নেগেটিভ সঞ্চারণও ঘটে। ডান হাত দিয়ে আমরা খেতে অভ্যস্ত। বাঁ হাত দিয়ে খেতে গেলে গোড়াতে অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটবে। ডান হাতের অভ্যাস বাঁ হাতের কাজে বাধা জন্মায়। একে বলা যেতে পারে নেগেটিভ সঞ্চারণ।

শিক্ষার সঞ্চারণ—পজিটিভ ও নেগেটিভ

শিক্ষায় সঞ্চারণ ঘটে কিনা এ বিষয়ে বর্তমান যুগে উইলিয়াম জেমস প্রথম অনুসন্ধান করেন। নিজের উপর দিয়ে তিনি অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করেন। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধানে কোন নিয়ন্ত্রণ দল ছিল না।

পরীক্ষাধীন ও নিয়ন্ত্রণ দলের সাহায্য নিয়ে ঐ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান থর্নডাইক করেন (২)। একবছর কাল ধরে লাটিন, গণিত ও ইতিহাস পড়বার

ফলে সঞ্চারণ ঘটে কিনা—এটি নির্ধারণ করা অনুসন্ধানটির উদ্দেশ্য ছিল। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, ঐ সব বিষয় পড়ার ফলে 'নির্বাচন ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা' কতখানি বাড়ে—এটা নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

একদল ছাত্র গণিত, লাটিন ও ইতিহাস পড়েছিল। ঐ শ্রেণীরই আরেক দল ছাত্র ঐ সব বিষয়ের পরিবর্তে ওয়ার্কসপ ও বুককিপিং নিয়েছিল। ঐ বিষয়গুলি পড়বার আগে দুই দলেরই 'নির্বাচন ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা' পরিমাপ করা হল। একবছর কাল বিষয়গুলি পড়বার পরে আবার দু'দলকে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল নির্বাচন ও সম্বন্ধ নির্ণয় করবার ক্ষমতায় তাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। পরবর্তী কালে অনুরূপ বহু অনুসন্ধানের দ্বারা থর্নডাইকের ঐ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি সমর্থিত হয়েছে।

শিক্ষাসঞ্চারণের স্বপক্ষে যুক্তি

জাড্ (৩) বলেন, কোন একটি বিষয় পড়ে, তার সাধারণ সূত্রগুলিকে উদ্ধার করে সচেতন ভাবে যদি সেগুলিকে গ্রহণ করা হয় তবে শিক্ষার সঞ্চারণ ঘটে। জ্যামিতিকে যদি যুক্তিবিচারের দৃষ্টান্তরূপে কেউ পাঠ করে তবে জ্যামিতি পড়ে তার বিচার করবার ক্ষমতা বাড়বে। অন্যান্য বিষয় শিক্ষার বেলায় সে ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। উইন্চ (৪) প্রশ্নের অঙ্ক কষে ছেলেমেয়েদের যুক্তি বিচারের ক্ষমতা বাড়ে এটা লক্ষ্য করেছেন।

এ সম্বন্ধে বার্লোর একটি গবেষণার ফল আমরা উল্লেখ করি। যুক্তিবিচারের অনুশীলন ঈসপের কথামালার নীতি আবিষ্কারে সাহায্য করে কিনা—পরীক্ষা দ্বারা এটি নিরূপণ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরীক্ষাধীন দলকে অন্বয় বিচার, বিশ্লেষণ, আরোহ ও অবরোহ—প্রত্যেকটির চারটি পাঠ দেওয়া হয়। প্রতিপাদ্য থেকে সিদ্ধান্তে কেমন করে পৌঁছান যায়—সে বিষয়ে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা আলোচনা করে বিষয়টি সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা অর্জন করল। নিয়ন্ত্রণ দলকে যুক্তিবিচার অনুশীলনের কোন সুযোগ দেওয়া হল না। পরীক্ষা করে দেখা গেল, কথামালার গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থটি ব্যাখ্যায় নিয়ন্ত্রণ দলের তুলনায় পরীক্ষাধীন দল অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করেছে। অতিরিক্ত ক্ষমতার পরিমাণ প্রায় ৬৪%। অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের (বুদ্ধি অনুযায়ী পরপর সাজালে নীচের ৫০%) তুলনায় উচ্চবুদ্ধিসম্পন্নদের অতিরিক্ত ক্ষমতার পরিমাণ ৩০% বেশী।

শিক্ষার সঞ্চারণের দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে ছুটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে ঃ

শিক্ষাসঞ্চরণে
(ক) বিষয়বস্তুর ঐক্য
(খ) পদ্ধতির ঐক্য

(ক) কোন ছুটি বিষয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি ঐক্য বা অভিন্নতা থাকে তবে শিক্ষার সঞ্চারণ সহজেই ঘটে। ইতিহাস পড়ে ছেলেমেয়েদের ভাষায় দখল বাড়ে। কারণ ইতিহাসের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভাষার স্থান রয়েছে। (খ) ছুটি বিষয় শেখবার পদ্ধতির মধ্যে যেখানে ঐক্য ও অভিন্নতা আছে সেখানেও শিক্ষার সঞ্চারণ ঘটে। একটি বিদেশী ভাষা শেখার পর আরেকটি বিদেশী ভাষা শেখা সাধারণতঃ সহজ। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করবার একটি পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিটি সচেতন ভাবে শিখলে পর আরেকটি ভাষা শেখবার বেলাতেও তাকে প্রয়োগ করা যায়। ব্যাকরণের সাহায্য নেওয়া, অভিধান দেখা—এসব বিদেশী ভাষা শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্গত।

বিষয়গুলির বস্তু বা পদ্ধতির মধ্যে যে ঐক্য আছে সেটি সুস্পষ্ট ও সচেতন ভাবে বুঝতে পারলে সঞ্চারণটি সহজে ঘটে। বিভিন্ন বিষয়ের ঐক্যকে দেখবার ও বোঝবার ফলে শিক্ষার্থী কতগুলি সাধারণ ধারণা লাভ করে। বিভিন্ন অবস্থায় এ সাধারণ ধারণাগুলি কি ভাবে, কতখানি প্রয়োগ করা যায় এ শিক্ষাও তার লাভ করা দরকার। এ জাতীয় শিক্ষার আরেকটি নাম—অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ।

আবেগের ব্যাপারে পাত্রান্তরণ ও সঞ্চারণ হামেশা ঘটে বলে ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন। কোন একটি আদর্শের মধ্যে আবেগের স্থানটি সুস্পষ্ট। তাই দেখা গেছে—শিক্ষার সঞ্চারণে আদর্শ সহায়তা করে। ব্যাপার-টাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি। একটি মেয়ের অঙ্কের খাতা হয়ত পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তার ভূগোলের খাতা মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়। অঙ্কের শিক্ষিকা খাতা অপরিচ্ছন্ন হলে রাগ করেন। মেয়েটি সে কারণে অঙ্কের খাতার বেলাতে সাবধানে কাজ করে। কিন্তু পরিচ্ছন্নতাকে সে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নি। পরিচ্ছন্নতা তার আদর্শ নয়। সে কারণে ভূগোলের খাতায় পরিচ্ছন্নতার কোন পরিচয় নেই।* আরেকটি মেয়ে—

শিক্ষার সঞ্চারণে আদর্শের স্থান

* সময় সময় সে খাতায় নেগেটিভ সঞ্চারণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ভয়ে, নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে অঙ্ক খাতা তার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। মনে মনে তার আক্রোশ জমে। ভুগোলের শিক্ষিকা ভালোমানুষ, কাউকে কিছু বলেন না। সুতরাং তার খাতাটাই যত খুশী সে অপরিচ্ছন্ন করে। সচেতন ভাবে না হলেও অচেতনভাবে এমন ঘটনা বহু বটে।

পরিচ্ছন্নতাকে একটি সুন্দর আদর্শ বলে নিজের মন থেকে গ্রহণ করেছে। তার প্রত্যেকটি খাতা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাঠ ও কাজের সুষ্ঠু পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত নির্দেশ পেলে কিছু পরিমাণ অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষার্থী ক্ষমতা অর্জন করে। ঐ ক্ষমতাকে অন্য বিষয় শিক্ষায় সে কাজে লাগাতে পারে। একটি বিষয়ের সূত্রগুলির সচেতন সামান্যীকরণ শিক্ষার সঞ্চারণের সহায়তা করে। উড্‌ওয়ার্থ ও মার্‌কুইসের ভাষায় (৫)—শিক্ষার সঞ্চারণ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে একটি বিষয়ে অর্জিত ক্ষমতা আপনা থেকেই আরেকটি বিষয়ে সঞ্চারিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে সঞ্চারিত হয় একটি সূত্র, একটি আবেগজনিত মনোভাব, একটি টেক্‌নিক বা পদ্ধতি। বিষয়বস্তুটির স্বরূপ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যদি সুস্পষ্টভাবে সচেতন হয়, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটির জ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব এটা যদি সে বোঝে—তবে বিষয়টির সঞ্চারণের সম্ভাবনা বাড়ে। সঞ্চারণে সক্রিয় ও সচেতন মনোভাব বিশেষ আবশ্যক। বিষয়বস্তু অপেক্ষা পদ্ধতির, জ্ঞাতব্য তথ্য অপেক্ষা আদর্শের সক্রিয় সঞ্চারণ অধিক ঘটে। (৬)

অধ্যায় ১৮

মানসিক কাজ ও ক্লান্তি

মন নিরন্তর কাজ করে চলেছে। জাগ্রত অবস্থায়, এমনকি ঘুমের সময়ও। ঘুমিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন মনেরই একজাতীয় কাজ। মানসিক কাজ তিন প্রকারের এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জ্ঞান, ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতি।

মনকে যখন আমরা ছেড়ে দিই, নানা রকম চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা, অনুভূতি ও আবেগ আপনা থেকেই মনে উদয় হয়। এটাকে মনের স্বতঃস্ফূর্ত কাজ বলা চলে। দৃষ্টান্ত হিসাব বলা যেতে পারে—ইজিচেয়ারে বসে আছি, সামনের নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে। একটার পর একটা চিন্তা মনের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কখনও ভাল লাগছে, কখনও মন্দ। মনকে আবার কোন একটি পথে, সময় সময় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করা যায়। এই অধ্যায়টি লেখবার সময় একটি পথ ও একটি লক্ষ্যকে স্থির রেখেই মন কাজ করে চলেছে। একে স্বৈচ্ছিক মানসিক কাজ বলা হয়। এ জাতীয় কাজে চেষ্টার দিকটি স্পষ্ট। একটার পর একটা চিন্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনকে আশ্রয় করতে চায়। সেই সকল চিন্তাকে রোধ করে বিশেষ একটি চিন্তাস্রোতকে অনুসরণ করতে হলে মনকে প্রবল ভাবে সক্রিয় হতে হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক কাজ

স্বৈচ্ছিক মানসিক কাজ

স্বৈচ্ছিক মানসিক কাজে আমরা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বা বস্তুতে মনকে নিবদ্ধ করি বা মনোযোগ দিই। স্বৈচ্ছিক মনোযোগ স্বৈচ্ছিক মানসিক কাজের প্রধানতম দিক।

জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত কাজ আমাদের করতে হয়, শিল্পকলা বিজ্ঞান সব কিছুতেই স্বৈচ্ছিক মনোযোগের দরকার। লেখাপড়া শিখতে হলে

অনেকখানি স্বৈচ্ছিক মনোযোগ দিতে হয়। ছেলেমেয়েদের পড়তে হয়, লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে হয়। তা নইলে লেখাপড়া আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু একটানা কতটা সময় তারা পড়তে পারে? কতটা পড়লে তাদের মানসিক ক্লান্তি আসে? এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পেলেই তদনুযায়ী পড়বার সময়-তালিকা তৈরি করা সম্ভব।

মানসিক ক্লান্তি সম্বন্ধে আজও আমরা সবকিছু জানি না। যেটুকু জানা গেছে নীচে তা লিপিবদ্ধ করা হল।

মানসিক ক্লান্তি কি বুঝতে হলে দৈহিক ক্লান্তির স্বরূপ আগে বোঝা দরকার।

দৈহিক ক্লান্তি

দৈহিক কাজে মাংসপেশীর সঞ্চালন হয়। কিছুক্ষণ একটানা কাজ করবার পর ক্লান্তি বোধ হয়, আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না। তবুও কাজ করতে হলে কাজে দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে এমন দেখা যায়। দীর্ঘ দৌড়ের দৃষ্টান্ত নিলেই উপরোক্ত সত্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। কিছুক্ষণ দ্রুত দৌড়বার পর আমরা ক্লান্ত বোধ করি। শরীর বিশ্রাম চায়। চেষ্টা করেও প্রথম দিককার গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

দৈহিক ক্লান্তির ব্যাপারেদুটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, ব্যক্তির ক্লান্তিবোধ। এটি হচ্ছে ব্যক্তির দিক থেকে অর্থাৎ ব্যক্তিমুখী বিচারে ক্লান্তির চিহ্ন। ক্লান্তির আর একটি চিহ্ন হচ্ছে কর্মে দক্ষতা হ্রাস। এটিকে বিষয়-মুখী বিচারে ক্লান্তির চিহ্ন বলা যেতে পারে।

দৈহিক বা মাংসপেশীর এই যে ক্লান্তি এর কারণ কি? মাংসপেশীতে দাহিকা-শক্তি সঞ্চিত থাকে। কাজ কর্মের জন্য ঐ দাহিকা শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন হয়। একটানা কাজের ফলে দাহিকা শক্তির স্বল্পতা ঘটলে ক্লান্তি আসে। ক্লান্তির আরেকটি কারণ আছে। পেশী সঞ্চালনের ফলে প্রধানতঃ ল্যাক্‌টিক এ্যাসিড নামক একপ্রকার দূষিত পদার্থ দেহে সঞ্চিত হয়। ঐ দূষিত পদার্থ স্নায়ুসন্ধিগুলির উপর কাজ করে দৈহিক কর্মক্ষমতা হ্রাস করে।

দৈহিক ক্লান্তির কারণ

বিশ্রাম ও নিদ্রার দ্বারা দাহিকা শক্তির পরিপূরণ ও পুনর্সঞ্চার হয় ও দূষিত পদার্থের নিষ্কাশন ঘটে। দৈহিক কর্মদক্ষতা পুনরুদ্ধারে নিদ্রা বিশেষ মূল্যবান। আহার, বিশেষতঃ চিনি ও শর্করা জাতীয় খাদ্যগ্রহণ শরীরের দাহিকা-শক্তি বৃদ্ধি ক'রে ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

সাধারণতঃ মানুষের কর্মে দেহ ও মন উভয়কেই কাজ করতে হয়। কেবলমাত্র দৈহিক কাজ কিম্বা কেবল মানসিক কাজ আছে বলে মনে করা কঠিন। তবে কোন কোন কাজে মনঃসংযোগটাই প্রধান, আর কোন কাজে দৈহিক শ্রমটাই বড়। এই অর্থেই লেখাপড়া মানসিক কাজ ও ফুটবল খেলা দৈহিক কর্ম।

কর্ম দেহ ও মন উভয়েরই কাজ

একটি ছেলে একটি বই পড়ছে। টেবিলের উপর বইখানা আছে। সোজা হয়ে বসে ঘাড়টি একটু কাৎ করে ছেলেটিকে বইটি পড়তে হচ্ছে। তাকে মেরু-দণ্ড খাড়া রাখতে হচ্ছে। পড়ার জন্য চোখ ও রেটিনার সূক্ষ্ম পেশী ব্যবহার করতে হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ একটানা পড়বার পর তার কিছু দৈহিক অস্বস্তি হয়। পিঠের শিরদাঁড়াটা হয়ত টনটন করে, চোখটা ভারী বোধ হয়। এগুলি প্রধানতঃ দৈহিক পেশীর ক্লান্তি। অনেকটা সময় মনঃসংযোগ করবার দরুণ মানসিক ক্লান্তি ঘটে কিনা এটাই প্রশ্ন। পড়ছে তবুও তেমন আর বুঝতে পারছে না, অঙ্ক করছে কিন্তু ক্রমশই অঙ্কে বেশী ভুল হয়ে যাচ্ছে—এমন জাতীয় ব্যাপার ঘটলে আমরা বলতে পারি তার মানসিক কাজের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

মানসিক ক্লান্তি ঘটে কি না ?

ক্রেপলিনের গুণ পরীক্ষা দ্বারা মানসিক কর্মে ক্ষমতা হ্রাস হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। নীচে কয়েকটি সংখ্যা পর পর সাজান হল।

৭	পরীক্ষার্থী মনে মনে ৭কে ২ দিয়ে গুণ করবে।
২	উত্তর—১৪। ১৪'র ৪কে পরবর্তী সংখ্যা ৯ দিয়ে গুণ
৯	করে পাওয়া গেল ৩৬। ৩৬'র ৬কে আবার গুণ
৭ (২)	করা হল ৭ দিয়ে। পাওয়া গেল ৪২। এর ২কে
৩	ব্র্যাকেটে পরীক্ষার্থী লিখবে। ২ আবার সারির
৮	দ্বিতীয় সংখ্যা। ২কে পুনরায় ৯ দিয়ে গুণ
৭	করা হল। পূর্ব পদ্ধতিতে সে পর পর গুণ
৯	করে চলে।

পরীক্ষার্থীর মানসিক ক্লান্তি কখন ঘটে তা বোঝবার জন্য বইয়ের পাতায় কোন একটি অক্ষর (যেমন 'ক') কতবার আছে তাকে খুঁজে বার করতে বলা

যেতে পারে। সাধারণতঃ ঐ অক্ষরটি পরীক্ষার্থী দেখা মাত্র তার তলায় দাগ দেবে। একটানা এ জাতীয় কাজ অনেকক্ষণ ধরে করবার পর ভুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাজের গতি যদিও তেমন হ্রাস পায় না। শ্রুতিলেখন পরীক্ষা একেবারে বিকালে ছুটির সময় নিলে গোড়ার দিকের তুলনায় ভুলের পরিমাণ ৩০% বেড়ে যায় এমন দেখা গেছে বলে ভ্যালেণ্টাইন (১) উল্লেখ করেছেন। যদি পরীক্ষার ছেলেমেয়েদের আগ্রহ বিশেষভাবে জাগ্রত হয় তবে ভুলের পরিমাণ হ্রাস পায়—এও দেখা গেছে। প্রশংসা, পুরস্কার, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রেরণার সাহায্যে আগ্রহকে বাড়ান সম্ভব। ভুলের পরিমাণও তাতে কমে।

কাজে ভুলের পরিমাণ বৃদ্ধি

মানসিক ক্লান্তি ঘটছে কিনা তার একটি ব্যক্তিমুখী বিচার আমরা সময় সময় করি। 'অনেকক্ষণ ধরে পড়ছি। আর পারছি না। এবারে একটু খেলা করি'—এমন ধরণের কথা ছেলেমেয়েদের মুখে মাঝে মাঝে শোনা যায়। এই 'পারছি না'র অর্থ বেশীর ভাগ সময়েই 'আর ইচ্ছে করছে না'। মানসিক ক্লান্তিবোধ এ সব ক্ষেত্রে আগ্রহের অভাব, ইচ্ছার অভাব।

ইচ্ছা ও আগ্রহ মানসিক শক্তির স্বরূপ

আগ্রহকে কাজ করবার উদ্যম বা মানসিক শক্তি বলা যেতে পারে। আগ্রহের উৎস জীবের সহজ প্রবৃত্তি ও অর্জিত ভাবগ্রন্থিচয়। চূড়ান্ত বিচারে, ভাবগ্রন্থিগুলির শক্তিও সহজ প্রবৃত্তিগুলির কাছ থেকে আসছে। মানুষের কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তি ও পরিবেশের প্রভাবে গঠিত বিভিন্ন ভাবগ্রন্থি আছে। প্রত্যেকটি সহজ প্রবৃত্তি একটি বিশেষ ধরণের ও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্যম বা মানসিক শক্তির ধারক। ঐ বিশেষ ধরণটিকে প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশের প্যাটার্ণ বলা যেতে পারে। ঐ শক্তি একটি সম্ভাবনা রূপে বিরাজ করে। প্রবৃত্তিটি জাগরিত হলে সেই শক্তি-সম্ভাবনার একটি অংশ সক্রিয় শক্তি বা উদ্যম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাজের মধ্য দিয়ে সেই জাগ্রত বা সক্রিয় শক্তি ব্যয় হয়।

মানসিক ক্লান্তির ব্যক্তিমুখী চিহ্ন

মানসিক কাজ করতে হলে মনকে দুই ভাবে সক্রিয় হতে হয়ঃ ১। একটি ব্যাপারে মনোনিবেশ করা ২। যে সব ইচ্ছা এবং চিন্তা অবিরত সচেতন মনকে অধিকার করতে চেষ্টা করেছ তাদের ঠেকিয়ে রাখা অর্থাৎ মনকে অন্যমনস্ক হতে না

স্বেচ্ছিক মানসিক কাজে সক্রিয়তার দুটি দিক

দেওয়া। এ সব অপ্রাসঙ্গিক ইচ্ছা ও চিন্তাকে মনোনিবেশের বাধা বলা যেতে পারে। এ ছাড়া মানসিক বাধার আরেকটি দিক আছে। মানসিক কর্মে দেহ একটি অংশ গ্রহণ করে। দেহ যখন ক্লান্ত হয় মানসিক কাজ করা তখন কঠিন হয়ে উঠে। মানসিক কর্মশক্তির উপর ল্যাকটিক এ্যাসিড প্রভৃতি দূষিত পদার্থেরও কিছু প্রভাব রয়েছে মনে করা যেতে পারে।

ম্যাকডুগালের মত: মানসিক ক্লান্তির কারণ

ম্যাকডুগালের মতে স্নায়ুতন্ত্রে সক্রিয় শক্তি বা উদ্যমের পরিমাণ এবং মানসিক বাধার পরিমাণ—এই দুইয়ের সম্বন্ধের দ্বারাই মানসিক ক্লান্তির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। সূত্রে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়—

$$\text{মানসিক ক্লান্তির পরিমাণ} = \frac{\text{মানসিক বাধার পরিমাণ}}{\text{সক্রিয় শক্তি বা উদ্যমের পরিমাণ}}$$

সক্রিয় শক্তির তুলনায় বাধা বেশী হলে মানসিক ক্লান্তি ঘটে। মানসিক শ্রমের দ্বারা যেটুকু আগ্রহ বা মানসিক শক্তি জাগ্রত হয়েছিল তা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হয়। অন্যান্য যে সব ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে অথচ পাচ্ছে না—সেগুলি মানসিক কর্মের বাধা রূপে কাজ করে। অপরিতৃপ্তির ফলে কিছু কিছু ইচ্ছার শক্তি বাড়ে; ফলে বাধারও শক্তি বৃদ্ধি হয়। বিষয়টিকে আরেকটু তলিয়ে দেখা চলে। অপ্রাসঙ্গিক ইচ্ছাগুলি ঠেকিয়ে রাখবার জন্যও মনকে শক্তি ব্যয় করতে হয়। প্রবল অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা মনকে ক্লান্ত করে। তার কারণ প্রবল অপরিতৃপ্ত ইচ্ছাকে রোধ করতে অনেকখানি মানসিক শক্তি ব্যয় করার প্রয়োজন হয়। যে সকল চরিত্রে দ্বিমুখী ইচ্ছার সমাবেশ অধিক, অন্তর্দ্বন্দ্বে যারা বেশী ভোগেন—মানসিক শ্রমে তারা দ্রুত ক্লান্ত বোধ করেন। একটি কাজ অনেকক্ষণ ধরে তাদের পক্ষে করা কঠিন। অন্যান্য ইচ্ছার দাবী ও শক্তিকে অস্বীকার করে বেশীক্ষণ এক কাজে তারা লেগে থাকতে পারেন না।

মিথ্যা ক্লান্তি

সময় সময় দেখা যায় কোন একটি বিষয়ে শিশুর আগ্রহকে বিশেষ জাগ্রত করা যায় না। যে উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে শিশু পড়তে বসে তার পরিমাণ সামান্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশুর পড়তে অনিচ্ছা দেখা যায়—ক্লান্ত ভাব, ইচ্ছার অভাব দেখা দেয়। একে ইংরেজীতে

boredom বলা হয়। অনেক সময় একে 'মিথ্যা ক্লান্তি' বলা হয়। বাধাটা এক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠে নি—কিন্তু কাজে আগ্রহের পরিমাণ অল্প।

আগ্রহকে নানা ভাবে উদ্দীপ্ত করা সম্ভব। আগ্রহ বা উদ্যমের পরিমাণ বাড়লে 'ঐ ক্লান্ত ভাবটি' দূর হয়। স্মরণ রাখা আবশ্যক, অমনক্ষেত্রে শক্তি সম্ভাবনার একটি ছোট অংশ সক্রিয় হয়েছিল। শক্তি সম্ভাবনার বড় অংশটি অচেতন ও নিষ্ক্রিয় রূপে ছিল।

কোন একটি কাজে একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবগ্রন্থি থেকে উদ্যম উৎসারিত হয়। পড়ার কথাই ধরা যাক। জানবার ইচ্ছা বা কৌতূহলের প্রেরণায় ছেলে-মেয়েরা কিছুটা পড়ে। কিন্তু বড় হব (আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা), না পড়লে বাবা মা বকবেন (ভয়), পড়লে বাবা মা ভালোবাসবেন (ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা) সকলের প্রশংসা পাব—ইত্যাদি বহু প্রেরণার শক্তি পড়বার মূলে রয়েছে। সুকৌশলে বিভিন্ন প্রবৃত্তির শক্তিকে যদি লেখাপড়ার কাজে সক্রিয় ও সংহত করা যায়, তবে আগ্রহের অভাব ঘটবে না—শিশু সহজে ক্লান্ত বোধ করবে না।

একটি কাজে শিশু ক্লান্তি বোধ করতে পারে। সে কাজের জন্য যে বিশেষ ধরণের সক্রিয় মানসিক শক্তির প্রয়োজন—কর্মের মধ্য দিয়ে হয়ত তার অধিকাংশই ব্যয় হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য ধরণের সক্রিয় মানসিক শক্তির সে কারণে অভাব ঘটে নি। অন্য কোন কর্মের মধ্য দিয়ে সেই সব আগ্রহ ও উদ্যম নিজেদের চরিতার্থ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। যে কাজটি শিশু করছিল—তাতে অনিচ্ছা ও অন্যমনস্কতার কারণ অনেকসময় অন্যধরণের আগ্রহের আকর্ষণ। সবরকম মানসিক কাজেই অক্ষমতা ও অনিচ্ছা—এমন সচরাচর ঘটে না।

ভ্যালেণ্টাইনের (৩) কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করি: আগ্রহ হচ্ছে কাজ করবার প্রেরণা অথবা একজাতীয় শক্তির উৎস। আগ্রহ যতক্ষণ রয়েছে, মানসিক কাজের ফলে ক্লান্তি ততক্ষণ সামান্যই ঘটে। সে সময় যে ক্লান্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তা সাধারণতঃ দৈহিক ক্লান্তি। অত্যধিক মানসিক কাজের ফলে মানসিক পীড়া ঘটেছে—এমন কথা আজকাল মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। আবেগজীবনে অন্তর্দ্বন্দ্বই সাধারণতঃ মানসিক রোগের কারণ। অবশ্য একথা ঠিক যে কঠিন মানসিক পরিশ্রম (যেমন লেখাপড়া) করতে গিয়ে কেউ যদি প্রয়োজনানুযায়ী না ঘুমোয়, শরীরের প্রতি অবহেলা করে, সময়মত না খায়—তবে সে অসুস্থ হবে।

অধ্যায় ১৯

নতুন শিক্ষা

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন পদ্ধতি কিছুকাল যাবত প্রবর্তিত হয়েছে। একে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি বলা হয়। প্রাথমিক স্তরে এ শিক্ষাপদ্ধতি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ই শেষ পর্যন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে, এটাই সরকারের পরিকল্পনা। কিছু কিছু মাধ্যমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে পুরানো শিক্ষাধারা ও বুনিয়াদী শিক্ষাধারা দুইই পাশাপাশি চলবে—এখন পর্যন্ত তাই আমরা মনে করছি।

বুনিয়াদী ও পুরানো শিক্ষাপদ্ধতি

পুরাণো শিক্ষাধারাকে অনেকসময় পুস্তককেন্দ্রিক বলা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষাতেও পুস্তকের একটি বড় স্থান আছে। তবে পুরাণো শিক্ষাধারাকে পুস্তক-কেন্দ্রিক বলবার কারণ কি? উত্তরে বলা যেতে পারে পুরাণো শিক্ষাতে ছেলেমেয়েদের বই ধরে পড়ান হয়। ১৫৬ পাতা শেষ হলে তারা পড়ে ১৫৭ পাতা। দ্বিতীয় পাঠের পর তৃতীয় পাঠ। বুনিয়াদী শিক্ষায় কোন একটি হাতের কাজ, বাস্তব জীবনের কোন ঘটনা নিয়ে আরম্ভ করা হয়। সে কাজটি করতে গেলে, সে ঘটনাটি জানতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তখন ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষক শিক্ষিকার সাহায্যে বই এবং অন্যান্য উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করে। এই কারণেই বলা হয়, বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা।

হাতের কাজের প্রতি শিশুদের স্বাভাবিক অনুরাগ আছে।* যে পরিবেশে শিশু বাস করে—সে পরিবেশ শিশুর কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে, তার জ্ঞানস্পৃহাকে জাগ্রত করে।** 'এটা কি? ওটা কি? এটা কেন? ওটা কেন?' শিশুর

* ৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

** ৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মুখে সর্বদা শোনা যায়। পরিবেশ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও হাতের কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ থেকে শিক্ষা সুরু হলে সে শিক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী হবে—আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এমন মনে করেন।

পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ কম। জীবন সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা তাদের মনে জাগে তার বেশীর ভাগের উত্তরই তারা বই থেকে পায় না। তারা বই পড়ে। কিন্তু বইতে যা লেখা আছে, যে সংবাদ দেওয়া আছে—সে সম্বন্ধে তখনও তাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগে নি।

শিশুর জিজ্ঞাসার উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার চেষ্টা করে। এই দিক দিয়ে প্রচলিত শিক্ষার তুলনায় বুনিয়াদী শিক্ষা উন্নত। শেখবার ও জানবার আগ্রহ ও উৎসাহ বুনিয়াদী শিক্ষায় অধিক জাগ্রত হয়—এটা দেখা গেছে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুরা একটি বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ জ্ঞান পায় না এমন একটি অভিযোগ আছে। জ্ঞানে একটি ধারাবাহিকতা আছে। যোগ বিয়োগের পর গুণ, তারপর ভাগ—এভাবেই অঙ্ক শিখতে হয়। জ্ঞানের একটি সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতার দিকও আছে। অনেক অপরিহার্য অংশ মিলেই জ্ঞানের সে সমগ্র রূপটি গড়ে ওঠে।

আমরা বলব যে জ্ঞানে ধারাবাহিকতা ও সম্পূর্ণতা কিছুটা বাস্তব, কিছুটা আমাদের আরোপিত। লেখা, পড়া ও অঙ্কে কিছু নৈপুণ্য আছে যেগুলিকে সিঁড়ির ধাপের মতন বলা চলে। একটি অতিক্রম করেই অপরটিতে পৌছানো সম্ভব। একটি বিষয়ের কতগুলি অপরিহার্য অংশ আছে—যা না জানলে বিষয়টির জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু কোন একটি বিষয়ের জ্ঞানের অনেক অংশ আছে যা ধারাবাহিকভাবে না শিখলে বিশেষ আসে যায় না। শিক্ষার একটি স্তরে বিষয়ের সব অংশকে সমভাবে অপরিহার্য না মনে করলেও চলে। ইতিহাসে হিন্দু যুগ না পড়ে মোগল যুগ পড়া যেতে পারে। ছেলেমেয়েরা অনেকসময় অমন পড়েও। ভূগোলের কোন কোন পাঠক্রমে আফ্রিকা আছে, কোন কোন পাঠক্রমে আফ্রিকা নেই।

বুনিয়াদী শিক্ষায় দরকার মত ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়া সময় সময় কঠিন হয়। সে কারণে জ্ঞানের ফাঁকগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার কথা অনেকে বলেন।

শিক্ষাদানে কোন্ পদ্ধতির সক্ষমতা কতখানি—অনুসন্ধানের দ্বারা জানবার কিছু

চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক হোটর মর্যাদা বিদ্যালয় ও হাব্‌রা হাই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ১৯৫৩ সালে একটি অনুসন্ধান করেন। ঐ অনুসন্ধানে অবর পরিদর্শকেরা তাকে সাহায্য করেছিলেন। হোটর মর্যাদা বিদ্যালয় একটি বুনিয়াদী স্কুল। হাব্‌রা স্কুলে প্রচলিত ধারায় শিক্ষাদান করা হয়। বয়স ও বুদ্ধিপরীক্ষার ভিত্তিতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের দুটি সমকক্ষ দলে ভাগ করা হয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরীক্ষাটি হয়েছিল। হাব্‌রা স্কুলের ছেলেদের সংখ্যা—২৭, হোটর বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল ২৩। দুই দিন ধরে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করা হয়। ৭০টি ছোটছোট অঙ্ক তাদের কষতে দেওয়া হয়। বাংলায় শব্দসম্পদ, বাক্যপূরণ, বানান, হাতের লেখা ও রচনা পরীক্ষা করা হয়। বাংলা ও অঙ্ক দুই বিষয়েই হোটরের ছেলেমেয়েদের গড় সাফল্যের পরিমাণ হাব্‌রার ছেলে-মেয়েদের গড় সাফল্যের চেয়ে উল্লেখযোগ্যরূপে বেশী দেখা গেল। ঐ পরীক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আমরা অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে সমান করতে পারিনি। সেটি হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষাদানে যত্ন ও নিষ্ঠা। সে বিষয়ে পরিমাপের কোন চেষ্টা আমরা করি নি। তবে আচরণ ও মনোভাব থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে হোটরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের যত্ন ও নিষ্ঠা বেশী ছিল।

একটি অনুসন্ধান

কর্মকেন্দ্রিক স্কুল ও পুরাণো স্কুলের শিক্ষার ফলাফল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ও গ্রেটবৃটেনে কিছু কাজ হয়েছে। সে সম্বন্ধে নীচে কিছু উল্লেখ করা হল।

কর্মকেন্দ্রিক স্কুল : প্রজেক্ট পদ্ধতি ও বুনিয়াদী শিক্ষা

কর্মকেন্দ্রিক স্কুলে সাধারণতঃ প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শেখানো হয়। এ ধরণের স্কুলের সঙ্গে বুনিয়াদী স্কুলের কিছু পার্থক্য আছে। কর্মকেন্দ্রিক স্কুলে বিষয় বা কর্ম নির্বাচনে শিশুদের স্বাধীনতা বেশী, বুনিয়াদী স্কুলে বিষয় বা কর্ম নির্বাচন প্রধানতঃ শিক্ষকশিক্ষিকারাই করেন। কর্মকেন্দ্রিক স্কুলে কোন একটি উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় সাধনের জন্য ছেলেমেয়েরা কাজ করে, জ্ঞান আহরণ করে। বুনিয়াদী স্কুলে কর্ম ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যটি ছেলেমেয়েদের কাছে সবসময়ে তত স্পষ্ট নয়। সুতাকাটা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিই। বুনিয়াদী স্কুলে ছেলেমেয়েরা চরকায় সুতা কাটে। সুতা দিয়ে কাপড় হয় এ তারা জানে। কিন্তু নিজেদের কোন একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা সবসময়ে সুতা কাটে এ কথা বলা যায় না। প্রজেক্ট পদ্ধতির কথা বলি। স্বাধীনতা দিবস আসছে।

ছেলেমেয়েরা স্থির করলো এবারে নিজেরা সূতা কেটে, তাঁত বুনে তারা একখানি জাতীয় পতাকা বানাবে। ১৫ই আগষ্ট সে পতাকাটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উত্তোলিত হবে। এখানে সূতাকাটা একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত। উদ্দেশ্য প্রজেক্ট পদ্ধতির মূল কথা—যে উদ্দেশ্যকে ছেলেমেয়েরা নিজেদের উদ্দেশ্য বলে মনে করে। প্রজেক্টের প্রেরণায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। তবে সব সময়ে তা করা হয় না—এ কথাই আমরা বলছি।

প্রজেক্ট পদ্ধতি ও পুরাণো পদ্ধতির তুলনা

প্রজেক্ট পদ্ধতি ও পুরাণো প্রচলিত পদ্ধতির ফলাফল তুলনার জন্য মিসৌরির তিনটি গ্রাম্যস্কুলকে নেওয়া হয় (১)। একটি পরীক্ষাধীন স্কুল—সেটার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪১। অপর দুটি নিয়ন্ত্রণ স্কুল—ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা একটির ২৯ ও অপরটির ৩১। পরীক্ষাধীন স্কুলের ছেলেমেয়েরা প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে। প্রজেক্টগুলিকে চারটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়ঃ ১। খেলা, যূথনৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি ২। পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ ৩। গল্প ও গান শোনা, ছবি দেখা প্রভৃতি ৪। গঠনমূলক হাতের কাজ। যেমন খরগোস ধরবার জন্য ফাঁদ বানানো, বাগানের কাজ প্রভৃতি।

বাস্তবজীবন থেকেই এসব প্রজেক্ট উদ্ভাবন করা হত। মিঃ স্মিথের বাড়ীতে প্রায়ই টাইফয়েড হয়। ছেলেমেয়েরা স্থির করলো—শিক্ষকের নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হবে। মিঃ স্মিথের বাড়ীতে তারা গেল, নানা রকম প্রাসঙ্গিক খবর সংগ্রহ করলো। সে নিয়ে বিবরণী তৈরি হল। টাইফয়েড নিবারণের জন্য তারা সব মাছি মারতে বদ্ধপরিকর হল। মাছি মারবার কল বানান হল, জানালায় পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করা হল। টাইফয়েড সম্বন্ধে তারা অনেক বই পড়লো। মাছি মারার কল ও জানালার পর্দা তৈরি করা ব্যাপারে কি খরচ পড়বে সে সম্বন্ধে তাদের হিসাব করতে হল। ফলে অঙ্ক শেখার প্রয়োজন তারা অনুভব করলো। হাতের কাজ করবার সুযোগ তাদের হল। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান তারা লাভ করলো।

নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষাধীন উভয় দলকে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করবার পূর্বে একবার পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন তারা শেখবার পর আবার তাদের পরীক্ষা করা হোল। পরীক্ষার বিষয় ছিল—হাতের লেখা, রচনা, বানান, আমেরিকান ইতিহাস, ভূগোল, পঠন ও অঙ্ক। দেখা গেল পরীক্ষাধীন দল

নিয়ন্ত্রণ দল অপেক্ষা ১৩৮·১% পরিমাণে বেশী শিখেছে। স্কুলে উপস্থিতি, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা ব্যাপারে পরীক্ষাধীন দলের ছেলেদের বেশী ভালো দেখা গেল। পরীক্ষাধীন ছেলেদের ৮০% অষ্টম গ্রেডের পরীক্ষা পাশ করেছিল, নিয়ন্ত্রণ দলের মাত্র ১০%।

কাজের মধ্য দিয়ে দশমিক শেখবার ব্যবস্থা করে একটি স্কুলে কি জাতীয় ফল পাওয়া গিয়েছিল সে সম্বন্ধে হারাপ্ ও মেপ্স্ (২) বর্ণনা করেছেন। এক বছর ধরে ছেলেমেয়েরা কাজ করে। কাজের মধ্যে ছিল স্কুলে ব্যাঙ্কের কাজ, টুথ পাউডার তৈরি করা, আসবাবপত্রে পালিশ বানানো, মায়ের জন্য উপহার তৈরি করা, বানানের তালিকা প্রস্তুত করা ও বাগানের কাজ করা।

এই এক্সপেরিমেণ্ট থেকে দেখা গেল দশমিক শেখাতে পরীক্ষাধীন দলের সাফল্যের পরিমাণ ৯৬% আর নিয়ন্ত্রণ দলের ৬৭%। একবছর পর আবার তাদের পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেল—পরীক্ষাধীন দলের বিষয়টিতে জ্ঞানের পরিমাণ গত বছরের চেয়েও বেশী। তারা যা শিখেছিল—তা তাদের মনে আছে। তার চেয়েও বেশী কিছু তারা শিখেছে। বাস্তব জীবন থেকে যা আমরা শিখি—তার অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের কাছে অনেক বেশী। শেখাতে আগ্রহও বেশী থাকে, ভুলিও আমরা কম। মুখস্থ বিদ্যার তাৎপর্য সামান্যই আমরা বুঝি, তাই ভুলতেও সময় লাগে না।*

দু একটি অনুসন্ধানে কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উৎকর্ষতা প্রমাণিত হয় নি। (৩) দু জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের তুলনামূলক পরিমাপ করা হয়। ২A গ্রেডে প্রকৃতি পাঠ, ৪A গ্রেডে অঙ্ক ও ৮A গ্রেডে ভূগোল শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানটি করা হয়েছিল। নয়াশিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাধারাটি ছাত্রছাত্রীরা পরিচালনা করেছিল, বিষয়গুলির শিক্ষায় অনুশীলন, আবৃত্তি ও পুনরালোচনার স্থান ছিল না, শিক্ষক পরামর্শদাতারূপে উপস্থিত ছিলেন। দেখা গেল, নয়া পদ্ধতির তুলনায় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ছেলেমেয়েরা দ্বিগুণ এমন কি তিনগুণ পর্যন্ত বেশী শিখেছে। তবে এটা লক্ষ্য করা গেল যে নয়াপদ্ধতিতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহ বেশী ছিল, তারা পড়েছিল বেশী এবং নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে তারা বেশী কাজে লাগিয়েছিল।

---

* ১৪ অধ্যায়ে ২৩৪ পাত দ্রষ্টব্য। অর্থপূর্ণ বস্তু থেকে অর্থহীন বস্তু লোকে অনেক তাড়াতাড়ি ভোলে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে নয়া পদ্ধতিতে অনুশীলন, আবৃত্তি ও পুনরালোচনাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ নূতন পদ্ধতির তুলনায় পুরাণো পদ্ধতির ফলাফলে উৎকর্ষতার এটাই প্রধান কারণ। নূতন পদ্ধতিতে অনুশীলন ও পুনরালোচনাকে বাদ দেওয়া উচিত হয় নি। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে অনুশীলন ও পুনরালোচনার স্থান রয়েছে। নয়া পদ্ধতিতে কার্জ করতে গিয়ে অসুবিধা হওয়ার ফলে অনুশীলনের প্রয়োজন ছেলেমেয়েরা বোঝে। সেটা বোঝবার পর অনুশীলন ও পুনরালোচনার দ্বারা বিষয়াংশটি তারা আয়ত্ত করে। একে বলে ঠেকে শেখা। পুরাণো পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছেলেমেয়েদের ঠেকে শেখবার জন্য অপেক্ষা করেন না। প্রয়োজনটা ছেলেমেয়েরা ঠিক অনুভব না করলেও পাঠ হিসেবে অনুশীলনের দ্বারা বিষয়াংশটিকে তাদের আয়ত্ত করতে হয়।

নূতন ও পুরাণো পদ্ধতিতে অনুশীলনের স্থান সম্বন্ধে উপরের ধারণা কিছুটা সত্য হলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে পুরানো পদ্ধতিতে অনুশীলনের স্থান যতখানি, নূতন পদ্ধতিতে অনুশীলনের স্থান ততখানি নয়।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিক থেকে দুটি পদ্ধতির পার্থক্য কী—এটি একটি গুরুতর প্রশ্ন। জিজ্ঞাসু মনোভাব, মৌলিকতা, স্বাধীনচিন্তা, আত্মনির্ভরতা নূতন শিক্ষায় বাড়ে এমন মনে করবার কারণ আছে। পুরাণো শিক্ষায় সঞ্চিত জ্ঞানরাশি আয়ত্ত করার উপর, সামাজিক আনুগত্য ও পরনির্ভরতার উপর জোরটা বেশী।

গ্রেটবৃটেনে শ্রীমতী গার্ডনার (৪) শিশুকেন্দ্রিক স্কুল ও বিষয়কেন্দ্রিক স্কুলের ফলাফলের তুলনামূলক বিচারের জন্য কিছু অনুসন্ধান করেছেন। ছয়টি শিশু-কেন্দ্রিক স্কুল ও ছয়টি বিষয়কেন্দ্রিক স্কুল নিয়ে গবেষণাটি করা হয়। শিশুকেন্দ্রিক স্কুলগুলি ছিল পরীক্ষাধীন এবং বিষয়কেন্দ্রিক স্কুলগুলি ছিল নিয়ন্ত্রণ স্কুল। প্রত্যেক জোড়া পরীক্ষাধীন ও নিয়ন্ত্রণ স্কুলের ছেলেমেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ মোটামুটি এক—এমন দেখে নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর থেকে স্কুলগুলিকে বাছা হয়েছিল। বয়স, বুদ্ধি এবং ছেলে বা মেয়ে বিচার করে দুই ধরণের স্কুলের ছেলেমেয়েদের দুটি সমকক্ষ দলে ভাগ করা হল। ছেলেমেয়েদের বয়স ছিল ছয়, সাত এবং আট।

গ্রেট বৃটেনে পরীক্ষা

শিশুকেন্দ্রিক স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েরা প্রধানতঃ খেলা ও চিত্তাকর্ষক কাজের

মাধ্যমে শেখে। অবশ্য লিখন, পঠন ও অঙ্ক শেখবার জন্য কিছুটা সময় ধরা থাকে। বিষয়কেন্দ্রিক স্কুলগুলিতে খেলা ও ইচ্ছামত কাজ করবার সুযোগ প্রায় নেই বল্লেই চলে। স্কুলে শিক্ষকশিক্ষিকারা পড়ান, ছেলেমেয়েরা শোনে। লিখতে বলা হলে তারা লেখে, অঙ্ক করতে বলা হলে তারা অঙ্ক করে। বিষয়-কেন্দ্রিক স্কুলে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখবার জন্য অনেক বেশী সময় ব্যয় করে।

দুই প্রকারের স্কুলের তুলনামূলক ফলাফল যা পাওয়া গেছে নীচে তা উল্লেখ করা হল:

লেখা ও রচনা

ছয় বছরে নিয়ন্ত্রণ দলের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে পারে। সাত আট বছরে পরীক্ষাধীন দলের ছেলেমেয়েরা লেখায় অধিক উৎকর্ষতা দেখালো। আট বছরে রচনা লেখায় পরীক্ষাধীন ছেলেমেয়েদের বেশী ভালো দেখা গেল।

পড়া ও বানান

পড়ায় একটি নিয়ন্ত্রণ স্কুলের সাত বছরের ছেলেমেয়েরা যুগ্ম পরীক্ষাধীন স্কুলের ছেলেমেয়েদের তুলনায় ভালো প্রমাণিত হল। অন্যান্য স্কুলের ফলাফলে বিশেষ তারতম্য দেখা গেল না। আট বছরে পড়ায় ও বানানে দুইদলই প্রায় সমকক্ষ।

অঙ্ক

সাত বছরের ছেলেমেয়েদের অঙ্কের পারদর্শিতা সম্বন্ধে দেখা গেল, একটি নিয়ন্ত্রণ স্কুলকে বাদ দিলে অন্যান্য স্কুলের ফলাফল প্রায় সমান। একটি নিয়ন্ত্রণ স্কুলের ছেলেমেয়েরা তার জোড়া পরীক্ষাধীন স্কুলের ছেলেমেয়েদের তুলনায় ঢের ভালো ছিল। আট বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কিছু কঠিন অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল, কিছু প্রশ্নের অঙ্কও ছিল। নিয়ন্ত্রণ স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাধীন দলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পারদর্শী দেখা গেল। নিয়ন্ত্রণ দল অঙ্কের নিয়ম বেশী জানে। পরীক্ষাধীন কোন কোন স্কুলে ভাগ আরম্ভ করাই হয়নি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ স্কুলে সবাই ভাগ শিখেছে। অঙ্কে অনুশীলনের স্থানটি বড়।* সেজন্যই বোধ হয় পরীক্ষাধীন স্কুলে আট বছরের ছেলেমেয়েরা অঙ্কে কিছু বেশী কাঁচা ছিল।

কতগুলি ক্ষমতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নীচের কয়েকটি ক্ষমতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরীক্ষাধীন ছেলেদের উন্নত দেখা গেল:

---

* ১৩ অধ্যায় দেখুন।

(ক) সুকৌশলে কতগুলি অংশকে মিলিয়ে মজার মজার ছবি তৈরি করা।

(খ) নিজেদের সৃজনাত্মক কল্পনাকে ড্রয়িং ও পেন্টিংয়ে রূপদান।

(গ) নিজেদের মনের ভাব মৌখিক ভাষায় প্রকাশ করা।

(ঘ) অপরিচিত বয়স্ক লোকদের প্রতি সহযোগিতা ও বন্ধুভাব প্রদর্শন।

(ঙ) সমবয়সীদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ।

(চ) স্বৈচ্ছিক কাজে একাগ্রতা।

নীচের কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষাধীন ছেলেমেয়েদের বেশী ভালো মনে হল, তবে সব স্কুলে সমান ফল পাওয়া যায় নি :

(ক) যে কাজটি আরম্ভে চিত্তাকর্ষক নয়, এমন একটি আদিষ্ট কাজে একাগ্রতা।

(খ) যে কাজে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন, এমন কাজ করা।

নতুন শিক্ষাপদ্ধতিকে অনেক সময় 'নরম শিক্ষানীতি' বলা হয়। পাঠক্রম শিশুর চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার, পাঠে শিশুদের আগ্রহ থাকা আবশ্যক—নয়া-শিক্ষাবিদেরা এরূপ দাবী করেন। ঐ ব্যাপারে পুরানো শিক্ষাবিদ্‌দের একটি আপত্তি আছে। তাদের মতে অপ্রীতিকর কাজে, কঠোর পরিশ্রমে শিশু যদি অভ্যস্ত না হয় তবে তার শিক্ষা জীবনোপযোগী হবে না। জীবনে অনেক কাজ আছে, যা ভালো লাগে না, তবু তা আমাদের করতে হয়। এই আপত্তির একটিকে সহজেই খণ্ডন করা যায়। কঠোর পরিশ্রমের কথা ধরা যাক। নতুন স্কুলের ছেলেমেয়েরা পুরানো স্কুলের ছেলেমেয়েদের তুলনায় কম পরিশ্রম করে না। পার্থক্য প্রধানতঃ একদলের আগ্রহ উৎসাহ বেশী, অপর দলের আগ্রহ ও উৎসাহ কম। দ্বিতীয় আপত্তির কথা এবার ধরা যাক। নিজেদের ইচ্ছা ও আগ্রহকে নতুন স্কুলের শিশুরা বড় করে দেখতে অভ্যস্ত। অন্যের ইচ্ছায় অপ্রীতিকর কাজে কতখানি তারা মনোযোগ দিতে পারবে? উপরের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ইচ্ছানুযায়ী কাজে একাগ্র হবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ দলের তুলনায় তাদের বেশী। কোন একটি ক্ষেত্রে অন্যের আদেশে অপ্রীতিকর কাজ করবার ক্ষমতাও তাদেরই বেশী মনে হল। অন্তত নিয়ন্ত্রণ দলের তুলনায় কম নয় এটা সুনিশ্চিত।

পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহযোগী মনোভাব পরীক্ষাধীন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশী। শিশুকেন্দ্রিক স্কুল একদিক থেকে আবার কর্মকেন্দ্রিক স্কুল। সেখানে ছেলে-মেয়েরা মিলে মিশে কাজ করবার সুযোগ পায়। বড়রা সেখানে থাকে প্রধানতঃ

তাদের সহায়ক ও পরামর্শদাতা হিসেবে। সকলকে তারা বেশির ভাগ সুহৃদ হিসেব দেখতে পায়। সেজন্য সুহৃদ হিসেবেই তাদের দেখতে শেখে। বিষয়-কেন্দ্রিক স্কুলে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়লেও সামাজিক জীবন গড়ে ওঠবার সুযোগ সেখানে কম। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পাশাপাশি বসে শিক্ষক-শিক্ষিকার কথা শোনে। কোন একটি কাজ সবাই মিলে করা ও কাজকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ সেখানে অল্পই ঘটে।

এ ছাড়াও আরেকটি কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয়। বিষয়কেন্দ্রিক স্কুলে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা বহুলাংশে নিরুদ্ধ, এমন কি নিগৃহীত হয়। সহজ স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের সুযোগ সেখানে কম। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেখানে কিছুটা শাসক, এমন কি ছেলেমেয়েদের অনেকের চোখে উৎপীড়ক। ফলে মানুষকে শিশুরা ভয় করতে শেখে। তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি সহজ বিশ্বাস, প্রীতি ও সহযোগী মনোভাবের অভাব দেখা যায়।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও নূতন শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষায় মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ও যৌক্তিক পদ্ধতির কথাটা ওঠে। জীবন সুবিন্যস্ত হয়ে আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। তার কোন একটি বাস্তব অংশকে একটি প্রজেক্ট রূপে গ্রহণ করে তাকে জানবার চেষ্টা করা হয়। অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি জীবনের বাস্তব অংশ নয়। বিষয়গুলির প্রত্যেকটি বিমূর্ত ধারণার এক একটি সমষ্টি। মনের বিশ্লেষণী ক্ষমতা দ্বারা জীবনকে বিভক্ত ও বিশ্লেষণ করে ঐ ধারণা সমূহে আমরা পৌঁছেছি। ঐ বিষয়গুলি বরাবর শেখবার পদ্ধতিকে যৌক্তিক পদ্ধতি বলা যায়। বিষয়গুলির বিভিন্ন অংশ সমূহকে সহজ থেকে কঠিন, সরল থেকে জটিল এমন কতগুলি ধাপে সাজান হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, পড়তে শিখতে হলে ছোটদের আমরা আগে অক্ষর শেখাই, অক্ষর শেখা হলে শব্দ, শব্দ শেখা হলে বাক্য। এভাবে ধাপে ধাপে শিক্ষা অগ্রসর হয়। এসব শিক্ষা যৌক্তিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

মনস্তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক পদ্ধতি

যৌক্তিক পদ্ধতি শিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি এ কথা আধুনিক শিক্ষাবিদেরা মানতে রাজী নন। যে ভূগোল রক্তমাংস বর্জিত কতগুলো শুকনো হাড়, অমন ভূগোল পড়ায় ছেলেমেয়েদের কোন আনন্দ নেই। অঙ্ক কতগুলি বিমূর্ত ধারণার সমষ্টি। মানসিক কসরৎ ছাড়া এর প্রয়োজন ছেলেমেয়েরা বোঝে না। কতগুলি বিমূর্ত,

বিচ্ছিন্ন বিষয় ছেলেমেয়েদের শেখাবার অর্থ হয় না। পরিপূর্ণ ও সমগ্র জীবন থেকে ছেলেমেয়েরা শিখবে। সে জীবনে অঙ্ক ও ভূগোল সবই আছে। সে জীবনের পটভূমিতে অঙ্ক ও ভূগোলের প্রয়োজন ও তাৎপর্য বোঝা ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজ হবে। তারা সাগ্রহে শিখবে। তেমনি বলা চলে শিশুরা শব্দকে জানে, বাক্যকে জানে। অক্ষর তাদের কাছে অপরিচিত ও দুর্বোধ্য। তাদের পাঠ শব্দ থেকে ও বাক্য থেকে আরম্ভ হওয়া উচিত। শব্দকে বিশ্লেষণ করে তারা অক্ষরকে জানবে। শব্দাংশ হিসাবে অক্ষরের অর্থ তখন তারা অনেকটা বুঝতে পারবে, বহুপরিমাণে তাদের গ্রহণযোগ্য মনে করবে। এ সবকে বলা হয় শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি।

প্রাথমিক স্তরে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের দরকার আছে। বিমূর্ত ধারণা শিশুর কাছে সুবোধ্য নয়, বিমূর্ত ধারণাকে শিশু অনেকসময় নিজের করে নিতে পারে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে জীবনকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় মানুষই সৃষ্টি করেছে। জগতকে ভালোভাবে জানবার জন্য, জগতের উপর মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য বিশ্লেষণ ও বিভাগের দরকার আছে। গোটা জিনিসটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝা কঠিন, তাকে আয়ত্বাধীনে আনা কঠিন। বিশ্লেষণ ও বিভাগ মানসিক বিকাশের একটি স্তরে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক। সুতরাং বলা চলে যৌক্তিক পদ্ধতি একটি স্তরে ও একটি মনোভাবে কিছু পরিমাণে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। উচ্চ বিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কাছে যৌক্তিক পদ্ধতিকে বহুল পরিমাণে স্বাভাবিক পদ্ধতি মনে হবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই।

অধ্যায় ২০

পরিবেশ ও বংশগতি

দুটি মানবশিশু দেহ ও মনের অনেক দিক দিয়ে একরকম। পক্ষীশাবক কিম্বা বাঘের বাচ্চাদের মধ্যেও বহু সাদৃশ্য আছে। দেহের দিক দিয়ে বিচার করলে—মানুষ, পাখী কিম্বা বাঘ দেখতে বিভিন্ন রকমের। কিন্তু নিজেদের ভিতরে তারা প্রত্যেকেই মূলতঃ একরকমের। এর কারণ প্রধানতঃ বংশগতি। বাঘের বাচ্চা বাঘ হবে, মানুষের বাচ্চা মানুষ। বাঘ ও বাঘিনীর চেহারার সঙ্গে তাদের শাবকের চেহারা মূলতঃ একরকম। মানুষের বেলাতেও সেই কথা সত্য। কিন্তু স্বভাবের কথা যদি বিচার করা হয় তবে ঐ উক্তি কতখানি সত্য? বাঘের বাচ্চা তার হিংস্রতা কি বংশগতির প্রভাবে বাঘের কাছ থেকে পেয়েছে? মানুষের শিশুর যে মানবীয় আচরণ—সেটা কি সবখানি বংশগতি না পরিবেশের প্রভাবও তাতে রয়েছে? বাঙ্গালীর ছেলের বাঙলা বলার কারণ বাঙলা ভাষাভাষী পরিবেশে সে বড় হয়েছে। তাকে যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সোজা ফরাসী দেশে চালান করে দেওয়া হ'ত, বাঙলা ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় না ঘটত তবে সে ছোটবেলাতে অনর্গল ফরাসী ভাষা বলতে শিখত, বাঙলা নয়। বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্বেও একথা সত্য। কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি? দেখা গেছে মা-বাবার বুদ্ধি থাকলে সাধারণতঃ সন্তানেরা বোকা হয় না; অন্যপক্ষে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতার সন্তানদের বুদ্ধিমান হতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। ফরাসী দেশে মানুষ হলেও তার পিতামাতার বুদ্ধির সঙ্গে তার বুদ্ধির কিছুটা ঐক্য থাকবে এমন মনে করা চলে।

ব্যক্তিগত সাদৃশ্য

দুটি মানুষের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য বা ঐক্য আছে তেমনি বলা চলে দুটি মানুষ এক নয়। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও আছে। কেউ ঢেঙ্গা, কেউ মাঝারি, কেউ বেঁটে। কেউ বেশী বুদ্ধিমান, কারো বুদ্ধি মাঝারি ধরণের,

কেউ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। কারো মধ্যে আবেগ প্রবল, কারো মাঝামাঝি, কারো মধ্যে আবেগ কম। দুটি মানুষের মধ্যে কত না পার্থক্যই রয়েছে। কেবলমাত্র সাদৃশ্য নয়, মানুষে মানুষে পার্থক্যেরই বা কারণ কি? বংশগতি না পরিবেশ?

ব্যক্তিগত প্রার্থক্য

মানুষের দৈহিক ও মানসিক গঠন বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব রয়েছে একথা এক-আধজন একচক্ষু দার্শনিক ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করবেন। একটি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ঐ দুটি প্রভাবই অপরিহার্য। মানুষের বিকাশে এমনভাবে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে, এমনভাবে পরস্পরের উপর তারা নির্ভরশীল যে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবকে ঠিক আলাদা করে দেখান সম্ভব নয়। উডওয়ার্থের (১) মতে, পরিবেশ ও বংশগতির সম্বন্ধটি যোগের সম্বন্ধ নয়, গুণের সম্বন্ধ। একটি ব্যক্তি = বংশগতি + পরিবেশ বললে ঠিক হবে না। বলতে হবে একব্যক্তি = বংশগতি × পরিবেশ। জ্যামিতিক ভাবে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় একটি সমকোণ চতুর্ভুজের দৈর্ঘ্য যদি বংশগতি হয়, উচ্চতা তার পরিবেশ এবং গোটা সমকোণ চতুর্ভুজটি অর্থাৎ তার দৈর্ঘ্য × প্রস্থ হচ্ছে সেই ব্যক্তি। চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বের বিকাশে দুইই একান্ত অপরিহার্য।

দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী কিভাবে দেহতাত্ত্বিক উপায়ে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় সে সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। যে কোন একটি জীবের জীবনের সূত্রপাত হয় একটি কোষ থেকে। মানুষের বেলাতে—একটি পুং কোষের দ্বারা উর্বরীকৃত একটি ডিম্বকোষ থেকে জীবনের আরম্ভ। উর্বরীকৃত কোষের আয়তন হল ·০১৩ মিলিমিটার অথবা $\frac{১}{২০০০}$ ইঞ্চি। উর্বরীকৃত কোষটির আয়তন কিছু বৃদ্ধি পাবার পর একটি কোষ বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। দুটি কোষ বিভক্ত হয়ে চারিটি, চারিটি আটটি—এইভাবে একটি কোষের স্থলে বহুকোষ সম্বলিত প্রাণীর আবির্ভাব হয়। উর্বরীকরণের তিনসপ্তাহ পরে সর্বপ্রথম কোষগুলির স্পন্দন আরম্ভ হয়। এই স্পন্দন পরে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের রূপ নেয়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির দুটি দিক আছে। এক, কোষ বৃদ্ধির ফলে ভ্রূণের আয়তন বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন কোষ-মণ্ডলী বিভিন্নরূপ গ্রহণ করে। কেউ হয় চোখ, কেউ মুখ কেউ হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি।

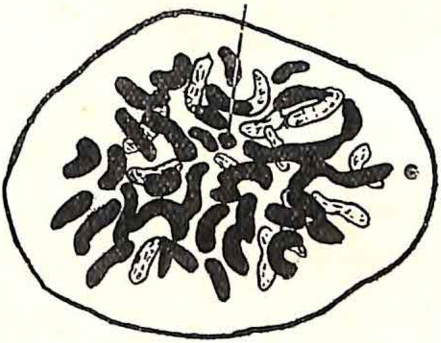
বংশগতির দেহগত ভিত্তি

গোড়া থেকেই রক্তচলাচলের জন্য ভ্রূণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে। প্ল্যাসেন্টার মধ্য দিয়ে মা ও শিশুর রক্তচলাচলের যোগাযোগ ঘটে।

দ্বিতীয়মাস থেকে ভ্রূণের চেহারা মানুষের মত হতে আরম্ভ করে। চতুর্থ-মাসে ভ্রূণের মস্তিষ্ক গঠন সুরু হয়। সাধারণতঃ নয়মাস দশদিনে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়।

স্ত্রীকোষ ও পুংকোষের মিলনে শিশুর জীবনের সূত্রপাত হয়। প্রত্যেকটি কোষের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস থাকে। কোষের অন্যান্য অংশ থেকে নিউক্লিয়াসের রাসায়নিক পার্থক্য রয়েছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অসমান কাঠির আকৃতির বস্তু আছে—শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যা চোখে পড়ে। এদের ক্রোমোসোম বলা হয়। অণুবীক্ষণে এদের অনেকটা পুঁতির মালার মত দেখায়। মানুষের বেলাতে প্রত্যেকটি কোষে ৪৮ (২৪ জোড়া) ক্রোমোসোম থাকে। এইসব ক্রোমোসোম মূলতঃ বংশপরমানু বা জিনের সমষ্টি। জিনকে

ক্রোমোসোম ও জিন



বংশগতির বাহক মনে করা হয়। মনুষ্যকোষে জিনের সংখ্যা হাজারেরও বেশী বলে অনুমান করা হয়। এই জিনেরা ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমদের মধ্যে অসমান সংখ্যায় ছড়িয়ে থাকে।

ক্রোমোসোম ও জিন শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে পায়। পিতামাতারা পায় আবার তাদের পিতামাতার কাছ থেকে। বংশানুক্রমিক গুণাবলী জিনদের মধ্য দিয়ে বংশধরদের মধ্যে বর্তায়। শিশুর ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের প্রতিটি জোড়ার একটি সে পায় পিতার কাছ থেকে, আর একটি পায় মাতার কাছ থেকে।

পিতা ও মাতার পুংকোষ ও গর্ভোকোষ প্রত্যেকটিতে ২৪ জোড়া করে ক্রোমোসোম থাকে ; সে ২৪ জোড়ার কোন ২৪টি শিশু পাবে এ সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। ২৪ জোড়া থেকে যে কোন ২৪টি ক্রোমোসোম ও তন্মধ্যস্থ জিন সে পেতে পারে। এই কারণেই একই পিতামাতার তুটি ছেলের মধ্যে সাধারণতঃ সাদৃশ্য থাকলেও তুজনে সর্বতোভাবে এক হয় না।

জিনদের ক্ষমতা সামান্য। একটি ক্ষুদ্র কীটের চোখের রূপ নির্ভর করে ৫০টি বিভিন্ন জিনের উপর। যত সামান্যই হোক—প্রত্যেকটি জিনের নিজস্ব 'একক চরিত্র' আছে। সেটি বংশানুক্রমে এক হলে প্রকাশ পায়, নইলে পায় না। কিছুটা প্রকাশ পেল, কিছুটা পেল না এমন হয় না। কিন্তু দেহমনের কোন একটি বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে বহুসংখ্যক জিনের কাজের উপর। সুতরাং বৈশিষ্ট্যটি বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে দেখা যায়। দেহের বর্ণের কথা ধরা যাক। মা ফর্সা, বাবা কালো হলে ছেলে মেয়ে ফর্সা কিম্বা কালো হতে পারে। আবার সে শ্যামবর্ণও হতে পারে ; কালোও নয়, ফর্সাও নয়।

জিনদের 'একক' চরিত্র

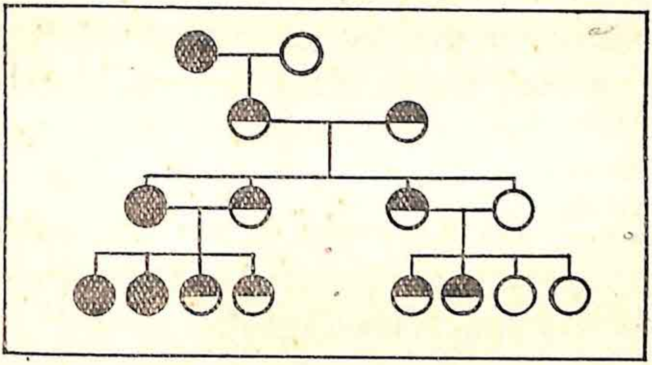
সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটা নির্ভর করে পিতার জিনদের উপর।

এ কথা স্বীকার করা দরকার জিনদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। মানসিক গুণাবলীর বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ জিনদের একক চরিত্রের উপর নির্ভর করে এ কথা বলবার মতো তথ্য আজও আমাদের জানা নেই।

জিনদের তুই ভাগে ভাগ করা চলে—প্রকট ও প্রচ্ছন্ন।* দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীল ও কটা চোখের জিনদের উল্লেখ করা যেতে পারে। কটা চোখের জিন হচ্ছে প্রকট ও নীল চোখের জিন প্রচ্ছন্ন। একটি লোক পিতা মাতা উভয়ের কাছ থেকেই যদি নীল চোখের জিন পেয়ে থাকে তবে তার চোখ নীল হবে। তার স্ত্রীর চোখও যদি নীল হয় এবং তার জিন নীল চোখের জিন হয়ে থাকে তবে ওদের সন্তানসন্ততির চোখের তারাও নীল হবে। কটা চোখের বেলাতেও অনুরূপ কথা বলা চলে। কিন্তু এমন যদি হয় লোকটি বাবার কাছ থেকে নীল ও মা'র কাছ থেকে কটা চোখের জিন পেয়েছে তবে যে জিনটি প্রকট সেটি তার চোখের রঙ্ নির্ণয়ে কার্যকরী হবে। অর্থাৎ, তার চোখের রঙ্ কটা

*'প্রকট' ও 'প্রচ্ছন্ন'কে ইংরেজিতে Dominant ও Recessive বলা হয়।

হবে। কিন্তু অনুরূপ জিনের অধিকারিণী একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হলে তাদের সন্তানসন্ততিদের শতকরা ২৫% নীল চোখ ও অবিমিশ্র নীল চোখের জিনের অধিকারী হবে, ২৫% অবিমিশ্র কটা চোখের ও জিনের এবং ৫০% কটা চোখ সম্পন্ন হলেও তাদের মধ্যে নীল ও কটা চোখ উভয় ধরণের জিনই থাকবে। মেণ্ডেল ঐ সত্যটি আবিষ্কার করেন। নীচের রেখাচিত্রে সন্তানসন্ততি বংশানুক্রমে কি জাতীয় জিন লাভ করে তা দেখানো হল। কালো রঙ্‌টিকে প্রকট এবং সাদাকে প্রচ্ছন্ন ধরা হয়েছে।



মাতৃগর্ভে শিশু নয়মাস দশদিন ধরে বড় হয়। ভ্রূণাবস্থায় মাতৃগর্ভ তার পরিবেশ। জন্মাবার পরে তাকে ঘিরে যে জগতটি থাকে—সেখানে থাকে তার মা বাবা ভাই বোন, আকাশ বাতাস, তাপ, খাদ্য প্রভৃতি। এ কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে পরিবেশের সব কিছুই শিশুকে প্রভাবিত করে না। শিশুর প্রয়োজনকে যা চরিতার্থ করে, শিশুর আগ্রহকে যা উদ্দীপ্ত করে, শিশুর সঙ্গে পরিবেশের যে অংশের যোগাযোগ ঘটে—সেই পরিবেশই শিশুর সক্রিয় পরিবেশ অথবা 'শিশুর পরিবেশ'। সে পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ সাধনের দ্বারা শিশু পরিবেশে পরিবর্তন ঘটায় ও পরিবেশ শিশুকে পরিবর্তিত করে। শিশুর পরিবেশ কেবলমাত্র বাইরের বস্তু নয়। মা'র ভালোবাসা শিশুর পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুর চরিত্রবিকাশে, জীবনের প্রতি শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে মা'র ভালোবাসা পরম সহায়তা করে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এ ব্যাপারে শিশু কি বিশ্বাস করে, অর্থাৎ মা তাকে ভালোবাসেন কিনা

পরিবেশ

এ সম্বন্ধে শিশুর ধারণাটিই আসলে প্রধান। পরিবেশের এই মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। একই মা-বাবার পিঠাপিঠি দুই ছেলে, অতএব তাদের একই পরিবেশ—এমন ভ্রান্তধারণা তাহলে আমরা করব না। ঐ পরিবেশ কিছুটা একরকমের—সতর্কভাবে এটুকু শুধু আমরা বলতে পারি। দুই ভাই। একজনকে মা বেশী ভালোবাসেন, আরেকজনকে কম ভালোবাসেন (অন্ততঃ শিশু যদি তাই মনে করে)—এই দুই ভাইয়ের পরিবেশে অনেকখানি পার্থক্য। পরিবেশের প্রভাব পরিমাপ করতে গেলে এই সব সূক্ষ্ম, কুয়াশাবৃত সত্যকে ভুললে চলবে না।

দুটি মানুষের মধ্যে নানান দিক দিয়ে নানারকম পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যের মূলে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। কোনটার প্রভাব কতখানি এই প্রশ্নের উত্তর পাবার কিছু চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত পার্থক্যে বংশ-গতি ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্যাল্‌টন ৩০০ বৃটিশ পরিবারের ৯৯৭ জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ করেন। এতে প্রত্যেকটি পরিবারে একাধিক প্রতিভাসম্পন্ন লোককে জন্মাতে দেখা যায়। তেমনি জিউকস্ ও ক্যাল্লিকাকের নামে কয়েকটি পরিবারের লোকদের জীবনী সংগ্রহ করে দেখা যায় যে সে সব পরিবারের প্রায় অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব ও সামাজিক অপরাধী ছিল।

এই ধরণের অনুসন্ধানের অসুবিধা এই যে পিতামাতা যেখানে প্রতিভাযুক্ত, গৃহের পরিবেশ সেখানে সাধারণতঃ শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত। তেমন গৃহের পরিবেশ সে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মানসিক উন্নতির সহায়তা করবেই। অন্যপক্ষে, পিতামাতা যেখানে সামাজিক অপরাধে অপরাধী, গৃহের পরিবেশ সেখানে দূষিত। সে গৃহ শিশুকে অপরাধের পথে ঠেলে দেবে তাতে আশ্চর্য কিছুই নেই। এ সব ক্ষেত্রে প্রতিভা কিম্বা অপরাধমূলক মনোবৃত্তির কতখানি শিশু বংশানুক্রমে লাভ করল, আর কতখানি গৃহের পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করল—বিচার বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করা কঠিন।

বংশগতি ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব বুঝতে হলে দুটির মধ্যে একটিকে স্থির বা একরকম রাখা আবশ্যক। যদি আমরা বংশগতির প্রভাব কতখানি জানতে চাই, তবে ঠিক একই পরিবেশে বিভিন্ন বংশগতির দুজনকে রেখে তাদের পার্থক্য কি হয় তা দেখতে হবে। পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা

যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়—তবে একই বংশগতি এমন দুটি শিশু বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হবার দরুণ কি তাদের মানসিক পার্থক্য ঘটে জানতে হবে। যমজ শিশু দুই প্রকারের। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখতে তারা একরকম, মনের দিক থেকেও তাদের প্রায় একরকম বলা চলে। এদের অনুরূপ যমজ শিশু বলা হয়। আরেকরকম যমজ শিশুদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য নেই। হয়ত দুটির একটি ছেলে অপরটি মেয়ে। আবার দুজনেই ছেলে কিম্বা দুজনেই মেয়েও হতে পারে। তবে দুই ভাই কিংবা দুই বোনে কিম্বা ভাইবোনে যতখানি সাদৃশ্য—এদের মধ্যে সাদৃশ্যও প্রায় ততখানি। এদের সহোদর যমজ শিশু বলা হয়। সহোদর যমজ শিশুর ক্ষেত্রে দুটি পুংকোষ—দুটি আলাদা ডিম্বকোষকে একই সময়ে উর্বর করার ফলে দুটি শিশু একই সময়ে মাতৃগর্ভে এসেছে। অনুরূপ যমজ শিশুর বেলায় একটি পুংকোষ দ্বারা উর্বরীকৃত একটি ডিম্বকোষ থেকে দুটি জীবন আরম্ভ হয়েছে। ফলে যমজ শিশুদ্বয়ের বংশগতি এক। এমন দুটি শিশুকে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ করলে তাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যাবে পরিবেশের প্রভাবকেই তার কারণ বলা যাবে।

পরিবেশের প্রভাব

প্রথমে বুদ্ধির কথা ধরা যাক। বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা এরূপ দুটি শিশুর মধ্যে গড় বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য কত তা নির্ণয় করা হয়েছে। নীচের তালিকায় তা সন্নিবেশ করা হল। (২)

একই শিশুকে দুইবার পরীক্ষা	অনুরূপ দুটি যমজ শিশু	সহোদর দুটি যমজ শিশু	দুটি ভাই কিম্বা দুটি বোন	দুটি নিঃসম্পর্কিত শিশু
৫	৫	৯	১১	১৫

মোটামুটি একই পরিবেশে মানুষ হচ্ছে এমন দুটি অনুরূপ যমজ শিশুর বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য এবং একই শিশুকে দুইবার বুদ্ধি পরীক্ষা করে যে পার্থক্য পাওয়া যায় এ দুটির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পরিবেশ আলাদা রকমের হলে বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য কি বেশী হবে? পরিবেশের বিভিন্নতায় তারতম্য সম্ভব। দুটি গৃহ শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটা একরকম এমন হতে পারে। আবার এও হতে পারে একটি গৃহ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত, অপরটিতে শিক্ষার কোন বালাই নেই; একটি গৃহের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে, অপরটির ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না। এমন দুটি গৃহের পরিবেশ বুদ্ধির বিকাশে সমভাবে অনুকূল নয়।

বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন কুড়িটি অনুরূপ যমজ শিশু সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। (৩) গৃহ আলাদা হলেও লেখাপড়া শেখবার সুযোগ যেখানে মোটামুটি একরকমের—সে সব ক্ষেত্রে অনুরূপ যমজ শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় পার্থক্যের পরিমাণ ৫। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত পার্থক্য পাওয়া যায়। ছয়টি ক্ষেত্রে একজন আরেকজনের তুলনায় লেখাপড়া শেখবার সুযোগ অনেক বেশী পেয়েছে। তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় পার্থক্য ১৩। একটি ক্ষেত্রে ২৪ পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য দেখা গেছে—একজনের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১৬, অপরজনের ৯২।

এত অল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থীদের ভিত্তিতে কোন নিশ্চিত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে ঐ থেকে এটুকু বলা চলে যে বুদ্ধির বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। যে কোন দুটি নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করলে তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় পার্থক্য হবে ১৫। কিন্তু দুটি একই রকমের যমজ শিশু বিভিন্ন গৃহে মানুষ করলে তাদের বুদ্ধ্যঙ্কে গড় পার্থক্য হচ্ছে ৫। এর কারণ তাদের বুদ্ধি বিকাশে বংশগতির প্রভাব। অন্যপক্ষে পরিবেশের প্রভাবকেও অস্বীকার করবার উপায় নেই। লেখাপড়া শেখবার সুযোগ বুদ্ধ্যঙ্ক বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল এমনও দেখা গেল। অনুরূপ যমজ শিশুদের মধ্যে যে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েছে—তার বুদ্ধ্যঙ্ক, যে পায়নি তার বুদ্ধ্যঙ্কের চেয়ে গড়ে ১৩ বেশী।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে অনুরূপ যমজ শিশুদের উপর বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব কতখানি সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে বিস্তারিত কিছু বলা কঠিন। মোটামুটি একথা বলা চলে যে পরিবেশের প্রভাবে তাদের সামাজিক মনোভাব ও আচরণে পার্থক্য ঘটে, কিন্তু মানসপ্রকৃতি প্রায় একই রকম থাকে। অনুরূপ যমজের যেটি কলেজে পড়ে শিক্ষিকা হয়েছেন, নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে তিনি সচেতন, অন্যে তাকে পছন্দ করছে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি আছে দেখা গেল। অপরপক্ষে যাঁর সে সুযোগ হয়নি এবং দুবছর পড়ে যিনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ নিয়েছেন—নিজের বেশভূষা কিংবা অন্যের পছন্দ অপছন্দের প্রতি তাঁর কোন দৃষ্টি নেই। দুজনেরই মানসপ্রকৃতি কিন্তু প্রায় একই রকমের দেখা গেল। দুজনেই বহির্মুখী, কর্মব্যস্ত, কথকী, নিজের ইচ্ছাকে সংযত করবার ইচ্ছা কম ও অল্পেতেই তাঁরা রেগে ওঠেন।

পরিবেশ যদি মোটামুটি এক থাকে, কিন্তু বংশগতি বিভিন্ন রকমের হয়—তবে বংশগতি কি ভাবে বিভিন্ন মানুষের মনকে বিভিন্নরূপে গড়ে তোলে কিছু পরিমাণে তা দেখা সম্ভব। অনাথ আশ্রমের পরিবেশে যে সব শিশু গোড়া থেকে মানুষ হয় তারা বিভিন্ন পিতামাতার সন্তান, বিভিন্ন বংশগতি তাদের। তাদের বুদ্ধি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে যদি পার্থক্য দেখা যায়, তবে সেই পার্থক্যের কারণ তাদের বংশগতি, অনেকে এমন মনে করবার পক্ষপাতী। ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্য বংশগতি বেশ কিছু পরিমাণে দায়ী এমন নিশ্চয়ই মনে করা চলে। তবে অনাথ আশ্রমে সব শিশুর সমভাবে একই পরিবেশ, এ কথা ঠিক নয়। একই গৃহে পিতামাতাও ছুটি সন্তানকে এক চক্ষে দেখেন না। অনাথ আশ্রমের বেলায় এ কথা বোধহয় আরও সত্য। শিশু বড়দের কাছ থেকে কি ব্যবহার পেল, সমবয়সীরা তাকে পছন্দ করে কিনা—শিশুর আবেগজীবনের বিকাশের পক্ষে এসব বড় কথা। এসব ব্যাপারে বিভিন্ন শিশুর ভাগ্য বিভিন্ন রকমের।

বংশগতির প্রভাব

পিতামাতার ২৪ জোড়া ক্রোমোসোম শিশুর দেহ ও মন গঠনের উপাদান। এই ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে এক হাজার কিম্বা তার চেয়ে বেশী জিন আছে। এই জিনেরা বহু ভাবে বীথিবদ্ধ হতে পারে। পিতা মাতার কাছ থেকে শিশু তার সমস্ত জিন পেলেও তার জিনের বীথিটি কিছু পরিমাণে তার পিতা বা মাতা প্রত্যেকের বীথির চেয়ে আলাদা। তার অন্যান্য ভাই ও বোনদের জিনদের সঙ্গে তার জিনদের যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। এজন্যই বলা চলে শিশু সম্পূর্ণরূপে পিতামাতা কিম্বা তার ভাইবোনদের মত নয়। কিন্তু জিনদের কিছু পরিমাণ সাদৃশ্যের জন্য তার পিতামাতার ও ভাইবোনদের সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্য থাকবে। শিশুর সঙ্গে তাই তার ভাইবোনের এবং পিতামাতার চেহারার কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বাবা মা লম্বা হলে সাধারণতঃ শিশু বেঁটে হয় না। বাবা ও মায়ের চুল কালো হলে শিশুর চুলও কালো হয়। বাবা ও মায়ের চোখের-তারা নীল হলে শিশুর চোখও নীল হয়। পিতামাতা ও সন্তানদের বুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ধারণা করা চলে বলে সোরেনসেন্ (৪) উল্লেখ করেছেন।

পিতামাতার বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ	হীনমানস সন্তানের শতকরা গড়
১৩০	·১
৭০	১৬
৪০	৩৩·৫

যে কোন দুটি নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের ঐক্যাঙ্ক = ০। সন্তান ও পিতামাতার বুদ্ধ্যঙ্কের ঐক্যঙ্ক + ·৫৮। (৫) কিন্তু এর সবটুকু কারণই বংশগতি নয়। বুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতা গৃহের যে পরিবেশ রচনা করেন, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতাদের গৃহ শিশুর বুদ্ধিবিকাশের পক্ষে ততখানি অনুকূল নয়।

বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের জীবিকার একটি সম্বন্ধ আছে এমন মনে করা চলে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক হতে হলে বিশেষ বুদ্ধির দরকার। অন্যপক্ষে, সাধারণ কায়িক পরিশ্রমে বুদ্ধির ততখানি আবশ্যকতা নেই। এজন্যই দেখা যায় বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড়, কায়িক পরিশ্রম করে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের চেয়ে বেশী। কিন্তু একথা বলা চলেনা যে কায়িক শ্রমিক মাত্রেই যে কোন একজন বুদ্ধিজীবীর চেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন। জীবনে সুযোগ সুবিধা বড় কথা। বুদ্ধি আছে, সুযোগ হল না—কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবন যাপন করছেন এমন লোক বিরল নয়। এ কথা ভারতবর্ষে বিশেষ ভাবে সত্য। কিন্তু এখানে আমরা বিভিন্ন বৃত্তিগ্রহণকারীদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় আলোচনা করছি, বুদ্ধ্যঙ্কের বিস্তার নয়। বিভিন্ন বৃত্তিগ্রহণকারীদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড়ের যেমন পার্থক্য আছে, তেমন পার্থক্য তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। টারম্যান্ ও মেরিল্ (৬) তাদের পরীক্ষা দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে যা পেয়েছেন তা নীচে উল্লেখ করা হল।

পিতামাতার পেশা	ছেলেমেয়েদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক
উচ্চতর বৃত্তি (যেমন ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি)	১১৬
কেরানীগিরি, দক্ষ কারিগরি	১০৭
আধাদক্ষ কারিগরি	১০৪
দিন মজুরি	৯৬

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে এই পার্থক্যের জন্য বংশগতি কতটা এবং পরিবেশই বা কতটা দায়ী। পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে বংশগতি ও পরিবেশ দুয়েরই

প্রভাব রয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় দত্তক ছেলেমেয়ে মানুষ করার বেশ একটি রেওয়াজ আছে। পিতামাতার নিজের সন্তানদের ও পালিত ছেলে-মেয়েদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ে মিনেসোটা ও কালিফোর্নিয়ায় কিছু কাজ হয়েছে।(৭) তারই একটি তালিকা নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

সারণী—১৬
পিতা, তার নিজের সন্তান ও পালিত সন্তানদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক

পিতার পেশা	পিতার বুদ্ধ্যঙ্ক	নিজের সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক*	পালিত সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক
উচ্চতর বৃত্তি	১২৩	১১৯	১০৯
মাঝারি বৃত্তি	১১৯	১১৯	১০৯
সাধারণ ব্যবসায়	১১০	১১৬	১০৮
দক্ষ শ্রমজীবিকা	১০১	১০৬	১০৫

উচ্চতর শ্রেণীর ও নিম্নতর শ্রেণীর পিতাদের গড় বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য ২২, তার সন্তানদের ১৩ ও পালিত সন্তানদের পার্থক্য মাত্র ৪। পালিত সন্তানদের পার্থক্যের কারণ প্রধানতঃ পরিবেশের পার্থক্য, স্বীয় সন্তানদের বেলায় পার্থক্যের কারণ যুগপৎ বংশগতি ও পরিবেশ।

বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব কোথায় কতটা এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলবার মত তথ্য এখনও সংগৃহীত হয়নি। এই ব্যাপারে মীড্, গোরার্ প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য। এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের আদিম জাতিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। উপজাতিদের শিশু পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ভবিষ্যত জীবনে সে শিশুদের আচরণের ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে এঁরা মনে করেন। ঐ সত্যকে নৃতত্ত্ববিদেরা এঁদের কালচার প্যাটার্ন থিয়োরিতে প্রকাশ কছেরেন।**

---

* মধ্যমের প্রতি প্রকৃতির একটি ঝোঁক আছে দেখা গেছে। অত্যন্ত উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি সাধারণতঃ পিতামাতার বুদ্ধির চেয়ে কিছু কম হয়; আবার অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পিতামাতার সন্তানদের বুদ্ধি সাধারণতঃ পিতামাতার বুদ্ধির চেয়ে বেশী হয়। এ ধরণের ঝোঁককে গাণিতিক প্রত্যাবৃতি বা ইংরেজিতে 'Regression' বলা হয়।

** শিশুর বিকাশ অধ্যায়ে ১৩৯-১৪০ পাতা দেখুন।

কাজেই এ কথা বলা চলে যে মানুষের ক্ষমতা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ববিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। বুদ্ধিবিকাশে বংশগতির প্রভাব স্পষ্টতর। হালে আমরা বুঝতে পারছি যে ঐ ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। বুদ্ধিতে ব্যক্তিগত পার্থক্যের—Variance'র*—৮৭% কারণ বংশগতি, বার্ট এমন ধারণা করবার কারণ পেয়েছেন বলে মনে করেন। (৮)

আবেগর ব্যাপারে বলা যায় যে কারো মধ্যে জন্মগতভাবেই আবেগের প্রাবল্য থাকে। (৯) এই প্রাবল্যের দরুণ তাদের আচরণে স্থৈর্য ও ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়। এ ধরণের লোক রাগে অন্ধ হয়ে যায়, ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। বংশানুক্রমে আবেগের এমন একটি আধিক্য এক একটি পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বংশগতি ছাড়াও এই ধরণের বংশানুক্রমিক মনোভাবে পরিবেশের প্রভাব নেই একথা বলা কঠিন। পিতামাতা যেখানে পাগল, সে গৃহের পরিবেশও পাগলের। কিন্তু পিতামাতা অপরাধী হলে তাদের সন্তানেরা বংশগতির প্রভাবে অপরাধী হবে এমন মনে করবার স্বপক্ষে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। পিতামাতা পাগল হলে ছেলেমেয়েদের পাগল হবার সম্ভাবনা কতখানি এটি একটি প্রশ্ন। বংশানুক্রমে পাগলামি সন্তানসন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় একথা মনোবিদেরা বলেন না। কিন্তু পাগলদের ছেলেমেয়েদের পাগল হবার কিছু সম্ভাবনা থাকে। দুর্বল অহম নিয়ে অনেকে জন্মায়—যারা আবেগের বেগে সহজেই পরাভূত হয়। যৌনশক্তির সুস্থ স্বাভাবিক পরিণতির সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের একটি গভীর যোগ আছে, ফ্রয়েড তা দেখিয়েছেন। এই পরিণতিতে পৌঁছবার জন্য মানুষের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সহজাত প্রেরণা আছে। কারো মধ্যে সেই প্রেরণাটি দুর্বল থাকে। যৌন ইচ্ছার শিশুসুলভ পরিতৃপ্তিতেই তারা ক্ষান্ত হতে চায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। সুতরাং দেখা যায় মানসিক রোগে বংশগতির কিছু প্রভাব রয়েছে। ব্যক্তিত্বের কোন কোন অংশের উপর বংশগতির প্রভাব বোধহয় বেশী। মানসপ্রকৃতি তেমন একটি অংশ। সামাজিক আচার ব্যবহার ও সামাজিক বোধে পরিবেশের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

---

* Variance বলতে প্রমাণ ব্যত্যয়ের বর্গ অথবা σ^2 বোঝায়।

অধ্যায় ২১

মনের দেহগত ভিত্তি

মনকে প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে দেখা গেছে। সেজন্যই মনস্তত্ত্বকে দেহতত্ত্বের একটি অংশ মনে করবার দরকার আছে বলে আমরা মনে করিনা। তথাপি দেহমন নিয়েই একটি মানুষ। দেহের ক্রিয়া মনকে প্রভাবিত করে, মন দেহকে প্রভাবিত করে। গ্ল্যাণ্ডের নিঃসরণের দ্বারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে নির্ধারিত হয়। তেমনি রাগ হলে, ভয় হলে, কোন কোন গ্ল্যাণ্ডের নিঃসরণ ঘটে। মানসিক কাজে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের সহযোগিতার দরকার হয়। প্রত্যেকটি শারীরিক ব্যাধির একটি মানসিক দিক আছে। রোগসৃষ্টির বেলাতেও একথা সত্য, রোগ নিরাময়েও সে কথা বলা চলে। কোন কোন রোগে মানসিক কারণটাই প্রধান। উন্মাদ রোগ, পেপটিক আলসার, ডায়াবেটিস, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগের নাম ঐ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব রোগে কোনটাতে দৈহিক এবং কোনটাতে মানসিক লক্ষণ প্রধান। কোন কোন রোগে দৈহিক কারণটি বড়। যেমন জি পি আই (সিফিলিসের ফলে এই মানসিক রোগটি ঘটে), ম্যালেরিয়া প্রভৃতি। মোটকথা দেহ মনে একটি অন্তরঙ্গতা আছে। মানসিক ক্রিয়ায় শরীরের কতগুলি অংশের বিশেষ সহযোগিতা দেখা যায়। দেহের এই অংশগুলির সম্বন্ধে নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

মানুষের আচরণ তার মানসিক ক্রিয়ার প্রকাশ। মানুষের আচরণে দেহের প্রায় প্রতি অংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করলেও স্নায়ুতন্ত্রকেই মূল বলা চলে। স্নায়ুতন্ত্র প্রধানতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা সংগ্রাহক অঙ্গ (চোখ, কান ইত্যাদি) ও কর্মেন্দ্রিয় বা সংসাধক অঙ্গের (পেশী ও গ্ল্যাণ্ড) সাহায্যে কাজ করে।

বাইরের জগতে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন উদ্দীপক সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের

* উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া কি—আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

শরীরের ভিতরও নানা জৈবিক ক্রিয়ার ফলে উদ্দীপকের অভাব নেই।

জ্ঞানেন্দ্রিয়

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি এই সব উদ্দীপক ধারণের যন্ত্র বিশেষ। এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এক এক বিশেষ জাতীয় উদ্দীপক ধারণের উপযোগী। যেমন রং ও আলোর খেলা ধরা পড়ে শুধু চোখে। শব্দ শোনার জন্য দরকার হয় কান। স্পর্শজনিত বোধের (কঠিনতা, কোমলতা, শীত, তাপ প্রভৃতি) জন্য আবশ্যক ত্বক্। ঘ্রাণ ও আস্বাদনের জ্ঞান হয় যথাক্রমে নাক ও জিভের সাহায্যে। চোখ, নাক, কান, জিভ ও ত্বক্ যেমন বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করে, দেহাভ্যন্তরে সংগ্রাহক স্নায়ুকোষসমূহ তেমনি আভ্যন্তরিক সংবাদ সংগ্রহের কাজ করে।

সংবাদ সংগ্রহ করা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ। অবস্থানুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব কর্মেন্দ্রিয়ের। এই দুই জাতীয় ইন্দ্রিয়দের মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। স্নায়ুতন্ত্র এই দুই জাতীয় ইন্দ্রিয়দের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

কর্মেন্দ্রিয় বলতে মাংপেশী ও গ্ল্যাণ্ডসমূহ বোঝায়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পেশীগুলির গঠন বিভিন্ন প্রকারের। দেখতে যেমনি হোক না কেন সঞ্চালন

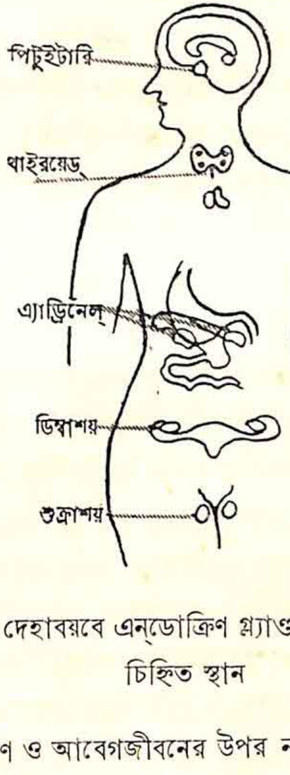
কর্মেন্দ্রিয়

সকল পেশীরই ধর্ম। কাজ অনুযায়ী মাংসপেশীকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। দেহের কতগুলি অঙ্গ সঞ্চালন আমাদের ইচ্ছাধীন। পেশীর সাহায্যে আমরা অঙ্গ সঞ্চালন করি। ইচ্ছা করলেই যে সকল পেশীকে আমরা চালনা করতে পারি সেগুলিকে ঐচ্ছিক পেশী বলে। হাত, পা প্রভৃতির মাংসপেশী ঐচ্ছিক। আবার কতগুলি পেশীর ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। ধমনী, শিরা, পাকস্থলী, হৃদযন্ত্র প্রভৃতির পেশীসমূহ আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না রেখে নিত্য নিয়ত কাজ করে চলেছে। এগুলিকে অনৈচ্ছিক পেশী বলে। পেশীর উপর ভাবাবেগের বিশেষ প্রভাব আছে। অনৈচ্ছিক পেশীর উপর ঐ প্রভাব আরো বেশি। মন খুশী থাকলে কাজ করতে ভাল লাগে; বেশি কাজও করা যায়। মন খারাপ থাকলে কাজে অনিচ্ছা বোধ হয়, অল্প কাজেই অবসাদ দেখা দেয়। বিশেষ উত্তেজনার সময় সাময়িকভাবে কাজের শক্তি বৃদ্ধি পেলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্লান্তি আসে।

গ্ল্যাণ্ডসমূহের আকৃতি অতি ক্ষুদ্র ও বৈশিষ্ট্যহীন হলেও দেহমনের উপর এই গুলির প্রভাব অনেকখানি। বিভিন্ন প্রকারের রস নিঃসরণ করা গ্ল্যাণ্ডদের কাজ।

দুই রকমের গ্ল্যাণ্ড আছে। কতগুলি গ্ল্যাণ্ড নলযুক্ত, কতগুলি নলহীন। নলযুক্ত গ্ল্যাণ্ডসমূহ নলের সাহায্যে বহিঃরস নিঃসৃত করে। লালা গ্ল্যাণ্ড, ঘাম গ্ল্যাণ্ড ঐ জাতীয় গ্ল্যাণ্ডদের দৃষ্টান্ত। এন্‌ডোক্রিণ বা নলহীন গ্ল্যাণ্ডের নিঃসৃত অন্তঃরস সোজাসুজি দেহের রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয়। কোন কোন গ্ল্যাণ্ডের অন্তঃরস অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের নিঃসরণে সাহায্য করে।

গ্ল্যাণ্ড



দেহাবয়বে এন্‌ডোক্রিণ গ্ল্যাণ্ডসমূহের
চিহ্নিত স্থান

শারীরিক গঠন, আচরণ ও আবেগজীবনের উপর নলহীন গ্ল্যাণ্ডনিঃসৃত অন্তঃরস গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। স্নায়ুতন্ত্রের সহিত এই গ্ল্যাণ্ডসমূহের কাজের যোগ আছে। কখনও কখনও গ্ল্যাণ্ডগুলির অতিপুষ্টতা ও অপুষ্টতার দরুণ দেহমনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এন্‌ডোক্রিণ গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল।

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড গলার সামনে, শ্বাসনালীর দুপাশে অবস্থিত। অসুস্থতার দরুন এই গ্ল্যাণ্ড নষ্ট হলে ব্যক্তি তার পূর্বের সজীবতা ও কর্মক্ষমতা হারায়, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। কোন বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা

তার থাকে না। ক্রমে সে জড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ছোট বেলায় এই গ্ল্যাণ্ড অকর্মণ্য হলে শিশুর দেহের বাড় কমে যায়। বিশেষ অবস্থায় শিশু বামনাকৃতি ও হীনবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়। ঐ জাতীয় শিশুদের ক্রেটিন বলে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড নিঃসৃত রসকে থাইরক্সিন বলে। এই রসের অধিক ক্ষরণও ভাল নয়। অত্যধিক রস ক্ষরণ হলে মানুষ অস্থির, উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অল্প বয়সে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বেশি সক্রিয় হলে শিশু দ্রুত লম্বা হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একটি অস্বাভাবিক দীর্ঘকায় মানুষে পরিণত হয়। বুদ্ধি অবশ্য এদের সে পরিমাণ বাড়ে না।

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড

এ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ডদুটি মূত্রাশয়ের নিকটে অবস্থিত। এ্যাড্রিনেলের বহিরাবরণকে কোরটেক্স ও তার ভিতরের অংশকে মেডুলা বলা হয়। কোরটেক্স নিঃসৃত রসকে কোরটিন ও মেডুলা নিঃসৃত রসকে এ্যাড্রিনেল বলে।. সামান্য পরিমাণ এ্যাড্রিনেল রক্তস্রোতে মিশলে বুক ধড়ফড় করে, দ্রুত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বয়, রক্তের চাপ বেড়ে যায়, চোখের তারা বড় হয়ে ওঠে ইত্যাদি। এ জাতীয় লক্ষণ সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবেও প্রকাশ পায়। তবে সে ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি অল্পকাল স্থায়ী হয়। কোরটিন সকলরকম জৈব কাজের সহায়তা করে। উপরন্তু তা পেশীর কাজ ও যৌন কাজকে প্রভাবিত করে। কোন কারণে কোরটেক্স সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের সব রকম জৈব কাজ মন্থর হয় এবং রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আচরণের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, অবিবেচনা ও অসহযোগিতার ভাব দেখা দেয়। এ্যাড্রিনেল কোরটেক্সের অধিক ক্ষরণের ফলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের পুরুষোচিত চেহারা হয়, গলার স্বর ভারী হয় এবং অনেক সময় গোঁফদাড়ি পর্যন্ত গজায়।

এ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড

শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় বংশ বৃদ্ধির জন্য কোষ সৃষ্টি করা ছাড়া আরও কতগুলি রস নিঃসরণ করে। মানুষের আচরণ ও তার বুদ্ধির উপর এদের বিশেষ প্রভাব আছে। এ ধরণের কতকগুলি অন্তঃরস পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই কাজ করে। পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্বের মূলে আছে ঐ গ্ল্যাণ্ডের অন্তঃরসের যথাযথ ও সুসঙ্গত কাজ। মেয়েদের সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের প্রেরণাও ঐ গ্ল্যাণ্ডের প্রভাবে হয় বলে অনেকে মনে করেন।

গোনাড্‌স্ গ্ল্যাণ্ড

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডহুটি মস্তিষ্কের উপরিদেশে মাথার খুলির অভ্যন্তরে অবস্থিত। এ হুটি দেখতে ছোট মটরদানার মত। আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও ও মানসিক বিকাশ অনেকাংশে এই গ্ল্যাণ্ডের রস নিঃসরণের উপর নির্ভর করে। গ্ল্যাণ্ডহুটির সন্মুখ অংশের অন্তঃরস দেহের আভ্যন্তরিক কতগুলি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চাৎঅংশ নিঃসৃত-অন্তঃরস থাইরয়েড্, এড্রিনাল কোরটেক্স, গোনাড্স্ এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডগুলিকে উদ্দীপ্ত করে। এ জন্যই একে প্রধান গ্ল্যাণ্ড (মাষ্টার গ্ল্যাণ্ড) বলা হয়। দেহের বৃদ্ধির উপর পিটুইটারির পশ্চাৎ ভাগের প্রভাব খুব বেশি। শিশুকালে এই অংশটি বিশেষ সক্রিয় হলে বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং অল্পবয়সেই শিশুর চেহারা দৈত্যের মত হয়। তবে অতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে অকালে গ্ল্যাণ্ডের কর্মশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে শিশুর অকাল-মৃত্যু ঘটে। আবার পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের পশ্চাৎ ভগের ক্রিয়া ছোটবেলায় ভাল না হলে শিশুর বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার দরুণ শিশু খর্বাকৃতি হয়। খর্বাকৃতি হলেও এরা দেখতে কিন্তু বামনদের মত নয়। এদের দেহের গড়নের ভিতর বেশ সামঞ্জস্য থাকে। বুদ্ধিও থাকে সাধারণ রকমের। চরিত্রের উপর পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের প্রভাব কি সে সম্বন্ধ বলা কঠিন। এই গ্ল্যাণ্ড অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের উত্তেজক হিসাবেই প্রধানতঃ কাজ করে। তবে এটুকু জানা গেছে, এই গ্ল্যাণ্ড কিছু বেশি সক্রিয় হলে মানুষ রাগী, হিসাবী ও সংযমী হয়। গ্ল্যাণ্ডের সক্রিয়তা কম হলে শিশু অলস হয়। সহজেই সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং একটুতেই কেঁদে ফেলে। তবে এ সবের জন্য কেবলমাত্র পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডই দায়ী নয়। সকল গ্ল্যাণ্ড যদি ঠিকমত তাদের কাজ না করে, পরস্পরের কাজের মধ্যে যদি সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে তবে চরিত্রে এসব লক্ষণ দেখা দেয়।

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড

অসংখ্য স্নায়ু শরীরের সকল প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমাদের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই স্নায়ুজালে সংবদ্ধ। অখণ্ড যোগসূত্রে আবদ্ধ এই স্নায়ুজালকে স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়।

স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ
১। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ২। প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র ও ৩। স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুতন্ত্র।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু। স্নায়ুতন্ত্রের সকল রকম যোগাযোগ সাধনের কাজ এই দুই জায়গাতেই হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলতে মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুকেই বোঝায়।

যে সকল স্নায়ু স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়দের সংযোগ ঘটায় তাদের প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র বলে। এর ভিতর যে সব স্নায়ু জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি থেকে উত্তেজনা বা সংবাদ বহন করে স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছে দেয় তাদের অন্তর্মুখ স্নায়ু বলে। স্নায়ুকেন্দ্র থেকে যে সব স্নায়ু কাজের আদেশ কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে পৌঁছে দেয় তাদের বহির্মুখ স্নায়ু বলে।

প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র

স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থেকেও বেশ কিছুটা স্বাধীন ভাবে কাজ করে। হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ কতগুলি দেহযন্ত্র ও গ্ল্যাণ্ডে এই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ নিবদ্ধ। আবেগ জীবনের সঙ্গে এর গভীর যোগ আছে। শিশুর বিকাশ অধ্যায়ে শিশুর আবেগ জীবন অংশে স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

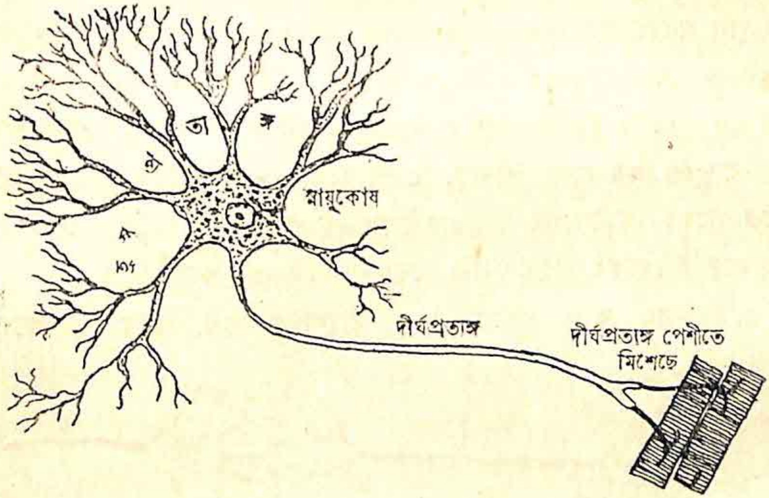
স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ বোঝবার জন্য প্রথমে এর মূল উপাদান নিয়ে সুরু করা যাক। স্নায়ুতন্ত্রের মূল উপাদান স্নায়ুকোষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্নায়ুকোষ, কলা (tissue) ও প্রয়োজনীয় রক্তকণিকা দিয়ে তৈরী এই স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুকোষের দুটি ভাগ। এক, ধূসর বর্ণের কোষ দেহ এবং দুই, অতি সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গ। বেশির ভাগ স্নায়ুকোষে একটি দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ এবং একাধিক হ্রস্ব প্রত্যঙ্গ থাকে। হ্রস্ব প্রত্যঙ্গগুলি গাছের ছোট ছোট প্রশাখার মত দেখতে। দীর্ঘ প্রত্যঙ্গগুলি বেশ কয়েক ফুট লম্বা হতে পারে। কোষ দেহ থেকে একটু দূর পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যঙ্গগুলি নানা ভাগে ভাগ হয়ে যায়। হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুরকম প্রত্যঙ্গেরই প্রান্তদেশ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখায় বিভক্ত। স্নায়ুকোষের দীর্ঘ প্রত্যঙ্গকে তন্তু বলে। দীর্ঘ প্রত্যঙ্গগুলি অন্তরিত টেলিফোন তারের মতন। অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে যে প্রত্যেকটি স্নায়ু অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তুর সমষ্টি। বহির্মুখ স্নায়ুগুলির তন্তুসমূহ মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জুতে অবস্থিত স্নায়ুকোষদের শাখা। প্রতিটি বহির্মুখ স্নায়ু কোন না কোন পেশী বা গ্ল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জুতে ঐ সকল স্নায়ুকোষের উত্তেজনা তাদের দীর্ঘ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে পেশী বা গ্ল্যাণ্ডে সঞ্চারিত হয়। অন্তর্মুখ স্নায়ুগুলির দীর্ঘ প্রত্যঙ্গসমূহ স্নায়ুকেন্দ্রের বাইরে অবস্থিত স্নায়ুকোষগুলির শাখা। চক্ষুতারা অবস্থিত স্নায়ুকোষগুলির উদ্দীপ্ত হলে তাদের দীর্ঘ প্রত্যঙ্গসমূহ সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে

স্নায়ুকোষ

পৌঁছে দেয়। নাকের ভিতর গন্ধবাহী স্নায়ুকোষগুলি তাদের দীর্ঘপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে গন্ধের সংবাদ স্নায়ুকেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যায়। অপর কতগুলি সংগ্রাহক স্নায়ুকোষ স্তবকাকারে মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জুর কাছাকাছি জায়গায় অবস্থিত। ঐ স্নায়ুকোষগুলির বিশেষত্ব এই যে এদের প্রত্যেকটির একটি মাত্র দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ বা তন্তু। এই প্রত্যঙ্গটি দুটি ভাগে বিভক্ত। এর এক ভাগ গিয়ে কোন এক সংগ্রাহক অঙ্গে মিলিত হয় আর এক ভাগ চলে যায় মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জুতে। এইভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয় বা সংগ্রাহক অঙ্গের সঙ্গে এরা স্নায়ুকেন্দ্রের সংযোগ রক্ষা করে।

স্নায়ুকোষের কাজ



সামান্য উত্তেজনাতেই স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজিত হয় ও সেই উত্তেজনা কোষান্তরে সঞ্চারিত হয়। এই স্নায়বিক উত্তেজনা এক প্রকার তাড়িত-রাসায়নিক (ইলেকট্রোকেমিক্যাল) তরঙ্গ বিশেষ। কোন একটি অন্তর্মুখ স্নায়ুকোষ একবার উত্তেজিত হলে নির্দিষ্ট কোন বহির্মুখ স্নায়ুকোষের সাহায্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই। শরীরের কোন অঙ্গ সঞ্চালন বা গ্ল্যাণ্ডের রস নিঃসরণ জাতীয় কোন না কোন কাজের ভিতর দিয়ে ঐ উত্তেজনার সমাপ্তি হয়। এক কথায় কোন স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যর্থ হতে পারে না।

কোন একটি স্নায়ুকোষ যখন উত্তেজিত হয় তখন সেটি পুরোমাত্রাতেই উত্তেজিত হয়। অবশ্য কোষটিকে উত্তেজিত করতে যে পরিমাণ শক্তি বা উদ্দীপক আবশ্যক অন্ততঃ ততটুকু উদ্দীপক থাকা দরকার। একটি উদ্দীপকের দ্বারা স্নায়ু-কোষে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় 'হয় সম্পূর্ণরূপে, নয় তো একেবারেই নয়।' সাধারণতঃ একটি শক্তিশালী উদ্দীপক জোরালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন দেখা যায়। কোন মৃদু আলোর চেয়ে তীব্র আলো আমাদের মধ্যে বেশি অনুভূতি জাগায়। অনুভূতির এই তারতম্য 'হয় সম্পূর্ণরূপে, নয় তো একেবারেই নয়' এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে দুটি কারণে এমনটি ঘটে। তীব্র উদ্দীপক অধিক সংখ্যক স্নায়ুতন্তুকে উত্তেজিত করে। একটি সূচের অগ্রভাগ দিয়ে গাত্রস্পর্শ করলেই বেশ কতগুলি স্নায়ুপ্রান্তে চাপ পড়ে। সূচটি গভীরভাবে বিদ্ধ করা হলে আরো বহুসংখ্যক স্নায়ুতন্তু আলোড়িত হয়। দ্বিতীয়তঃ, তীব্র উদ্দীপক স্নায়ুকোষে একবারে বেশী পরিমাণে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে না সত্য, কিন্তু এক মুহূর্তের ভিতর বহুবার উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। এক মুহূর্তে একটি স্নায়ুতন্তু কম হলে পাঁচবার, বেশি হলে ২০০ বার উত্তেজনা প্রবাহ বহন করতে পারে। উদ্দীপকের তীব্রতার উপর এই সংখ্যা নির্ভর করে। পেশীতন্তু-সমূহ তাই উদ্দীপকের তীব্রতানুযায়ী উত্তেজনা তরঙ্গ বহন করে।

প্রতিক্রিয়ার কাজ বুঝতে হলে স্নায়ুসন্ধির কথা জানা দরকার।



স্নায়ুসন্ধি দুদিকে দুটি স্নায়ুকোষ

স্নায়ুকেন্দ্রের অগণিত স্নায়ুকোষের মধ্যে নানাপ্রকার যোগাযোগের ফলে কত বিচিত্র অনুভূতি, কত বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়!

স্নায়ুসন্ধি

স্বীয় ঝিল্লী-আবরণ নিয়ে প্রতিটি স্নায়ুকোষ একেকটি একক। তথাপি কার্যসূত্রে তাদের পরস্পরকে জড়িত দেখা যায়। একটি স্নায়ুকোষের দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ অপর একটি স্নায়ুকোষের হ্রস্ব প্রত্যঙ্গের সহিত বা কোষদেহের সহিত মিলিত হওয়ার ফলে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চারের পথ তৈরী হয়।

ঐ মিলনস্থানকে স্নায়ুসন্ধি বলে। স্নায়ুসন্ধিতে স্নায়ুপ্রত্যঙ্গ নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে অপর স্নায়ুতন্তুর প্রান্তভাগগুলিতে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অপর স্নায়ুকোষের গাত্রে মিলিত হতে চায়। প্রতিটি স্নায়ু-প্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশে অনেকগুলি প্রশাখা থাকে। সুতরাং একটি স্নায়ুকোষ সাধারণতঃ অনেকগুলি অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুকোষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা স্নায়ুসন্ধির পথে একটি স্নায়ুকোষের দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ থেকে অপর স্নায়ুকোষের হ্রস্ব প্রত্যঙ্গে অথবা কোষ গাত্রে সঞ্চারিত হয়। স্নায়ুসন্ধি একমুখী গতিতে স্নায়বিক উত্তেজনাকে শুধু সম্মুখদিকে প্রবাহিত করে। স্নায়বিক উত্তেজনা স্নায়ুসন্ধিতে বিভিন্ন মাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন স্নায়বিক উত্তেজনা একবার প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করে স্নায়ুসন্ধির পথ দিয়ে সঞ্চারিত হলে পর তাকে বাধা দেবার শক্তি স্নায়ুসন্ধির হ্রাস পায়।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন অনুযায়ী কোন কোন স্নায়ুকোষ জন্মের আগে থেকেই পরস্পর সম্বন্ধিত থাকে। ঐ সব স্নায়ুপথ ও স্নায়ুসন্ধি সহজাত। এ সব ক্ষেত্রে এক স্নায়ুকোষ থেকে অপর স্নায়ুকোষে উত্তেজনা সহজেই সঞ্চারিত হয়। এ ধরণের স্নায়ুপথ ও স্নায়ুসন্ধির সাহায্যে যে সকল কাজ সম্পন্ন হয় তার মধ্যে চমক বা প্রতিবর্তক্রিয়া একটি।

সাধারণ প্রতিক্রিয়ায় উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে যে প্রস্তুতি দরকার হয়, চমক বা প্রতিবর্তক্রিয়ায় তেমনদ রকার হয় না। এর প্রতিক্রিয়া অতি দ্রুত। এবং উদ্দীপনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। (অবশ্য সব প্রতিবর্তক্রিয়া যে সাধারণ প্রতিক্রিয়ার চেয়ে দ্রুত হয় এমন নয়। কোন কোন প্রতিবর্তক্রিয়া সাধারণ প্রতিক্রিয়ার চেয়ে ধীরে হয়। যেমন চক্ষু তারকার প্রতিবর্তক্রিয়া) যেমন কারো হাতে একটি পিন ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত সরিয়ে নেয়। এ কাজের মধ্যে তার ইচ্ছা বা চিন্তার স্থান নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন শ্বাসক্রিয়া) প্রতিবর্তক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে বলে মনে হয়। এই ধরণের প্রতিবর্তক্রিয়াগুলি মেরু-মজ্জার স্নায়ুকেন্দ্রের সাহায্যে হয়। কতগুলি প্রতিবর্তক্রিয়া সচেতন এবং কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য (যেমন হাঁচি)। এখানে প্রতিবর্তক্রিয়া সম্বন্ধে একজন শরীরতত্ত্ববিদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (১)। "একটি সরল চমক বা

প্রতিবর্তক্রিয়া বা রিফ্লেক্স

প্রতিবর্তক্রিয়া সম্ভবতঃ একটি বিমূর্ত ধারণা। সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র পরস্পর সংবদ্ধ। এর কোন অংশই সম্ভবতঃ অপরাপর অংশগুলির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ও তাদের প্রভাবিত না করে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। এটা সুনিশ্চিত যে এই স্নায়ুতন্ত্র কখনও কোন মুহূর্তেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে না।"

স্নায়ুতন্ত্রে অন্তর্মুখ স্নায়ু ও বহির্মুখ স্নায়ুর একটি নির্দিষ্ট সংযোগের ফলে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কোন একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুকেন্দ্র এবং স্নায়ুকেন্দ্র থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট কর্মেন্দ্রিয় পর্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবাহের পথটিকে প্রতিফলন-ধনু বা স্নায়বিক ক্রিয়ার গতিপথ বলা হয়।

স্নায়বিক ক্রিয়ার গতিপথ বা প্রতিফলন ধনু

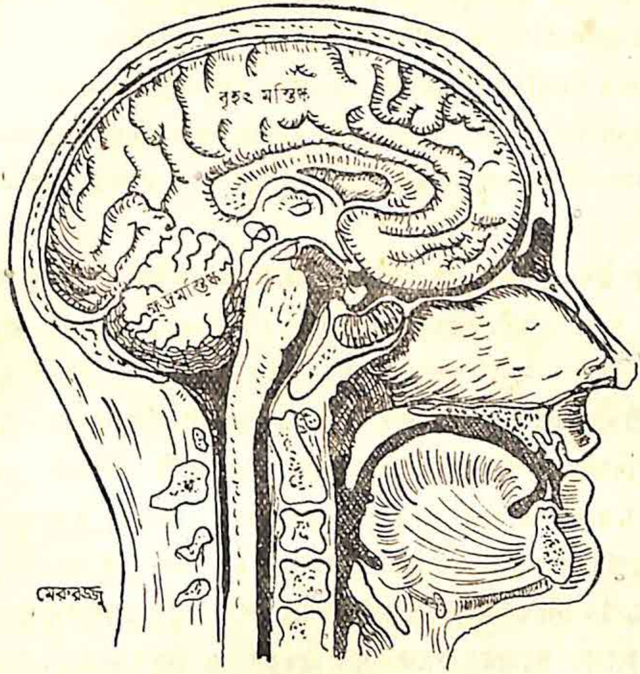
একটি সহজতম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতেও কম পক্ষে দুটি স্নায়ুকোষের (একটি অন্তর্মুখ ও একটি বহির্মুখ) দরকার হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনটি বা কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি স্নায়ুকোষের সংযোগ আবশ্যক।

বিবর্তনবাদের দিক থেকে বিচার করলে মেরুরজ্জুই স্নায়ুতন্ত্রের প্রথম স্তর। খণ্ড খণ্ড অস্থি দ্বারা মেরুদণ্ড গঠিত। সেই খণ্ড খণ্ড অস্থিগুলি পরস্পর যুক্ত। ঐ আবরণের ভিতর থাকে সাদা নরম দড়ির মত পদার্থে গঠিত এই মেরুরজ্জু। তিরিশ জোড়ারও বেশি প্রান্তিক স্নায়ু—মেরুরজ্জু থেকে মেরুদণ্ডের দু পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মেরুরজ্জুর পথে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি থেকে উত্তেজনা বা সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছায় ও মস্তিষ্ক থেকে কর্মেন্দ্রিয়ের প্রতি যথাযোগ্য কাজের আদেশ আসে। মেরুরজ্জুর নিজস্ব একটি সংযোজনকেন্দ্রও আছে। তুলনামূলক ভাবে কতগুলি সহজ প্রতিবর্তক্রিয়ার কাজ মেরুরজ্জুতেই হয়। এ ছাড়া যে সব কাজে সচেতন ভাবে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ দরকার হয় না সে কাজগুলিও মেরুরজ্জুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কাজ

মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান সংযোজনা ও সঙ্গতি সাধনের কেন্দ্র। এটি একটি কোমল স্নায়ুপদার্থে তৈরী। অবস্থানভেদে আলাদা আলাদা নাম হলেও প্রকৃত পক্ষে মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু একটি অখণ্ড পদার্থ। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ : (ক) অধঃমস্তিষ্ক (খ) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (গ) সেতু মস্তিষ্ক (ঘ) বৃহৎ মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্ক



মেরুরজ্জুর ঠিক উপরে অধঃমস্তিষ্ক অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে অধঃমস্তিষ্ককে মেরুরজ্জুর শীর্ষদেশ বলা চলে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি কতগুলি কার্য পরিচালনায় অধঃমস্তিষ্ক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

অধঃমস্তিষ্ক

অধঃমস্তিষ্ক রেখা থেকে একটু সরে মাথার পিছন দিকে ঘাড়ের ঠিক উপরে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অবস্থিত। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক শরীরের পেশীসমূহের কাজের মধ্যে সংযোগ ও সঙ্গতি রক্ষা করে ও দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে স্নায়ুতন্তু গঠিত একটি ক্ষুদ্র অংশকে পনস্ বলে। এটিও একটি বিশেষ সামঞ্জস্যসাধন কেন্দ্র।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও পনসের উপর একটি সংযোজক কেন্দ্র আছে। মস্তিষ্কের এই অংশটিকে সেতু মস্তিষ্ক বা মধ্য মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। এর কাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা থাকলেও এখনও অনেক কিছুই আমাদের অজানা রয়েছে। এতে থ্যালামাস্ নামে একটি জটিল স্নায়ুকেন্দ্র

সেতুমস্তিষ্ক বা মধ্যমস্তিষ্ক

আছে। মস্তিষ্কের উর্ধ্বতম স্তর ও স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য অংশের মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা চলাচল বা সংবাদ আদানপ্রদানের সোজাসুজি কোন পথ নেই। এ কাজ একমাত্র থ্যালামাসের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। সেতু মস্তিষ্কের সাবথ্যালামাস্ ও হাইপোথ্যালামাস নামক কেন্দ্র ছুটি দেহের কতগুলি আভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। আবেগজীবনের উপর হাইপোথ্যালামাসের বিশেষ প্রভাব আছে।

বৃহৎ মস্তিষ্ক

ভ্রূদ্বয়ের উপর থেকে ঘাড়ের কিছু উপর পর্যন্ত ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে প্রায় আবরিত করে বৃহৎ মস্তিষ্ক বিস্তৃত। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় অংশ। সামনে থেকে বরাবর পিছন দিক পর্যন্ত একটি খাঁজ একে দুভাগে ভাগ করেছে। এ দুটি ভাগ আবার পাশাপাশি দুটি খাঁজে বিভক্ত। বৃহৎ মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ধূসর বর্ণের স্তরটিকে কোরটেক্স (cortex) বলে। এতে বহু খাঁজ ও ভাঁজ দেখতে পাওয়া যায়। মনের চেতনা, বুদ্ধি, বিচারক্ষমতা, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে মস্তিষ্কের এই অংশের নিবিড় যোগ রয়েছে। নিম্নতর স্নায়ুকেন্দ্রগুলির কাজে বৃহৎ মস্তিষ্ক প্রয়োজনমত সাহায্য করে। আবার তাদের কাজে বাধা দেওয়া ও নিবৃত্ত করার দায়িত্বও বৃহৎ মস্তিষ্কের। এককথায় নিম্নতর স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর বৃহৎ মস্তিষ্ক সর্বময় কর্তৃত্ব করে।

মস্তিষ্কের ওজন ও বুদ্ধি

মাথা বড় হলে বুদ্ধি বেশি হয় সাধারণ ভাবে এমন একটি ধারণা আছে। এ বিষয় কিছু কিছু পরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে জীব জন্তুদের মধ্যে শরীরের তুলনায় মস্তিষ্কের ওজন যাদের বেশি তারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। তবে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে তার মস্তিষ্কের ওজনের কোন সম্বন্ধ আছে বলে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

বিভিন্ন মানসিক কাজের জন্য চিহ্নিত মস্তিষ্কের অংশ

বিভিন্ন মানসিক কাজের জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট আছে কিনা এটি একটি প্রশ্ন। এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে। বহু গবেষণার পর এইটুকু স্থির হয়েছে যে কিছু কিছু মানসিক কাজের জন্য মস্তিষ্কে বিশেষ কতগুলি নির্দিষ্ট স্থান আছে। তবে অনেক কাজেই মস্তিষ্কের একাধিক অংশের এমন কি প্রায় সমগ্র মস্তিষ্কের সাহায্যই প্রয়োজন হয়।

চোখ দিয়ে আমরা দেখি। প্রকৃতপক্ষে সে দেখার কাজ সম্পূর্ণ হয় আমাদের

মাথার একেবারে পিছনে—মস্তিষ্কের সর্বোচ্চস্তরের সাহায্যে। মস্তিষ্কের ঐ অংশের কোন রকম ক্ষতি হলে মানুষ প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। কানে শোনা, দৈহিক কর্ম ও অনুভূতির জন্য মস্তিষ্কে অনুরূপ বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থান আছে। দেখা, শোনা ও ঐধরণের কতগুলি সহজ কাজের জন্য মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট স্থান থাকলেও জটিল পর্যবেক্ষণ, স্মরণ ও শেখার কাজের জন্য অমন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই।

বর্তমানে মস্তিষ্কের একান্ত সম্মুখদেশে অনুষঙ্গ অঞ্চলটি নিয়ে বহু গবেষণা হচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে যে সব মানসিক কাজ দরকার হয় তার জন্য মস্তিষ্কের এই স্থানটির সাহায্য আবশ্যক। এ বিষয় বানর নিয়ে বহু অনুসন্ধান হয়েছে। দেখা গেছে বানরদের মস্তিষ্কের এই অংশ অপসারিত করার ফলে উদ্দেশ্যমূলক কাজ করবার ক্ষমতা তাদের নষ্ট হয়ে যায়।

মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগের এই অংশটি কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষও তার দৈনন্দিন জীবনের উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে না।

আজকাল কতকগুলি মানসিক রোগের অস্ত্রচিকিৎসায় এই জ্ঞান কাজে লাগান হচ্ছে। মস্তিষ্কের এই অংশের কিছুটা অপসারণ বা কোন কোন তন্তুর গতিমুখে বাধাসৃষ্টি দ্বারা ঐ সকল রোগের কিছু উপশম হয় এমন দেখা গেছে। যদিও এর ফলে রোগীদের আচরণের মধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতিও লক্ষিত হয়েছে।

অধ্যায় ২২

অস্বাভাবিক শিশু

শিশুদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। কারো বুদ্ধি বেশী কারো বুদ্ধি কম, কেউ পড়াশোনায় ভাল, কেউ ভাল নয়, কেউ ধীর স্থির, কেউ আবেগপ্রবণ ইত্যাদি। মানসিক গুণাবলী কম বেশী থাকলেও কম বেশীর একটি মাত্রা পর্যন্ত শিশুদের আমরা স্বাভাবিক মনে করি। সেই মাত্রা অতিক্রম করলে শিশু অস্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে।

অস্বাভাবিক শব্দটিকে আমরা বেশী গুণসম্পন্ন ও অল্প গুণসম্পন্ন—দুই অর্থেই ব্যবহার করছি। বুদ্ধির কথা ধরা যাক। অল্পবুদ্ধি যাদের—তাদের আমরা অস্বাভাবিক বলি। উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রতিভাযুক্তদেরও অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে—বাংলা ভাষায় যদিও সাধারণতঃ অমন বলা হয় না। তেমন শিশুদের (বা লোকদের) আমরা বলি অসাধারণ। ১২০'র উপরে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক, বুদ্ধি ব্যাপারে তারা আসাধারণ। প্রথমতঃ অসাধারণদের নিয়ে আলোচনা করব। ১২০ থেকে ১৪০ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন। ১৪০ উপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক* তাদের প্রতিভাসম্পন্ন বা অসামান্য বলা চলে। অসামান্য শিশুদের সম্বন্ধে টারম্যান্ কিছু অনুসন্ধান করেছেন। এ সব শিশুরা যে কেবলমাত্র বুদ্ধিতেই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের স্বাস্থ্য ও আবেগজীবন সাধারণ শিশুদের তুলনায় ভালো বলে দেখা যায়। এদের কৌতুকপ্রিয়তা, ধৈর্য, মনোযোগের ক্ষমতা ও আগ্রহ প্রভৃতিও বেশী। প্রকৃতি যাদের উপরে সদয়, সকল দিক দিয়েই প্রকৃতির দান যেন তারা লাভ করে। একদিক দিয়ে বঞ্চিত করে অপর দিক দিয়ে পূর্ণ করা সাধারণতঃ প্রকৃতির নিয়ম নয়। একথা অবশ্য সত্য যে, প্রতিভাযুক্ত শিশুরা বুদ্ধিতেই অসামান্য। অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী সাধারণের তুলনায় তাদের

অসামান্য শিশু

* সীমাটি ১৩০ না ১৪০ বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—এ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন।

বেশী থাকলেও—ঐ সব বিষয়ে তাদের অসামান্য বলা চলে না। হাতের কাজে এদের ক্ষমতা সম্ভবতঃ স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে বেশী নয়। ১৩০'র উপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা চলে এমন মনে করবার কারণ নেই। ঐ উক্তি শুধু সাধারণ ভাবে সত্য।

প্রকৃত বয়সের তুলনায় এদের মনোবয়স বেশী। মানসিক বয়োবৃদ্ধির হার এদের স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে অধিক। প্রশ্ন এই যে বিদ্যালয়ে এদের শ্রেণী নির্বাচনে কোন বয়সকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হবে—প্রকৃত বয়স না মনোবয়স? একটি আট বছরের ছেলে, এগারো বছর তার মনোবয়স। আট বছরের ছেলেরা সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। সে কি আট বছরের ছেলেদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বে? না, তাকে পড়তে দেওয়া হবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে—যেখানে অধিকাংশ ছেলের বয়স এগারো বছর? পড়াশোনার দিক দিয়ে যদি বিচার করা যায়—তবে আশা করা চলে যে পড়া সে এগারো বছরের ছেলেদের মতই পারবে, লেখায় অবশ্য তার কিছু অসুবিধা হবে। তৃতীয় শ্রেণীতে তাকে ভর্তি করে দিলে শ্রেণীর পাঠ তার কাছে বড় বেশী সহজ হবে। অমন পাঠ তার চিত্তাকর্ষক হবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যে পাঠ ও কাজের দ্বারা শিশুর ক্ষমতা ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয়, সে পাঠ ও কাজই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করতে পারে। মনোবয়সের ভিত্তিতে শ্রেণী নির্বাচন করলে শ্রেণীর পাঠ্য শিশুর বুদ্ধিগত বিকাশের অধিকতর উপযোগী হবে। কিন্তু এগারো বছরের ছেলেদের সাহচর্য, তাদের সঙ্গে খেলাধূলায় একটি আট বছরের শিশুর পক্ষে সুস্থ দৈহিক ও সামাজিক বিকাশ লাভ করা কঠিন। বুদ্ধিগত বিকাশই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। শিশুর দৈহিক, সামাজিক আবেগজীবনের বিকাশের কথা ভুললে চলবে না। এক আধ বছরের বড় ছেলেদের সঙ্গে পড়াশোনা চলতে পারে—কিন্তু বয়সের পার্থক্য তার চেয়ে বেশী হওয়া সঙ্গত নয়। ক্রিম্যানের ধারণা (১) প্রকৃত বয়সের তুলনায় উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ছুটি শ্রেণী উপর পর্যন্ত পড়তে দেওয়া যেতে পারে। তার বেশী নয়।

অসামান্য শিশুদের শিক্ষা ও শ্রেণী নির্বাচন

বয়সের তুলনায় কে উচ্চতর শ্রেণীতে পড়বে, কে পড়বে না—এ ব্যাপারটি নির্ধারণে বুদ্ধি ছাড়া শিশুর দেহ মনের অন্যান্য দিকের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

আরেকটি উপায়ে প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অনুকূল সামাজিক বিকাশের জন্য ছেলেমেয়েদের প্রকৃত বয়সানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হোক; জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য তাদের পাঠক্রম সমৃদ্ধ করা হোক; সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ে তারা সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে পরিমাণে বেশী পড়বে, বিষয়গুলির তাৎপর্য তারা বেশী বুঝবে। তাদের চিন্তা ও সৃজনীশক্তির বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পাঠক্রমের এই সমৃদ্ধি অনুভূমিক হবে, উল্লম্ব নয়। অর্থাৎ, সেই শ্রেণীর পাঠক্রমকেই প্রধানতঃ বিস্তৃততর ও ব্যাপকতর রূপে প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের আয়ত্ত করতে বলা হবে।

পাঠক্রম সমৃদ্ধি

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সাধারণতঃ উনমানস বলা হয়। কিন্তু একমাত্র বুদ্ধির পরিমাণ দিয়ে একজনকে উনমানস বলে মনে করা চলে না। ধরা যাক, দুজন লোকের বুদ্ধ্যঙ্ক একই। কিন্তু সময় সময় এমন দেখা যায়, একজনের শেখবার ক্ষমতা আরেকজনের চেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপে বেশী। বুদ্ধিকে কিভাবে কতখানি ব্যবহার করা যাবে—সেটা অনেকটা নির্ভর করে আবেগজীবনের সংহতি ও স্বরূপের উপর। উনমানস নির্ধারণে যেমন বুদ্ধ্যঙ্কের খোঁজ নেওয়া দরকার, তেমনি জানা দরকার কতখানি একজন প্রকৃত শিখতে পেরেছে, তার সামাজিক ও আবেগজীবনের সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যই বা কতখানি। একজন উনমানস কিনা স্থির করতে গোটা মানুষটাকে বিচার করা দরকার।

উনমানস

তবে উনমানসতা নির্ণয়ে বুদ্ধিই যে সবচেয়ে বড় তথ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৫০ থেকে ৭০ পর্যন্ত যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের সাধারণতঃ শিক্ষাযোগ্য উনমানস বা হীনবুদ্ধিসম্পন্ন বলা চলে। ৫০-এর নীচে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক, লেখাপড়া শেখা তাদের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। একই ধরণের সহজ হাতের কাজ করে এদের একাংশ জীবিকা অর্জন করতে পারে। বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের খুব কম, সারাজীবনই তাদের পরাশ্রিত ও পরনির্ভরশীল জীবনযাপন করতে হয়। ভিন্‌ল্যাণ্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কোন মনোবয়স (আমরা একটু আধটু পরিবর্তন করেছি) এবং কোন বুদ্ধ্যঙ্কের লোকেরা কি জাতীয় কাজ করতে পারে—নীচে তা উল্লেখ করা হল ঃ

সারণী ১৭

শ্রেণী ও বুদ্ধ্যঙ্ক	মনোবয়স	কর্মদক্ষতা
ক। জড়ধী (Idiot)— এদের বুদ্ধাঙ্ক ২০'র নীচে।	২, ২½ বছরের নীচে।	এদের কেউ কেউ একান্ত অসহায়। আবার কেউ হাঁটতে পারে, নিজের হাতে খেতে পারে।
খ। অল্পধী (Imbecile)— এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০-৫০।	৩—৭ বছর।	অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অল্পধী শিশুরা খেলে কিন্তু কাজ করে না। একটু বেশী বুদ্ধি থাকলে খুব সরল কাজ করতে পারে। প্লেট ধুতে, ঘরদোর ঝাট দিতে, ছোট খাট ফাইফরমাস খাটতে—এদের শেখান যায়।
গ। হীনধী (moron)— এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০-৭০	৮—৯।১০ বছর।	এরা অপেক্ষাকৃত ভারী কাজ করতে পারে। বিছানা করতে, গৃহ নির্মাণে ইট সাজাতে এদের শেখান যায়।

৫০ থেকে ৭০ কিংবা ৮০ পর্যন্ত যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক, নিজেদের মানোবয়সানুযায়ী কিছু কিছু লেখাপড়া শেখা তাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু সাধারণ বা স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই স্কুলে বা একই শ্রেণীতে পড়ে তাদের পক্ষে লাভবান হওয়া কঠিন। শ্রেণীর পড়া আয়ত্ত করা এদের পক্ষে প্রায়ই অমন ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়। নিজের প্রতি এদের ধিক্কার জন্মে। নিজের হীনত্ববোধ থেকে মুক্তির জন্য অনেক সময় এরা শ্রেণীতে গোলমাল করে, এমন কি কেউ কেউ সামাজিক অপরাধের পথও বেছে নেয়।

শিক্ষাযোগ্য উনমানস

প্রকৃত বয়স অনুযায়ী এরা লেখাপড়া শিখবে এমন দাবী করা সঙ্গত নয়। মনোবয়সের দ্বারা এদের পাঠক্রম নির্ধারিত হওয়া উচিত। উন্নত দেশসমূহে এদের জন্যে বিশেষ বিদ্যালয় এবং বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐসব বিদ্যালয়ে হাতের কাজের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। যার পক্ষে যতটুকু লেখাপড়া শেখা

সম্ভব—তা শেখবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাত্যহিক জীবনে যে সব জ্ঞান দরকার, সেই সবই বিশেষভাবে তাদের শেখাবার চেষ্টা করা হয়। একজন লোকের একটি বিষয় আয়ত্ত করতে কত সময় লাগবে সেটা নির্ভর করে প্রধানতঃ তার বুদ্ধ্যঙ্কের উপর। বুদ্ধ্যঙ্ক যেখানে কম, সেখানে শিখতে সময় বেশী লাগে। এই সব বিশেষ শ্রেণী বা বিদ্যালয়ে শেখবার জন্য অতিরিক্ত সময় তারা পায়। সংক্ষেপে, মনোবয়সের দ্বারা প্রধানতঃ নির্ধারিত হয়—কতটুকু তারা শিখতে পারবে এবং বুদ্ধ্যঙ্কের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাদের শেখবার গতি।

অনগ্রসর শিশু বলতে আমরা লেখাপড়ায় কাঁচা এমন ছেলেমেয়েদের বুঝি। বার্ট (২) মনে করেন যে সব শিশুর শিক্ষাঙ্ক ৮৫'র নীচে, তাদেরই অনগ্রসর বলা সঙ্গত হবে। $\frac{\text{শিক্ষার বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$ হচ্ছে শিক্ষাঙ্ক।

অনগ্রসর শিশু

শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ খুঁজতে গিয়ে বার্ট লণ্ডনের ছেলে মেয়েদের নিয়ে তার একটি অনুসন্ধানে আবিষ্কার করেছেন যে অনগ্রসর ছেলে মেয়েদের শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫'র নীচে। "এদের অনগ্রসরতা দূর করা সম্ভব নয়।" ঐ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে শতকরা ৯৫ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক স্বাভাবিকের চেয়ে কম।

যে সব শিশুর শিক্ষাবয়স তাদের মনোবয়সের চেয়ে কম তাদের শিক্ষায় মন্দিত বলা হয়। পরিবেশে পরিবর্তন ঘটিয়ে, শিক্ষালাভের প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে এসব শিশুদের অনগ্রসরতা দূর বা হ্রাস করা সম্ভব।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বুদ্ধি আছে, কিন্তু একেবারে পড়বার ইচ্ছা নেই; কিম্বা, ইচ্ছা হয়ত আছে—কিন্তু উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার জন্য মনোযোগের ক্ষমতা কম। ইচ্ছা ও আবেগের এ ধরণের ত্রুটির ফলে কিছু ছেলেমেয়েদের শিক্ষ মন্দিত হতে দেখা যায়। তাদের আবেগ জীবনের ত্রুটি দূর করা সম্ভব হলে শিক্ষার গতি তাদের মনোবয়সানুযায়ী হবে।

শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ

যে সব অস্বাভাবিক আচরণ শিশুদের মধ্যে দেখা যায় সেগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে: (ক) সমাজ-বিরোধী আচরণ (খ) আত্মবিরোধী আচরণ। শ্রেণীতে গোলমাল করা থেকে আরম্ভ করে চুরি করা, কাউকে গুরুতর আঘাত করা—এসব সমাজ-বিরোধী আচরণের দৃষ্টান্ত। লেখাপড়ায় অনিচ্ছা, অত্যধিক ভয়, কারো সঙ্গে

মিশতে অনিচ্ছা, সব সময়েই একা একা থাকা, প্রায়ই বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন ভাব, নিউরসিস বা উদ্বায়ু রোগ—এ সব হচ্ছে আত্মবিরোধী আচরণ।

সমাজ-বিরোধী আচরণে শিশু সামাজিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধতা করে, অন্যের ক্ষতি করে। আর আত্মবিরোধী আচরণে সে নিজের ক্ষতি করে। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে কোন আচরণই একান্তরূপে সমাজ-বিরোধী বা একান্তরূপে আত্মবিরোধী নয়। যা সমাজ-বিরোধী, তা আত্মবিরোধীও। যে ছেলে চুরি করে, সে অন্যের ক্ষতি করে, কিন্তু নিজের ক্ষতিও সে কম করে না। যা আত্মবিরোধী, তা কিছু পরিমাণে সমাজ-বিরোধীও। সে ছেলের মানসিক রোগ নিয়ে বাবা মা আত্মীয়স্বজনদের কম ভুগতে হয় না। তবে কোন আচরণে সামাজের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবটা বেশী প্রকট, কোন আচরণে আত্মবিরোধটা অধিক প্রকট।

অস্বাভাবিক শিশুদের শ্রেণীবিন্যাস

বার্ট (৩) অস্বাভাবিক শিশুদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন (ক) উত্তেজিত ও আক্রমণেচ্ছু শিশু (খ) ভীত ও দমিত শিশু। উত্তেজিত ও আক্রমণেচ্ছু শিশুদের আচরণে সমাজের প্রতি বিরোধটি বড় এবং ভীত ও দমিত যারা তাদের মধ্যে আত্মবিরোধটা বেশী।

অসমঞ্জস শিশু ও সামাজিক অপরাধী বা মানসিক রোগী

আচরণ ও আবেগজীবনে গোলমাল থাকা সত্বেও তাদের পরিপূর্ণভাবে সামাজিক অপরাধী বা মানসিক রোগী বলা যায় না এমন শিশুদের অসমঞ্জস শিশু বলা হয়। অসমঞ্জস শিশুদের কার্যকলাপ কিছু পরিমাণ অসামাজিক ও সমাজ বিরোধী। মানসিক রোগের কিছু কিছু লক্ষণও সময় সময় তাদের মধ্যে দেখা যায়।

একান্ত শৈশবে ছোটদের মধ্যে সামাজিক বোধ কম থাকে। সামাজিক রীতি-নীতি তারা বোঝে কম। অন্যের সুখদুঃখ বা অন্যের প্রয়োজনের দিকটা তারা কম দেখে। শিশু সাধারণতঃ খামখেয়ালী, আবেগপ্রবণ ও আত্মকেন্দ্রিক। এ জন্য বলা চলে যে তার প্রায় অধিকাংশ আচরণই কিছু পরিমাণে অসামাজিক।

ছোট শিশুদের অসামাজিকতা

সামাজিক চেতনা গড়ে ওঠার আগে শিশুর যেটা স্বাভাবিক আচরণ সেটাকে অসামাজিক বললেও সমাজ-বিরোধী বলা সঙ্গত হবে না। এরি মধ্যে কোন কোন শিশুর আচরণে অসামাজিক ভাবটির বাড়াবাড়ি দেখা যায়। যেটুকু সামাজিক বোধ

একটি স্বাভাবিক শিশুর মধ্যে দেখা যায় তাও এদের থাকে না। এদের কার্য-কলাপকে কিছু পরিমাণে সমাজ-বিরোধী বোধ হয় বলা চলে। কোন কোন ছেলে অন্যদের প্রায় সব সময়ে মারধোর করে; ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ইংরেজিতে যাকে বলে bully এরা তাই। আবার কোন কোন ছেলেমেয়ের রাগ হলে তাদের আচরণ সব রকম মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তারা হাত পা ছোড়ে, চীৎকার চেঁচামেচি করে, কাঁদে, মাথা খোঁড়ে। এ জাতীয় বদমেজাজকে ইংরেজিতে Temper Tantrum বলা হয়।

শিশু যখন বড় হয়, গৃহ ছাড়াও খেলার মাঠ ও বিদ্যালয় তার পরিবেশ রচনা করে। ঐ পরিবেশের প্রয়োজন ও দাবী কেউ সহজ ও সুষ্ঠুভাবে মেনে নেয়, কেউ তা পারে না। তার অক্ষমতা ও বিদ্রোহ আত্ম প্রকাশ করে নানা প্রকার সমাজ-বিরোধী আচরণের মধ্য দিয়ে। স্কুল পালান, পরীক্ষায় অসাধুতা এসব সমাজ-বিরোধী কাজের দৃষ্টান্ত।

আত্মবিরোধী আচরণ

পড়াশুনায় অনিচ্ছা, উদ্যমের অভাব, বিমর্ষভাব, আত্মবিশ্বাসের অভাব, হীনতাবোধ থেকে আরম্ভ করে মানসিক বিকার ও ব্যাধি এগুলি আত্মবিরোধী আচরণের দৃষ্টান্ত। মানসিক ব্যাধিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ (ক) বায়ুরোগ বা নিউরসিস্ (খ) উন্মাদ রোগ বা বাতুলতা। কোন একটা চিন্তা বারে বারে মনে আসছে—কিছুতেই দূর করা যাচ্ছে না, কোন একটি বস্তুর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভীতি, নিয়ত উৎকণ্ঠা—এসব বায়ু রোগের দৃষ্টান্ত। পাগল বা উন্মাদ রোগগ্রস্ত লোক আমরা প্রায় সবাই দেখেছি। পাগলদের কেউ হয়ত নিজেকে মনে করছে সে রাজা, তার বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে। কেউ হয়ত খাওয়া, কথাবার্তা সব বন্ধ করে নিজেকে সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। নিউরসিসে বাস্তববোধ কম হলেও কিছু থাকে এবং রোগীর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে সে রোগগ্রস্ত। উন্মাদ রোগে বাস্তব জ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। রোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস যে ভ্রান্তি, রোগেরই একটি লক্ষণ—রোগী তা বোঝে না।

বায়ু রোগের বিভাগ

নিউরসিসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ (ক) অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ। কখন কি হবে, কখন কি ঘটবে, এমন আশঙ্কায় মন সর্বদা উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত থাকা এ রোগের এই হচ্ছে লক্ষণ। (খ) আতঙ্ক। আতঙ্ক রোগের লক্ষণ কোন একটি বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে অস্বাভাবিক

ও অত্যধিক ভয়। কেউ কেউ চামচিকে বা আরশুলাকে দেখে ভয়ানক ভয় পায়। মেয়েদের মধ্যে এটি বেশী দেখা যায়। ছোট বেলায় ছেলেরা কেউ কেউ ঘোড়াকে, কুকুরকে বিশেষ ভয় পায়। এ সব হচ্ছে আতঙ্ক রোগের দৃষ্টান্ত। (গ) কনভার্সন হিস্টিরিয়া। এ রোগে মানসিক উত্তেজনা দৈহিক লক্ষণে রূপান্তরিত হয়। কোন কোন লোক চোখে দেখতে পায় না। কানে শুনতে পায় না। কিন্তু তাদের দেহ-যন্ত্রে কোন গোলমাল নেই। দেখা বা শোনার অবদমিত অনিচ্ছার ফলে এ জাতীয় অন্ধত্ব বা বধিরত্ব সৃষ্টি হয়। কনভার্সন হিস্টিরিয়ার এসব হচ্ছে দৃষ্টান্ত। (ঘ) বাতিক বা অবসেসন। কোন চিন্তা বা কোন কাজ না করে কিছুতেই থাকা যায় না, কিছু না ভাবলে বা না করলে ভয়ানক অস্বস্তি হয়—এ ধরণের রোগকে বাতিক বলে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে কোন কোন লোক সিঁড়িগুলি না গুনে উঠতে পারেন না; কোন কোন লোকের মধ্যে দেখা যায় সব সময় একটি অশুচিবোধ, বারে বারে তাদের স্নান করতে হয়, হাত পা ধুতে হয়। এ সব বাতিকের দৃষ্টান্ত।

উন্মাদ রোগকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ (ক) সিজোফ্রেনিয়া বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা। এই রোগে রোগী নিজেকে সকলের কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়। একক অবস্থায় সময় সময় স্থাণুবৎ হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে রোগীর বুদ্ধিও আক্রান্ত হয়। রোগীর বোধসোধ কমে আসে। (খ) প্যারানোইয়া। এ রোগে রোগীর কমবেশী তিন প্রকার ভ্রান্তি বা অমূল প্রত্যয় জন্মায়। নিজেকে রোগী খুব বড় মনে করে। একটি রোগীর ধারণা ছিল সে জুলিয়াস সিজার, আরেকজনের ধারণা সে একজন অবতার। তাদের নির্যাতন করবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র চলছে—এ বিশ্বাস এদের অনেকের মধ্যে থাকে। স্বামীর (বা স্ত্রীর) চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহবায়ু এ রোগের একটি লক্ষণ। (গ) ম্যানিক ডিপ্রেসিভ উন্মাদ রোগ বা খেদোন্মত্ত বাতুলতা। এ রোগে কখনও রোগী অকারণ আত্মগ্লানি, অনুশোচনা ও অবসাদে ভোগে, আবার কখনও অস্বাভাবিক উদ্যম, উত্তেজনা ও উন্মত্ততা তাকে আশ্রয় করে।

উন্মাদ রোগের বিভাগ

মানসিক রোগের সূত্রপাত শৈশবে হলেও তার পরিপূর্ণ রূপ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই সাধারণতঃ দেখা যায়। শৈশবজীবনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের বাধা মানসিক রোগের একটি প্রধান কারণ। সেজন্য ব্যাধি নিবারণ ও মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হলে শিশু যাতে সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ পায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

আবেগজীবনের ক্রটী ও বুদ্ধির দৈন্য অস্বাভাবিক আচরণের কারণ বলে মনে করা হয়। ছেলেমেয়েদের সামাজিক অপরাধের সঙ্গে বুদ্ধির স্বল্পতার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা—এ বিষয় জানবার কিছু চেষ্টা হয়েছে। ২০০টি অল্পবয়সী সমাজ-অপরাধীকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে (৪) তাদের শতকরা ৮০ ভাগের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০'র চেয়ে কম। শতকরা মাত্র ৮ ভাগের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০৫'র চেয়ে বেশী। বুদ্ধির স্বল্পতার সঙ্গে সামাজিক অপরাধের এই সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বলা সঙ্গত হবে না। সমাজ এদের কাছে যে দাবী করে—এরা বেশীর ভাগই তা পূরণ করতে পারে না। পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এদের ক্ষমতা কতখানি তা বুঝতে না পেরে প্রায়ই এদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। ফলে এদের মধ্যে আক্রোশ ও হীনতাবোধের সৃষ্টি হয়। সামাজিক অপরাধের পথ গ্রহণ করে অচেতনভাবে এরা নিজেদের আক্রোশকে চরিতার্থ করে, নিজেদের চক্ষে নিজেদের মূল্যকেও বাড়ায়।

সামাজিক অপরাধের কারণ

আবেগজীবনের ক্রটীই অসমঞ্জস আচরণ ও সামাজিক অপরাধের প্রধান কারণ। ক্রটী নানাদিক দিয়ে নানাভাবে প্রকাশ পায়। ছেলেদের সামাজিক অপরাধে চুরির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত শিশুরা কেউ কেউ চুরি করে। যে স্নেহে তারা বঞ্চিত হল চুরির মধ্য দিয়ে বুভুক্ষিত মন তারই অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় পিতামাতার বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ ও প্রতিশোধের ইচ্ছা (৫)। যে মা বাবা তাদের ভালোবাসেন না, তাদের ও তৎস্থানীয় বড়দের জিনিস তারা নিয়ে নেবে ও তাদের ক্ষতি করবে। শিশু যদি পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করতে না পারে, পিতামাতা যদি অপরাধদুষ্ট হন তবে সে সব শিশুর পক্ষে সামাজিক অপরাধের পথ বেছে নেওয়া স্বাভাবিক। শিশু পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে পারলে পিতার আদর্শে সে তার জীবনকে গড়ে তোলে। শ্রদ্ধার অভাব ঘটলে শিশুর জীবনে আদর্শের অভাব ঘটে, নিজেকে শ্রদ্ধা করতেও শিশু শেখেনা। আত্মশ্রদ্ধাহীন জীবন আবেগ ও প্রবৃত্তির একান্ত দাস। নিয়ম ও শৃঙ্খলা যে গৃহে ক্রটীপূর্ণ—সে গৃহ শিশুর আবেগজীবন বিকাশের অনুকূল নয়। শিশুর অসমঞ্জস আচরণ, এমন কি সামাজিক অপরাধের একটি কারণ ঐ জাতীয়

সামাজিক অপরাধে আবেগজীবনের ক্রটী

সামাজিক অপরাধের কারণ স্নেহের অভাব

পিতামাতাকে অশ্রদ্ধা

গৃহে নিয়ম শৃঙ্খলার ক্রটী

গৃহ। আদুরে শিশু যা চায় প্রায়ই তা পায়। কোন কোন গৃহে নিয়ম ও শৃঙ্খলার বাড়াবাড়ি শিশুকে নিয়ত পীড়িত করে। আবার এমন পিতামাতাও আছেন যাঁরা একসময় শিশুকে যা খুশি তা করতে দেন, আবার অন্য সময়ে শিশু যা করতে চায়—তাতেই বাধা দেন। দেখা গেছে—শেষোক্ত ধরণের গৃহ শিশুর অনুকূল বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক। এ জাতীয় গৃহ শিশুর মানসিক নিরাপত্তাবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। কি করতে হবে, কি করলে ভালো হয়—নিশ্চিতরূপে সে কিছুই জানে না, বোঝে না। শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পিতামাতার মধ্যে যেখানে সদ্ভাব নেই, যে গৃহে পিতা বা মাতা বা পিতামাতা কেউ নেই—সে গৃহ শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের প্রতিকূল।

পিতামাতার মধ্যে অসদ্ভাব বা পিতামাতার অভাব

অত্যধিক দারিদ্র্যের ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের পক্ষে মানসিক বিকাশের পূর্ণতার জন্য কিছু পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য আবশ্যক।

দারিদ্র্য

কোন কোন শিশুর মধ্যে আবেগ অতি প্রবল থাকে। মনোবিদ্‌দের অনেকের ধারণা আবেগের এমন প্রাবল্য কিছুটা বংশগত। আবেগ যাদের প্রবল এমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অসমঞ্জস আচরণ কিছু কিছু দেখা যায়।

সামাজিক-অপরাধীদের কেউ কেউ মানসিক রোগগ্রস্ত হলেও সবাইকেই মানসিক রোগী মনে করা চলে না। মানসিক রোগ কেন হয় এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে সব রকম মানসিক রোগের মূলে দুটি জিনিস আছে—এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। এক হচ্ছে মনের অতৃপ্ত কামনা বাসনা বা আবেগজীবনের ব্যর্থতা এবং দুই, রোগীর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব। মানসিক বাধার দরুণ ব্যক্তি নিজের মনের বহু বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। মানসিক রোগের দ্বারা সেই অবরুদ্ধ ও অবদমিত বাসনা অন্যরূপে নিজেকে চরিতার্থ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি যেখানে স্বীয় মানসিক বাধার দরুণ রুদ্ধ—হিস্টিরিয়ার মধ্য দিয়ে রোগীকে সময় সময় সে বাসনা পরিতৃপ্ত করতে দেখা যায়। প্যারানোইয়া রোগ সমকাম যৌন ইচ্ছার বিকৃত অভিব্যক্তি বলে ফ্রয়েড মনে করেন।

মানসিক রোগ

কোন্ জাতীয় ইচ্ছা বা আবেগের ব্যর্থতা প্রধানতঃ মানসিক রোগের কারণ এ বিষয়ে মনোচিকিৎসকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। ফ্রয়েডের ধারণা

যৌন ইচ্ছার ব্যর্থতা এবং যৌন ইচ্ছার বিকৃত রূপান্তরের দ্বারা মানসিক ব্যাধি ঘটে। আড্লার মনে করেন হীনতাবোধ শিশুর মনকে পীড়িত করে। তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সময় সময় সে অস্বাভাবিক আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ বেছে নেয়। জীবনযাপনের এই বিকৃতিই হচ্ছে মানসিক ব্যাধি।

কেবলমাত্র ইচ্ছার ব্যর্থতার দ্বারা মানসিক ব্যাধি ঘটে না। এর মধ্যে একটি অন্তর্বিরোধের ব্যাপার আছে। মনের এক অংশ চায়, অপর অংশ চায় না। একই জিনিসকে আমরা ভালো মনে করছি, আবার মন্দও ভাবছি। বাস্তব প্রতিকূল বলে নয়, নিজের মানসিক বাধার দরুণ একটি প্রবল ইচ্ছাকে স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে সে ইচ্ছাটির পক্ষে মানসিক ব্যাধির রূপ নেওয়া অসম্ভব নয়। অমন ক্ষেত্রে ইচ্ছাটির উর্ধায়নও অবশ্য হতে পারে।

দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কার্ট লিউইনের মতবাদটি উল্লেখ করা যেতে পারে। মতবাদটি আচরণের 'ভূমিতত্ত্ব'* রূপে পরিচিত। লিউইনের মতে দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝতে হলে জীব বা পরিবেশকে আলাদা আলাদা করে দেখলে চলবে না। জীব ও পরিবেশের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারাই দ্বন্দ্বকে বোঝা সম্ভব।

প্রেরণা ও প্রবণতাকে লিউইন ভেক্টর (vector) বলে অভিহিত করেছেন। ভেক্টরের দ্বারা কোন প্রেরণার শক্তি ও গতিমুখ দুইই বোঝায়। পরিবেশের সঙ্গে জীব ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাইতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করবার জন্য সে ব্যগ্রও হতে পারে। প্রথমটিকে পজিটিভ ভ্যালেন্স বলে আখ্যায়িত করা হয়; দ্বিতীয়টিকে—সরে আসা, দূরে যাওয়ার ইচ্ছাকে, নেগেটিভ ভ্যালেন্স বলা হয়।

মানসিক দ্বন্দ্ব তিন প্রকারের হতে পারে: (ক) দুটি পজিটিভ ভ্যালেন্সের মধ্যে বিরোধ (খ) দুটি নেগেটিভ ভ্যালেন্সের মধ্যে বিরোধ ও (গ) পজিটিভ ও নেগেটিভ ভ্যালেন্সে বিরোধ।

দুটি পজিটিভ ভ্যালেন্সে বিরোধ

দুটি কাজই শিশু করতে চায়, দুটি আকর্ষণই সমভাবে তাকে টানছে। সে একখানা গল্পের বই পড়ছে। বিকাল হয়ে গেছে। ফুটবল খেলবার সময়। সে খেলতে যাবে না পড়বে—দ্বিধায় পড়েছে। দেখা গেছে এ জাতীর দ্বন্দ্বের ফলে কদাচিৎ মানসিক বৈকল্য ঘটে। কারণ এ জাতীয় দ্বন্দ্বে দ্বিধা আছে কিন্তু দুর্ভাবনা

* ইংরেজিতে বলা হয় Field Theory।

বা ভয় নেই। এমন দ্বন্দ্বে একটির পর আর একটি কাজ করবার সুযোগ যদি থাকে, তবে এর সমাধান সহজ। কিন্তু যেখানে একটি কাজ করতে গেলে অপরটিকে ছাড়তে হয়, সেখানে যা ছাড়তে হল তার জন্য কিছু দুঃখ মনে থাকা আশ্চর্য নয়। যা পাওয়া গেল না তাকে—যা পাওয়া গেল তার চেয়ে মধুরও মনে হতে পারে। চল্‌তি কথায় বলে যে মাছটা পালিয়ে গেল, সেটাই বড়ো মাছ ছিল।

পড়তে শিশুর ভাল লাগে না। কিন্তু না পড়লে বাবা-মায়ের বকুনি খাবার ভয় আছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে মন চাইছে কিন্তু পালিয়ে গেলে ভীরু কাপুরুষ এমন অপবাদ শুনতে হবে। এমন অবস্থায় 'ভূমিত্যাগ' করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সাধারণতঃ দেখা যায়। শিশু হয়ত বল্লে, তার মাথা ধরেছে। কিম্বা সে বই মুখে দিয়ে বসে রইল, কিন্তু পড়াতে তার মন নেই। সময় সময় অবশ্য কোন সমাধানই সম্ভব হয় না। অস্থির, দোদুল্যমান অবস্থায় ব্যক্তিকে থাকতে হয়। মানসিক উদ্বেগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে মন পীড়িত থাকে।

দুটি নেগেটিভ ভ্যালেন্সে বিরোধ

বাবাকে শিশু ভালোবাসে আবার ঘৃণাও করে। সে ফুটবল খেলতে চায়, আবার ভয় পায় পাছে তার আঘাত লাগে। এ জাতীয় মানসিক দ্বন্দ্ব মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বলে দেখা গেছে।

পজিটিভ ও নেগেটিভ ভ্যালেন্সে বিরোধ

ইডিপাস দ্বন্দ্বও এ জাতীয়। মাকে শিশু সম্পূর্ণরূপে চায়, কিন্তু বাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সে ভয় পায়। বাবার অপসারণ সে চায়, কিন্তু বাবাকে সে আবার ভালোবাসে। এসব সমস্যার সহজ সমাধান নেই বলে মন নিরন্তর সমস্যাটির চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত একটি প্রেরণার সঙ্গে সচেতন মনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ব্যক্তি অনেক সময় সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান মন থেকে অবদমিত প্রেরণা বিভিন্নরূপে সচেতন মনে ফিরে এসে মনকে পীড়িত ও ব্যাধি-গ্রস্ত করে তোলে।

ফ্রয়েডের আবিষ্কারের দ্বারা লিউইনের তত্ত্ব সমর্থিত হলেও অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে বোসের ধারণা কিছুটা বিভিন্ন। বোসের ধারণা বোঝাবার জন্য মনঃ-সমীক্ষার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গোড়ার দিকে রোগীর অবাধ ভাবানুষঙ্গে, কল্পনায় কোন জৈবিক ইচ্ছারই পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে না। কিছুদূরে গিয়েই, কল্পনা বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই বাধাকে মুখ্যতঃ ভয় বলা চলে

(পজিটিভ ও নেগেটিভ ভ্যালেন্স)। আগে কিম্বা পরে, কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বৈর ইচ্ছাও তার পরিতৃপ্তি খোঁজে। কিন্তু সেখানেও ভয় পরিতৃপ্তিতে বাধা দেয় (দুটি নেগেটিভ ভ্যালেন্স)। মনঃসমীক্ষকের সহায়তায় রোগী ক্রমশঃ ভয় ও রোষের অন্তর্নিহিত জৈব ইচ্ছাটিকে দেখতে পায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বিরোধমান ইচ্ছা দুটি হচ্ছে সক্রিয় কাম ও নিষ্ক্রিয় কাম। এদের মধ্যে সন্তোষজনক মীমাংসার দ্বারা রোগী তার হৃত মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পায়। অতএব দেখা যাচ্ছে বোসের মতে বিরোধ শেষ পর্যন্ত দুটি পজিটিভ ভ্যালেন্সের মধ্যে।

চিকিৎসার যে সব পদ্ধতি আছে—তার মধ্যে মনঃসমীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড চিকিৎসার এই পদ্ধতিটির উদ্ভাবক। ডাক্তারের কাছে রোগীর নিজের মনকে সম্পূর্ণ খুলে দিতে হয়, মুখে যা আসে অবাধে তাই তাঁকে বলে যেতে হয়। এই নিয়ম রোগী মেনে নিতে রাজী হলেই রোগীর চিকিৎসা ডাক্তার হাতে নেন। অবাধে নিজের চিন্তাকে ছেড়ে দেবার এই পদ্ধতির নাম অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি। সামাজিক নীতির মানদণ্ডে রোগীকে বিচার করা ডাক্তারের কাজ নয়; রোগীকে বোঝা এবং বুঝে রোগী যাতে নিজেকে বুঝতে পারেন সে চেষ্টাই ডাক্তার করেন। রোগী যতই একথা বুঝতে পারেন ততই নিজেকে ছেড়ে দেওয়া তাঁর কাছে আরও সহজ হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ ভাবানুষঙ্গের মধ্য দিয়ে নিজের নির্জ্ঞান মনের বিভিন্ন স্তরের ইচ্ছা ও চিন্তা সম্বন্ধে রোগী সচেতন হন।

মানসিক রোগের চিকিৎসা : মনঃসমীক্ষা

মানসিক রোগের মূলে থাকে এই সকল অবদমিত ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার সঙ্গে রোগীর সচেতন মনের যখন মুখোমুখি পরিচয় ঘটে, রোগী যখন আবেগের সঙ্গে নিজের নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে মনে মনে স্বীকার করে নিতে পারেন—তখন রোগের লক্ষণ দূর হয়। গোড়াতে ফ্রয়েডের এই ধারণা থাকলেও—পরবর্তীকালে তাঁর ধারণা কিছু বদলেছিল। নির্জ্ঞান ইচ্ছার সঙ্গে রোগীর সচেতন মনের পরিচয় ঘটলেই ডাক্তারের কাজ শেষ হয় না। মানসিক বাধার ফলে একটি ইচ্ছা অবদমিত হয়েছিল। সে বাধা যতক্ষণ না দুর্বল হচ্ছে বা অপসৃত হচ্ছে, ততক্ষণ অবদমিত ইচ্ছা সচেতন হলেও আবার নির্জ্ঞান

অবদমিত ইচ্ছাকে সচেতন করার প্রয়োজন

হতে তার দেরী হবে না। রোগ সাময়িকভাবে দূর হতে পারে। কিন্তু রোগ নিরাময় স্থায়ী হবে না। সুতরাং রোগীর মানসিক বাধাকে দুর্বল ও অক্ষম করাকেই আজকাল সমীক্ষার প্রধান কাজ মনে করা হয়। দেখা গেছে মানসিক বাধার স্বরূপটি রোগী স্পষ্ট বুঝতে পারলে মানসিক বাধার শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

মানসিক বাধাকে অক্ষম করার প্রয়োজন

রোগ নিরাময়ের জন্য অবরুদ্ধ বাসনা সম্বন্ধে রোগীর সচেতন হওয়া দরকার। সে বাসনাকে কার্যে রূপ দেওয়া সম্ভব কিনা, সে বাসনাকে রোগী পূর্ণ করবেন কিনা—সেটা মানসিক স্বাস্থ্যোদ্ধারের পর রোগী স্থির করেন। চিকিৎসার ফলে রোগীর বাস্তব বোধ বাড়ে। নিজের মন ও বাস্তব—দুইয়ের কথা বিবেচনা করেই রোগী তাঁর পথ স্থির করেন। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছা সচেতন হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার বাস্তব পরিতৃপ্তি সম্ভব হয় না। সে সব ইচ্ছা কল্পনায় রোগী পরিতৃপ্ত করেন। মানসিক বাধা দূর হওয়ায় কাল্পনিক পরিতৃপ্তির পথ সুগম হয়।

এ কাজটি সহজসাধ্য নয়। এজন্য দীর্ঘ সময় আবশ্যক। প্রায় প্রতিদিন চিকিৎসা করে অনেক সময় কয়েক বৎসর ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া দরকার হয়। নিজের মনের বাধাকে, মনের সংস্কারকে রোগী আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। রোগলিপ্সা মানসিক রোগের একটি ধর্ম। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের প্রতি রোগীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা জন্মায়। পিতামাতার প্রতি শৈশবে রোগীর যে বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল—এ তারই পুনরাবৃত্তি। পিতা-মাতার স্থানে ডাক্তারকে তিনি বসান। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রান্তর হয় বলে একে বলা হয় পজিটিভ পাত্রান্তর।

সময় সময় রোগীর মধ্যে ডাক্তারের প্রতি তীব্র বিদ্বেষও দেখা দেয়। পিতামাতার প্রতি বিদ্বেষেরই তা নামান্তর। ডাক্তার পিতামাতার প্রতিভূ। একে বলে নেগেটিভ পাত্রান্তর। রোগীর রোগলিপ্সা, রোগীর মনের বাধা দূর করবার জন্য ডাক্তার রোগীর বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে কাজে লাগান। এ জন্যই যে রোগে রোগীর ভালোবাসার শক্তি একেবারে কমে যায় সে রোগে মনঃসমীক্ষা সম্ভব হয় না।

ছোট শিশুদের ভাষার উপর দখল কম। কথার সাহায্যে বেশীর

ভাগ মনোভাব তারা প্রকাশ করতে পারে না। সব সময়ে তারা কথা বলতে চায়ও না। কিন্তু খেলাতে শিশুর আগ্রহের শেষ নাই। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু একজন বিশেষজ্ঞের চোখের সামনে নিজের মনকে মেলে ধরে। এজন্য ছোটদের মানসিক চিকিৎসায় খেলাকে কাজে লাগান হয়। নানারকম খেলনা, জল, বালি প্রভৃতি ঘরে থাকে। শিশু ইচ্ছামত সে সব নিয়ে খেলে। সমীক্ষক সময়মত খেলার অর্থটি শিশুর কাছে স্পষ্ট করেন। অসমঞ্জস আচরণের মূলে কোন মনোবৃত্তি রয়েছে—শিশু ক্রমশঃ তা বুঝতে পারে। অসমঞ্জস আচরণ, মানসিক রোগ ও সামাজিক অপরাধের মূলে কোন্ কোন্ ইচ্ছা ও আবেগ রয়েছে—শিশু সচেতনভাবে বুঝতে পারলে সেই ইচ্ছা ও আবেগের শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পায়। এর সঙ্গে ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার তুলনা চলে। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধে ইন্দ্রজিত অজেয়; কিন্তু সামনাসামনি যুদ্ধে সে দুর্বল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অস্বাভাবিক আচরণের মূলে নির্জ্ঞান ইচ্ছা থাকে—সে আচরণ না করে রোগী থাকতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছাটি যখন সচেতন হয়, তখন সে ইচ্ছার উপর অহম ও সচেতন মনের অনেকখানি কর্তৃত্ব জন্মে। মনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তখন সে ইচ্ছার একটি যোগাযোগ, এমন কি সমন্বয় ঘটে। বাস্তব সম্বন্ধেও শিশু উপযুক্ত পরিমাণ সচেতন হয়।

শিশু-সমীক্ষা

একটু বড় হলে শিশু অনেক সময় ইচ্ছামত ছবি আঁকে। সে সব ছবিতে সে কি এঁকেছে জিজ্ঞাসা করলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের মনের ভাব সে প্রকাশ করে। শিশু সমীক্ষার এটিও একটি পন্থা।

শিশুর অস্বাভাবিক আচরণ, বিশেষতঃ অসমঞ্জস আচরণের চিকিৎসার জন্য উন্নত দেশসমূহে শিশু নিরাময় পরামর্শ ক্লিনিক* খোলা হয়েছে। ডাক্তার, মনোচিকিৎসক (বা মনঃসমীক্ষক কিম্বা ক্লিনিক্যাল মনোবিদ্), মনোবিদ্ ও সমাজকর্মী—এই নিয়ে সাধারণতঃ একটি ক্লিনিক গঠিত হয়।

শিশু নিরাময় পরামর্শ ক্লিনিক

শিশুর রোগের একটি ইতিহাস নেওয়া হয়। তার গৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে আবশ্যকায় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এ কাজগুলি সাধারণতঃ ট্রেনিং-প্রাপ্ত সমাজকর্মীই করেন। শিশুর অস্বাভাবিক আচরণের মূলে কোন দৈহিক

* ইংরেজিতে এগুলিকে Child Guidance clinic বলা হয়।

কারণ আছে কিনা ডাক্তার সেটি দেখেন। মনোবিদ্ বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে শিশুর মানসিক ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করেন। মনঃসমীক্ষক বা মনো-চিকিৎসক শিশুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে শিশুকে বোঝেন। এর পরে ক্লিনিকের কর্মীদের একটি মিলিত আলোচনায় অস্বাভাবিক আচরণের সম্ভাব্য কারণ কি ও কি পন্থায় তার চিকিৎসা দরকার—এ বিষয় স্থির করা হয়। শিশুর মানসিক চিকিৎসার দায়িত্ব মনঃসমীক্ষক বা মনোচিকিৎসক গ্রহণ করেন।

গৃহ শিশুর অনুকূল বিকাশের সহায় নয় এমন মাঝে মাঝে দেখা যায়। দূষিত গৃহ সময় সময় শিশুর অস্বাভাবিক আচরণের কারণ। পিতামাতা মানসিক অসুস্থ কিম্বা সামাজিক অপরাধী হলে শিশুর

চিকিৎসা

পক্ষে সুস্থ হয়ে বড় হয়ে ওঠা কঠিন। শিশুর অস্বাভাবিক আচরণ বহু ক্ষেত্রেই পিতামাতার অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিক্রিয়া এমন বলা চলে। এজন্য অধিকাংশ ক্লিনিকে শিশুর চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার মনেরও আংশিক চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়। পিতামাতা যাতে শিশুকে বুঝতে পারেন, তার মানসিক প্রয়োজন মেটাতে পারেন তারি চেষ্টা করা হয়। শিশুর প্রতি পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো সম্ভব না হলে অনেক সময় শিশুকে অন্য জায়গায় রাখবার পরামর্শ দেওয়া হয়। গৃহ পরিবর্তন সব সময় কার্যতঃ সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও অনেকে এটাকে একেবারে শেষ পন্থা হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী। সে কারণে শিশু চিকিৎসার দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যোঝবার মতন শক্তি যাতে শিশু লাভ করে—তারি চেষ্টা করা হয়।

অধ্যায় ২৩

শিক্ষা ও বৃত্তি-পরামর্শ

শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন ব্যাপারে পরামর্শকে ইংরাজিতে Educational and Vocational Guidance বলা হয়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনে মনোবিগ্যাকে আজকাল কিছু কিছু কাজে লাগান হচ্ছে।

শিক্ষা নির্বাচন

কোন্ শিক্ষা কার উপযোগী সেটা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর উপর। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য দরকার উচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক। উচ্চ শিক্ষালাভে ইচ্ছা ও আগ্রহও থাকতে হবে। যে ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়—তার শরীর মোটামুটি ভালো হওয়া দরকার। উচ্চ বুদ্ধি, যথেষ্ট পরিমাণ আঙ্কিক ও স্থানিক সামর্থ্য, গণিতে বিশেষ পারদর্শিতা ও কিছু যান্ত্রিক ক্ষমতা তার থাকা আবশ্যক। সে ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার প্রতি আগ্রহ আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে।

উপরোক্ত শিক্ষা নির্বাচনে বৃত্তির কথাটা বিশেষভাবে এসে পড়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং সেই পড়তে যাবে যে ইঞ্জিনিয়ারিং জীবনে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করবে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কাউকে পরামর্শ দেওয়ার অর্থ ইঞ্জিনিয়ারিং তাকে বৃত্তিরূপে গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া। সুতরাং বলা চলে এ শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষা নির্বাচনে প্রায়ই বৃত্তির কথা কিছু না কিছু এসে পড়ে।

শিক্ষা-পরামর্শকে আমরা প্রথমতঃ দুইভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

(১) স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষা।

(২) অস্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষা।

অস্বাভাবিক শিশুদের কথা বলতে গেলে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অন্ধ ও বধির প্রভৃতি বিকলাঙ্গ শিশুদের কথা বলতে হয়। কোন্ পাঠ এদের উপযোগী হবে, কোন্ বৃত্তি এরা অবশেষে গ্রহণ করবে—এসব স্থির করতে হলে এদের ক্ষমতা ও

অক্ষমতার কথা বিশেষভাবে ভাবতে হয়। স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষা নিয়েই আমরা আমাদের আলোচনা বর্তমানে সীমাবদ্ধ রাখব।

কোন বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করা উচিত—এ বিষয়ে 'শিশুর বিকাশ' অধ্যায়ে আমরা কিছু উল্লেখ করেছি। ছয় সাত বছর বয়সের আগে লেখাপড়া আরম্ভ করলে সুফল পাওয়া যায় না—কয়েকটি অনুসন্ধানের ফলে এটি জানা গেছে। উইনেট্‌কাতে (১) এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান হয়েছিল। পড়তে আরম্ভ করবার ঠিক পূর্বে একদল ছেলেমেয়ের মনোবয়স নির্ধারণ করা হল। ছ' মাস পড়াশোনা করবার পর ছেলেমেয়েরা কে কতটুকু পড়তে শিখেছে—প্রমাণবিধিত পরীক্ষার দ্বারা তা নিরূপণ করা হল। দেখা গেল, সাড়ে ছয় বছরের নীচে যাদের মনোবয়স এমন ছেলেমেয়েদের তুলনায় সাড়ে ছয় কিম্বা ততোধিক বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নতির পরিমাণ অনেক বেশী। এ বিষয়ে কেনেডি ফ্রেজারের (২) মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। সাড়ে ছয় বছর মনোবয়সের পূর্বে ছেলেমেয়েদের পড়া আরম্ভ করা উচিত নয়। তার চেয়ে অল্প বয়সে শেখালে ছেলেমেয়েরা পড়তে হয়ত শিখতে পারে, কিন্তু সে শিক্ষাকাজে তাদের সময় ও শক্তি অনেক বেশী ব্যয় করতে হয়। উপরন্তু অসময়ে শিক্ষারম্ভের জন্য তাদের পাঠে বিতৃষ্ণা জন্মাবার একটি নিত্য সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষারম্ভ

দেহমনের স্বাভাবিক প্রস্তুতির আগে শিক্ষারম্ভ করলে অতিরিক্ত অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্যটুকু শেষপর্যন্ত বজায় থাকে—একথাও সত্য নয়। পাঁচ বছর মনোবয়সে একদল ছেলেমেয়ে পড়া আরম্ভ করল। ছয় বছর মনোবয়সে আরেকদলের পাঠ শুরু হল। সাত বছর বয়সে দুদলকে পরীক্ষা করে দেখা গেল—তাদের শিক্ষায় উন্নতির পরিমাণ প্রায় সমান।

পড়াশোনা শেখার জন্য যখন শিশু প্রস্তুত নয় তখন তাকে জোর করে শেখাবার চেষ্টা করলে সুফল না হয়ে কুফল হবার সম্ভাবনাই বেশী। এতে পড়াশোনায় তার বিরক্তি বোধ হয় ও শেষপর্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মায়। এ বিষয়ে একজন শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। তিনি তখন ছোট। একদিন তিনি একটি বিড়ালছানাকে ইঁদুর শিকার করতে শেখাতে উদ্যোগী হলেন। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করলেন এবং হাতে তিনি একখানা ছড়ি নিলেন। বারবার ইঁদুরটিকে তিনি বিড়ালছানার দিকে এগিয়ে দেন, তাকে শিকার করবার জন্য উৎসাহিত করেন,

বিড়ালটি পালাবার চেষ্টা করলে তার পৃষ্ঠের উপর ছড়িটির সদ্ব্যবহার করেন। কিছুক্ষণ এমন চলবার পর কোন রকমে জানালার ফাঁক করে বিড়ালছানাটি পালাল। শিকার করা শিখতে সে গররাজী, কারণ তার মধ্যে শিকার প্রবৃত্তি তখনও পূর্ণতা লাভ করে নি। বিড়ালছানাটি বড় হল। স্বাভাবিক বিকাশের ফলে তার শিকার প্রবৃত্তিরও পূর্ণতা লাভ করবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইঁদুর দেখলেই তাকে আক্রমণ না করে সেখান থেকে সে পালাত। ঐ বিড়ালটির শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা তার সুস্থ, স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে রইল।

অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মনোবয়স তাদের প্রকৃত বয়সের কাছাকাছি। সুতরাং সাধারণতঃ সাড়ে ছয় বছরকে (প্রকৃত বয়স) শিক্ষারম্ভের বয়স বলে ধরা যেতে পারে। কিছু কিছু ছেলেমেয়ের মনোবয়স তাদের প্রকৃত বয়সের চেয়ে বেশী। সেখানে শিক্ষারম্ভ আগে হতে পারে। উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পক্ষে ছয় বছর প্রকৃত বয়সের আগে পড়া যত সহজ লেখা তত সহজ হবে না। লেখা বহুলাংশে দৈহিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে। তাদের শিক্ষা ছয় বছরের আরম্ভ করলেও লেখার উপর গোড়াতে জোর দেওয়াটা সঙ্গত হবে না।

শিক্ষারম্ভ ফলপ্রসূ হবে কিনা—সেটা মনোবয়স ছাড়াও শিক্ষার্থীর স্থানিক ক্ষমতা, ডান-বাঁ জ্ঞান ও দিকজ্ঞানের বিকাশের উপর নির্ভর করে বলে ডেনমার্কের মনোবিদ্‌রা অনেকে বিশ্বাস করেন। দুটি কাছাকাছি শব্দের পার্থক্য শিশু শুনলে বুঝতে পারে কিনা—এটাও তারা পরীক্ষা করে দেখেন।

কোন একটি বা দুটি বিষয়ে অনগ্রসরতা

সময় সময় কোন একটি বিষয়ে ছেলেমেয়েদের অপেক্ষাকৃত অক্ষমতা দেখা যায়। অন্যান্য সব বিষয়ে মোটামুটি একজন ভালো, কিন্তু অঙ্কে সে কাঁচা কিম্বা ভূগোলে সে একেবারে ভালো নয়। সে সব ক্ষেত্রে জানা দরকার কেন সে অঙ্কে বা ভূগোলে কাঁচা। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তার সহজাত ক্ষমতার স্বল্পতা, শিক্ষায় কিম্বা আবেগজীবনে কোন ত্রুটী ইত্যাদি। প্রকৃত কারণটি খুঁজে বার করবার জন্যে ছেলেটিকে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা দরকার হয়। এ ব্যাপারে কারণসন্ধানী অভীক্ষা উল্লেখযোগ্য। অঙ্কের কথাই ধরা যাক। হয়ত গোড়ায় একটি ভুল অভ্যাসের দরুণ (যেমন ৭ আর ৫ যোগ করলে ১৩ হয় বলে একটি ছেলে ধারণা করে

রেখেছে) প্রায়ই সে কম নম্বর পাচ্ছে। দেখা গেছে গোড়া কাঁচা থাকলে, বিশেষতঃ অঙ্কে, পরবর্তীকালে ভালো ফল করা কঠিন। কোথায় শিক্ষার্থীর ভুল ও দুর্বলতা—কারণসন্ধানী অভীক্ষার দ্বারা এটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষার সীমা

কার কতখানি শিক্ষালাভের ক্ষমতা (যেটা প্রধানতঃ বুদ্ধি) তার উপরে কার পক্ষে কতখানি শিক্ষালাভ সম্ভব—সেটা নির্ভর করে। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষালাভের ক্ষমতাও কিছু বাড়ে এটা ঠিক। কিন্তু শিক্ষালাভের ক্ষমতা সাধারণতঃ বাড়ে খুব ছোট বেলায় এবং সে বৃদ্ধি সীমিত।

মনোবয়স ও বুদ্ধ্যঙ্কের উপর নির্ভর করেই প্রধানতঃ স্থির করতে হয় কার কতখানি শিক্ষালাভ সম্ভব। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০, সে ম্যাট্রিক পড়ে কৃতকার্য হবে এমন আশা করা চলে না। কতখানি পাঠের জন্য কি পরিমাণ বুদ্ধ্যঙ্ক দরকার—এ সম্বন্ধে অন্যান্য দেশে অনুসন্ধানের ফলে যা পাওয়া গেছে 'ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি পরীক্ষা' অধ্যায়ে তা আমরা আলোচনা করেছি।

উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্স

আমাদের দেশে উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্সের প্রবর্তন হয়েছে। সবশুদ্ধ সাতটি কোর্স আছে—হিউম্যানিটিস্, বিজ্ঞান, কমার্স, টেকনিক্যাল, কৃষি, গৃহবিজ্ঞান, চারুশিল্প। ছেলে-মেয়েরা কে কোন্ কোর্স নেবে নবমশ্রেণীতে সেটা স্থির করা হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নয়। ছেলেমেয়েদের মানসিক ও সামাজিক প্রবণতা এবং সামর্থ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে। ভাষা, গণিত, যান্ত্রিক সামর্থ্য, আর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কেউ এতে ভালো, কেউ ওতে ভালো। অনুরাগেরও তেমনি পার্থক্য আছে। যে যে বিষয়ে ভাল, যার যে বিষয়ে আগ্রহ —সে বিষয়টির অনুশীলনের মধ্য দিয়েই তার চিত্তবৃত্তির চরম বিকাশ সম্ভব। একদিককার মনের বিকাশ মনের অপরদিককেও কিছু প্রভাবিত করে—এ কথাও সত্য। ঐ প্রভাবের পরিমাণ কতখানি হবে—সেটা মুখ্যতঃ নির্ভর করে শিক্ষা-পদ্ধতির উপর; 'শিক্ষার সঞ্চারণ' অধ্যায়ে একথা আমরা উল্লেখ করেছি। বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে কতগুলি সাধারণ সত্যে পৌছান শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। সাধারণ সত্যে পৌছতে কেউ হয়ত 'ক' অভিজ্ঞতার

সাহায্য নিল, কেউ হয়ত 'খ' অভিজ্ঞতার সাহায্য নিল। শিক্ষার মধ্যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে সাধারণ সত্যের প্রতি ইঙ্গিতটি স্পষ্ট থাকা দরকার। তাহলেই শিক্ষার্থীর মনে 'অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ বা সাধারণীকরণ' সহজে ঘটে। কোন কোন সাধারণ সত্যের সঙ্গে কোন একটি অভিজ্ঞতার হয়ত বিশেষ যোগ থাকে। অন্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে সত্যটি পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। তবু বলব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়ে মনের একটি উদার এবং বিস্তৃত-শিক্ষা সম্ভব।

একটি বিশ্লেষণ-নিপুণ মনোভাব, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সমগ্রতা আনা শিক্ষার আরেকটি বড় লক্ষ্য। জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যকে আশ্রয় করে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী, ঐ মনোভাবের বিকাশ সাধন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এই সব বিবেচনা করে বলা যায় যে, সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের শিক্ষাপ্রকরণের উদ্দেশ্য মনের উদার শিক্ষা, নিছক বৃত্তি শিক্ষা নয়। কিন্তু একথাও সত্য যে কোর্স নির্বাচন করতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা বৃত্তির কথা ভাবে। বাস্তবিক পক্ষে, ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা ভেবেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে তাদের কোর্স নির্বাচন করে।

কে কোন্ কোর্সের উপযোগী এটা স্থির করবার জন্য কি কি তথ্য সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া দরকার? সাধারণতঃ বিজ্ঞান কোর্সে সাফল্যের জন্য গণিতে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক। হিউম্যানিটিস্ বা সাহিত্য ও সামাজিক পাঠ গ্রহণের পূর্বে একজনের ভাষায় অধিকার কতখানি, সেটা দেখা দরকার। ছেলেমেয়েরা কে কোন্ কোর্সে যেতে চাইছে, তাদের অভিভাবকদেরই বা ইচ্ছা কি, ভবিষ্যতে কোন বৃত্তি গ্রহণের কথা ছেলেমেয়েরা ভাবছে—কোর্স নির্বাচনে এসবেরও খোঁজ নেওয়া দরকার হয়। এ সব তথ্য ছাড়াও সঠিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি, তাদের বাচনিক, আঙ্কিক ও স্থানিক সামর্থ্য, তাদের যান্ত্রিক ক্ষমতা, মানসপ্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব, তাদের আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করা দরকার।

পরীক্ষার ফলাফল

কার কোন্ বিষয়ে পারদর্শিতা, পারদর্শিতার পরিমাণ কতখানি—স্কুলের পরীক্ষার দ্বারা তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা হয়। ঐ পরীক্ষার ফলাফলের কিছু মূল্য থাকলেও তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়—'পরীক্ষা' অধ্যায়ে তা আমরা দেখতে পাব। কিছু পরিমাণে বিষয়মুখী পরীক্ষার দ্বারা ছেলেমেয়েদের পারদর্শিতা আরও সঠিকরূপে নির্ধারণ করে নেওয়া ভালো।

প্রশ্ন হতে পারে বুদ্ধি, বাচনিক, আঙ্কিক ও স্থানিক সামর্থ্যের পরীক্ষার দরকার কি? গণিতে যে পারদর্শী, আঙ্কিক সামর্থ্য তার নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সাহিত্যে যে পারদর্শী, বাচনিক সামর্থ্য তার যথেষ্ট রয়েছে। লেখাপড়ায় যে ভালো, বুদ্ধি তার নিশ্চয়ই বেশী। স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ফলাফল যখন বিবেচনা করা হচ্ছে, তখন বুদ্ধি ও প্রাথমিক ক্ষমতাসমূহের আবার পরীক্ষার প্রয়োজন কি? এর উত্তর হচ্ছে—স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ের সাফল্যের মধ্যে দুটি জিনিস আছেঃ (ক) স্বাভাবিক সামর্থ্য, (খ) ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ ও মনোযোগ, শ্রম ও অধ্যবসায়। বেশী বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কেউ পড়াশোনা না করলে পড়াশোনায় তার পক্ষে ভালো হওয়া কঠিন। সুতরাং পড়াশোনায় ভালো হলে তার বুদ্ধি বেশী এটা মনে করা যেমন সহজ, পড়াশোনায় যে ভালো নয় তার বুদ্ধি কম—নিশ্চিতরূপে তেমন মনে করা চলে না। বুদ্ধি ও প্রাথমিক সামর্থ্যসমূহ হচ্ছে সম্ভাবনা। ঐ সম্ভাবনাসমূহ প্রচুর পরিমাণে যাদের রয়েছে, সচেষ্ট হলে তাদের পক্ষে ব্যুৎপত্তি লাভ করা সম্ভব। যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তেমন চেষ্টা করে নি, বিষয়গুলিতে তারা ভালো ফল দেখাতে পারে না। কিন্তু আজ সে চেষ্টা করেনি বলে কাল যে চেষ্টা করবে না এমন কথা বলা যায় না। বিষয়গুলির প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রয়োজন বুঝতে না পারার দরুণ আজ হয়ত তাদের আগ্রহ জাগে নি। যতই বিষয়গুলির প্রয়োজন ও মূল্য তারা বুঝতে পারবে, হয়ত ততই তারা আগ্রহশীল ও সচেষ্ট হবে। স্কুলে পড়াশোনায় ভালো ছিল না, কিন্তু কলেজে কিম্বা বৃত্তিমূলক কলেজে গিয়ে ভালো করেছে এমন দৃষ্টান্তের সংখ্যা কম নয়। অবশ্য এমন লোকও কিছু কিছু আছে যারা বিশেষ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনদিনই তাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাবার প্রেরণা অনুভব করে না। এজন্যই একজনের স্বাভাবিক সামর্থ্যের পরীক্ষা যেমন দরকার, স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে—স্বাভাবিক সামর্থ্য ও পরিশ্রমের সাহায্যে —সে কতখানি জ্ঞান লাভ করেছে এটাও জানা দরকার।

বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষমতার পরীক্ষার আবশ্যকতা

এসব পরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে—এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে তার ফলাফল জানা দরকার। ধরা যাক, ছাত্রদের ইচ্ছা অনিচ্ছা ও দৈহিক স্বাস্থ্য ছাড়া গণিতের নম্বর, বুদ্ধ্যঙ্ক, যান্ত্রিক সামর্থ্য বিবেচনা করে টেকনিক্যাল কোর্সের

ছাত্রদের নির্বাচন করা হল। দেখতে হবে নির্বাচনী পরীক্ষায় যারা ভালো নম্বর পেল, টেকনিক্যাল কোর্সের পাঠে তারা তদনুরূপ ভালো হল কিনা। নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল এবং টেকনিক্যাল কোর্সে সাফল্যের পারম্পর্য্যের ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ কি আমাদের জানতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে এসব খবরাখবর সংগ্রহ করা দরকার। এসব ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তবেই নির্বাচনী পরীক্ষায় কোন্ কোন্ তথ্য বিশেষ আবশ্যক, কি কি অভীক্ষা প্রয়োগ করা দরকার—এ ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত জোর করে মতামত দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

গ্রেট ব্রিটেনে
শিক্ষা নির্বাচন

গ্রেটব্রিটেনে কিছু কিছু ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সাঙ্গ করার পর ১১ বছর বয়সে একটি নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবার পর ১৫% থেকে ২০% ছেলেমেয়ে যায় গ্রামার স্কুলে, ১০%—১৫% ছেলেমেয়ে যায় টেকনিক্যাল হাই স্কুলে ও প্রায় ৭০% ছেলেমেয়ে পড়ে মডার্ন স্কুলে। গ্রামার স্কুলের ছেলেমেয়েদের একাংশ স্কুলের পাঠ শেষ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যায়। টেকনিক্যাল স্কুলের পড়ুয়ারা পাঠ সমাপ্তির পর কেউ কলেজে কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কেউ বা নিম্নতর টেকনিক্যাল পাঠ বা বৃত্তি গ্রহণ করে। মডার্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ কলেজে কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না।

গ্রামার স্কুলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। গ্রামার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচনে অনেক জায়গায় নিম্নোক্ত পন্থা গ্রহণ করা হয়ঃ প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক (বা শিক্ষিকা) ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি, বিদ্যা, বিশেষ ক্ষমতা, আগ্রহ ও ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পেশ করেন। তারপর ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি, ইংরেজি ও অঙ্ক পরীক্ষা করা হয়। বিশেষরূপে নির্বাচিত শিক্ষকেরা সে সব পরীক্ষাপত্র দেখেন। বিভিন্ন বিষয়ে ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক নম্বরগুলিকে (যেটা ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পায়) প্রমাণ স্কোরে পরিণত করা হয়। ছেলেমেয়েদের বয়স ১১ বছরের কম বা বেশী হলে তাদের স্কোরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা হয়। তিনটি বিষয়ের প্রমাণ স্কোরকে সমান গুরুত্ব দিয়ে যোগ করা হয় এবং মোট নম্বরের ভিত্তিতে গ্রামার স্কুলে কার স্থান হবে, কার স্থান হবে না এটা স্থির করা হয়।

একেবারে সীমারেখায় যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের ফলাফল, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা দ্বারা তারা নির্বাচনের উপযুক্ত কিনা ঠিক করা হয়। স্কটল্যাণ্ডে ঐ ফলাফলের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকার ধারণাকে একটি আঙ্কিক মূল্য দিয়ে যোগ করা হয়।

এক, দুই বা তিন বছর পর্যন্ত গ্রামার স্কুলে পাঠকালীন সাফল্যের সঙ্গে নির্বাচনী পরীক্ষার পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক + ·৭৪ থেকে + ·৯০ পর্যন্ত হতে দেখা গেছে বলে ম্যাক্‌মোহন দাবী করেন। (৩) গ্রামার স্কুলে তিনবছর পড়বার পর ছেলেমেয়েরা যে পারদর্শিতা অর্জন করে তার সঙ্গে নির্বাচনী বুদ্ধি পরীক্ষার পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক + ·৭২ এবং নির্বাচনী ইংরেজী ও অঙ্ক পরীক্ষার ফলাফলের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক হচ্ছে + ·৭৫—ম্যাক্‌লেলাণ্ডের (৪) একটি অনুসন্ধান থেকে তা জানা গেছে।

গ্রামার স্কুল ও টেকনিক্যাল হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী নির্বাচনটি কিছু পরিমাণে সমস্যামূলক। ১১+ বছর বয়সে তাদের কি পরিমাণ বুদ্ধি আছে বলা সম্ভব হলেও, বিশেষ ক্ষমতার (যান্ত্রিক ক্ষমতা প্রভৃতি) উপযুক্ত বিকাশ ১৩, ১৪ বছরের আগে সাধারণতঃ হয় না। টেকনিক্যাল কোর্স যারা পড়বে তাদের বৃত্তি সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা আছে। শিক্ষা সমাপ্ত করে একদল সহজ সরল যান্ত্রিক কাজ বেছে নেয় যাতে হস্তনৈপুণ্যের দরকার, কিন্তু G বা বুদ্ধি অল্প হলেও চলে। এর চেয়ে অধিকতর দক্ষতার কাজে বেশ কিছুটা যান্ত্রিক ক্ষমতার দরকার হয়। তারপরের শ্রেণী হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার যারা প্ল্যান ও পরিকল্পনা করে; ঐ কাজে দরকার গণিতে ব্যুৎপত্তি এবং উচ্চবুদ্ধি বা G.

গ্রামার স্কুল বা টেকনিক্যাল হাইস্কুলে পড়তে গেলে (অন্ততঃ একাংশের) উচ্চ বুদ্ধির দরকার। ভাষায় যাদের দখল বেশী তাদের গ্রামার স্কুলে এবং গণিতে যাদের বেশী অধিকার কিম্বা হস্তনৈপুণ্য যাদের অধিক—সাধারণতঃ তাদের উচ্চ টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দেওয়া হয়। কর্নওয়ালে কারা গ্রামার স্কুলের এবং কারা টেকনিক্যাল স্কুলের উপযোগী স্থির করবার জন্য অ-বাচনিক বুদ্ধি-পরীক্ষা, বাচনিক পরীক্ষা, যান্ত্রিক সামর্থ্যের পরীক্ষা, নিয়মের অঙ্ক এবং রচনা পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

একটি ছাত্র বা ছাত্রী কোন্ কোর্স নেবে, কি সে পড়বে এ স্থির করার জন্য তাকে মনোবিদ্যাসম্মত সাহায্যদানের পদ্ধতিকে শিক্ষানির্বাচন পরামর্শ বলা

যায়। একটি স্কুলে (যেমন গ্রামার কিংবা টেকনিক্যাল স্কুলে) একটি কোর্সে কাদের নেওয়া হবে আধুনিক পদ্ধতিতে সেটা স্থির করবার পদ্ধতিকে ছাত্রছাত্রী নির্বাচন বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে একে Educational Selection বলা হয়। শিক্ষা নির্বাচন কিংবা ছাত্রছাত্রী নির্বাচন কিছুটা এক রকমের। বহুলাংশে একই ধরণের পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের করা হয়। পার্থক্যও কিছু আছে। একটি ছাত্রের বেলাতে বহুমুখী পরীক্ষার সাহায্যে কোন্ কোর্স তার পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপযোগী হবে সেটা জানবার চেষ্টা করা হয়। কোন একটি কোর্সের জন্য (যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স, মেডিক্যাল কোর্স) কোর্সের উপযোগী পরীক্ষার সাহায্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বাছাই করা হয়। একটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে কে কোন্‌টার উপযোগী স্থির করবার জন্য যে চেষ্টা ও পরামর্শ তাকে যুগপৎ শিক্ষা নির্বাচন ও ছাত্রছাত্রী নির্বাচন পরামর্শ বলা চলে।

শিক্ষানির্বাচন ও ছাত্রছাত্রী নির্বাচন

কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে এটা আজও সাধারণতঃ আমরা যে ভাবে স্থির করি—তাকে সুষ্ঠু বা সুচিন্তিত পদ্ধতি বলা চলে না। পিতামাতার ইচ্ছা ও আর্থিক সঙ্গতি, ছেলেমেয়েদের বৃত্তি উপযোগী শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভের ইচ্ছা ও শিক্ষা ও বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি দ্বারা কার কোন্ বৃত্তি সেটা ঠিক হচ্ছে। কিন্তু এমনভাবে বৃত্তি নির্বাচনের দ্বারা বৃত্তিতে ব্যক্তি সাফল্যলাভ করছে কিনা, বৃত্তি তার ভালো লাগছে কিনা, বৃত্তি গ্রহণের দ্বারা সে সুখী হচ্ছে কিনা এইটে হচ্ছে প্রশ্ন। একথা জানা গেছে যে বৃত্তি গ্রহণকারীদের একটি মোটা অংশ নিজেদের বৃত্তিকে পছন্দ করেন না। সম্ভব হলে তারা নিজেদের বৃত্তি বদলে নিতেন। একদল মানুষ কিছুতেই খুশী নন, একথা সত্য। এঁদের জীবনে দুর্ভাগ্যক্রমে, সব অবস্থাতেই সন্তুষ্টির অভাব থাকে। এঁরা কিছু পরিমাণে মানসিক অসুস্থ। কিন্তু এঁরা ছাড়াও অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের বৃত্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ নন, নিজেদের বৃত্তি তাদের ভালোও লাগে না। সারাজীবন ধরে বৃত্তির দুর্বহ ভার এঁদের বহন করে যেতে হয়।

বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ আবশ্যকীয় জ্ঞান

বৃত্তি নির্বাচনে সাফল্য কি এটা আরেকটু পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। প্রথমতঃ সাফল্য বলতে আমরা বুঝি যে ব্যক্তি উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করতে পারছেন। দ্বিতীয়তঃ, কাজ করতে তার ভালো লাগছে। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ

বৃত্তি নির্বাচনে সাফল্যের সঠিক অর্থ

করেন সে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। কাজটি ব্যক্তির ভালো লাগছে কিনা ব্যক্তি নিজে বলতে পারেন।

একজন কাজে দক্ষ কিনা, কাজ তাঁর ভালো লাগে কিনা—এসব জানবার একটি পরোক্ষ পন্থা আছে। চাকরিতে তাঁর উন্নতি হচ্ছে কিনা, তিনি ঘন ঘন কাজ বদলাচ্ছেন কিনা—এসব তথ্যের থেকে বৃত্তি নির্বাচনের সাফল্যের পরিমাণ অনেকটা অনুমান করা যায়।

মনোবিদদের পরামর্শ দান

কার পক্ষে কোন বৃত্তি উপযোগী এ বিষয়ে মনোবিদেরা আজকাল পরামর্শ দিয়ে থাকেন। একে বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ বলা হয়। একজনের ক্ষমতা ও আগ্রহানুযায়ী বৃত্তি খুঁজে বার করতে মনোবিদরা তাকে সাহায্য করেন।

ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্ব

বৃত্তি সম্বন্ধে ও ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ব্যক্তিকে দেওয়া পরামর্শদাতার কাজ; বৃত্তি তার পক্ষে উপযোগী হবে কিনা বুঝতে পরামর্শদাতা তাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে বৃত্তি নির্বাচনের অধিকার ব্যক্তিরই। এ বিষয়ে ভুল বা ভালোর দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত তার নিজের।

বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান

বৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান ছেলেমেয়েদের এমন কি বড়দের পর্যন্ত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একটি দশবছরের ছেলেকে কয়টি উচ্চতর বৃত্তি আছে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, "চারটি। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার ও জজ।" আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বৃত্তির একটি অভিধান তৈরি করা হয়েছে। তাতে ২২০০০ বৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন বৃত্তিতে কার আগ্রহ এটা জানতে হলে বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান থাকা দরকার। যতগুলি বৃত্তি আছে সবগুলির কথা তারা জানবে—এটা সম্ভবও নয়, তার দরকারও নেই। কোন ছেলেমেয়ের পক্ষে বৃত্তি সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান দরকার—সেটা বৃত্তি পরামর্শদাতা স্থির করবেন। একজাতীয় অনেকগুলি বৃত্তিকে একেকটি পরিবারভুক্ত করার ফলে বৃত্তিজ্ঞান দেওয়া সহজ হয়।

বক্তৃতা ও আলোচনা, বই ও সিনেমা প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন বৃত্তিতে কি ধরণের কাজ করতে হয়, কি জাতীয় বিদ্যা ও ট্রেনিং আবশ্যক, কোন্ কোন্ দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী থাকা দরকার, চাকরির বাজারের অবস্থা, কি রকম বেতন আশা করা যায়, চাকরির ভবিষ্যত—এসব খবরাখবর ছেলেমেয়েদের

সরবরাহ করা হয়। বৃত্তি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করার পর ছেলেমেয়েরা তাদের মন স্থির করে। সুইডেনে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর পরিমাণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রশ্নাবলীর সাহায্যে সাধ্যমত নিরূপণ করা হয়। যে বৃত্তি তারা গ্রহণ করতে চায় সে বৃত্তির উপযোগী সামর্থ্য তাদের আছে কিনা—এটা দেখা হয়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বৃত্তি নির্বাচন

অনেক ক্ষেত্রে দু' এক সপ্তাহকাল তাদের পছন্দানুযায়ী কয়েকটি বৃত্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করা হয়। এটা অবশ্য সে সব বৃত্তিতেই সম্ভব যেখানে বৃত্তিগ্রহণের জন্য বিশেষ বিদ্যা বা ট্রেনিং আবশ্যক নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পর কাজ সম্বন্ধে তারা তাদের চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করে। তাদের কাজ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মতও নেওয়া হয়। বৃত্তি নির্বাচন সম্বন্ধে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত এর পরে গ্রহণ করা হয়। ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বৃত্তি নির্বাচনের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

বৃত্তি বিশ্লেষণ

সন্তোষ ও সাফল্যের সঙ্গে একটি কাজ করতে হলে তাতে কোন কোন দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী আবশ্যক, কি জাতীয় বিদ্যা ও ট্রেনিংএর দরকার—একেকটি বৃত্তি বিশ্লেষণ করে সেটা নির্ণয় করা হয়। কাজটির স্বরূপ দেখে মনোবিদেরা অনেক সময় তাতে কোন কোন মানসিক সামর্থ্য ও শক্তি আবশ্যক সেটা অনুমান করেন। বিভিন্ন বৃত্তিতে কাজ করে যাঁরা সন্তোষ ও সাফল্য লাভ করেছেন তাঁদের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য, প্রেরণা ও প্রবণতা, আগ্রহ এসব জানলে বৃত্তিটির জন্য কি জাতীয় ও কি পরিমাণে দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী দরকার—এটা অনেকটা বোঝা যায়। প্রত্যেক কাজের সাফল্যের জন্য বুদ্ধি দরকার। কোন জাতীয় বৃত্তি কি পরিমাণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা অবলম্বন করছে সে সম্বন্ধে আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ফলাফল নীচের সারণীতে প্রকাশ করা হল। (৫)

সেনাবাহিনীর সাধারণ শ্রেণী বিন্যাস অভীক্ষার দ্বারা এদের* পরীক্ষা করা হয়েছিল।

* এই অভীক্ষাটি যুক্তরাষ্ট্রে গত মহাযুদ্ধের সময় প্রস্তুত করা হয়। অন্য কিছু কিছু উপাদান থাকলেও এটি প্রধানতঃ বুদ্ধি অভীক্ষা।

সারণী ১৮

বৃত্তি বা পাঠ	লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ স্কোর
এ্যাকাউন্‌টেণ্ট	১২১—১৩৬
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	১২২—১৩৫
মেডিক্যাল ছাত্র	১২০—১৩৫
লেখক	১২৩—১৩৩
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	১১৭—১৩৪
আইনজীবী	১১৮—১৩২
শিক্ষক	১১৭—১৩২
স্টেনোগ্রাফার	১১৫—১৩৫
ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান	১০৯—১২৭
ফোটোগ্রাফার	১০৯—১২৪
আর্টিস্ট	১০৬—১২১
ইলেকট্রিসিয়ান	৯৬—১১৮
কর্মকার	৮৮—১১৩
দর্জি	৮২—১১২
পরামাণিক	৭৯—১০৯
কৃষক	৭০—১০৩

উপরের সারণীতে একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন করেছে এমন লোকদের সবার বুদ্ধি সমান নয়। শিক্ষকদের কথা ধরা যাক। তাঁদের সর্বনিম্ন স্কোর ১১৭ এবং সর্বোচ্চ স্কোর ১৩২। ঐ তথ্য থেকে মনে করা যেতে পারে যে শিক্ষক হতে হলে একজনের ১১৭—১৩২ এর মধ্যে একটি স্কোর পাওয়া দরকার। কিন্তু এঁদের সবাই যে বৃত্তিতে উপযুক্ত পরিমাণ ভালো—এ কথা সত্য নয়। দক্ষতা ও সন্তোষের সঙ্গে একটি বৃত্তি অনুসরণ করতে হলে একটি ন্যূনতম বুদ্ধ্যঙ্ক দরকার। সেটা কি?

প্রান্তিক স্কোর

ধরা যাক, বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন করেছে এবং তাতে তারা নিম্নরূপ সাফল্য লাভ করেছে ঃ

বুদ্ধ্যঙ্ক	শতকরা সাফল্যলাভের সংখ্যা
১২০	৮২
১১৫	৭১
১১০	৬৬
১০৫	৫৬
১০০	৪২

১১০ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের তিনজনের মধ্যে একজন কাজটি সন্তোষজনক ভাবে করতে পারছে না। অন্যভাবে বলতে গেলে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা তিন ভাগের দুইভাগ। বুদ্ধ্যঙ্ক যদি ১১০'র চেয়েও কম হয় তবে সাফল্যের সম্ভাবনা আরও কমে যাবে; সাফল্য রীতিমত অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্যই কোন একটি ছেলে যদি ঐ বৃত্তি অবলম্বনে ইচ্ছুক হয়—তবে অন্ততঃপক্ষে ১১০ তার বুদ্ধ্যঙ্ক থাকলেই তাকে হয়ত বৃত্তি নির্বাচনে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে হয়ত ১১৫ বা তার চেয়েও অধিক বুদ্ধ্যঙ্ক দরকার হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্ক বা অন্য কোন সামর্থ্যের এই সীমারেখাকে প্রান্তিক বা ক্রিটিক্যাল স্কোর বলা হয়।

কাজ সামর্থ্যানুযায়ী হওয়া উচিত। এ কথার আরেকটি অর্থ হচ্ছে—যে কাজে সামর্থ্যের যথোচিত ব্যবহার সম্ভব হয় না, ব্যক্তির পক্ষে সে কাজ ভালো লাগবার কথা নয়। বুদ্ধি যার বেশী, সাধারণতঃ সে যে কাজে বুদ্ধির খেলা আছে সে কাজই পছন্দ করবে।

রোজারের ধারণা বৃত্তিনির্বাচন পরামর্শে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ছয়টি বিশেষ সামর্থ্য সম্বন্ধে জানা দরকার হয়ঃ যান্ত্রিক ক্ষমতা, হস্তনৈপুণ্য, আঙ্কিক সামর্থ্য, বাচনিক সামর্থ্য, সঙ্গীত বা ড্রয়িংয়ের ক্ষমতা। (৬) বৃত্তি নির্বাচনে 'স্থানিক সামর্থ্যের'ও গুরুত্ব রয়েছে। সে সামর্থ্য যান্ত্রিক ও ড্রয়িংয়ের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে পরীক্ষিত হয়। তাছাড়াও হয়তো ঐ সামর্থ্যকে কিছুটা আলাদাভাবে পরীক্ষা করার দরকার আছে।

বিশেষ সামর্থ্যসমূহ

বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তির মানসপ্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ও ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এটা সবসময়েই জানা দরকার যে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে কি হতে

চায়। কিন্তু এই 'হতে চাওয়াটা'কে সময়ে সময়ে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য তথ্য বলে ধরা মুস্কিল। একটি দশ বছরের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হল—সে কি হতে চায়। সে বল্লে—ট্রেনের গার্ড। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—গার্ডের পোশাকটা তার ভালো লাগে, আর তার ভালো লাগে গার্ডের সবুজ নিশানটি। গার্ড যে ড্রাইভারকে হুকুম দেয় এটাও ছেলেটি জানে। সুতরাং গার্ড হতে সে চায়। এ জাতীয় দুর্বল যুক্তির উপর ভিত্তি করে সময় সময় বড় বড় ছেলেমেয়েরাও নির্বাচনের কথা ভাবে। এজন্যই বলব যে বৃত্তি সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বাড়ানো দরকার।

অনেক সময় তের চোদ্দ বছরে ছেলেমেয়েদের বৃত্তি নির্বাচনের কথা ভাবতে হয়। ভবিষ্যতে বৃত্তিকে চোখের সামনে রেখে তারা কি পড়বে—সেটা স্থির করা হয়। ঐ বয়সে বৃত্তি সম্পর্কে তাদের যে পছন্দ অপছন্দ তাকে খুব নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। অনেকক্ষেত্রেই তার পরিবর্তন হয়।

বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তির আগ্রহকে কাজে লাগাবার জন্য স্ট্রং একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এক জাতীয় বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের একই ধরণের অনেক আগ্রহ থাকে এমন দেখা যায়। অন্য বৃত্তিতে যারা নিযুক্ত তাদের আগ্রহের ধরণটা আবার অন্য রকমের। ৪৫টি পুরুষের বৃত্তিতে ও ২৫টি মেয়েদের বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আগ্রহসমূহের কি কি ধরণ হয়—সেটা দেখা হয়েছে। প্রশ্নাবলীর সাহায্যে ছেলেমেয়েদের আগ্রহের ধরণটি অনুধাবন করা হয়। কোন ধরণের বৃত্তি তাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হবে তা থেকে অনেকটা বুঝতে পারা যায়।

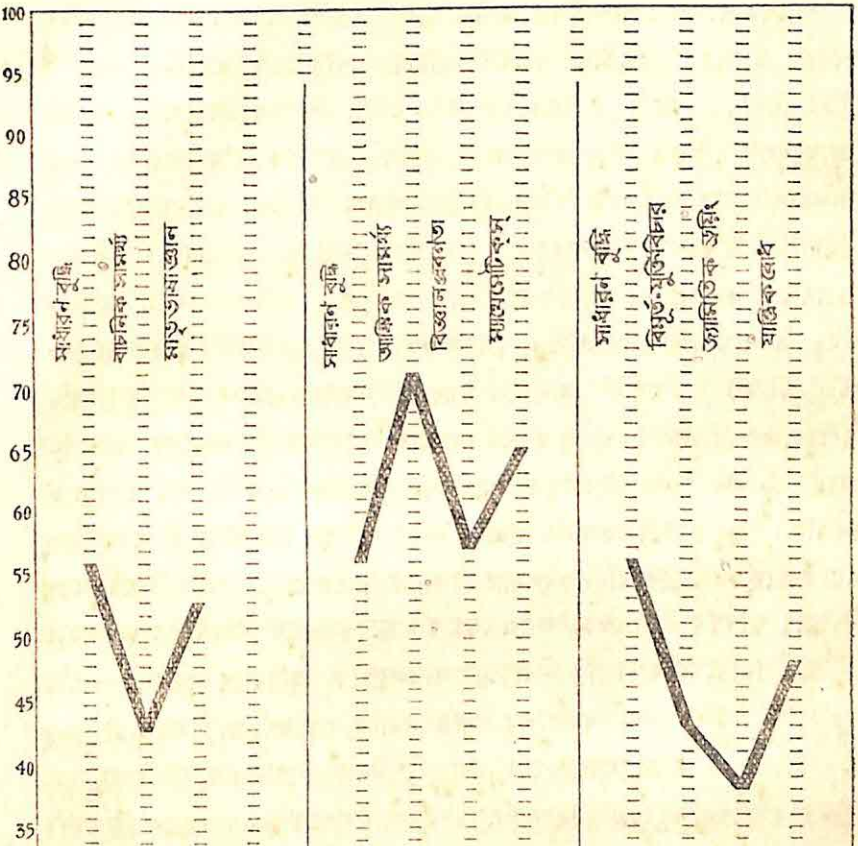
ব্যক্তির আগ্রহ ও সামর্থ্য জানতে কেবলমাত্র একবারের অভীক্ষার উপর সবখানি নির্ভর করাটা সমীচীন নয়। পরপর কয়েক বছর ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষা করে, সমস্ত ফলাফল সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছলে তার নির্ভরযোগ্যতা স্বভাবতঃই বেশী হবে। তারি সঙ্গে কয়েক বছর ধরে স্কুলে, খেলার মাঠে, সম্ভব হলে গৃহে, ছেলে-মেয়েদের কার্যকলাপ যদি লক্ষ্য করা যায় ও সেগুলির রেকর্ড রাখা হয়—তবে আরও ভালো হয়। অভীক্ষার ফলাফল এবং কার্যকলাপের তাৎপর্য—উভয়কে বিচারবিবেচনা করলে ছেলেমেয়েদের মানসিক গুণাবলী ও সেগুলির পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশী সত্য ও নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভ করতে পারব।

শিক্ষা ও বৃত্তি পরামর্শের সঙ্গে শিক্ষার একটি বিশেষ ধরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—কোন কোন মনোবিদদের মুখে হালে আমরা একথা প্রায়ই শুনছি! শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতা কোন বিষয়ে কম—এটুকু জানাই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন না। কেন কম—সে কথা জানতে হবে। কি ভাবে বিষয়টিতে আগ্রহ ও ক্ষমতা বাড়ান যায়, শিক্ষা ও বৃত্তি পরামর্শে তেমন ইঙ্গিতও সময় সময় থাকা দরকার। ধরা যাক, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে একটি ছেলের আগ্রহ আছে। জ্ঞানও কিছু কিছু সে অর্জন করেছে। কিন্তু অঙ্কে সে কাঁচা। বিজ্ঞান কোর্স পড়তে হলে অঙ্কে ভালো ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার। অমন ক্ষেত্রে অঙ্কে ছেলেটির দুর্বলতা কোথায় খুঁজে বার করতে যে তাকে সাহায্য করবেন, ঐ দুর্বলতা কেমন করে কাটিয়ে ওঠা যায় যে তাকে বলে দেবেন—তাঁর পরামর্শকেই শিক্ষার্থী মূল্যবান মনে করবে। 'তুমি অঙ্কে ভালো নও, অতএব বিজ্ঞান কোর্সের তুমি উপযুক্ত নও'—এ কথা বলে ক্ষান্ত হলে সে পরামর্শকে খুব দামী পরামর্শ মনে করা চলে না। অবশ্য যে ক্ষেত্রে অঙ্কে অক্ষমতার পরিমাণ খুব বেশী, যে অক্ষমতা বহুলাংশে দুরপনেয়—সে ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান কোর্স আমার জন্য নয়' এ কথা জানার দাম আছে। ঐ সত্যকে জানতে পারলে এবং মানতে পারলে মিথ্যা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপব্যয় সে করবে না, ব্যর্থ প্রচেষ্টার ক্ষোভ ও গ্লানিকে জীবনে ডেকে আনবে না।

বৃত্তি নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী ছাড়াও অনেক বিষয় ভাববার আছে। গরীবের ছেলেকে উকীল হতে পরামর্শ দেওয়াটা কতখানি সঙ্গত হবে ভাববার কথা। ওকালতি ও অর্থ উপার্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বৃত্তিতে চাকরি সংস্থানের কথাও পরামর্শদাতার স্মরণ রাখতে হবে।

দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর রেখাঙ্কন বা প্রোফাইল

একেকটি কাজে সাফল্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সামর্থ্যের আবশ্যক হয়। এমনও দেখা গেছে কোন একটি সামর্থ্যের আধিক্য একটি সীমা পর্যন্ত অন্য একটি সামর্থ্যের স্বল্পতার অভাব পূরণ করে। বিভিন্ন সামর্থ্য ও মানসিক গুণাবলীর একটি গোটা চিত্র বা প্রোফাইলের উপর অনেকে জোর দেন। পর পৃষ্ঠায় প্রোফাইলের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ


100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
সাধারণ বুদ্ধি
বাচনিক সামর্থ্য
মাতৃভাষাজ্ঞান
সাধারণ বুদ্ধি
আঙ্কিক সামর্থ্য
বিজ্ঞানপ্রবণতা
সাধারণ বুদ্ধি
বিমূর্ত-যুক্তিবিচার
জ্যামিতিক ড্রয়িং
যান্ত্রিকবোধ
হিউম্যানিটিস
বিজ্ঞান
টেকনিক্যাল

আগের পাতার প্রোফাইলটি কলিকাতার একটি সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রের। স্কুলটিতে তিনটি হায়ার সেকেণ্ডারি কোর্স আছে—হিউম্যানিটিস, বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল। কোর্স-নির্বাচন পরামর্শের জন্যই প্রোফাইলটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কোর্স তিনটিতে সাফল্যলাভের জন্য বিভিন্ন পরিমাণে ও কিছুটা বিভিন্ন ধরণের সামর্থ্য ও প্রবণতা দরকার হয়। হিউম্যানিটিসে দরকার—সাধারণ বুদ্ধি, বাচনিক সামর্থ্য ও ভাষাজ্ঞান। বিজ্ঞান কোর্সের সাফল্যলাভের জন্য দরকার—সাধারণ বুদ্ধি, বাচনিক সামর্থ্য, আঙ্কিক সামর্থ্য ও অঙ্কে ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি। ছেলেদের গড় স্ট্যাণ্ডার্ড স্কোর ধরা হয়েছে—৫০। তিনটি কোর্সের কোনটিতে ছেলেটি সবচেয়ে বেশী উপযোগী সেটা নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেকটি কোর্সের ঘরে ছেলেটির প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের স্ট্যাণ্ডার্ড স্কোর চিত্রিত করা হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধি কম বেশী সব কোর্সেই দরকার। সে কারণে ছেলেটির সাধারণ বুদ্ধির পরিমাণ তিনটি ঘরেই রেখাঙ্কিত করা হয়েছে। যান্ত্রিকবোধ কেবলমাত্র টেকনিক্যাল কোর্সে ছেলেটির উপযোগিতা নির্ধারণে আবশ্যক বলে টেকনিক্যাল কোর্সের ঘরেই তাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃত্তি পরামর্শের সাফল্য

বৃত্তি পরামর্শের দ্বারা বৃত্তি নির্বাচনের সাফল্য কি পরিমাণে বেড়েছে—এটা জানা দরকার। বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ ব্যতীত যারা বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শের ভিত্তিতে যারা বৃত্তি গ্রহণ করেন, এঁদের দুইদলের সাফল্যের পরিমাণকে তুলনা করলে কি দেখা যায়? আমেরিকায় একটি অনুসন্ধানের ফলে (৭) জানা গেছে যে বৃত্তি নির্বাচন যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের শতকরা ৯৬ জনের সফল নির্বাচন হয়েছে। বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ যাঁরা গ্রহণ করেন নি সেখানে শতকরা মাত্র ৫০ জনের বৃত্তি নির্বাচন সফল হয়েছে। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইনডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজির অনুসন্ধানে জানা যায় (৮)—বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ গ্রহণকারীদের সাফল্যের হার শতকরা ৯৩। যাঁরা পরামর্শ গ্রহণ করেন নি তাঁদের সাফল্যের সংখ্যা শতকরা ৬৬। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, বৃত্তি নির্বাচনে পরামর্শের দ্বারা বৃত্তি নির্বাচনে ভুলভ্রান্তিকে সম্পূর্ণরূপে আমরা এড়াতে পেরেছি, কিংবা বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ যাঁরা গ্রহণ করেন নি বৃত্তি নির্বাচনে তাঁদের সকলেরই ভুল ঘটে। তবে বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ দ্বারা অনেকখানি ভুল এড়াতে পারা যায় একথা সত্য। ব্যক্তিগত সুখ ও সামাজিক কল্যাণের দিক থেকে সেটা কম কথা নয়।

অধ্যায় ২৪

শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য

শিক্ষার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশদুটি হ'ল—শিক্ষক (কিম্বা শিক্ষিকা) ও শিক্ষার্থী (কিম্বা শিক্ষার্থিনী)। গৃহে শিশু মা-বাবার কাছ থেকে শেখে, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে। সঠিক বিচারে এঁরা সবাই শিক্ষক কিম্বা শিক্ষিকা। এই শিক্ষার সবটুকু অংশই স্বৈচ্ছিক বা সচেতন নয় ; শিক্ষকের আচরণ থেকে, চরিত্র থেকে অনেকটা নিজের এবং শিক্ষকের অগোচরেই শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। শিক্ষকের আদর্শ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর বিশ্বাস অবিশ্বাস শিক্ষার্থীর জীবনাদর্শকে প্রভাবিত করে।

শিক্ষা কতখানি সুষ্ঠু ও সফল হচ্ছে বুঝতে গেলে দুটি জিনিসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্য ; দুই, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্বন্ধ। শিক্ষার্থী সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি। শিক্ষক সম্বন্ধেই এই অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করব। শিক্ষক জ্ঞানী হবেন, গুণী হবেন এ যেমন সত্য কথা, তেমনি তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলেই শিক্ষা সফল হবে, না থাকলে শিক্ষা গুরুতররূপে বিঘ্নিত হবে, এও তেমন সত্য কথা।

মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এখানে আরো কয়েকটি কথা বলব।

মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আর্নেষ্ট জোন্স (১) যা বলেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য। তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি বলেছেন। অব্রাহামের একটি লাইন উদ্ধৃত করে তিনি প্রথমতঃ বলেছেন, মানসিক স্বাস্থ্যবান লোকদের মধ্যে অন্যদের প্রতি "যথেষ্ট পরিমাণে প্রীতি ও বন্ধুভাব" (২) দেখা যায়। যারা নিজেদের মানসিক বিকাশে এ্যামবিভ্যালেন্স বা দ্বিমুখী মনোভাব ও আত্মপ্রেমকে অনেকখানি অতিক্রম করতে পারে—তাদের পক্ষেই মানুষের প্রতি প্রীতি ও বন্ধুভাব সম্ভব হয়।

কিছু লোক আছে—যারা অন্যদের বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়। তাদের নম্র, নরম স্বভাব দেখে বাইরে থেকে মনে হতে পারে তারা মানুষকে ভালোবাসে। কিন্তু সেটা সত্য নয়। প্রকৃত ভালোবাসার মূলে আছে বিশ্বাস, ভয় নয়। মানুষকে যারা সত্যিকারের ভালোবাসে তাদের সহনশীলতা বেশী, অন্যের বিরুদ্ধতা ও বিরূপ আচরণ দেখলেই তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। আমরা যোগ করতে পারি ভালোবাসা পাবার জন্যই তারা ভালোবাসে না। প্রতিদানের কথা না ভেবে—দিয়ে, ভালোবেসে অনেকখানি তৃপ্তিলাভ করবার মানসিক বিকাশ এঁদের হয়েছে। তাই ভালোবাসার পরিবর্তে ভালোবাসা না পেলে, এমন কি, বিরুদ্ধতা দেখলেও এঁদের ভালোবাসা লোপ পায় না।

মানসিক স্বাস্থ্যের দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে এবার বলব। মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি তার কাজকর্মে নিজের শক্তি সামর্থ্যের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে। অন্তর্দ্বন্দ্ব বা নিজের মানসিক বাধা তার জীবনের সাফল্যের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করছে কিনা এটা দেখা দরকার। এমন সার্থকতা সম্বন্ধে অবশ্য একটি কথা যোগ করা দরকার। বাস্তবে জীবনে কে কতখানি সাফল্য লাভ করবে সেটা কিছুটা সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে। সব মানুষ জীবনে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় না। কিন্তু যে সুযোগ-সুবিধা একজন পেল, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করতে পারছে কিনা, নিজের মানসিক বাধা তার আত্মোপলব্ধির বিঘ্ন-স্বরূপ হচ্ছে কিনা, মানসিক স্বাস্থ্য বিচারের সময় এটাই আমরা দেখব। স্বীয় চেষ্টার দ্বারা সুযোগের যে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে তেমন জীবনকেই আমরা সার্থক বলব।

মানসিক স্বাস্থ্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যকে জোন্‌স্ প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। ওই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে সুখিত্ব। সুখিত্ব বলতে কেবল মাত্র সুখ বোঝায় না। সুখিত্বের মধ্যে রয়েছে উপভোগের ক্ষমতা ও আত্মসন্তুষ্টি। যে জীবনে আত্মসন্তুষ্টির অভাব সে জীবনে দেখা যায় নির্জ্ঞান অপরাধবোধ বাসা বেঁধেছে। ঐ অপরাধবোধ উপভোগ করবার ক্ষমতাকেও হ্রাস করে। সুখী মনোভাবের দৈন্যের মূলে ভয়, ঘৃণা এবং অপরাধবোধ রয়েছে এমন দেখা যায়। এ তিনটির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভয় বা উৎকণ্ঠা।

একথা অবশ্য সত্য, বর্তমানে পরিবেশের প্রভাবকে বাদ দিলে চলবে না। কোন একটি পরিবেশে একজন কতখানি সুখী থাকতে পারে সেটা নিশ্চয়ই

বিচার করতে হবে। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবকে সময় সময় আমরা খুব বড় করে দেখি, একথাও সত্য। প্রতিকূল পরিবেশেও কোন কোন মানুষ অনেকখানি সুখী এমন দেখা যায় ; আবার অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশেও কারো কারো মধ্যে সুখিত্বের অভাব দেখা যায়। মনে সুখ না থাকলে নিজের অসুখী মনোভাব বহির্বাস্তবের উপর প্রক্ষেপ করে, সেই বাস্তবকে অনেক সময় আরো কালো, আরো অন্ধকার করে আমরা দেখি একথা মনে রাখতে হবে।

একথা বোধহয় যোগ করা চলে যে, প্রত্যেক আত্মসচেতন মানুষের একটি জীবনদর্শন থাকে। একটি সুষ্ঠু জীবনদর্শনের ভিত্তি হল ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এক কথায় বাস্তবকে সম্যক জেনে ও বুঝেই ব্যক্তি নিজের জীবনদর্শন রচনা করতে পারে। জীবনকে স্থির ভাবে দেখা, সমগ্র ভাবে দেখাকে ম্যাথু আর্নল্ড দর্শন বলেছেন। আমি কি চাই, কি পারি, আমার সুযোগসুবিধা কতখানি, অন্যেরা আমার কাছ থেকে কি চায়, আমাকে কি দিতে হবে, বিশ্বসমাজে, বিশ্বভূমণ্ডলে আমার স্থান কোথায়, আমার স্থান কতটুকু —ঐ সমস্ত বিচার করে একজনকে তার জীবনদর্শন রচনা করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যের দ্বারা জীবনদর্শনের রূপটি গভীর ভাবে প্রভাবিত হলেও মানুষের কার্যকলাপের উপর জীবনদর্শন প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষের প্রতি প্রতি যাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা আছে, যাদের জীবনে সন্তুষ্টি ও আনন্দ আছে, কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে যারা নিজেদের আত্মোপলব্ধির জন্য সচেষ্ট, একটি সুষ্ঠু জীবনদর্শন যাদের রয়েছে—তেমন জীবনের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই লাভবান হবে। সুখী ভাব, বন্ধুভাব, ও আত্মোপলব্ধির চেষ্টা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি কমবেশী সঞ্চারিত হয়, তার মূল্য বড় কম নয়।

শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে কি নেবে, কতখানি নেবে—সেটা এই সম্বন্ধের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। জীবনের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব সম্বন্ধে একথা বিশেষরূপে সত্য। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে বাস্তবিকই স্নেহ করেন, শিক্ষার্থী যদি শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে—তবে শিক্ষক যা শেখাতে চান, শিক্ষার্থী তাই শিখতে চেষ্টা করবে ; শিক্ষার্থীর ভালোমন্দ সম্বন্ধে শিক্ষক যদি উদাসীন হন, শিক্ষার্থী যদি শিক্ষককে

শ্রদ্ধার চোখে দেখতে না পারে—তবে সুফল ফলবার সম্ভাবনা কম। যেখানে সম্বন্ধটি বৈরভাবাপন্ন, সেখানে শিক্ষক যা চান না, শিক্ষার্থী তাই করতে চেষ্টা করবে।

শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের আচরণ শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করে। সকল শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর আচরণ সমান নয়। কাউকে সে ভয় করে, কাউকে সে ভক্তি করে, কাউকে বিদ্রূপ করে, ছোট করে সে আনন্দ পায়। কোন কোন শিক্ষকের আচরণেই সময় সময় এমন কিছু থাকে যা দেখে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে বিদ্রূপ করবার সুযোগ পায়।

কোন কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভয় পান। কেউ কেউ শিক্ষার্থীদের পছন্দ করেন না। কারো আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট—কোন ছেলেকে তাঁর ভালো লেগে গেল, কোন ছেলেকে দেখলেই তাঁর রাগ হয়। কোন শিক্ষক হয়ত অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত —কি করেন, কি না করেন তার ঠিক নেই। কেউ হয়ত নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে করেন; কারো আবার তার ঠিক উল্টো, নিজেকে তিনি অনন্য বলে ভাবেন।

ছাত্রদের প্রতি তাঁর আচরণটিকে ঠিক ভাবে শিক্ষককে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে। এই আচরণের মূলেই বা কি আছে, ছাত্রদের প্রতি তাঁর নিজের মনোভাবের স্বরূপটি কি, এটা তাঁকে জানতে হবে। ছাত্ররা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে সর্বদা এমন আশঙ্কা যিনি পোষণ করেন—তাকে বুঝতে হবে এই আশঙ্কার মধ্যে বাস্তবই বা কতটুকু, আর কতখানি তাঁর নিজের বৈরভাবের প্রক্ষেপ। আমার যদি কারো উপরে রাগ থাকে এবং তার উপরে রাগ আছে একথা নিজের মনের কাছে স্বীকার করতেও যদি বাধা থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সে রাগ আমি তার উপর প্রক্ষেপ করে ভাবি—না, আমার তার উপরে রাগ নেই, কিন্তু আমার উপর তার রাগ আছে। হঠাৎ একটি ছেলেকে দেখে রাগ হল; বিস্মৃত অতীত জীবনের কোন অপ্রীতিভাজন ব্যক্তির সঙ্গে হয়ত ছেলেটির কোন সাদৃশ্য আছে—তাই তাকে দেখে আমার রাগ হল। কিন্তু কেন যে রাগ হল নিজে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। অকারণে কারো উপরে রাগ করায় নিজের মন নৈতিক সায় দিতে পারে না। তাই রাগের একটি মনগড়া কারণ আমি খাড়া করলাম: ছেলেটিকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি ছেলেটি ভাল নয়।

এই জাতীয় প্রক্ষেপ, পাত্রান্তরণ, যুক্তি উদ্ভাবন প্রধানতঃ নির্জ্ঞান মনের কাজ। নির্জ্ঞান মনের এসব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষকদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু ঐ সব পদ্ধতি সম্বন্ধে শুধু সাধারণ ধারণা থাকলেই চলবেনা। প্রত্যেকের নিজের মন কিভাবে কাজ করছে, ঐ সব প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে নিজের মন কত রকম ছল চাতুরির খেলা খেলছে—এসব তাদের বুঝতে হবে।

নিজের আচরণ ও নিজের মনোভাব সম্বন্ধে শিক্ষক যদি সচেতন হন, তবে নিজের আচরণ ও মনোভাবের উপর তাঁর অনেকখানি কর্তৃত্ব জন্মাবে। কি করছি, কেন করছি—এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে অন্যদের প্রতি আমাদের আচরণ অনেক পরিমাণে শোভন হবে। নিজেকে জানা মানে কেবলমাত্র সচেতন মনটুকুকে জানা নয়; নিজের গভীর মনের ইচ্ছা ও আবেগসমূহকে জানতে হবে। এক জাতীয় অন্তর্দর্শন কারো কারো মধ্যে দেখা যায় যা দিয়ে নিজেদের কাজকে তাঁরা নানাভাবে সমর্থন করেন। সংসারের ভালোর জন্য তারা সব কিছু করেন, তবু কেউ তাদের বোঝে না—এমন একটা মনোভাব এঁরা আঁকড়ে থাকেন। এ জাতীয় অন্তর্দর্শনকে আত্মজ্ঞান বলা চলে না। নিজেদের জানতে হলে নিজেদের প্রতি অমন ভিজে কারুণ্যের কোন স্থান নেই। আত্মজ্ঞানে সত্যনিষ্ঠাকে একমাত্র পাথেয় করে নিজেকে তন্ন তন্ন করে দেখতে হয়। নিজেদের স্বার্থপরতা, অহমিকা ও নৈতিক দৈন্য সব কিছুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করতে হয়।

এই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অসুস্থ মনের উপর মনের বিচ্ছিন্ন ও নির্জ্ঞান অংশের প্রভাব বেশী। নির্জ্ঞান মনকে অনেকাংশে জেনেই রোগী তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে সে সম্বন্ধে আগের একটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

শিক্ষার্থীদের আচরণের দ্বারা শিক্ষকেরা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হন—একথাও স্মরণ রাখা দরকার। সময় সময় ছেলেদের আচরণের কোন কারণ আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। শিক্ষকটি অধিকাংশ ছাত্রের শ্রদ্ধাভাজন, কিন্তু একটি ছেলে তাঁকে মোটে পছন্দ করে না। শিক্ষকটি স্নেহশীল, কিন্তু একটি ছেলে তাঁকে ভয়ানক ভয় করে। মাঝে মাঝে দেখা যায় তুচ্ছ কারণে ছেলেরা দল বেঁধে শিক্ষকদের বিরুদ্ধাচরণ করে। এ জাতীয় আচরণ অনেক সময়

ছেলেদের প্রতি শিক্ষকদের মনকে বিরূপ করে। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের যদি শুভেচ্ছা না থাকে, বিদ্বেষের দ্বারা সে সম্বন্ধ যদি কলঙ্কিত হয় তবে সে সম্বন্ধের দ্বারা কল্যাণ হবে, এমন আশা করা কঠিন। কারো বৈরাচরণ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি স্নেহ ও শুভেচ্ছা বজায় রাখা সাধারণতঃ কিছুটা কঠিন। তবে যদি বুঝতে পারা যায় ঐ বৈর আচরণের মূল কারণ কি, যদি জানা যায় শিক্ষক ছেলেদের চোখে অন্য কারো প্রতিভূ মাত্র—ঐ বৈর আচরণ হয়ত পিতামাতার বিরুদ্ধে ছেলেদের নিজেদের নিরুদ্ধ আক্রোশেরই বহিঃপ্রকাশ—তবে ছাত্রদের বৈর মনোভাবকে শিক্ষক অপেক্ষাকৃত সহজ মনে গ্রহণ করে, ঐ বৈর মনোভাব যাতে ছেলেরা কাটিয়ে উঠতে পারে, সে উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সাহায্য তিনি তাদের করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষককে বুঝতে হবে—এ কথা আগাগোড়াই আমরা বলে এসেছি। এখানে শুধু এ কথাই বলছি যাঁরা নিজেদের বোঝেন না, তাঁদের পক্ষে শিক্ষার্থীদের বোঝা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের বুঝতে হলে শিক্ষকদের প্রথমতঃ নিজেদের বুঝতে হবে। নিজেদের বুঝলেই শিক্ষার্থীকে সবখানি বুঝতে পারা যায়, এ কথা অবশ্য আমরা বলছি না। শিক্ষার্থীকে বুঝতে হলে বোধ হয় আরো কিছু বেশী জ্ঞানের দরকার। তবে নিজেদের যাঁরা ভাল করে বোঝেন, নিজেদের গভীর মনের যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা নিজেদের বয়স্ক মনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অন্তর্নিহিত শিশুমনকেও জানেন। নির্জ্ঞান মন অনেকাংশে একজনের শিশুমনই।

সুস্থ মনের কাছ থেকে আমরা দুটি জিনিষ আশা করতে পারি: (ক) নিজেদের তাঁরা বোঝেন (খ) অন্যকে তাঁরা বোঝেন। অন্যকে এই যে বোঝা—এটা কেবলমাত্র বুদ্ধির ব্যাপার নয়। বিভিন্ন মানুষের ও বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সহজভাবে একাত্ম হবার শক্তির দ্বারাই এটা প্রধানতঃ ঘটে। মানসিক সুস্থ লোকদের মধ্যে এই সহজ একাত্মতার শক্তিটি বেশী দেখা যায়। অসুস্থ লোকেরা সাধারণতঃ নিজেদের মধ্যে নিজেরা আবদ্ধ থাকে।

সংক্ষেপে বলতে হয়, যাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো—অমন শিক্ষক ছোটদের কাছে জীবনের একটি সুন্দর আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে ছোটরা নিরাপত্তা বোধ করে, তাদের বন্ধুভাব ছোটদের আকৃষ্ট করে। ছোটদের যাঁরা বোঝেন, শ্রদ্ধা করেন—ছোটরা তাঁদের ভালবাসাকে মূল্য দেবে, তাঁদের

খুশী করতে নিজেদের অসামাজিক ইচ্ছা ও প্রেরণাকে সংযত করে সুস্থ সামাজিক জীবন যাপনে আগ্রহ দেখাবে—তাতে আশ্চর্য কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন এই, নিজের মনকে শিক্ষকরা কেমন করে জানবেন। সচেতন মনকে না হয় অনেকটা জানা গেল, কিন্তু মনের বেশীর ভাগই তো নির্জ্ঞান। আমাদের আচরণের মূলে সচেতন ইচ্ছা যতখানি, তার চেয়েও বেশী হল মনের নির্জ্ঞান ইচ্ছা।

নির্জ্ঞানকে জানবার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা মনঃসমীক্ষা। কিন্তু মনঃ-সমীক্ষার সুযোগ অধিকাংশ শিক্ষকদের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব নয়। মনঃসমীক্ষা অর্থসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া সারা ভারতবর্ষে ক'জন ট্রেনড্ মনঃসমীক্ষকই বা আছেন? কলকাতায় বর্তমানে মনঃসমীক্ষকদের সংখ্যা সাতজনের বেশী নয়। সুতরাং দ্বিতীয় পন্থা হিসেবে বলা যেতে পারে—আত্ম-সমীক্ষা—নিজেকে নিজেই সমীক্ষা করা। আত্মসমীক্ষা খুবই কঠিন, আত্ম-সমীক্ষায় কোন কোন ক্ষেত্রে অশুভ ফল হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে আত্মসমীক্ষা কারো কারো পক্ষে সম্ভব বলে দেখা গেছে এবং তাতে কিছু কিছু সুফলও পাওয়া গেছে। ফ্রয়েড, গিরীন্দ্রশেখর বসু—নিজেদের সমীক্ষা নিজেরাই করেছিলেন। ফ্যারো (৩) নিজের আত্মসমীক্ষার পদ্ধতি ও ফলাফল একখানি ছোট বইয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আত্মসমীক্ষার ফলে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে, মানসিক গোলমালের কিছুটা উপশম হয়েছে—এমন তিনি দাবী করেছেন।

কোন মনঃসমীক্ষকের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ রেখে (যেমন সপ্তাহে একদিন) আত্মসমীক্ষা করতে পারলে সুফল পাবার সম্ভাবনা বেশী, ভুলত্রুটী বা বিপদের সম্ভাবনা কম।

আত্মসমীক্ষা কার পক্ষে সম্ভব, এটাও মোটামুটি বোঝা দরকার। যার অহম বিশেষ দুর্বল, আত্মসমীক্ষার চেষ্টা তার না করাই ভালো। আত্মসমীক্ষা করতে গেলে মনঃসমীক্ষার পদ্ধতি ও তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। আত্মসমীক্ষার যোগ্যতা একজনের আছে কিনা, এটা কোন মনঃসমীক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে পারলে ভালো হয়।

মনঃসমীক্ষার ষোল আনা সুফল আত্মসমীক্ষায় পাওয়া যায় না, একথা সত্য। মানসিক বাধাকে অক্ষম করে নির্জ্ঞান ইচ্ছা সমূহকে মুখোমুখি জানা, নিজের

মনের ভুলভ্রান্তির নিরসন ঘটিয়ে নিজের মধ্যে বাস্তববোধকে জাগ্রত করার কাজে মনঃসমীক্ষায় মনঃসমীক্ষকের সহায়তা পাওয়া যায়। মনঃসমীক্ষকের উপর আস্থা ও নির্ভরতা দ্বারা মনঃসমীক্ষিতের নিজেকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের বাধা অনেকখানি দূর হয়, বাস্তবকে বোঝা, বাস্তবকে স্বীকার করা তার পক্ষে সহজ হয়।

আত্মসমীক্ষায় ঐ কাজ মানুষের অহমকে একাই করতে হয়। গিরীন্দ্রশেখর বসু একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আত্মসমীক্ষায় সাধারণতঃ গভীর মনের বেশীদূর পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না। তবে নির্জ্ঞান মনের কিছুটা জানা যায় এবং কিছু উপকারও হয়। মনঃসমীক্ষার দুটি অংশ : (ক) মনঃসমীক্ষিতের অবাধ ভাবানুষঙ্গ (খ) মনঃসমীক্ষক কর্তৃক ঐ ভাবানুষঙ্গের ব্যাখ্যা। আত্মসমীক্ষায় ঐ ব্যাখ্যাটি যে সমীক্ষিত হচ্ছে তাকে নিজেকেই করতে হয়। সেজন্য মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকা দরকার।

আত্মসমীক্ষা সাধারণতঃ যে পদ্ধতিতে করা হয়, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলি। মনঃসমীক্ষকের কাছে মনঃসমীক্ষিতকে যা মনে আসবে, তাই বলে যেতে হবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই মনঃসমীক্ষা আরম্ভ করতে হয়। আত্মসমীক্ষায় এই প্রতিশ্রুতি নিজের কাছে নিজেকে দিতে হয়। ফ্যারো বলার পরিবর্তে লেখা বেছে নিয়েছিলন। একটি মোটাখাতায় যা তাঁর মনে আসতো, যত তাড়াতাড়ি-সম্ভব তাই তিনি লিখে যেতেন। ঐ লেখা সঙ্গত কিনা, নীতিসমর্থিত কিনা—এসব বিচারকে তিনি আমল দিতেন না। লেখার সময় ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে নেওয়া ভালো যেন কেউ দেখতে না পায়। কেউ দেখবে মনে হলে স্বভাবতঃই নিজের মনের কথা লিখতে বাধা আসবে। পনেরো কুড়ি মিনিটকাল এমন লেখার পর, কি লিখলেন, কেন লিখলেন—এটা বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। ফ্যারো পূর্বে কিছুকাল মনঃসমীক্ষিত হয়েছিলেন, মনসমীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কিছুটা জ্ঞানও ছিল। ঐ পূর্বজ্ঞানের আলোতে নিজের ভাবানুষঙ্গকে তিনি কিছুটা বুঝতে পারতেন।

ফ্যারো লিখেছিলেন, আত্মসমীক্ষায় 'বলাও' যেতে পারে। লেখা সম্বন্ধে একটি কথা বলা বোধহয় দরকার। অবাধ ভাবানুষঙ্গ লিপিবদ্ধ করা ডায়েরি লেখা নয়। ডায়েরি লেখাতে মানুষ কিছুটা নিজের কথা বলে। কিন্তু সেটা তার সচেতন মনেরই ব্যক্তিগত কথা। ডায়েরি লেখার সময় মানুষ কিছু কেটে-

ছেঁটে, বেছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। তার রূপটি মোটামুটি সুসংবদ্ধ। নিজের নির্জ্ঞান মনের খবর উদ্ধার করবার জন্যই অবাধ ভাবানুষঙ্গের প্রয়োজন। ভাব বাছাই করার কাজকে সেক্ষেত্রে একেবারে বাদ দিতে হবে। যা মনে আসবে, তাই বলতে হবে। ভাবানুষঙ্গ সুসংবদ্ধ হবে, এমন আশাও করা যায় না। যখন যেটা মনে আসছে, তখন সেটা বলছি (বা লিখছি)। আমাদের মন শাখা-মৃগের মত। একবার লাফিয়ে এ ডাল ধরছে, আরেকবার ঐ ডাল। একটা ছেড়ে আর একটা ধরার পিছনে অবশ্য কারণ আছে। ভাবানুষঙ্গের ব্যাখ্যার সময় সেটা বুঝতে হবে।

অবাধ ভাবানুষঙ্গের রূপটি কেমন তার কিছু নমুনা দিই। ভাবানুষঙ্গগুলি একটি মেয়ের। মেয়েটি একটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। তিনটি বিভিন্ন দিনে সে যে ভাবানুষঙ্গ দিয়েছে তার প্রত্যেকটির থেকে কিছু কিছু নীচে তুলে দেওয়া হল।

ভাবানুষঙ্গ ঃ "শীলার কি হয়েছে। দুদিন কথা বলেনা। শিপ্রা বাড়ী গেছে। মনে আসছে না কিছু। বলতেই হবে এমন কি দায়। মনের তলায় কিছু নেই...অন্ধকার...অনেক দূরে কে যেন...মা'র মত। চুল খুলে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় মা'ই হবে।"

ব্যাখ্যা ঃ কোন কিছু মনে না আসা'র মানে বলতে বাধা রয়েছে। মা'র সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতেই আসলে বাধা। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে মনে অবদমনের শক্তি কাজ করছে। 'বলতেই হবে এমন কি দায়' কথার দ্বারা এ্যানালিস্টের উপর রাগও প্রকাশ পাচ্ছে। কারো কাছে নতিস্বীকার করতে তার মন প্রস্তুত নয়।

ভাবানুষঙ্গ ঃ "একেবারে একা। কেমন একটা অসহায় ভাব। বাণীকে সবাই ভাল বলতো। আমাকে বাড়ীর সবাই বলতো ওর কত গুণ আর তুই কি? সেদিন সা, রে, গা, মা সাধছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার কি গান শেখা হবে? কাল রাত্রে মনে হল কে যেন ঘরে ঢুকল। ভাবলাম কাউকে ডাকি। পারলাম না। গা আমার কাঁপছিল। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলাম। কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না।"

ব্যাখ্যা ঃ মেয়েটির মধ্যে অসহায়বোধ ও হীনতাভাব রয়েছে। সে একা, কেউ তাকে ভালোবাসেনা, এ মনে করে সে নিজেকে অসহায় ভাবছে। ভয় পেয়েও ডাকতে পারছেনা—এর মধ্যে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়, ডাকতে চাইছে আবার চাইছেও না।

ভাবানুষঙ্গ ঃ "ট্রেনে আসছিলাম। একটা ৩, ৪ বছরের ছেলে ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই ধাক্কা দিয়ে ফেলে। ছেলেটা চেঁচাচ্ছিল। ধমকালাম। ভাবলাম ওর আত্মীয়স্বজন আমাকে মারবে। তার চেয়ে নিজের গলায় ছোরা বসাই সেও ভাল। ওকে ফেলে দিই রেল লাইনে। কি হল? গলাটা কাটা পড়ল। রক্ত ছুটল। সবাই ছুটে এল। মনে হচ্ছিল একদম মেরে শেষ করব। তারপর যা হবার হোক। ছোট বোনের উপর যখন রাগ হয় মনে হয় এমন মারব লাঠি দিয়ে যে পিঠটা একদম বেঁকে যাবে। অতটা পারিনা। মনে হয় বলি, তুই মরে যা। মরে যা বল্লে মা রাগ করে।"

ব্যাখ্যা ঃ অপরকে আঘাত করবার ইচ্ছা ও সেই সঙ্গে নিজেরও আঘাত পাবার ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। একটা আরেকটার পূর্ণ পরিতৃপ্তির পথে আবার বাধা সৃষ্টি করছে। মারতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার খাবার ভয় মনে আসছে। মার খাবার ভয় আসলে নির্জ্ঞান মনে মার খাবার ইচ্ছা। আবার মার খেতে মনে আপত্তিও রয়েছে।

অবাধ ভাবানুষঙ্গে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া খুব সহজ নয়। অনেক দিন ধরে, অনেক চেষ্টা করে এ ক্ষমতাকে আয়ত্ত করতে হয়। নিজেকে ছেড়ে দেবার দৈহিক ও মানসিক বাধাগুলি দূর করতে হয়। বিছানা বা ইজি চেয়ারে শুয়ে, চোখ বুজে সাধারণতঃ কথা বলতে হয়। যা খুশি বলার প্রধান বাধা আমাদের নৈতিক বোধ, আমাদের অহঙ্কার। নৈতিক বাধা সম্বন্ধে বলতে গেলে সোপেনহাওয়ারের দুটি কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় ঃ আমাদের কাজ আমাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। অসামাজিক কাজ থেকে আমরা নিবৃত্ত থাকব, কিন্তু অসামাজিক ইচ্ছা যদি আমাদের মনের গহনে থেকে থাকে, তবে তার অস্তিত্ব নিজের কাছে স্বীকার করতে আমাদের সঙ্কুচিত হলে চলবে না। অন্যের মনের খবর আমাদের জানা নেই। জানলে দেখতাম সবাই আমরা প্রায় একই রকমের। যতটা সাধু বলে আমরা সংসারে পরিচিত, মনে মনে (হয়ত আচরণেও) আমরা তার চেয়ে ঢের বেশী অসাধু। একথা স্বীকার করতে আমাদের অহঙ্কারে লাগলেও, যেটা সত্য তাকে এড়িয়ে যাবার অর্থ হয় না। ভয় করে সেটাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখাতে কোন কল্যাণ নেই। নিজেকে জানা দরকার—নিজের যৌন ও রোষাত্মক ইচ্ছাকে, নিজের নির্জ্ঞান অপরাধবোধ ও অজ্ঞান অহঙ্কারকে।

অধ্যায় ২৫

পরীক্ষা

স্কুলে বিভিন্ন বিষয় ছেলেমেয়েদের পড়ান হয়। বিষয়গুলি কেমন ও কতটা তারা শিখল সেটা পরিমাপ করবার জন্য মাঝে মাঝে তাদের পরীক্ষা করা হয়। নীচের দু'একটি শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা প্রধানতঃ মৌখিক হয়। একটু উপরে উঠলেই, অন্ততঃ বাঙলা দেশে, ছেলেমেয়েদের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। প্রশ্নপত্রে সাধারণতঃ সাত আটটি প্রশ্ন থাকে। তার মধ্যে পাঁচ ছয়টির উত্তর পরীক্ষার্থীদের লিখতে হয়। একমাত্র অঙ্ক ছাড়া প্রশ্নাবলীর উত্তরে ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট রচনা লেখে। অর্থাৎ, প্রবন্ধাকারেই প্রশ্নের উত্তর তাদের দিতে হয়। একটি প্রশ্নপত্রের মোট নম্বর সাধারণতঃ থাকে ১০০। পাশের একটা মান থাকে, তেমনি থাকে প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ প্রভৃতির মান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশের নম্বর হচ্ছে—৩০, দ্বিতীয় বিভাগের জন্য অন্ততঃ পেতে হবে ৪৫ ও প্রথম বিভাগের নম্বর হচ্ছে ৬০ ও তদূর্ধ্ব।

প্রশ্ন এই যে প্রচলিত পরীক্ষা দ্বারা ছেলেমেয়েদের অর্জিত জ্ঞান ও পারদর্শিতার সম্পূর্ণ ও সঠিক পরিমাপ বাস্তবিকই হয় কিনা! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আবশ্যক পরীক্ষার পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রধানতঃ তিনটি দিক আছে। প্রথমতঃ প্রশ্নপত্র রচনা, দ্বিতীয়তঃ খাতা দেখা ও নম্বর দেওয়া, তৃতীয়তঃ নম্বরের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা।

পরীক্ষার পরীক্ষা

দ্বিতীয়টি নিয়েই আরম্ভ করব। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে একই খাতা বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষা করে বিভিন্ন নম্বর দেন। বিভিন্ন পরীক্ষকদের নম্বর দেওয়ার মধ্যে কতখানি পার্থক্য ঘটে সে সম্বন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ফলাফল উল্লেখ করি। কার্নেজি ফাউণ্ডেশন ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজের উদ্যোগে ১৯৩১ সালে পরীক্ষার জন্য

একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়।* সেই সম্মেলনে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, স্কটল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ঐ দেশগুলির প্রত্যেকটিতেই পরীক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হবে বলে স্থির করা হয়। (১) ইংল্যাণ্ডে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা (যে পরীক্ষাটি ছেলেমেয়েরা ১৬ বছরে দেয়) ও হাইস্কুলে স্থানলাভের পরীক্ষা (১০ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েরা এই পরীক্ষাটি দেয়) ও আরো দু'একটি পরীক্ষার খাতা নিয়ে এই অনুসন্ধানটি চলে।

নম্বর দেওয়ায় পরীক্ষকদের মধ্যে সঙ্গতির অভাব

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ইতিহাসের ১৫টি খাতা নেওয়া হল। এই খাতাগুলি মাঝামাঝি নম্বর পেয়েছিল। নম্বরগুলি খাতা থেকে মুছে ফেলে পনেরো জন অভিজ্ঞ পরীক্ষককে খাতাগুলি পরীক্ষা করতে বলা হল। খাতা পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটি পরীক্ষককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও যথেষ্ট সময় দেওয়া হল। নির্দেশ রইল খাতার উপর নম্বর না দিয়ে তাঁরা আলাদা কাগজে নম্বর লিখবেন। পর পর পনেরো জন পরীক্ষকই খাতাগুলি পরীক্ষা করলেন। কেউ কারো নম্বর দেখলেন না। খাতাগুলি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় একই নম্বর পেয়েছিল। নূতন পরীক্ষায় পনেরো জন পরীক্ষকের হাতে খাতাগুলি ৪০ রকম বিভিন্ন নম্বর পেল। ন্যূনতম নম্বর হল ২১ ও গরিষ্ঠতম ৭১। বছরখানেক পরে আবার ঐ চোদ্দ জন (এক জন অনিবার্য কারণবশতঃ পরীক্ষা করতে পারেন নি)—খাতাগুলি পুনরায় পরীক্ষা করলেন। ১৪ জন ১৫টি খাতা পরীক্ষা করলে ১৪ × ১৫ = ২১০টি নম্বর পড়ে। ঐ ২১০টি নম্বরের মধ্যে ৯২ ক্ষেত্রে দেখা গেল পরীক্ষকেরা তাঁদের মত বদলেছেন, খাতায় অন্য নম্বর দিয়েছেন। দুবারের পরীক্ষাতেই নম্বর দেবার সঙ্গে প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থীকে পাশ, ফেল ও কৃতিত্ব বলে চিহ্নিত করতে পরীক্ষকদের বলা হয়। ৯টি ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় সাফল্যচিহ্নের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। ফেল কৃতিত্ব হয়ে গেল; কৃতিত্ব ফেল হল। একটি পরীক্ষক ১৫ জনের মধ্যে ৮ জনের বেলাতে নিজের মত পরিবর্তন করেন। যাকে আগে পাশ করিয়েছিলেন তাকে ফেল করালেন, যাকে ফেল করিয়েছিলেন তাকে পাশ করালেন।

---

* অনুসন্ধানের জন্য যে ইংলিশ কমিটি গঠিত হয়—তার মধ্যে ছিলেন সার মাইকেল স্যাডলার (চেয়ারম্যান), স্যার ফিলিপ হারটগ (ডিরেক্টর) এবং পি, বি, ব্যালার্ড, সিরিল বার্ট, পার্সি নান, সি, সি, স্পীয়ারম্যান প্রভৃতি।

ইতিহাসের বেলাতে পার্থক্যটি সবচেয়ে বেশী দেখা গেল। অন্যান্য বিষয়েও পার্থক্যের পরিমাণ কম নয়। যে অঙ্ক শুধু গণনার ব্যাপার সেখানে পার্থক্যটি সামান্য। কিন্তু প্রশ্নের অঙ্কে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা গেল।

সংক্ষেপে, বিভিন্ন পরীক্ষকের হাতে একটি খাতা গড়ে ১০% থেকে ১২% কম বা বেশী নম্বর পেল। কয়েকটি খাতাতে পার্থক্য দেখা গেল সামান্য; আবার কোন কোন খাতাতে ২০% নম্বর কম বা বেশী হল।

পরীক্ষকদের মধ্যে অসঙ্গতির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১২ সালে ষ্টার্চ ও এলিয়ট যে মূল্যবান অনুসন্ধানটি করেন—সেটি নীচে উল্লেখ করা হল। বিভিন্ন স্কুলের ১১৬ জন জ্যামিতির প্রধান শিক্ষককে একখানা জ্যামিতির খাতা পরীক্ষা করতে বলা হল। সে খাতাটি বিভিন্ন পরীক্ষকের হাতে ২৮% থেকে ৯২% পর্যন্ত নম্বর পেলে। উড্ আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি একদিক দিয়ে কৌতুকজনক। আবার প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতা কতখানি—ঘটনাটিতে সেটিও প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। কয়েকটি খাতা ৬ জন পরীক্ষকের পরীক্ষা করবার কথা। প্রথম পরীক্ষক প্রশ্নগুলির আদর্শ উত্তর কি হওয়া উচিত নিজের নম্বর দেবার সুবিধার জন্য একটি খাতায় লিখলেন। খাতাগুলি ফেরৎ দেবার সময় ভুলে সেই খাতাটিও অন্যান্য খাতার সঙ্গে চলে গেল। বাকী পাঁচজন পরীক্ষক ঐ খাতাটিও পরীক্ষা করলেন। খাতাটি পাঁচজন পরীক্ষকের হাতে ৪০% থেকে ৯০% পর্যন্ত নম্বর পেল। (২)

এদেশের পরীক্ষকদের মনোভাব

এ দেশের পরীক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। যে রচনা রামবাবুর কাছে সুন্দর সে রচনাকে শ্যামবাবু সুন্দর মনে করেন না। রামবাবু আধুনিক মনোভাবাপন্ন। চলতি ভাষাকে ভাবপ্রকাশের একটি শক্তিমান বাহন বলে তিনি মনে করেন। বানান ভুল তাঁর মতে বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু একটি কি দুটি বানান ভুলের দ্বারা মহাভারত অশুদ্ধ হয় এমন তিনি মনে করেন না। শ্যাম বাবু পুরাতনপন্থী। বানান ও ব্যাকরণ তাঁর কাছে বড়। কি লিখল এটা তাঁর কাছে তত মূল্যবান নয়। ছেলেমেয়েরা কেমনভাবে লিখল, রচনা নির্ভুল হল কিনা—এটা তাঁর কাছে আসল কথা।

অঙ্কের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। রমেনবাবু মনে করেন—পরীক্ষার্থী পদ্ধতি

জানে কিনা এটাই বড় কথা। অঙ্ক কষতে গিয়ে যোগবিয়োগে সামান্য ভুলের জন্য অনেকসময় উত্তর ভুল হয়। সেজন্য কয়েক নম্বর কাটতে হবে ঠিকই। তবে বেশী নম্বর কাটা ঠিক হবে না। সমরবাবু মনে করেন অঙ্কে নির্ভুলতাই আসল কথা। পদ্ধতি ঠিক করতেই হবে, কিন্তু উত্তরও ঠিক চাই। এর কোনটাতে ভুল হলেই সব ভুল। এর মধ্যে মাঝামাঝি কিছু নেই।

অঙ্কে নম্বরদানের পদ্ধতি

মনোভাবে এই রকম শতসহস্র পার্থক্য পরীক্ষকদের মধ্যে আছে। পরীক্ষার্থী কি লিখল—কেবলমাত্র তার উপরে পরীক্ষার ফল নির্ভর করে না। যে পরীক্ষক খাতা দেখবেন—তার পছন্দ অপছন্দ, তিনি কোনটাকে ঠিক বা কোনটাকে বেঠিক মনে করেন—তার উপর পরীক্ষার্থী কি নম্বর পাবে সেটাও অনেকখানি নির্ভর করে। এ জাতীয় পরীক্ষা পরীক্ষার্থীর শিক্ষামান কতখানি সঠিক ভাবে নিরূপণ করে এটা ভাববার কথা।

ভৌতিক ক্ষেত্রের একটি ব্যাপারের সঙ্গে এর তুলনা দেব। একটি ছেলের দৈর্ঘ্য মাপা হবে। মাপের ফিতে আনা হল। রামবাবু মেপে বললেন, ৫ ফুট। শ্যামবাবু বললেন, ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। বিভিন্ন লোকের হাতে ছেলেটির মাপ বিভিন্ন রকম পাওয়া গেল। ঐ মাপকে কতটুকু নির্ভরযোগ্য বলা যায়? তেমনি যে পরীক্ষায় ছাত্র রামবাবুর কাছে পায় ৬০ আর শ্যামবাবুর কাছে পায় ৪০—সে পরীক্ষার মূল্য কতটুকু?

পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীদের শিক্ষামান সঠিক ভাবে নির্ধারিত হচ্ছে কিনা এটা বোঝবার জন্য কয়েকটি জিনিস আমাদের জানা দরকার: (ক) বিভিন্ন পরীক্ষক যদি ঐ খাতাগুলি দেখেন তবে তাঁদের নম্বরের মধ্যে সঙ্গতি কতখানি। রামবাবুর হাতে যে উচ্চ নম্বর পেল শ্যামবাবুর কাছেও সে উচ্চ নম্বর পেল কিনা ইত্যাদি। বিভিন্ন পরীক্ষকদের নম্বরের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক কি এটা জানলে নম্বরগুলির সঙ্গতি আমরা বুঝতে পারব।

নম্বরদানে পরীক্ষকদের মানের মধ্যে সঙ্গতির প্রয়োজন

(খ) একই পরীক্ষক যদি খাতাগুলি দ্বিতীয়বার দেখেন তবে তাঁর প্রথমবারের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের নম্বরদানের সঙ্গতি কতখানি—একথা জানা দরকার। একই খাতায় দু'বার দু'রকম নম্বর পড়েছে এমন দেখা যায়। এই অসঙ্গতি দু'রকম হতে পারে। সব পরীক্ষার্থীই হয়ত দ্বিতীয় পরীক্ষায়

প্রায় সমভাবে কিছু বেশী বা কিছু কম নম্বর পেতে পারে। যেখানে পাশ, ফেল ও কৃতিত্বের একটি ন্যূনতম মান বেঁধে দেওয়া আছে—যেমন আমাদের পরীক্ষায়—সেখানে পরীক্ষার্থীদের নম্বর বাড়া বা কমা'র মূল্য পরীক্ষার্থীদের কাছে অনেকখানি। নম্বর বাড়লে, যে ফেল ছিল সে হয়ত পাশ করল; যে কেবলমাত্র পাশ করেছিল সে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করল। নম্বর কমলে, পাশ হয়ত ফেল হল; কৃতিত্ব শুধুমাত্র পাশে পর্যবসিত হল।

পরীক্ষকের নিজের মানের মধ্যে সঙ্গতির প্রয়োজন

পরিসংখ্যান শাস্ত্রানুসারে একটি নম্বরের প্রকৃত মূল্য বা মান বোঝবার জন্য পরীক্ষার্থীদের গড় নম্বর ও প্রমাণ ব্যত্যয়ের সাহায্যে নেওয়া হয়। নম্বরগুলি ঐভাবে দেখলে পরীক্ষার্থীদের নম্বর সমভাবে বাড়া কিম্বা সমভাবে কমার ফলে তাদের নম্বরের প্রকৃত মূল্য বা মান বিশেষ বদলাবে না। বিশেষভাবে মারাত্মক যেখানে অসঙ্গতি সব সময় ঠিক একটি দিকে নেই। কারো বেলায় হয়ত নম্বর বাড়ল, আবার কারো বেলাতে কমল। এ জাতীয় অসঙ্গতির পরিচয়ও পরীক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে।

প্রচলিত পরীক্ষায় বিভিন্ন পরীক্ষকদের মানের মধ্যে ও পরীক্ষকের নিজের মানের মধ্যে সঙ্গতির অভাব দেখা যায়। বিষয়মুখী পরীক্ষায় এই অসঙ্গতিটি থাকে না। বিষয়মুখী পরীক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে পরে এসম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি।

(গ) একজন পরীক্ষার্থী একটি পরীক্ষা যদি অল্পদিনের ব্যবধানে দুইবার দেয় তবে তার দুটি ফলের মধ্যে কতখানি সঙ্গতি থাকবে? ধরা যাক, মালতী অঙ্ক পরীক্ষা দিচ্ছে। একটি প্রশ্নপত্র তাকে দেওয়া হল। প্রথমবার সে পেল ৮০। একমাস পর ঐ প্রশ্নপত্রটি আবার তাকে দেওয়া হল। অঙ্ক কষতে গিয়ে কয়েকটি অঙ্ক তার ভুল হয়ে গেল। সে পেল ৪০। যে পরীক্ষার ফলাফলে স্থিরতার এতখানি অভাব, যে পরীক্ষার আত্মসঙ্গতি এত কম—সে পরীক্ষা দ্বারা অঙ্কে মালতীর পারদর্শিতা সঠিকভাবে নিরূপিত হচ্ছে একথা আমরা কেমন করে বলব?

পরীক্ষার আত্মসঙ্গতির প্রয়োজন

(ঘ) কোন একটি বিষয়ে একবারের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী একটি নম্বর পেল। ধরা যাক সেটি প্রথম টার্মিন্যাল পরীক্ষা। দ্বিতীয় টার্মিন্যাল পরীক্ষায় তার নম্বর কি, প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলাফলে সাদৃশ্য কতখানি—এটাও

জানা দরকার। এক-আধজনের বেলাতে গুরুতর পার্থক্য হলে আমরা মনে করতে পারি, হয়ত ছেলেটি এবারে অসুস্থ ছিল, পড়তে পারে নি, সেজন্য তার ফল খারাপ হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা যদি নির্ভরযোগ্য মাপক হয়, তবে বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থীদের অনুরূপ দুটি পরীক্ষার ফলের মধ্যে উচ্চ সঙ্গতি থাকবে। অর্থাৎ, ফলাফল দুটির পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক পজিটিভ হবে। ঐক্যাঙ্ক পূর্ণ (অর্থাৎ + ১) না হলেও, পূর্ণের কাছাকাছি হবে।

দুটি অনুরূপ পরীক্ষার মধ্যে সঙ্গতির প্রয়োজন

(ঙ) কোন একটি বিষয়ে পরীক্ষার্থীরা উপযুক্ত পরিমাণ জ্ঞান ও পারদর্শিতা অর্জন করেছে কিনা পরীক্ষা দ্বারা তারই পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। ধরা গেল, পরীক্ষকদের মধ্যে ও পরীক্ষার মধ্যে উচ্চ সঙ্গতি বা পারম্পর্য রয়েছে। তবু কি জোর করে বলা যায় যে ঐ পরীক্ষার দ্বারা বিষয়টিতে ছাত্রদের জ্ঞান ও পারদর্শিতা নিরূপিত হয়েছে? ধরা যাক পরীক্ষাটি বাঙলার। প্রশ্ন এই যে, বাঙলায় যারা সত্যিকারের ভালো তারা পরীক্ষায় ভালো করেছে কিনা। যারা বাঙলা কম জানে, তাদেরই বা পরীক্ষার ফলাফল কেমন হয়েছে? প্রশ্নটি উল্টো করেও করা যেতে পারে। যারা বেশী নম্বর পেয়েছে তারা বাঙলায় তদনুরূপ ভালো কিনা? যারা কম নম্বর পেল তারাই বা বাঙলায় কেমন? বাঙলায় একটি ছেলের সত্যি কেমন পারদর্শিতা এটা স্থির করবার জন্য কয়েক রকম পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

পরীক্ষার সত্যতার প্রয়োজন

(১) কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফলের গড়

একটি বিষয়ে ছেলেমেয়েদের কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফলের গড়ের দ্বারা তাদের শিক্ষামান কিছু পরিমাণ নিরূপিত হয়—আমরা মনে করিতে পারি। তার চেয়েও ভালো হয় যদি একাধিক পরীক্ষক পরপর কয়েকটি পরীক্ষার খাতা প্রত্যেকে দেখেন, তারপর সেই সব নম্বরের গড় নেওয়া হয়। ছেলেমেয়েদের পারদর্শিতার মান ঐ গড় নম্বরগুলির দ্বারা সঠিকরূপে সূচিত হয়।

(২) একাধিক পরীক্ষকের পরীক্ষার গড়

পরিসংখ্যান শাস্ত্রানুসারে একটি পরীক্ষার অসম্পূর্ণতা সাধারণতঃ আরেকটি পরীক্ষা দ্বারা কিছু পরিমাণে দূর হয়; একটি পরীক্ষকের ভ্রম ও একদেশদর্শিতা অপর পরীক্ষক হ্রাস করেন।

একটি বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকদের অভিমতের গুরুত্ব আছে। বাঙলায় একটি ছেলে কেমন—সে সম্বন্ধে শ্রেণীতে বাঙলা যাঁরা পড়ান তাঁরা নিশ্চয়ই অনেকটা বলতে পারবেন। ছেলেটিকে প্রায় রোজই তাঁরা শ্রেণীতে দেখেন। সে শ্রেণীতে পড়াশোনা করে আসে কিনা, বিষয়টি সে কেমন বোঝে, তার রচনাশৈলী কেমন—ছেলেটির প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণীর কাজ থেকে শিক্ষকদের ধারণা জন্মায়। বিষয়টি সম্বন্ধে ছেলেটির জ্ঞান ও পারদর্শিতা সম্বন্ধে শিক্ষকদের অভিমত সতর্ক ও সযত্ন প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণের উপর আশ্রিত হলে সেই অভিমতকে বিশেষ মূল্যবান বলে স্বীকার করতে হবে। অমন ক্ষেত্রে ছেলেটিকে শিক্ষকেরা ভালো বল্লে ছেলেটি ভালো এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল যদি শিক্ষকদের ধারণার সঙ্গে অনেকাংশে এক হয়—তবেই বলা চলে যে পরীক্ষা দ্বারা ছেলেদের জ্ঞান ও পারদর্শিতার প্রকৃত পরিমাপ বা পরীক্ষা হচ্ছে। অর্থাৎ, বাঙলা পরীক্ষায় যে ভালো নম্বর পেল, বাঙলা সে ভালো জানে। মাঝামাঝি যার নম্বর, বাঙলার জ্ঞান তার মাঝামাঝি। কম নম্বর যে পেল, সে বাঙলা কম জানে।

শিক্ষকদের অভিমত

প্রচলিত পরীক্ষায় পরীক্ষার ফল পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হয়। একই পরীক্ষার খাতা দেখে একেকজন পরীক্ষক একেকপ্রকার নম্বর দেন। একই পরীক্ষকের হাতে একই খাতা দু'বার পরীক্ষায় দু'রকম নম্বর পায় এও দেখা যায়। এমন পরীক্ষার ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। পরীক্ষায় পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের ছাপ যাতে না পড়ে, বিভিন্ন পরীক্ষকের হাতে একই উত্তর যাতে একই নম্বর পায়, একই পরীক্ষক দু'বার দেখলে যাতে নম্বর একই থাকে—সেই উদ্দেশ্যে বিষয়মুখী প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। প্রচলিত ও বিষয়মুখী প্রশ্নের নমুনা নীচে উল্লেখ করা গেল। ধরা যাক, পরীক্ষাটি ইতিহাসের।

বিষয়মুখী প্রশ্নপত্র

প্রচলিত প্রশ্নের নমুনা

১। গুপ্তযুগকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

২। শেরসাহের রাজ্যশাসন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্নের নমুনা

১। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কোন সালে হয়েছিল ?

২। চারিটি উত্তরের মধ্যে যেটি ঠিক উত্তর—তার নীচে দাগ দাও।

(ক) দীন ইলাহি ধর্ম প্রচার করেছিলেন কে ? কবীর ? আকবর ? আওরঙ্গজেব ? শিবাজী ?

(খ) আওরঙ্গজেব তাঁর সাম্রাজ্যবিস্তারে সব চেয়ে বেশী বাধা পান—রাজপুতানা অভিযানে ? দাক্ষিণাত্য অভিযানে ? মুরাদের কাছে ? দারার কাছে ?

৩। দুটি উত্তরের মধ্যে যেটি ঠিক উত্তর তার নীচে দাগ দাও।

(ক) অশোক শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন—হাঁ ঃ না।

(খ) সারনাথে বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন—হাঁ ঃ না।

প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় প্রবন্ধাকারে। বিষয়মুখী নয়া প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত, একটি দুটি শব্দ কিম্বা একটি শব্দের নীচে দাগ। সব চেয়ে বড় কথা, বিষয়মুখী প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর **মাত্র একটিই** হবে। পরীক্ষার্থী সেই উত্তরটি দিতে পারলে নম্বর পাবে ; যদি না পারে—সে নম্বর পাবে না। ঐ নম্বরদান ব্যাপারে পরীক্ষকদের নিজস্ব বিচার বা বিবেচনার কোন স্থান নেই। এইজন্য বলা হয় পরীক্ষাটি ব্যক্তিমুখী নয়, বিষয়মুখী।

ব্যক্তিমুখী ও বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তরের ধরণ

বিষয়মুখী পরীক্ষার প্রশ্নাবলী দুই জাতীয় হতে পারে। একজাতীয় প্রশ্নে উত্তরটিতে অনুস্মরণ করতে হয়। যেমন প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কোন সালে হয়েছিল ? এ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া নেই। পরীক্ষার্থীকে ভেবে, মনে করে লিখতে হবে। একে স্মৃতিরূপ প্রশ্নোত্তর বলা যেতে পারে।

বিষয়মুখী পরীক্ষা স্মৃতিরূপ প্রশ্নোত্তর

আরেকজাতীয় প্রশ্নের সঙ্গে দুই থেকে পাঁচটি উত্তর দেওয়া থাকে। তারই মধ্যে যেটা প্রশ্নের ঠিক উত্তর সেটি চিনে বা বুঝে তার তলায় দাগ দিতে হবে। এ জাতীয় পরীক্ষাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কোন প্রশ্নের সঙ্গে দুটি উত্তর থাকে। আবার কোন প্রশ্নের সঙ্গে দুইয়ের অধিক উত্তর দেওয়া থাকে। দুই থেকে কিম্বা বহু থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করতে হয়। প্রথমটিকে বলা হয়—'দুই (উত্তর) থেকে নির্বাচন', পরেরটিকে—'বহু (উত্তর) থেকে নির্বাচন'।

প্রচলিত বা ব্যক্তিমুখী পরীক্ষায় সাধারণতঃ পাঁচ থেকে দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। বছরের পর বছর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—এমনও দেখা যায়। সমস্ত বই না পড়ে—পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর শেখার উপরই পরীক্ষার্থীরা জোর দেয়। সে সব প্রশ্ন পরীক্ষায় এসে গেলে ফল ভালো হয়। আর যদি না আসে তবে ফল খারাপ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? পরীক্ষার ফলাফলে এই অনিশ্চয়তার দরুণ পরিমাপক হিসেবে পরীক্ষার মূল্য অনেকখানি কমে যায়।

প্রচলিত ও বিষয়মুখী পরীক্ষার তুলনা: প্রচলিত পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যাল্পতা

বিষয়মুখী পরীক্ষায় একটি প্রশ্নোত্তরের জন্য সাধারণতঃ এক আধ মিনিট সময় লাগে। ফলে পরীক্ষাপত্রে বহু প্রশ্ন থাকে। ৫০ থেকে ১০০টি প্রশ্নও থাকতে দেখা যায়। যে বিষয়টির পরীক্ষা—সে বিষয়টি সম্বন্ধে বহু ও বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। বিষয়মুখী পরীক্ষায় বিষয়টি না জেনে পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব নয়।

বিষয়মুখী পরীক্ষায় বহু প্রশ্নের সন্নিবেশ

প্রচলিত পরীক্ষায় পরীক্ষার জন্য তৈয়েরি হবার একটি আলাদা কৌশল আছে। পড়াশোনায় ভালো হলেই যে পরীক্ষায় এক জন সব সময় ভালো করে এ কথা সত্য নয়। অন্যপক্ষে পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়েও বেছে বেছে প্রশ্ন তৈয়েরি করে—ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে—কোন কোন ছেলে মেয়েকে পরীক্ষায় ভালো করতে দেখা গেছে। বিষয়মুখী পরীক্ষায় ভালো করবার আলাদা কৌশলের বিশেষ গুরুত্ব নেই। পরীক্ষায় ভালো করতে হলে বিষয়টিকে ভালো করে জানতে হবে।

নীচে একটা দাগ দিয়ে কিম্বা একটি দুটি শব্দ লিখে পরীক্ষা দেবার পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষার্থীর বিদ্যার কতটুকু আমরা পরিচয় পাই—এ সন্দেহ প্রথমেই আমাদের মনে আসে। একটি জিনিসকে গুছিয়ে লিখতে পারে, ভাষার দ্বারা সুচারুরূপে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে—তবেই তো সে লেখা-পড়া শিখেছে এ কথা আমরা মনে করতে পারি। উত্তরে একথা বলা চলে—একটি বিষয়কে জানা ও সেই বিষয়ে একটি ভালো প্রবন্ধ লেখা—দুটি সর্বতোভাবে এক নয়। সাহিত্যের বেলাতে অবশ্য রচনার উৎকর্ষই সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু একজন ইতিহাস ভালো জানে এ কথার অর্থ কি?

বিষয়মুখী পরীক্ষার অসম্পূর্ণতা: রচনাশক্তি পরীক্ষিত হয় না

উত্তরে বলা যেতে পারে যে ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে তার প্রভূত জ্ঞান আছে। প্রবন্ধ লেখাতে হয়ত সে ভালো নয়, কিন্তু ইতিহাস সে জানে। ইতিহাস পরীক্ষা দ্বারা আমরা তার ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করতে চাই, তার বাঙলা বা ইংরেজি ভাষার দখল নয়। ভাষাজ্ঞান ও ভাষা দ্বারা ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা পরীক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সেটা আমরা ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষার সময় নির্ণয় করব ; প্রয়োজন মনে করি তো ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষায় মোট নম্বর আমরা বাড়িয়ে দেব। কিন্তু ইতিহাস পরীক্ষা করতে হলে ভাষার পরীক্ষা নয়, ইতিহাস জ্ঞানেরই পরীক্ষা আবশ্যক।

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির বেলাতে এ কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল যে বিষয়মুখী পরীক্ষা দ্বারা আমাদের কাজ চলতে পারে। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষার বেলাতে কি করণীয়—এই প্রশ্নের উত্তরটি অত সহজ নয়। বাংলার কথাই নেওয়া যাক। একজন বাংলা জানে—এ কথার অর্থ কি? উত্তরে অনেক কিছু বলতে হয়ঃ তার শব্দসম্ভার বেশী, বহু শব্দের মানে সে জানে, বিভিন্ন জায়গায় সেসব শব্দ সে ব্যবহার করতে পারে।

ভাষা ও সাহিত্যে ব্যক্তিমুখী পরীক্ষার আংশিক প্রয়োজন

একটি গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা পড়ে তার অর্থ সে বুঝতে পারে।

প্রত্যেকটি পংক্তির ও গোটা প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতাটির অর্থ তার হৃদয়ঙ্গম হয়।

সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা তার আছে।

বাঙলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে তার জ্ঞান আছে।

নিজের ভাব প্রকাশে সক্ষম ও সুচারুভাবে ভাষাকে সে ব্যবহার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে তার রচনাশৈলীর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লেখাতে সে ভুল করে না কিম্বা ভুল কম করে। ভুল বলতে—বাক্য গঠনে কিম্বা বানানে ভুল থাকতে পারে।

বাঙলা ভাষার দখলকে এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায়—এর কিছু অংশ বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী দ্বারা পরীক্ষা সম্ভব এবং কোন কোন অংশ পরীক্ষার জন্য প্রচলিত ব্যক্তিমুখী পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। রচনা লেখবার ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য রচনা লেখা ছাড়া অন্য কোন তেমন উপযুক্ত কার্যকরী উপায় আজও আমরা জানি না। রচনা লিখেই রচনা লেখার ক্ষমতার

পরীক্ষা আজও ছেলেমেয়েদের দিতে হবে। ব্যক্তিমুখী পরীক্ষার অসম্পূর্ণতা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। খাতা দেখার ব্যাপারে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া থাকলে—যা কিছু পরিমাণে এখনও থাকে—নম্বরদানে পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের ছাপ কিছু কম পড়বে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে—বানান ভুলের জন্য কত নম্বর কাটা হবে, বাক্য গঠনে ভুলের জন্যই বা কত নম্বর; লেখা ব্যাপারে সাধু ও চলতি ভাষার স্থান, ভাষার নির্ভুলতা ও সৌন্দর্য—কিসের জন্য কত নম্বর ধরা হবে—এ সমস্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এ সব নির্দেশ সত্ত্বেও পরীক্ষকদের নম্বরদানে কিছু পার্থক্য থাকবেই। এই অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ রেখেও বলতে হবে—ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতার একটি অংশকে, যেমন রচনা লেখার ক্ষমতা, পরিমাপের জন্য আজও ব্যক্তিমুখী পরীক্ষা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য অংশ পরীক্ষার জন্য বিষয়মুখী প্রশ্নাবলীর ধরণ সম্বন্ধে নীচে একটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হল।

১। পাঠ ও অর্থবোধের ক্ষমতা পরীক্ষা

নীচের লেখাটি খুব মন দিয়ে পড়। পড়া হয়ে গেলে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতে হবে। লেখাটির শেষে প্রশ্নগুলি দেওয়া আছে।

পাঠ

'মৃত্যু সাধারণতঃ আমাদের কাম্য নহে। একদিন আমাদের সকলকেই মরিতে হইবে, হৃদয় হইতে এ কথা পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করিনা। ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সেদিন একাকী, সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে মারবার অধিপতি পৃথ্বীসিংহের মনে হইল, স্বহস্তে ললাটে কলঙ্ক তিলক পরিবার পূর্বে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তিনি ভাবিলেন, অন্তহীন নিঃস্বপ্ন সুপ্তিই মৃত্যু। তবে মৃত্যুকে ভয় কিসের? তিনি মরিয়া বাঁচিবেন। কটিতে ছোরা ঝুলিতেছিল। তাঁহার ডান হাত ছোরার হাতলটি স্পর্শ করিল। অমনি সম্বিৎ ফিরিল। আত্মহত্যা ভীরুতা। জীবনের রণাঙ্গন হইতে পলায়নেরই তাহা নামান্তর। সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ রজনীতে পৃথ্বীসিংহের চোখে ঘুম আসিল না।'

উপরের লেখার সাহায্যে নীচের প্রশ্নকয়টির উত্তর দাও। কোন কোন প্রশ্নের সঙ্গে চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক উত্তর সেটির নীচে দাগ দাও।

(ক) মারবারের রাজার নাম কি?

(খ) সেদিন রাত্রিতে পৃথ্বীসিংহ মরিলেন? ঘুমাইলেন? ঘুমাইলেন না? মরিলেন না?

(গ) পৃথ্বীসিংহ কেমন করিয়া মরিবেন ভাবিয়াছিলেন? বিষ খাইয়া? তরোয়ালের সাহায্যে? যুদ্ধ করিয়া? ছোরা বসাইয়া?

(ঘ) মানুষ ভাবে সে অমর। কারণ—জীবন সুখের? মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়? মরণকে মানুষ ভয় করে? মরণ বড় কষ্টের?

(ঙ) 'অন্তহীন নিঃস্বপ্ন সুপ্তি'র দ্বারা সবচেয়ে কোনটি বেশী বোঝায়—কলঙ্ক অপনয়ন? অঘোর নিদ্রা? চেতনার সমাপ্তি? চিরশান্তি?

(চ) পৃথ্বীসিংহ স্থির করিলেন—তিনি মরিয়া বাঁচিবেন। 'মরিয়া বাঁচিবেন' এ কথার দ্বারা সবচেয়ে বেশী বোঝায় কোনটি—নবজন্ম লাভ করিবেন? দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন? মরিয়া ভূত হইবেন? মায়ামোহ হইতে মুক্তি মিলিবে?

(ছ) পৃথ্বীসিংহের আত্মহত্যা না করিবার কারণ কি তাঁহার—সাহস? ভয়? দুঃখ? আত্মহত্যা পাপ বলিয়া তাঁহার ধারণা?

২। শব্দ সম্ভার পরীক্ষা

নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে চারটি করে উত্তর রয়েছে। যেটি ঠিক উত্তর তার নীচে দাগ দাও।

(ক) দৈন্য বলতে সবচেয়ে বেশী কি বোঝায়—দুঃখ? হীনতা? দারিদ্র্য? দুর্দশা?

(খ) শাশ্বত বলতে সবচেয়ে বেশী কি বোঝায়—
ক্ষণস্থায়ী? নিত্য? সুন্দর? শুভ্র?

(গ) বিপ্লব বলতে সবচেয়ে বেশী কি বোঝায়—বিবর্তন? সোস্যালিজম? যুদ্ধ? আমূল পরিবর্তন?

(ঘ) শান্তি বলতে সবচেয়ে বেশী বোঝায় কোনটি—
সুখ? স্বাচ্ছন্দ্য? নিরুদ্বেগ মানসিক অবস্থা? ঈশ্বরলাভ?

৩। নীচে কয়েকটি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া আছে। কতগুলি শব্দও রয়েছে। একটি শব্দ একটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে পূরণ করবে। অসম্পূর্ণ বাক্যগুলি ঐ শব্দসমূহের সাহায্যে পূরণ কর ঃ

বিদ্বেষ, চৈতন্য, হিংস্র, নিরামিষাশী।

(ক) বাঘ একটি—জীব।

(খ) গরু—।

(গ) বন্ধুর দেহে রক্তপাত দেখিয়া তাঁহার—লোপ পাইল।

(ঘ) একমাত্র প্রেমই মানুষের মন হইতে—দূর করিতে পারে।

বিষয়মুখী পরীক্ষার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ যে ঐ পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষার্থী কেবলমাত্র তথ্য জানে কিনা তারই পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষা প্রধানতঃ পরীক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা—কেউ কেউ এমন মনে করেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ ঃ বিষয়মুখী পরীক্ষা স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা

বিষয়মুখী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অনেক সময়ে যেভাবে রচিত হয় তাতে উপরোক্ত অভিযোগ কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য বলে দেখা গেছে। তবু আমরা বলব যে শুধু মনে রাখা নয়, বিষয়টি পরীক্ষার্থী বুঝেছে কিনা—বিষয়মুখী প্রশ্নাবলীর দ্বারা তার বিচারও সম্ভব। শুধু স্মৃতিশক্তি নয়, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরীক্ষাও বিষয়মুখী প্রশ্নপত্র দ্বারা করা যায়। স্মরণ রাখা দরকার যে বুদ্ধি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী বিষয়মুখীই। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। কলা ও কমলালেবু কোন্ দিক দিয়ে একরকম? বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সাহায্যেই ঐ প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব।

চিন্তাকে সংহত ও সুসংবদ্ধরূপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা বিষয়মুখী পরীক্ষার দ্বারা নিরূপিত হয় না—এ আরেকটি অভিযোগ। এ সম্পর্কে ব্যালার্ডের (৩) উত্তর হচ্ছে—ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পরীক্ষার্থীরা তথ্যসমূহকে সম্বন্ধিত করে। একে স্টাউট—'নোয়েটিক সংশ্লেষণ' বলেছেন। একটি সুসংবদ্ধ প্রবন্ধ লিখতে মনের সংগঠনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি বিষয়মুখী

তৃতীয় অভিযোগ ঃ মনের সংগঠনী ক্ষমতার পরীক্ষা হয় না।

প্রশ্নের উত্তর দিতে তথ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ স্থাপনে মন একজাতীয় ক্ষমতার পরিচয় দেয়। এই দুটি ক্ষমতার মূলেই রয়েছে মনের একই সংশ্লেষণ শক্তি। দুটি সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে এক কিনা—এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ অবশ্য পরিসংখ্যানের

অনুসন্ধান থেকেই পাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে পুরোপুরি প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে তা থেকে এ কথা বোধ হয় বলা যায় যে জ্ঞানকে সংহত ও সংবদ্ধ করবার ক্ষমতা পুরানো পরীক্ষা ও নূতন পরীক্ষায় প্রায় সমপরিমাণে নির্ণীত হয়।

চিন্তাশক্তির মৌলিকতা নূতন পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় না—এটি আরেকটি অভিযোগ। এই অভিযোগে অনেকখানি সত্যতা আছে। কিন্তু পুরানো ব্যক্তিমুখী পরীক্ষাতে ঐ মৌলিক চিন্তাশক্তির কতটুকু পরীক্ষা হয়? পরীক্ষার খাতায় ছেলেমেয়েরা নিজেদের মতামত কতটুকু লেখে? ইতিহাসের কথাই আবার ধরা যাক। প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থীরা তাদের বই ও নোট থেকে সংগ্রহ করে। কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে নিজেদের মতামত লেখবার সাহস ক'জন পরীক্ষার্থীর আছে? বইয়ে যা আছে তা লেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাস্তবিকই নিজের মতামত দেওয়া অনেক সময় বিপজ্জনক। অন্ততঃ এ কথাত সত্য, ঐ মৌলিক মতামত বিভিন্ন পরীক্ষকের হাতে বিভিন্ন রকম নম্বর পাবে। সাধারণতঃ কোন একটি মৌলিক চিন্তার মূল্য সম্বন্ধে পরীক্ষকদের মত বিভিন্ন এবং বি. এ. পর্যন্ত একটি পরীক্ষার্থীর খাতা একজন পরীক্ষকই দেখেন। এ সব ক্ষেত্রে যে তথ্য ও মতামত সর্ববাদীসম্মত সেগুলি পরীক্ষায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। যে ব্যাপারে একাধিক মতামত পোষণের অবকাশ আছে— ঐ সব পরীক্ষার খাতায় তার উল্লেখ করা যেতে পারে, সমাধান সম্ভব নয়।

চতুর্থ অভিযোগ: চিন্তাশক্তির মৌলিকতা পরীক্ষা হয় না

উপরোক্ত অভিমতকে সবখানি স্বীকার করা সম্ভব না হলেও শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মৌলিক শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশের প্রয়োজন আছে। সেই মৌলিক শক্তি ও সামর্থ্য শিক্ষার দ্বারা কতখানি বর্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হল— তারও পরিমাপের প্রয়োজন আছে। প্রচলিত পরীক্ষার দ্বারা ঐ পরিমাপের চেষ্টাকে বহুলাংশে অক্ষম প্রচেষ্টা বলব। নয়া পরীক্ষা দ্বারা ঐ পরিমাপ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে আরও ভাবা দরকার।

যে সব বিষয়মুখী প্রশ্নের সঙ্গে দুই বা ততোধিক উত্তর থাকে—সে সব প্রশ্নোত্তরে সঠিক উত্তর না জেনে কেবলমাত্র আন্দাজ বা অনুমান করে পরীক্ষার্থীর পক্ষে কিছু নম্বর পাওয়া সম্ভব। বিষয়মুখী পরীক্ষার এটি একটি বড় ত্রুটী বলে কেউ কেউ মনে করেন। ব্যাপারটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝা যাক। ধরা

যাক ১০০টি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নাবলীর প্রত্যেকটির উত্তর হবে হাঁ কিম্বা না। একটি ছেলে ৩০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানে। বাকী ৭০টি প্রশ্নের উত্তর সে আন্দাজ করল। পরিসংখ্যানের সম্ভাব্য নিয়ম অনুযায়ী মনে করা যেতে পারে ছেলেটির ঐ ৭০টি উত্তরের ৩৫টি নির্ভুল ও ৩৫টি ভুল হবে। সুতরাং সবশুদ্ধ তার ৩০+৩৫=৬৫টি উত্তর নির্ভুল হল। প্রত্যেকটি সঠিক প্রশ্নোত্তরের জন্য ১ নম্বর থাকলে ছেলেটি পেল ৬৫, যদিও তার পাওয়া উচিত ছিল ৩০।

বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তরে অনুমানের স্থান

অনুমান বা আন্দাজের ফলে সব পরীক্ষার্থীই যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে কিছু বেশী নম্বর পাবে। নম্বরের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝবার দিক থেকে একজন কত নম্বর পেল বা কত'র মধ্যে কত পেল সেটা বড় কথা নয়। একজনের নম্বরকে অন্যদের নম্বরের সঙ্গে তুলনা করেই তার সঠিক তাৎপর্য বুঝতে হয়।* সকলের নম্বরই বেশী, সুতরাং একজনের নম্বর বেশী হওয়াতে—সে নম্বরের মূল্য বা তাৎপর্য বদলালো না। অন্য এক ভাবে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। ১০০ প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ বা অনুমাণ করে ৫০টি যদি ঠিক হয়—তবে ৫০ নম্বরকে আমরা ০ বলে ধরতে পারি। ৫০'র উপরে যে যা পেল সেটাই তার নম্বর।

অনুমানের দ্বারা অতিরিক্ত নম্বর পাবার পথ আরেকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। প্রথম দৃষ্টান্তটি আবার উল্লেখ করা যাক। ১০০টি প্রশ্নের ৩০টি উত্তর একটি ছেলে জানত। বাকি ৭০টি প্রশ্ন আন্দাজ করাতে তার ৩৫টি নির্ভুল ও ৩৫টি ভুল হল। ছেলেটির মোট নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা ৬৫ ও ভুলের সংখ্যা ৩৫। যদি নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা থেকে ভুল উত্তরের সংখ্যা বাদ দেওয়া যায় তবে হবে ৬৫ − ৩৫ = ৩০। ছেলেটিকে ৩০ নম্বর দেওয়া হল। ছেলেটি ৩০টি প্রশ্নেরই উত্তর জানত। সূত্রাকারে প্রকাশ করলে লিখতে হয়ঃ নম্বর=নির্ভুল − ভুল।

অনুমানের দ্বারা অতিরিক্ত নম্বর পাওয়া বন্ধ করার সূত্র

প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে কেবলমাত্র দুটি উত্তর দেওয়া থাকলে ঐ সূত্র প্রযোজ্য। আরেকটি সূত্র আছে। সেটি প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে দুই বা

* ১৩ অধ্যায়ের ২২০—২২২ পাতা দ্রষ্টব্য। ঐ বিষয়ে এই অধ্যায়েও শেষের দিকে আলোচনা করেছি।

ততোধিক যতগুলি উত্তরই থাকুক না কেন সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সূত্রটি হচ্ছে ঃ

$$\text{নম্বর} = \text{নির্ভুল} - \frac{\text{ভুল}}{\text{উত্তরের সংখ্যা} - ১}$$

অনুমান করে ঠিক উত্তরটি বলবার সম্ভাবনা প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত উত্তরের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কমে যায়। চার বা ততোধিক উত্তর দেওয়া থাকলে অনুমান করে ঠিক উত্তরটি বলবার সম্ভাবনা বেশ কম। ঐসব ক্ষেত্রে উপরের সূত্রটি কমই ব্যবহার করা হয়। নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা গুনেই নম্বর দেওয়া হয়। অনুমান করতে গিয়ে পরিসংখ্যানের সম্ভাব্য নিয়ম অনুসারে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই প্রায় সমান হারে (২টি উত্তর দেওয়া থাকলে—৫০%, ৩টি উত্তর দেওয়া থাকলে—৬৬·৬%, ৪টি উত্তর দেওয়া থাকলে—৭৫%) ভুল করবে। তবে কয়েকজনের ভুলের সংখ্যা ঐ হারের চেয়ে কম বা বেশী হবে। মোট কথা, ভুলের হারের বিন্যাসটি প্রাকৃতিক বিন্যাসের ধরণের হবে। কোন একটি নম্বরকে যদি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক মনে না করা হয়, নম্বরটিকে যদি সেই নম্বর±একটি ছোট রাশির মধ্যবর্তী যে কোন একটি নম্বর হতে পারে বলে মনে করা হয়—তবে সমস্যাটিকে অত বড় মনে হবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে ৬০কে একান্তরূপে ৬০ না ভেবে ৬০±৩ অর্থাৎ ৫৭ থেকে ৬৩'র মধ্যে যে কোন একটি নম্বর হতে পারে এমন আমাদের ভাবতে হবে। মোট কথা, এ 'কমবেশী'র জন্য পরীক্ষার ফলাফলে কিছু বিক্ষেপ ঘটলেও ঐ বিক্ষেপ মারাত্মক নয়।

অনুমান বা আন্দাজ করা ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া দরকার। কেউ অনুমান করল, কেউ অনুমান করল না—এমন হলে ফলাফলে গুরুতর ভ্রান্তি ঘটা সম্ভব। সেজন্য হয় বলতে হবে—'উত্তরটি না জানা থাকলে অনুমান করবে' অথবা 'উত্তরটি না জানা থাকলে, বাদ দিয়ে যেয়ো ; আন্দাজ বা অনুমান করতে যেয়ো না।'

পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও আত্মসঙ্গতি

একটি বিষয়ে একই ছাত্রদের একাধিক পরীক্ষার ফলের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন আছে এ কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফলাফলে উচ্চ-সঙ্গতি থাকলেই টেকনিক্যাল অর্থে পরীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ হচ্ছে নির্ভরযোগ্যতার মান। যে পরীক্ষা

যোগ্যতার সহিত সামর্থ্য পরিমাপে সক্ষম হয় তাকে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ বলা চলে।

নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণের তিনটি পন্থার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করব। দুটির কথা অবশ্য পূর্বেই একবার বলা হয়েছে। একই প্রশ্নাবলীর সাহায্যে—অল্প দিনের ব্যবধানে ছেলেমেয়েদের দুইবার পরীক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষার দুটি ফলাফলের আত্মপারম্পর্যের দ্বারা একপ্রকার নির্ভরযোগ্যতা সূচিত হয়। এ নির্ভরযোগ্যতাকে আত্মসঙ্গতি বলা যেতে পারে। পরীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য হলে পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক উচ্চ হবে। ঐক্যাঙ্ক + '৯ হবে এমন আমরা আশা করতে পারি।

অর্ধবিভক্তি পদ্ধতি

আত্মসঙ্গতি নির্ধারণ করবার আরেকটি পন্থা আছে। ধরা যাক ১০০টি প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নাবলী রচিত হয়েছে। প্রশ্নাবলীকে ৫০—৫০ দুইভাগে ভাগ করে তাদের ফলাফলের সঙ্গতি বা পারম্পর্য নির্ণয় করা যেতে পারে। নির্ভরযোগ্যতা বা আত্মসঙ্গতি নির্ণয়ের এ পন্থাকে 'অর্ধবিভক্তি পদ্ধতি' বলা হয়।

দুইটি পৃথক প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান বা দক্ষতার পরীক্ষা করা চলতে পারে। দুটি পরীক্ষার মাঝখানের সময়ের ব্যবধান অল্প হওয়াই সঙ্গত। প্রশ্নপত্রটি যদি অনুরূপ হয় এবং একই জ্ঞান ও সামর্থ্য পরীক্ষার জন্যই যদি প্রশ্নাবলী ঠিক তৈরী হয়ে থাকে, তবে—সময়ের ব্যবধান অল্প হলে—পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক, সংক্ষেপে নির্ভরাঙ্ক উচ্চ হবে আশা করা চলে।*

অঙ্ক পরীক্ষার স্বল্প নির্ভরযোগ্যতা

পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার কথা আলোচনা করতে গেলেই অঙ্কের পরীক্ষার কথা সর্বাগ্রে মনে আসে। ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা অঙ্কের মত কম নয়। ঐসব বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে মোটামুটি সঙ্গতি থাকলেও পরীক্ষকদের মানের বিভিন্নতার জন্য পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কম দেখা যায়। কিন্তু অঙ্কে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাদানের মধ্যেই সময় সময় গুরুতর অসঙ্গতি থাকে। অঙ্কে আজ যে মোট ১০০ পেলে, কাল সে যে ৪০ পাবে না—তা

---

* বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য টারম্যান ও মেরিল দুটি পৃথক অভীক্ষা প্রস্তুত করেছেন। L ও M প্রশ্নাবলী নামে সে দুটি পরিচিত। দুটির ফলাফলের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক '৯০'র বেশী বলে দেখা গেছে। (৪)

জোর করে বলা কঠিন। অন্ততঃ নীচের শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের বেলাতে একথা বিশেষভাবে সত্য। কিছু ছেলেমেয়ে অবশ্য আছে (উপরের শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের বেলাতে একথা আরও সত্য) যাদের ফলাফলের মধ্যে আগাগোড়াই একটি উচ্চসঙ্গতি থাকে। এরা দুইদলে বিভক্ত। একদল নির্ভুল অঙ্ক কষে ও অঙ্ক ভালো বোঝে। আরেকদল অঙ্ক প্রায় সব সময়েই ভুল করে, অঙ্ক এরা বোঝেও না। এদের বাদ দিলেও বহু ছেলেমেয়ে থাকে। অঙ্ক পরীক্ষাটা যাদের কাছে একটা ভাগ্যের ব্যাপার। অঙ্ক ঠিক হতে পারে, আবার ভুলও হাতে পারে। এক পরীক্ষায় এরা ভালো নম্বর পায়, অন্য পরীক্ষায় খারাপ।

স্কুলের নীচু শ্রেণীতে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক কি পরিমাণ হয়—কলিকাতার একটি মেয়েদের স্কুলের* তথ্য থেকে সংগ্রহ ও গণনা করে নীচে দেওয়া হল। এই ২২টি মেয়ের পরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ষান্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পারম্পর্যটি গণনা করে হয়েছে। ছাত্রীসংখ্যা যথেষ্ট না হলেও এর থেকে পারম্পর্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চলে।

বাঙলা ও অঙ্ক পরীক্ষায় ঐক্যাঙ্কের স্বল্পতা: একটি ছোট অনুসন্ধানের ফল

সারণী ১৯

ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক ফলাফলের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক

	ছাত্রীসংখ্যা	অঙ্ক	বাঙলা
দ্বিতীয় শ্রেণী	২২	·৪৬	·৫৬
তৃতীয় শ্রেণী	২২	·৪৩	·৫২

কলিকাতার একটি ছেলেদের স্কুলের* প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েক বছর আগেকার (বর্তমানে ষাণ্মাষিক পরীক্ষার স্থলে স্কুলে মাসিক পরীক্ষা হয়) ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক ফলাফলের পারম্পর্যও অনুরূপ। নীচে তা উল্লেখ করা হল:

---

* সখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।

এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শান্তি ব্যানার্জির কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি।

* বালীগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুল। তথ্য সংগ্রহ ও গণনায় স্কুলের শিক্ষক শ্রীঅমর বোস আমাদের সাহায্য করেছেন।

সারণী ২০

ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক ফলাফলের পারম্পর্যের ঐকাঙ্ক

	ছাত্রসংখ্যা	অঙ্ক	বাঙলা
প্রথম শ্রেণী		·৩৫	·৫৬
দ্বিতীয় শ্রেণী		·৪৮	·৫২

২৪ পরগণা জেলার একটি স্কুলের* তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদের ষান্মাষিক ও বার্ষিক অঙ্ক পরীক্ষার ঐক্যাঙ্ক দেখা যায় ·৩৩। ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৪ জন।

অঙ্কে মেয়েদের স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ২২টি ছাত্রীর স্থান বা ক্রম ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক ঐ দুটি পরীক্ষায় কতখানি পরিবর্তিত হয়েছিল—নীচে তা উল্লেখ করা হল ঃ

সারণী ২১

ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় ক্রম পরিবর্তনের পরিমাণ (অর্থাৎ গড়ে কটি ক্রম পরিবর্তিত হয়েছিল)	দ্বিতীয় শ্রেণী ছাত্রীসংখ্যা	তৃতীয় শ্রেণী ছাত্রীসংখ্যা
·০— ·৪	১	০
০·৫— ১·৪	৩	৬
১·৫— ২·৪	২	৩
২·৫— ৩·৪	২	০
৩·৫— ৪·৪	২	১
৪·৫— ৫·৪	০	৪
৫·৫— ৬·৪	৪	১
৬·৫— ৭·৪	১	২
৭·৫— ৮·৪	১	১
৮ ৪— ৯·৫	১	০
৯·৫—১০·৪	১	১
১০·৫—১১·৪	৩	০
১১·৫—১২·৪	১	২
১২·৫—১৩·৪	০	১
মোট সংখ্যা	২২	২২

* দত্তপুকুর নিবোধাই হাই স্কুল। শ্রীপ্রমথ ভট্টাচার্য তথ্য সংগ্রহ ও গণনা করেন

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে—ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় শ্রেণীরই ১০টি মেয়ে অর্থাৎ অর্ধেকের কাছাকাছির—ক্রম পরিবর্তনের পরিমাণ ৪'র বেশী নয়। অর্ধেকের কিছু বেশী মেয়ের পরীক্ষার ফলাফলের অসঙ্গতির পরিমাণ বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ের অঙ্কের নম্বরের পার্থক্য কতখানি পাওয়া গেছে—তার কয়েকটি নমুনা নীচে দেওয়া হল :

সারণী ২২

তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষার নম্বর

রোল নম্বর	ষাণ্মাষিক	বার্ষিক
২	৮০	৪১
৪	৫৫	৭৯
৬	৬৮	৩৫
৭	৫২	৭১
১১	৫২	৭৯
১৮	৮৭	৬৬

অঙ্ক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গতি উচ্চ নয়। বাঙলার পরীক্ষার ফলাফলের পরিমাণেও যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে। আমাদের মতে—অঙ্ক পরীক্ষায় অসঙ্গতির প্রধান কারণ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রচেষ্টায় সঙ্গতির অভাব। পরীক্ষকদের নম্বরদানে সঙ্গতির অভাব বাঙলা পরীক্ষার ফলাফলের স্বল্প পারম্পর্যের একটি গুরুতর কারণ একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নীচের শ্রেণীতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রচেষ্টাও সব সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে আত্মসঙ্গত নয়।

অঙ্ক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার স্বল্পতা হ্রাস করবার জন্য কি করা যেতে পারে? অঙ্ক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার স্বল্পতার কারণ কি—এটা আগে বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

অঙ্ক পরীক্ষার স্বল্প নির্ভরযোগ্যতার কারণ

নীচের ক্লাসে কয়েকটি বড় বড় অঙ্ক ছেলেমেয়েদের কষতে দেওয়া হল। অঙ্কগুলি কেমন করে কষতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা জানে। কিন্তু পাঁচ লাইনের যোগ করতে গিয়ে হঠাৎ একটা লাইনে ভুল হয়ে গেল, হয়ত হাতে যে সংখ্যা থাকবে লাইনটি যোগের সময় সেটা ধরা হল না। মুহূর্তের

অন্যমনস্কতায় যেখানে উত্তর হবে ৭৩৪৬১, উত্তর লেখা হল ৭২৪৬১। গোটা অঙ্কটাই ভুল হয়ে গেল।

অঙ্ক কষাতে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলি ধাপ থাকে। সবটা অঙ্ক কষেই শেষ উত্তরটি নির্ণয় করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেটি অর্ধেকটা, এমন কি তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত অঙ্কটা ঠিক কষেছে। তারপরই হয়ত গণনায় সামান্য একটি ভুলের জন্য অঙ্কের উত্তরটা আর ঠিক হল না।

অঙ্কের বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা আলাদা নম্বর দেবার পদ্ধতির স্বপক্ষে যুক্তি

গোটা অঙ্কটার উপর নম্বর না দিয়ে অঙ্কের বিভিন্ন অংশের পদ্ধতি ও গণনার জন্য আলাদা আলাদা নম্বর ধরা যেতে পারে। ঐ ভাবে নম্বরদানের রীতি অঙ্ক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা অনেকখানি বাড়ায় এমন দেখা গেছে। অঙ্ক পরীক্ষার বর্তমান অনিশ্চয়তা প্রস্তাবিত নয়া পদ্ধতিতে অনেকখানি দূর হবে।

অঙ্কবিদগণ অবশ্য বলতে পারেন উত্তরই যদি ভুল হল তবে সেটা আবার অঙ্ক হ'ল কি? উত্তরে বলা যেতে পারে যে পরীক্ষার্থীদের অঙ্কে পারদর্শিতার পরিমাণ নির্ণয় করা পরীক্ষার লক্ষ্য, অঙ্ক ভুল বা নিভুল হল এটা হল গৌণ কথা। নয়া পদ্ধতি দ্বারা আমরা পরীক্ষার্থীর পারদর্শিতা যদি নির্ভরযোগ্যরূপে জানতে পারি, যদি বিশ্বাস করবার কারণ থাকে যে অঙ্ক সে ভালো জানে —তবে অঙ্কের শেষ উত্তরটি ভুল না নির্ভুল হল তার উপরে জোর দেবার দরকার নেই।

স্বাভাবিক বিকাশে গণনার দক্ষতা বৃদ্ধি

ব্যাপারটিকে আর একদিক দিয়ে দেখা যাক। অঙ্ক পরীক্ষায় গণনায় আকস্মিক ভুল ছোটদের প্রায়ই হয়। মনের উপর তাদের কর্তৃত্ব কম। একটানা অখণ্ড মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা তাদের অল্প। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই তারা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মন হারিয়ে যায় বিষয়ান্তরে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বৈচ্ছিক মনোযোগের ক্ষমতা তাদের বাড়ে। একটি বিষয়ে অনেকটা সময় ধরে মনকে তারা নিবদ্ধ রাখতে পারে। সুতরাং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভুলের মাত্রাও কমে আসে।

দীর্ঘ ও কঠিন গণনা ব্যাপারে ছোটদের স্বাভাবিক অক্ষমতা আছে। স্বাভাবিক বিকাশ লাভের ফলে ঐ অক্ষমতা আপনা থেকেই তারা কাটিয়ে ওঠে। সুতরাং নীচু শ্রেণীতে শিশুর শিক্ষামান নিরূপণে ঐ অক্ষমতাকে বড় করে

দেখবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি? ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় দেখা দরকার তারা অঙ্ক বোঝে কিনা, অঙ্ক কষবার নিয়ম তারা জানে কিনা। শিক্ষা একবছরেই শেষ হবে না। কয়েক বছর ধরে চলবে। কয়েক বছর ব্যাপী শিক্ষার অন্তে শিশু যদি শিক্ষা ও স্বাভাবিক বিকাশের ফলে অঙ্ক কষা ব্যাপারে যথোচিত নৈপুণ্য অর্জন করে—তবে প্রথম দু চার বছর শিশুর অঙ্কে ভুল করা না করা ব্যাপারে আমাদের ধৈর্য ধারণ করাই সঙ্গত হবে।

অঙ্কের উত্তর (অর্থাৎ শেষ উত্তর) ঠিক হল না, তবু পরীক্ষার্থী কিছু বা বেশীর ভাগ নম্বর পেল—এ ব্যাপারে মনে কিছুটা আপত্তি থেকে যেতে পারে। ঐ সমস্যামূলক ব্যাপারটিকে কিছুটা এড়িয়ে যাবার আরেকটি পন্থার কথা বলি। প্রচলিত পরীক্ষাতে সাধারণতঃ কয়েকটি বড় বড় অঙ্ক দেওয়া হয়। সে সব প্রত্যেকটি অঙ্কই অনেকগুলি ধাপ বা অঙ্কের সমষ্টি। একটি বড় যোগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ৫।৬ রাশি—ডান থেকে বাঁয়ে এবং তেমনি উপর থেকে নীচে—এমন না করে আমরা ছোট ছোট অনেকগুলি অঙ্ক ছেলে-মেয়েদের দিতে পারি। ৬ লাইনের (পাশাপাশি ও উপর নীচ) একটি যোগ না দিয়ে, ৬টি ১ কি ২ লাইনের যোগ দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি রাশি একক কি দশক হল, কিন্তু পর পর যে সব রাশি সাজিয়ে যোগ করতে হবে তা ২, ৩, ৪—যা আবশ্যক তাই হতে পারে। নীচে বড় ও ছোট অঙ্কের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

কয়েকটি বড় অঙ্কের স্থলে ছোট ছোট বহু অঙ্ক দেবার আবশ্যকতা

৫ ৭ ৮ ৬ ৪ ৩	৪	৪ ১	৫ ৭	৬ ৩
৯ ৬ ৫ ২ ১ ৮	৩	৯	৮ ১	৪ ২
৭ ৬ ৪ ৩ ২ ৫	—	——	——	৫ ৯
১ ৪ ৬ ৮ ৭ ৯				——
৪ ৫ ৩ ১ ৯ ৩				
৫ ৭ ৮ ৪ ২ ১		৪ ৫		৬ ৯
——————		৬ ৭		৭ ১
		৪ ৮		৮ ৫
		২ ৮		৪ ৩
		——		——

ঐ ধরণের প্রশ্নে নম্বর দেওয়া ব্যাপারে অঙ্কের উত্তরটি ঠিক হলেই পরীক্ষার্থী নম্বর পাবে, ভুল হলে পাবে না। কিন্তু পরীক্ষায় অঙ্কের সংখ্যা অনেক থাকাতে এবং অঙ্কগুলি ছোট ছোট হওয়াতে পরীক্ষায় দৈবাৎ ভালো ও মন্দ করার সম্ভাবনা হ্রাস পায়; পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার পরিমাণ বাড়ে। বহু ধাপ (চিন্তা ও গণনার) সম্বলিত জটিল সমস্যামূলক অঙ্কগুলিকে এমন ভাবে ভেঙ্গে ছোট ছোট অঙ্কে পরিণত করা যায় কিনা—সে সম্বন্ধে অবশ্য প্রশ্ন করা চলে। আমাদের ধারণা যে তা সম্ভব। অঙ্ক পরীক্ষা সম্বন্ধে পি. বি. ব্যালার্ডের ধারণা—বড় বড় কয়েকটি অঙ্ক না দিয়ে ছোট ছোট বহু অঙ্ক দ্বারাই পরীক্ষার্থীদের অঙ্কে পারদর্শিতার নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা সম্ভব। (৫)

পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের দুটি সম্ভাব্য কারণ

পরীক্ষার ফলাফলে সঙ্গতি কম হবার কারণ প্রধানতঃ দুটি হতে পারে। কোন বিষয়ে পারদর্শিতা একটি অবিভাজ্য একক বস্তু নয়। বহু ছোট ছোট সামর্থ্য বা নৈপুণ্যের সমষ্টিকে আমরা বিষয়টিতে পারদর্শিতা বলি। ঐ সব সামর্থ্য বা নৈপুণ্যের একটি উপযুক্ত নমুনা পরীক্ষার দ্বারাই পারদর্শিতার সঠিক পরিমাপ সম্ভব। কার্যতঃ যে নমুনাটি পরীক্ষিত হয়—তাকেই উপযুক্ত নমুনা বলা চলে না। একটি পরীক্ষায় হয়ত আমরা পারদর্শিতার একটি অংশ পরীক্ষা করলাম, পরের পরীক্ষায় আরেকটি অংশ। পরীক্ষা দুটির ফলাফলের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক কম হবে তাতে আশ্চর্য কি আছে? প্রত্যেকটি পরীক্ষায় সামর্থ্যের বহু ও বিভিন্ন অংশ যদি প্রায় সমভাবে পরীক্ষিত হয় তবেই পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে।

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার্থীর মানসিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে সঙ্গতি কম হতে পারে। এই পরিবর্তনকে আমরা দুইভাগে ফেলতে পারি: এক, সাময়িক পরিবর্তন; দুই, স্থায়ী পরিবর্তন। শরীরটা খারাপ, মনটা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল—এ জাতীয় পরিবর্তনকে সাময়িক পরিবর্তন বলা যায়। মনের সাময়িক পরিবর্তন হেতু কোন কোন পরীক্ষার্থীর দুইটি অনুরূপ পরীক্ষার মধ্যে সঙ্গতি কম হওয়া আশ্চর্য নয়। তবে বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থীদের বেলাতে সাময়িক পরিবর্তেনর গুরুত্ব তত বেশী নয়।

তারপর ভাবতে হয় স্থায়ী পরিবর্তনের কথা। জ্ঞান অর্জিত। পড়াশোনায় আজ যে ভালো, পড়াশোনায় আজ যে মনোযোগ দিচ্ছে—কাল সে পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে, তদনুরূপ ভালো থাকবে এমন কথা জোর করে বলা চলে না।

বুদ্ধি পরীক্ষার বেলাতে যেমন আমরা দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে প্রায় একই রকম ফলাফল আশা করতে পারি, জ্ঞানের বেলাতে সেটা সম্ভব নয়। এজন্যই সময়ের ব্যবধান যত বাড়ে, পরীক্ষার্থীর ফলাফলের ঐক্যাঙ্ক তত কমে। ঐসব ক্ষেত্রে পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক কম বলে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কম বলা ঠিক হবে না। ফলাফলের সঙ্গতির অভাবের কারণ ছেলেমেয়েরাই হয়ত বদলেছে, যে ভালো সে খারাপ হয়েছে, যে খারাপ সে হয়ত ভালো হয়েছে। পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ করতে হলে অল্পদিনের ব্যবধানে গৃহীত দুটি অনুরূপ ফলাফলের পারম্পর্য বিচার করাই সঙ্গত।

পরীক্ষার সত্যতা বা বস্তু-সঙ্গতি

একটি পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য হতে পারে; কিন্তু সে পরীক্ষা দ্বারা সামর্থ্যটিকে বাস্তবিক পরিমাপ করা হয়েছে কিনা—সেটা জানা দরকার। দৌড়ের প্রতিযোগিতার ফলাফলকে প্রতিযোগীদের গায়ের জোর পরীক্ষার ফলাফল বলে যদি কেউ মনে করেন—তবে একথা নিশ্চয়ই বলব যে গায়ের জোর নিরূপণের জন্য ঐ পরীক্ষাটি যথার্থ পরীক্ষা নয়। যে ক্ষমতাটি পরীক্ষা করতে চাই একটি পরীক্ষা দ্বারা সেই ক্ষমতাটি বাস্তবিকই পরীক্ষিত হলে টেকনিক্যাল ভাষায় বলা যায় যে পরীক্ষার সত্যতা বা বস্তু-সঙ্গতি আছে। পরীক্ষার বস্তু-সঙ্গতি আছে কিনা জানবার জন্য দরকার—পরীক্ষার বাইরের কোন পরিমাপ (বা ধারণা)—যার সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলের তুলনা করা চলে। কোন একটি বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারণার সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলের তুলনা করার প্রয়োজনের কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। ঐ ক্ষেত্রে পরীক্ষার সত্যতা বা বস্তু-সঙ্গতি নির্ণয়ের জন্য শিক্ষকদের ধারণা হচ্ছে—বহির্নিরূপক।

মোট কথা, পরীক্ষার বস্তু-সঙ্গতি নির্ণয়ে একটি বহির্নিরূপক দরকার। সেই বহির্নিরূপকের সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক পজিটিভ ও উচ্চ হলেই পরীক্ষাটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কিম্বা আত্মসঙ্গতিতে যে পরিমাণ উচ্চ ঐক্যাঙ্ক পাওয়া সম্ভব, বস্তুসঙ্গতির বেলায় ততখানি উচ্চ ঐক্যাঙ্ক আশা করা চলে না। বস্তুসঙ্গতির বেলাতে +·৭৫ ঐক্যাঙ্ককে বেশ উচ্চ ঐক্যাঙ্ক বলে মনে করা হয়।

তেমন ভালো বহির্নিরূপক সব সময়ে পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু হয়ত দেখা গেল ছেলেরা কোন একটি বিষয়ে অল্পদিনের মধ্যে সাপ্তাহিক,

মাসিক, ত্রৈমাসিক—এমন আট-দশটি পরীক্ষা দিয়েছে। ঐসব পরীক্ষার ফলাফলের গড়ের দ্বারা ছেলেদের সাফল্যমান মোটামুটি ঠিক সূচিত হয়েছে —এমন আমরা মনে করি। ঐ গড়ের সঙ্গে যে পরীক্ষাটির পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক সবচেয়ে বেশী—সে পরীক্ষার বস্তু-সঙ্গতি বা সত্যতা সবচেয়ে বেশী এমন মনে করা যেতে পারে।

নয়া পরীক্ষা ও পুরানো পরীক্ষার পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক পাওয়া গেছে ·৬০; নয়া পরীক্ষা ও শিক্ষকদের মতামতের ঐক্যাঙ্ক হচ্ছে ·৬২। অতএব বহুলাংশে উভয় পরীক্ষা দ্বারা একই পারদর্শিতা পরীক্ষিত হচ্ছে। প্রশ্ন হল কোন্ পরীক্ষা দ্বারা ছেলেমেয়েদের পারদর্শিতার সঠিক পরিমাপ হয়। এ সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধানের ফল প্রণিধানযোগ্য (৬)। প্রচলিত ধারায় ১১৭ জন ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করা হল। খাতাগুলি বিভিন্ন পরীক্ষকদের হাতে দুইবার পরীক্ষিত হল। এই দুইবারের নম্বরের মধ্যে ঐক্যাঙ্ক পাওয়া গেল ·৬৬। ঐ পরীক্ষার্থীদের বিষয়মুখী প্রশ্নপত্রের সাহায্যে আবার পরীক্ষা করা হল। সেই ফলাফলের সঙ্গে পুরানো পরীক্ষার প্রথমবারের নম্বরের পারম্পর্য হল ·৫৯ ও দ্বিতীয়বারের পরীক্ষার সঙ্গে ·৫৩। পুরানো পরীক্ষার প্রথমবারের ও দ্বিতীয়বারের ফলাফলের গড় নেওয়া হল। মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে ঐ গড়ের দ্বারা পরীক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মান সঠিকতর ভাবে সূচিত হয়েছিল। ঐ গড়ের সঙ্গে নয়া পরীক্ষার ঐক্যাঙ্ক হল ·৬২। ঐ ঐক্যাঙ্ক নিশ্চয়ই নয়া পরীক্ষার উৎকর্ষ প্রমাণ করছে।

পুরানো ও নয়া পরীক্ষার সত্যতা বা বস্তু-সঙ্গতির সম্বন্ধে আরও দুচার কথা বলা যেতে পারে। ব্যালার্ড (৭) কয়েকটি অনুসন্ধানের ফল উল্লেখ করেছেন। থর্নডাইক রচিত বুদ্ধিপরীক্ষার সঙ্গে নয়া পরীক্ষা, পুরানো পরীক্ষা ও শিক্ষকদের অভিমতের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক পাওয়া গেছে—পর্যায়-ক্রমে ·৫১, ·৩৮ ও ·৩৫। ব্যালার্ডের অভিমত—বুদ্ধি পরীক্ষার সঙ্গে নয়া পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ ঐক্যাঙ্ক দ্বারা পরিমাপক হিসাবে নয়া পরীক্ষায় উৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের মতে নয়া পরীক্ষা কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করে, বুদ্ধি বা চিন্তা শক্তি নয়—ঐক্যাঙ্কের উচ্চতা দ্বারা ঐ ধারণা খণ্ডিত হচ্ছে।

প্রশ্নপত্র রচনার কয়েকটি নিয়ম

প্রশ্নপত্র রচনায় কয়েকটি নিয়ম পালন করলে পরিমাপক হিসেবে পরীক্ষার সক্ষমতা ও সত্যতা বাড়বে। যে কোন বিষয়ে জ্ঞানের নানান দিক আছে। সেই সব দিক যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নপত্রটি এমন হবে যাতে যারা অল্প জানে তাদের থেকে

আরম্ভ করে যারা বেশী জানে সকলেরই জ্ঞানের পরিমাপ সম্ভব হয়। অর্থাৎ, প্রশ্নপত্রে খুব সোজা থেকে খুব কঠিন সবরকম প্রশ্নই থাকবে। গোড়া থেকেই যদি কঠিন প্রশ্ন দিয়ে সুরু করা যায়, তবে যারা অল্প জানে তারা কি জানে বা পারে—তার পরীক্ষা হলই না। আবার পরীক্ষায় যদি কঠিন প্রশ্ন না থাকে তবে যে সব ছেলে খুব ভালো তাদের মধ্যে যে কি পার্থক্য সেটা নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। এজন্য বলা যায়—যে পরীক্ষায় কেউ ০ পায় আর কেউ মোট ১০০ পায়—পরিমাপক রূপে সে পরীক্ষার ত্রুটী আছে।

জ্ঞান ও সামর্থ্য প্রাকৃতিক বিন্যাসের ধরণে বিন্যস্ত এ কথা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বহু এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত নয়, সে পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের সামর্থ্যের উপযোগী হলে তার নম্বরের বিন্যাসটি মোটামুটি প্রাকৃতিক বিন্যাস হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলের বিন্যাসটি প্রাকৃতিক ধরণের হওয়া উচিত। যদি না হয়ে থাকে, বুঝতে হবে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচনা করা হয় নি।

নম্বরের বিন্যাস প্রাকৃতিক হওয়ার প্রধান অর্থ গড় ও তার কাছাকাছি নম্বরই পাবে সবচেয়ে বেশী ছাত্রছাত্রী। খুব বেশী বা খুব কম নম্বর অল্প পরীক্ষার্থীই পাবে।

প্রশ্নপত্রের অধিকাংশ প্রশ্ন এমন ভাবে রচনা করতে হবে যাতে শতকরা ৫০টি পরীক্ষার্থী সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কতগুলি প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অল্পসংখ্যক প্রশ্ন খুব কঠিন হবে। অপরপক্ষে কতগুলি প্রশ্ন সহজ ও অল্পসংখ্যক প্রশ্ন খুব সহজ হবে। সবাই পারে কিম্বা একেবারে কেউই পারে না এমন ধরণের প্রশ্ন পরীক্ষায় দেবার কোন সার্থকতা নেই। প্রশ্নগুলি প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশ সম্বন্ধে একটি নিয়ম পালন করলে বোধ হয় ভালো হয়। প্রশ্নগুলিকে সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিন এভাবে সাজানো বাঞ্ছনীয়।

এখানে প্রশ্নপত্রকে পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করে প্রস্তুত করবার কথা বলা হয়েছে। ব্যাপারটি বোধ করি আরও গভীর। পাঠক্রম ছেলেমেয়েরা আয়ত্ত করেছে কিম্বা করতে পেরেছে কিনা তারই পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র রচিত হয়। যদি এমন হয় যে পাঠক্রমই অধিকাংশ ছেলেমেয়ের সাধ্যাতীত, সেখানে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করতে হলে পাঠক্রমের আর পুরোপুরি পরীক্ষা হয় না। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে ত্রুটি পাঠক্রমের, পরীক্ষা বা পরীক্ষার্থীদের নয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে আমরা বলি শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শক্তি ও সামর্থ্যের উপযোগী হবে। ঐ শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে বোঝায় না। পাঠক্রম, পাঠক্রমের পরীক্ষা—সবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। 'থিয়োরি অব রিলেটিভিটি' তত্বটি

জ্ঞানগর্ভ। পদার্থবিদ্যার থিয়োরি হিসেবে শুধু তার মূল্য নয়, তার দার্শনিক তাৎপর্যও অনেকখানি। সকলের পক্ষেই ঐ থিয়োরিটি জানা উচিত। তবে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের আমরা ঐ থিয়োরি পড়াই না কেন? কারণ, তারা থিয়োরিটি বুঝবে না। জানবার পক্ষে দরকারি ও মূল্যবান অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যে বয়সে যেটুকু জানা সম্ভব, সে বয়সের ছেলেমেয়েদের পাঠক্রমে সেটুকুই থাকা সঙ্গত। কিন্তু একথা কি সর্বদা আমাদের স্মরণ থাকে? স্কুলের পাঠক্রমে কি অনেক কিছু নেই যা ছেলেমেয়েদের অধিকাংশের সাধ্যাতীত?

প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ

কিছু প্রয়োগ ও কিছু বিশ্লেষণের দ্বারাই একটি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ঠিক হয়েছে কিনা—সে সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা সম্ভব। ঐ প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ অবশ্য সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োগ করলে কি রকম ফলাফল পাওয়া যাবে—পরীক্ষার্থীদের পারদর্শিতা ও সামর্থ্যের কথা স্মরণ করে, পরীক্ষককে অনুমান করে নিতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য প্রাথমিক প্রয়োগ ও বিশ্লেষণের দ্বারা বিভিন্ন প্রশ্নের দুরূহতা ও সত্যতার মান নির্ধারণ করা হয়েছে। তৎপর গ্রহণযোগ্য প্রশ্নগুলি বেছে পাকাপাকি ভাবে প্রশ্নপত্র রচিত হয়েছে। স্ট্যাণ্ডার্ড বা প্রমাণ পরিমাপের জন্য ঐসব প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়। বুদ্ধি পরীক্ষা ও বিভিন্ন জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য এমন ধরণের প্রশ্নপত্র কিছু কিছু প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ ধরণের প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য যা আবশ্যক তাকে বলা হয় প্রশ্নপত্রের উপাদান বা প্রশ্ন-বিশ্লেষণ। উপাদান-বিশ্লেষণের তিনটি ভাগ আছে:

(ক) প্রশ্ন নির্বাচন

(খ) প্রশ্নের দুরূহতা নির্ণয়

(গ) প্রশ্নের সত্যতা বা বস্তু-সঙ্গতি নির্ণয়

প্রশ্ন নির্বাচন

কোন একটি বিষয় পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র রচনার সময় বিষয়টির সব দিক দেখে প্রশ্ন করা হয়েছে কিনা—এ বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌রা চূড়ান্ত মত দেবেন। বিষয়টিতে পারদর্শিতার পরীক্ষার জন্য সব রকম প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে থাকবে।

প্রশ্নের দুরূহতা নির্ণয়

প্রশ্নপত্রটি যে শ্রেণীর বা বয়সের পরীক্ষার্থীর জন্যে ব্যবহার করা হবে, সে শ্রেণীর বা বয়সের অন্য একদল ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করা দরকার। সে ফলাফল থেকে প্রত্যেকটি প্রশ্ন কত সংখ্যক বা শতকরা কতজন পেরেছে তা গণনা করে প্রশ্নগুলির দুরূহতার মান নির্ণয় করা হয়। যে প্রশ্ন বেশী সংখ্যক পরীক্ষার্থী উত্তর দিতে পেরেছে তার দুরূহতা কম;

যেটা কম পেরেছে তার দুরূহতার মান বেশী। শতকরা ৫০ ভাগ ছেলেমেয়ে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে, সে প্রশ্নগুলি ঐ পরীক্ষার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী প্রশ্ন। যে প্রশ্ন সবাই উত্তর দিতে পারল কিম্বা কেউই পারল না পরীক্ষায় সে প্রশ্নের কোন মূল্য নেই। প্রমাণ প্রশ্নপত্রে সাধারণতঃ সহজ থেকে কঠিন—এইভাবে প্রশ্নগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়।

শতকরা কতজন প্রশ্নটি উত্তর দিতে পারে সেটা হিসাব করে দুরূহতার মান স্থির করা হয়। ১০% পরীক্ষার্থী একটি প্রশ্ন পারলে আমরা বলি দুরূহতার মান—১০। একটি প্রশ্নপত্রের প্রশ্নাবলীর দুরূহতার মান কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে শ্রীরায় (৮) বুদ্ধি পরীক্ষাপত্র রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন। বিদ্যা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য।

দুরূহতার মান	প্রশ্নের সংখ্যা
০ থেকে ৪০	২০%
৪০ থেকে ৬০	৬০%
৬০ থেকে ১০০	২০%

প্রশ্নের দুরূহতা নির্ণয়ের জন্য প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষার্থীদের শতকরা সাফল্য থেকে মান নির্ণয়ের কথা আমরা বললাম। কিন্তু পরীক্ষিত সামর্থ্যটির বিন্যাস প্রাকৃতিক হলে %'র দ্বারা মানটি সঠিক রূপে নির্ধারিত হয় না—σ'র সাহায্যে দুরূহতার মানটি সঠিক রূপে বোঝা যায়! ধরা যাক—একটি প্রশ্ন মাত্র শতকরা ১০ জন পেরেছে। প্রাকৃতিক বিন্যাসে গড় হল ৫০ অর্থাৎ যা শতকরা ৫০ জন পেরেছে। সুতরাং গড় থেকে উপরের ১০%'র মাঝখানে শতকরা ৪০ জন থাকবার কথা। আমরা জানি গড় থেকে ১·২৮'র মধ্যে আছে ৪০%। অতএব ঐ প্রশ্নটির (অর্থাৎ যে প্রশ্নটি শতকরা ১০ জন মাত্র পেরেছে) মান হচ্ছে ১·২৮। নীচে কয়েকটি প্রশ্ন শতকরা কতজন পেরেছে এবং তাদের মানের কথা উল্লেখ করা হল।

প্রশ্ন নম্বর	শতকরা কতজন পেরেছে	মান (σ'র এককে)	পার্থক্য
ক	১০%	১.২৮	—
খ	২০%	·৮৪	·৪৪
গ	৩০%	·৫২	·৩২

যদি আমরা চাই একটি প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলি ক্রমে ক্রমে সমভাবে কঠিন ও কঠিনতর হবে—তবে শতকরা কতজন পেরেছে তা দ্বারা দুরূহতার মান বিচার না করে, σ মনের দ্বারা বিচার দরকার। শতকরা কতজন পেরেছে এই দিক থেকে হিসাব করলে আমাদের স্বভাবতঃই মনে হতে পারে—ক ও খ এবং খ ও গ প্রশ্নগুলির মধ্যে দুরূহতার পার্থক্য সমান। কিন্তু প্রশ্নের দুরূহতার মান যদি σ হিসাবে ধরা হয় তবে বলব খ'র থেকে ক যতখানি শক্ত, গ'র থেকে খ ততখানি শক্ত নয়।

গোটা প্রশ্নপত্রের সত্যতা বা বস্তু-সঙ্গতি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার একটি প্রশ্নপত্র বহু প্রশ্ন নিয়ে গঠিত। গোটা প্রশ্নপত্রটির উত্তম বস্তুসঙ্গতি থাকতে হলে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উপযুক্ত বস্তুসঙ্গতি বা সত্যতা থাকা দরকার। তাই প্রত্যেকটি প্রশ্নের সত্যতা সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সত্যতা বলতে আমরা কি বুঝি? কোন একদল' বিষয়টি ভালো জানে ও আরেকদল বিষয়টি কম জানে। একটি প্রশ্ন ঐ দুই দলের মধ্যে যতখানি পার্থক্য করতে পারবে, অর্থাৎ ঐ দুই দলের পার্থক্য যতখানি ধরতে পারবে, প্রশ্নটির সত্যতা তত বেশী হবে। সংক্ষেপে, প্রশ্নটির সঠিক উত্তরে প্রথম দল ও দ্বিতীয় দলের পার্থক্যের পরিমাণ যত বেশী হবে, প্রশ্নটি তত বেশী সত্য। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। ১০০টি ছেলেকে পরীক্ষা করা গেল এবং কৃতিত্ব অনুযায়ী ছেলেদের নম্বর পরপর সাজান হল। প্রথম ৩০ জন বিষয়টি ভালো জানে এমন মনে করা যেতে পারে; শেষের ৩০ জন বিষয়টি কম জানে। কোন একটি প্রশ্ন নেওয়া হল। গণনা করে দেখা হল প্রথম ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জন অর্থাৎ, ৫০% ঐ প্রশ্নটির উত্তর দিতে পেরেছে ও শেষের ৩০ জনের মাত্র ৫ জন অর্থাৎ, আনুমানিক ১৭%। প্রশ্নটির সত্যতার অঙ্ক হচ্ছে ৫০-১৭ = ৩৩। প্রশ্ন বেশী—জানাদের থেকে কম জানাদের যত বেশী পার্থক্য বা বিনিশ্চয় করতে সক্ষম হবে—সে প্রশ্নের সত্যতা তত বেশী।

প্রশ্নের সত্যতা

প্রশ্নের সত্যতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্য না নিয়ে ছাত্রদের সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারণার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। ছাত্রদের সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারণা অনুসারে ছাত্রদের দুটি কিম্বা তিনটি (তিনটি হলে প্রথম ও তৃতীয়টির তুলনা করতে হবে) দলে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি প্রশ্ন বেশী জানার দলের কয়জন ও কম জানার দল কয়জন উত্তর দিতে পারল সেটা গণনা করে শতকরা হারে প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় সংখ্যা বাদ দিলেই প্রশ্নটির সত্যতার মান পাওয়া যাবে।

উপরোক্ত উপায়ে প্রতিটি প্রশ্নের সত্য নির্ধারণকে পরোক্ষ উপায় বলা যেতে পারে। প্রশ্নের 'সত্যতা বা বস্তুসঙ্গতি নির্ধারণের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ উপায় আছে। সেগুলি কিছুটা জটীল। পরিসংখ্যানের

কোন বই থেকে পাঠক-পাঠিকাবর্গ দরকার মনে করলে দেখে নিতে পারেন।*

প্রত্যেকটি প্রশ্নকে যাচাই করে দেখে তার মধ্য থেকে যে সব প্রশ্নের সত্যতার মান বেশী তাই নিয়ে প্রশ্নপত্রটি পাকাপাকি তৈরি করলে—সে প্রশ্নপত্রের বস্তু-সঙ্গতি বেশী হবে।

অধিকাংশ পরীক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকে—আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা কিম্বা তার চেয়েও বেশী। কোন্ পরীক্ষায় কতটুকু সময় দেওয়া হবে, সেটা কিছু পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা করেই স্থির করা হয়। একটি প্রশ্নপত্র উত্তর দিতে অর্ধেক কিম্বা অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর যে সময় দরকার হয়—সেটাকেই ঐ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেবার সময় বলে মনে করা হয়।

প্রশ্নোত্তরের সময়

দ্রুতি অর্থাৎ কত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে—কোন কোন পরীক্ষায় সেটা জানবার চেষ্টা করা হয়। মোটামুটি সময় পেলে ছেলেমেয়েরা কি পর্যন্ত পারে, কতটা তাদের ক্ষমতা—অধিকাংশ পরীক্ষাতে এটা দেখা হয়। দ্রুতির পরীক্ষায় প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে একজনের যে সময় লাগল সেটাই তার স্কোর। কোন কোন দ্রুতির পরীক্ষায় অল্প কিছুটা সময় দেওয়া থাকে, সে সময়ের মধ্যে কে কতটা উত্তর দিতে পারে সেটা দেখা হয়। যে পরীক্ষায় দ্রুতির চেয়ে সামর্থ্য পরিমাপের চেষ্টাটাই বড়, সে পরীক্ষায় বেশ কিছুটা সময় থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ঐ সময়ে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পারে।

প্রশ্নপত্রটি পাকাপাকি তৈরি হল। একটি শ্রেণী (বা একাধিক শ্রেণী) বা একটি (বা একাধিক) বয়সের জন্য প্রশ্নটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই শ্রেণীর বা সেই বয়সের বহু ছেলেমেয়েদের ঐ প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষিত ছেলেমেয়ের দল যাতে ঐ শ্রেণী বা বয়সের ছেলেমেয়েদের একটি যথার্থ নমুনা হয়—সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।* ঐ পরীক্ষার ফলাফলের গড় ও প্রমাণ-ব্যত্যয়কে আমরা ঐ বয়সের সব ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার গড় ও প্রমাণ-ব্যত্যয় মনে করতে পারি। ঐ গড়কে বলা হয় নর্ম্।

পরীক্ষার প্রমাণ-বিধান ঃ নর্ম্

---

* প্রশ্নের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য স্থান বিশেষে **biserial correletion, tetrachoric correletion** প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়।

* 'প্রকৃত নমুনা' কাকে বলে—তা ১৩ অধ্যায়ে দেখুন।

একটি পরীক্ষা যদি প্রমাণবিধিত হয়, তার নর্ম্ যদি আমাদের জানা থাকে—তবে তারই সাহায্যে (বিনে'র বুদ্ধিপরীক্ষার দ্বারা মনোবয়সের মতনই) ছেলেমেয়েদের কোন একটি বিষয়ে পারদর্শিতার বয়স নির্ণয় করা সম্ভব। ধরা যাক ১০, ১১ ও ১২ বছরের ছেলেদের পরীক্ষা করে একটি অঙ্ক পরীক্ষা প্রমাণ-বিধিত হল। তাদের নর্ম্ পর্যায়ক্রমে ৩০, ৩৪, ৪০ পাওয়া গেল। এ কথার অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে ১০ বছরের একটি মোটামুটি সাধারণ ছেলে অর্থাৎ, যে বিশেষ ভালোও নয়, বিশেষ মন্দও নয় সে অঙ্ক পরীক্ষাটিতে ৩০ পাবে; একটি সাধারণ ১১ বছরের ছেলে পাবে ৩৪ এবং একটি সাধারণ ১২ বছরের ছেলে পাবে ৪০। কোন একটি ১৩ বছরের ছেলে হয়ত পরীক্ষার জন্য এল। পরীক্ষাতে সে পেল ৩০। অর্থাৎ, প্রকৃত বয়স তার ১৩ হলেও অঙ্কের (অর্থাৎ অঙ্কে পারদর্শিতার) বয়স মাত্র ১০। এইভাবে স্কুলপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ে একজনের বয়স নির্ণয় করে, সে সব বয়সের গড় নিয়ে শিক্ষা-বয়স নির্ণয় করা হয়।

শিক্ষা-বয়স

প্রকৃত বয়স, শিক্ষা-বয়স ও মনোবয়স জানা থাকলে আমরা শিক্ষাঙ্ক ও সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করতে পারি। শিক্ষাঙ্ক ও সাফল্যাঙ্কের সূত্র আমরা ১৩ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করে নম্বর দেওয়া ব্যাপারে বলবার বিশেষ কিছু নেই। নম্বর দেওয়া ব্যাপারটিতে পরীক্ষকদের ভাবনা-চিন্তার কোন অবকাশ নেই। উত্তর কি হবে নিশ্চিতরূপে সেটি ঠিক করা আছে। পরীক্ষার্থী সেটা বলতে পারলে নম্বর পায়, না পারলে নম্বর কাটা যায়। পরীক্ষার্থীদের নম্বরের বিন্যাসটি প্রাকৃতিক হবে কিনা সেটা প্রশ্নপত্র রচনার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করবে।

নম্বরদান সম্বন্ধে নিয়ম ও নির্দেশ

রচনামূলক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কম হলেও ঐ পরীক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। ভাষা ও সাহিত্যের একটি অংশ পরীক্ষার জন্য রচনামূলক পরীক্ষার আজও প্রয়োজন আছে। নম্বর দেওয়া ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশের দ্বারা রচনামূলক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান যায় কিনা এ সম্বন্ধে পূর্বে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। মূল্যায়ন ও নম্বরদানে পরীক্ষকদের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য আছে। কেউ কিছুতেই সন্তুষ্ট নন। কোন লেখাই তাঁর কাছে ভালো নয়। অধিকাংশ লেখা তাঁর চোখে নিকৃষ্ট।

এঁদের কাছে বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থীই কম নম্বর পান। আবার কেউ অল্পতেই খুশী। নম্বরদান ব্যাপারে এঁরা উদার। এঁদের কাছে পরীক্ষার্থীদের খাতা পড়লে বুঝতে হবে ভাগ্য তাদের প্রতি সুপ্রসন্ন। কি রকম নম্বর কতজন পাবে এ সম্বন্ধে পরীক্ষকদের যদি আগে থেকেই একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, তবে কারো কাছে বেশী, কারো কাছে কম নম্বরের পার্থক্য অনেক পরিমাণে এড়ান সম্ভব হবে। নম্বরদানটি প্রাকৃতিক বিন্যাসের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে ফলাফল অধিকতর সঙ্গত ও নির্ভরযোগ্য হবে।

নম্বর অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি। A, B, C, D, F। যারা সাধারণ ভাবে পাশ করেছে তাদের C বলা যেতে পারে। এদের সংখ্যাই বেশী। B—সাধারণের চেয়ে যারা অপেক্ষাকৃত ভালো। D—যারা সাধারণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পেয়েছে। A—পরীক্ষায় যারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। F—পড়াশোনায় যারা একেবারেই কাঁচা; যাদের কোনমতেই পাশ করান চলে না। সংক্ষেপে এই বলা যায়ঃ

A—বিশেষ কৃতিত্ব

B—কৃতিত্ব

C—সাধারণভাবে পাশ

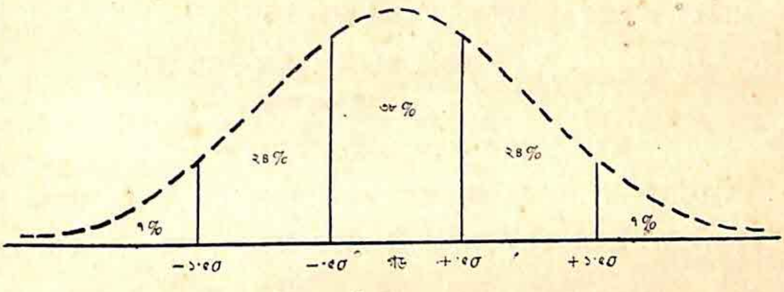
D—কোনমতে পাশ

F—ফেল।

কোন বিভাগে শতকরা কতজন পরীক্ষার্থী পড়া উচিত—এ সম্বন্ধে সোরেনসেন্ যে সারণীটি দিয়েছেন নীচে তা উল্লেখ করা হল। (৯)

	A	B	C	D	F
১	১০	২০	৪০	২০	১০
২	৭	২৪	৩৮	২৪	৭
৩	৫	২৫	৪০	২৫	৫
৪	৫	২০	৫০	২০	৫
৫	১৫	২৫	৪৫	১০	৫
৬	১০	২০	৫০	১০	১০
৭	১৫	২৫	৪৫	১৫	০

প্রত্যেকটি বিভাগে শতকরা কতজন থাকবে এ বিষয়ে সোরেনসেন্ সাতটি ধারা উল্লেখ করেছেন। কোনটি শিক্ষকেরা গ্রহণ করবেন সেটা তাঁরা স্থির করবেন।* ৭ নম্বর ধারায় কোন ফেল নেই। ৫ ও ৬ নম্বর ধারায় সাধারণের চেয়ে ভালোর হার সাধারণের চেয়ে খারাপের হারের থেকে বেশী। এদের মধ্যে ২ নম্বরের ধারাটি সঠিক প্রাকৃতিক বিন্যাসের নিয়ম অনুসারে সাজান হয়েছে।



গড় ± থেকে ·৫σর মধ্যে আছে ৩৮%; ·৫σ থেকে ১·৫σ'র মধ্যে আছে ২৪%, ১·৫σর উর্ধ্বের নম্বরের সংখ্যা হচ্ছে ৭%। তেমনি—·৫σ থেকে—১·৫σ'র মধ্যে ২৪% ও—১·৫σ'র নীচে আছে ৭%। কোন একটি পরীক্ষার গড় নম্বর যদি ৫০ হয় ও প্রমাণব্যত্যয় ১০ হয় তবে ৪৫ থেকে ৫৫ পাবে সাধারণ পরীক্ষার্থী, তাদের সংখ্যা ৩৮%। ৫৫ থেকে ৬৫ যারা পেয়েছে তারা হবে ২৪%। ৬৫'র উপর যাদের নম্বর তারা ৭%। তেমনি ৩৫ থেকে ৪৫ যারা পেয়েছে—তারা ২৪%। আর ৩৫'র নীচে অথবা ফেল হচ্ছে ৭%।

---

* বিভিন্ন বিভাগে শতকরা কতজন পড়বে—সে সম্বন্ধে ৮০টি আমেরিকান কলেজের গড় উল্লেখ করা হল: A—১৫·২%, B—৩১·১% C—৩৬·৪%, D—৯·১% এবং F—৩·২%। (১০) আমেরিকান কলেজী পরীক্ষায় পরীক্ষকদের ঝোকটা হচ্ছে বেশী নম্বর দেওয়ার দিকে। আমাদের দেশে পরীক্ষকদের ঝোঁক হচ্ছে কম নম্বর দেওয়ার দিকে। ১৯৫৯ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া হল। পরীক্ষা পাশের তিনটি বিভাগ—প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ; তা ছাড়া ফেল। প্রথম বিভাগের—১·৪%, দ্বিতীয় বিভাগে—১১·৩%, তৃতীয় বিভাগে—২১·৬% ফেল—৬৫·৭%। হয়ত কেউ বলবেন—পরীক্ষার্থীরা উপযুক্ত নয় বলেই তারা পরীক্ষায় অত বেশী অকৃতকার্য হয়। আমাদের উত্তর হবে—শতকরা এত বেশী ছেলেমেয়েরা যদি ঐ পরীক্ষার অনুপযুক্ত হয় তবে তাদের

ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন নম্বর পায়। রাম হয়ত ভূগোলে পেল ৬০, ইংরেজীতে ৪৫, বাঙলায় ৫৬। এই নম্বরগুলির সঠিক তাৎপর্য কি?

নম্বর বা স্কোরের তাৎপর্য বোঝা

নম্বরকে আমরা স্কোর বলতে পারি। স্কোরের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের পরিমাণ সূচিত হয়। পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা যে নম্বর পায় সেগুলিকে তাদের লব্ধ স্কোর কিম্বা প্রাথমিক স্কোর বলা চলে। এই স্কোরগুলিকে স্ট্যাণ্ডার্ড বা প্রমাণ স্কোরে রূপান্তরিত করেই এগুলির সঠিক তাৎপর্য বোঝা সম্ভব। রূপান্তরের সূত্রটি হচ্ছে: *

$$\text{প্রমাণ স্কোর} = \frac{\text{লব্ধ বা প্রাথমিক স্কোর—গড় স্কোর}}{\text{প্রমাণ ব্যত্যয়}}$$

প্রমাণ স্কোরকে সংক্ষেপে σ স্কোর বলা হয়।

ধরা যাক—পরীক্ষকেরা এমন ভাবে নম্বর দিলেন যে বিভিন্ন বিষয়ের গড় নম্বর ও প্রমাণ ব্যত্যয় সমান হল। ঐ ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েরা যে নম্বর পেল (যাকে আমরা প্রাথমিক নম্বর বলে অভিহিত করেছি)—তাকে আর রূপান্তর করার আবশ্যকতা থাকে না। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমন হয় না, সুতরাং রূপান্তর করা দরকার হয়।

প্রাথমিক নম্বর বা স্কোরগুলির রূপান্তরণের আবশ্যকতার আরেকটি কারণ উল্লেখ করব। বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ফলকে যোগ করে, সেই সমষ্টিফলের উপর পরীক্ষার্থীদের প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ ও ফেল স্থির

ঐ পাঠ পড়তে দেওয়া হয় কেন, তারা পরীক্ষা দেবার সুযোগই বা লাভ করে কেন? প্রত্যুত্তরে বলা যেতে পারে যে পড়বার বা পরীক্ষা দেবার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তাদের আমরা কেমন করে বঞ্চিত করব, কিম্বা না পড়ে তারা করবেই বা কি? সেক্ষেত্রে আমরা বলব তাহলে তারা যা পারে, পাঠ ও পরীক্ষার মান তেমনই হওয়া উচিত। পরীক্ষার খাতাতে নম্বর দেওয়ার ব্যাপারেও পরীক্ষকদের মনোভাব বদলাতে হবে। ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ যেটুকু জানে, তাকেই গড় মান ধরতে হবে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে অধিকাংশ বিষয়ে উত্তরের ন্যূনতম মান বলে কিছু নেই। এমন ইংরেজী প্রবন্ধ লিখলে সে ৬০ কি ৫০ নম্বর পাবে—এ ধারণা পরীক্ষকদের নিজস্ব মতামত ছাড়া কিছু নয়। পরীক্ষকরা বলেন—এটা পরীক্ষার্থীদের পারা 'উচিত' ছিল। কী উচিত ছিল সেটা নির্ধারণ করবার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখতে হয় কী তারা পারে। শতকরা ৪০ জন যেটা পারে, সেটাকে শতকরা ৯০।৯৫ জন পারবে মনে করবার কোন যুক্তি নেই।

* এ সম্বন্ধে বুদ্ধি পরীক্ষা ও পরিসংখ্যান দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

করা হয়। দেখা গেছে অঙ্ক বিজ্ঞানে নম্বর তোলা যত সহজ, সাহিত্যে তত সহজ নয়। অঙ্কে যারা ভালো তাদের পক্ষে পুরো বা পুরোর কাছাকাছি নম্বর পেতে অনেক সময় দেখা যায়। অন্যপক্ষে সাহিত্যে ভালোদের পক্ষে ৬০।৭০ পেলেই যথেষ্ট পাওয়া হল। সাহিত্যে ৮০।৮৫ দুর্লভ নম্বর। একটি ছেলে হয়ত অঙ্কে ভালো, সাহিত্যে তত ভালো নয়। আরেকটি ছেলে সাহিত্যে ভালো, অঙ্কে তত ভালো নয়। এমন ক্ষেত্রে অঙ্কে যে ভালো, অঙ্কের উচ্চ নম্বরের কল্যাণে মোট সে বেশী নম্বর পায়। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক নম্বরকে প্রমাণ স্কোরে রূপান্তরিত করলে এই অসঙ্গত সুবিধাটি ঐ ছেলেটি ভোগ করতে পারবে না।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অঙ্ক ও সাহিত্যের গড় নম্বরের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য না থাকলেও এগুলির প্রমাণ ব্যত্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটি গুরুতর হয়। সাহিত্যের নম্বরের ব্যাপ্তি কম—নম্বরগুলির মধ্যে ব্যবধান অল্পই দেখা যায়। অপরপক্ষে অঙ্কের নম্বরের ব্যাপ্তি বেশী। ১০০ও যেমন কেউ কেউ পায়, আবার কারো কারো ৫।১০ পাওয়াও আশ্চর্য নয়। কলকাতার একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর ১০০টি ছেলের পরীক্ষার ফলের যে গড় নম্বর ও প্রমাণ ব্যত্যয় পাওয়া গেছে—তা নীচে উল্লেখ করা হল : (১১)

বিষয়	**গড় নম্বর**	**প্রমাণ ব্যত্যয়**
অঙ্ক	৪৫·৩	১৮·৯
ইংরেজি	৪৩·৮	৭·৫
সংস্কৃত	৪৬·০	১৫·১
ইতিহাস	৪৪·৯	১২·৪
বাঙলা	৪৮·৮	৮·৭
ভূগোল	৫৩·০	১৪ ৮
মোট	৪৬ ২	৯·১

প্রাথমিক স্কোরকে T স্কোরে রূপান্তরণের একটি পন্থা ম্যাকল্ উদ্ভাবন করেছেন। T স্কোরগুলির গড় হচ্ছে ৫০ ও প্রমাণ ব্যত্যয় হচ্ছে ১০। O থেকে ১০০ পর্যন্ত স্কোরগুলির ব্যাপ্তি। প্রাথমিক স্কোরগুলির বিন্যাসটি প্রাকৃতিক না হলেও—T মানকে সেগুলিকে প্রাকৃতিক বিন্যাসের রূপ দিয়ে নেওয়া হয়।

প্রমাণ স্কোরের সঙ্গে T স্কোরের কয়েকটি পার্থক্য আছে। প্রমাণ স্কোরে নম্বরগুলির নিজস্ব বিন্যাস বদলানো হয় না (অর্থাৎ T মানকের মত বিন্যাসের প্রাকৃতিক রূপ করে নেওয়া হয় না)। প্রমাণ স্কোরের সমক হচ্ছে O; T স্কোরের ৫০। প্রমাণ স্কোরের প্রমাণ ব্যত্যয় ১; T স্কোরের ১০। T স্কোরটি আমাদের কাছে সুবোধ্য বলে ঐ মাপকটি ব্যবহারে অনেকে পক্ষপাতী।*

প্রমাণ স্কোর বা T স্কোরের যে মাপক—তার একক মাপকের বিভিন্ন অংশে সমান। অর্থাৎ, T স্কোরের ৫০ থেকে ৬০ এ যে পার্থক্য, ৬০ থেকে ৭০'র মধ্যেও সেই পার্থক্য। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের T স্কোর বা প্রমাণ স্কোর যোগ করে সেগুলির সমষ্টির ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের ক্রম, বিভাগ বা পাশ ফেল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করবার প্রয়োজনও আজকাল শিক্ষকেরা কিছু কিছু অনুভব করছেন। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ আজও কঠিন।

বিদ্যালয়ে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ : রেটিং স্কেল

ব্যক্তিত্বের কোন একটি বৈশিষ্টের পরিমাপে তিন, পাঁচ বা সাতটি বিভাগে ছেলেমেয়েদের বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। তিনটি ভাগ হলে উচ্চ, সাধারণ, নিম্ন এবং পাঁচটি ভাগ হলে বিশেষ উচ্চ, উচ্চ, সাধারণ, নিম্ন, বিশেষ নিম্ন এমন জাতীয় ভাগ হবে। শব্দ ব্যবহার না করে—A B C D E প্রতীকের দ্বারা ঐ মান সূচিত হতে পারে। একে তুলনামূলক বা রেটিং স্কেল বলা যায়। বিভিন্ন ভাগে শতকরা কতজন পড়বে—ঐ কথা স্মরণ রেখে যদি আমরা ছেলেমেয়েদের পর্যায়ভুক্ত করি তবে রেটিং অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য হবে। ছাত্রদের সময়ানুবর্তিতা রেটিং করতে গিয়ে একটি ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে গুরুতর মত পার্থক্য ঘটত সেটা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। একজন অধ্যাপকের কাছে বেশীর ভাগ ছাত্রই E, দু'চারজন D পেত। সমায়ানুবর্তিতা বলতে তিনি বোঝেন—সময়ের কাঁটায় কাঁটায় কাজ করে যাওয়া। এক মিনিট দেরী হওয়া চলবে না। ক্লাশে বা কলেজের অন্য কোন কাজে যে একদিন দেরী করেছে সেই D, এমন কি E। আরেকজনের কাছে

---

* রূপান্তরণের পদ্ধতির জন্য Henry Garret'র Statistics in Psychology & Education ১৪৯—১৫৭ পাতা দেখুন।

বেশীর ভাগই পেত B, দু চারজন Aও পেত। অমন পার্থক্যের কারণ কি? আসল কথা—সময়ানুবর্তিতার একটা আদর্শকে সামনে রেখে ছেলেদের এঁরা বিচার করেছেন। বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের ধারাটি বিভিন্ন। যে পরিমাণ সময়ানুবর্তিতা ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় সেটিকে C ধরা হয়। স্থান কাল ভেদে মানুষের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার পার্থক্য আছে এ কথা স্মরণ রেখেই এই রেটিং করতে হবে।

অধ্যায় ২৬

পরিসংখ্যান

স্কুলের পরীক্ষায় ছেলেমেয়েরা নম্বর পায়, বুদ্ধি পরীক্ষাতেও নম্বর দেবার পদ্ধতি রয়েছে।* নম্বর ছেলেমেয়েদের সাফল্যের পরিমাণ সূচিত করে। এজন্য তাকে স্কোর (Score) বলা হয়। কোন একটি কাজে একজনের কতখানি দক্ষতা বা নৈপুণ্য আছে তা পরিমাপের জন্য আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ পরীক্ষার্থী **কত সময়ে** শেষ করতে পারে অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে **কি পরিমাণ কাজ** সে শুদ্ধভাবে শেষ করতে পারে—এই দুই পদ্ধতিই ব্যবহার করতে পারি। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সময়ের পরিমাণ (সঠিকরূপে বলতে গেলে, সময়ের স্বল্পতা) ও দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ হবে স্কোর।

মানুষের দৈহিক ক্ষেত্রেও পরিমাপের স্থান আছে। একটি লোক কতখানি লম্বা, তার ওজন কত—ইত্যাদি। রাশির সাহায্যে এসবের পরিমাপের চেষ্টা করা হয়।

রাম বাংলা পরীক্ষায় ৫০ পেয়েছে। এ থেকে পরীক্ষায় রামের সাফল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের একটি ধারণা হল—ধারণাটি অবশ্য খুব স্পষ্ট নয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু যে শ্রেণীতে রাম পড়ে বাংলা পরীক্ষায় সে শ্রেণীর সাফল্য কতখানি জানতে হলে কি করা দরকার? ধরা যাক, শ্রেণীতে ১০টি ছেলে পড়ে। তারা নিম্নলিখিত নম্বর পেয়েছেঃ ৬৯, ৫৪, ৬২, ৫৮, ৫১, ৫৭, ৪২, ৬১, ৫৬, ৫০,। দেখা যাচ্ছে—কেউ ৬৯ পেয়েছে, কেউ ৪২ পেয়েছে আবার কেউ ৫০ পেয়েছে। এই সব নম্বরগুলির গড় নিলে শ্রেণীর গড় নম্বরটি জানা যাবে। সমস্ত নম্বরগুলি যোগ করে—ছাত্রসংখ্যা দিয়ে সেই যোগফলকে ভাগ করলে শ্রেণীর গড় স্কোরটি পাওয়া যাবে। এই জাতীয় গড়কে **সমক** বা ইংরেজিতে **mean** বলা হয়।

সমক

একে প্রচলিত ভাষায় গড়ও বলা চলতে পারে। গড় শব্দটির আর একটি ব্যাপক অর্থ আছে। অনেকগুলি সংখ্যার মধ্যবর্তী সংখ্যাটি হচ্ছে গড়—সেটি সমক হতে পারে, মধ্যক হতে পারে আবার শীর্ষস্কোর হতে পারে।*

সমক

সঙ্কীর্ণ অর্থে গড় বার করবার পদ্ধতি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেটা সূত্রাকারে হচ্ছে: সমক $= \frac{\text{নম্বরগুলির যোগফল}}{\text{ছাত্র সংখ্যা}}$

সাঙ্কেতিকে প্রকাশের পদ্ধতি: $M = \frac{\Sigma X}{N}$

M হচ্ছে সমক, X নম্বর কিম্বা অন্য কোন পরিমাপ, N পরীক্ষার্থীদের (নম্বরের) মোট সংখ্যা, Σ চিহ্নটি গ্রীক অক্ষর 'সিগমা'। কতগুলি রাশির সমষ্টি বা যোগফল বোঝাতে ঐ প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়।

মধ্যক

নম্বরগুলি বেশী থেকে কম (বা কম থেকে বেশী) এমনভাবে পরপর সাজালে মধ্যবর্তী সংখ্যাটি হবে মধ্যক। নম্বরগুলির সংখ্যা বিজোড় হলে মধ্যক বার করবার কোন অসুবিধা নেই। মধ্যবর্তী নম্বরটির উপরে যতগুলি সংখ্যা থাকে নীচেও ঠিক ততগুলি সংখ্যা থাকে। একটি বিজোড় সংখ্যক নম্বরের সারি নেওয়া যাক। ৬, ৭, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২। সারিটির মধ্যক হচ্ছে ৯। কারণ ৯ নম্বরটির উপরে ৩টি সংখ্যা এবং নীচে ৩টি সংখ্যা।

একটি জোড় সংখ্যক নম্বরের সারি নেওয়া যাক। ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২। এখানে মধ্যকটি ৯ ও ১০ এর মধ্যবর্তী একটি নম্বর হবে। সে নম্বরটি হচ্ছে ৯·৫। এ নম্বরটি অবশ্য কোন ছেলেই পায়নি। ৯ ও ১০ যোগ করে তাকে ২দিয়ে ভাগ করে ৯·৫ নম্বরটি পাওয়া যায়।

নম্বরগুলিকে পরপর সাজালে মধ্যক $= \frac{\text{ছাত্র সংখ্যা} + ১}{২}$ তম নম্বর।

পূর্বের ১০টি ছেলের বাংলার নম্বর পর পর সাজিয়ে সেগুলির সমক ও মধ্যক বার করা হল।

* ইংরেজিতে সমক হচ্ছে Mean, মধ্যক Median, ও শীর্ষস্কোর Mode.

সারণী

নম্বর (X)

৬৯
৬২
৬১
৫৮
৫৭
—৫৬.৫০ (মধ্যক)
৫৬
৫৪
৫১
৫০
৪২
——
৫৬০ যোগফল

$$\text{সমক} = \frac{\text{নম্বরগুলির যোগফল}}{\text{ছাত্র সংখ্যা}}$$

$$= \frac{৫৬০}{১০} = ৫৬$$

$$\text{মধ্যক} = \frac{\text{ছাত্রসংখ্যা} + ১}{২} \text{তম সংখ্যা}$$

$$= \frac{১০ + ১}{২} \text{ তম সংখ্যা}$$

$$= ৫.৫ \text{ তম সংখ্যা}$$

উপরের বা নীচের যে কোন দিক থেকে গুণলে দেখা যায় ৫৬ ও ৫৭'র মধ্যবর্তী সংখ্যাটি অর্থাৎ ৫৬.৫ হচ্ছে মধ্যক।

শীর্ষস্কোর

কোন একটি নম্বরের সারিতে যে নম্বরটিকে সবচেয়ে বেশী বার দেখা যায় অর্থাৎ যে নম্বরটির পৌনঃপুনিকতা সর্বাধিক—তাকে শীর্ষস্কোর বলা হয়। ৭ ৮ ৯ ১০ ১০ ১০ ১১ ১২। এই সারিতে ১০ হচ্ছে শীর্ষস্কোর কারণ ১০ এর পৌনঃপুনিকতা ৩, অন্যান্য নম্বরের ১।

গড় ব্যত্যয় ও প্রমাণ ব্যত্যয়*

একটি শ্রেণীর ছেলেদের গড় নম্বর জানার দরকার হয়। তেমনি শ্রেণীর গড় নম্বর থেকে ছেলেদের নম্বরের ব্যবধান কতখানি—এটা জানারও দরকার আছে। দরকারটি কি—ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি পরীক্ষা অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি।

গড় ব্যত্যয় ও প্রমাণ ব্যত্যয়* নির্ণয়ের সূত্র নীচে দেওয়া হল।

---

* ইংরেজিতে গড় ব্যত্যয় **Mean Deviation** ও প্রমাণ ব্যত্যয় **Standard Deviation.**

শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নি এমন সব স্কোরের
সমক ব্যত্যয় ও প্রমাণ ব্যত্যয় নির্ণয়

$$\text{সমক ব্যত্যয়} = \frac{\text{(সমক থেকে) ব্যত্যয় সমূহের যোগফল}}{\text{ছাত্র সংখ্যা}}$$

$$\text{সাঙ্কেতিকে } MD = \frac{\Sigma \mid x \mid}{N}$$

MD অর্থে সমক ব্যত্যয়, N ছাত্র সংখ্যা, Σ যোগফল, $\mid x \mid$ সমক থেকে ব্যত্যয় বোঝায়।

$$\text{প্রমাণ ব্যত্যয়} = \sqrt{\frac{\text{(সমক থেকে) বর্গ ব্যত্যয় সমূহের যোগফল}}{\text{ছাত্র সংখ্যা}}}$$

$$\text{সাঙ্কেতিকে SD অথবা } \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}$$

SD অথবা σ অর্থে প্রমাণ ব্যত্যয়, N ছাত্রসংখ্যা, Σ যোগফল, x^2 ব্যত্যয়সমূহের বর্গফল বোঝায়।

σ চিহ্নটি গ্রীক অক্ষর 'সিগমা'। প্রমাণ ব্যত্যয় বোঝাতে ঐ প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়।

নম্বর	**সমক থেকে ব্যত্যয়** X	**বর্গ ব্যত্যয়** X^2
৬৯	+১৩	১৬৯
৬২	+ ৬	৩৬
৬১	+ ৫	২৫
৫৮	+ ২	৪
৫৭	+ ১	১
৫৬	০	০
৫৪	— ২	৪
৫১	— ৫	২৫
৫০	— ৬	৩৬
৪২	—১৪	১৯৬
মোট সংখ্যা = ১০	৫৪	৪৯৬
	ব্যত্যয়সমূহের সমষ্টি (পজিটিভ ও নেগেটিভ চিহ্ন উপেক্ষা করে সমস্ত ব্যত্যয়কেই পজিটিভ ধরা হয়েছে)	বর্গ ব্যত্যয়সমূহের সমষ্টি

সমক = ৫৬

$$\text{সমক ব্যত্যয়} = \frac{\text{ব্যত্যয়সমূহের সমষ্টি}}{\text{ছাত্র সংখ্যা}} = \frac{৫৪}{১০} = ৫\cdot৪$$

$$\text{প্রমাণ ব্যত্যয়} = \sqrt{\frac{\text{বর্গ ব্যত্যয়ের সমষ্টি}}{\text{ছাত্র সংখ্যা}}}$$

$$= \sqrt{\frac{৪৯৬}{১০}}$$

$$= \sqrt{৪৯\cdot৬} = ৭\cdot০৪ \text{ (আনুমানিক)}$$

শ্রেণীবদ্ধ বা কোঠাবদ্ধ নম্বর

১০টি ছেলে বাঙলা পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের নম্বরগুলি আলাদা আলাদা লিখে—সেগুলির গড়, সমক ব্যত্যয় ও প্রমাণ ব্যত্যয় নির্ণয় করা হল। কিন্তু যেখানে বহু ছাত্র পরীক্ষা দেয়, বহু নম্বর নিয়ে কাজ করতে হয়—সেখানে নম্বরগুলিকে কোঠা বা শ্রেণীতে ফেলে প্রকাশ করা আবশ্যক। পূর্বেকার ১০টি নম্বরকে আমরা ৩টি কোঠায় প্রকাশ করতে পারি।

যেমন ৬০'র কোঠায়—৩টি নম্বর
৫০'র " —৬টি নম্বর
৪০'র " —১টি নম্বর

ঐ ক্ষেত্রে একেকটি কোঠার ব্যাপ্তি* হচ্ছে ১০। যেমন ৬০ থেকে ৬৯, ৫০ থেকে ৫৯, ৪০ থেকে ৪৯।

৬০'র কোঠায় ৩টি নম্বর আছে। কোঠাবদ্ধ নম্বর থেকে সমক, মধ্যক প্রভৃতি বার করতে হলে ঐ তিনটি ছেলে প্রত্যেকে কত পেয়েছে বলে ধরা হবে? একটি সারির মধ্যবর্তী নম্বরটি সারির নম্বরগুলির স্বরূপ সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করে। সারিটি হচ্ছে—৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯। এগুলির মধ্যবর্তী নম্বরটি কি?

* ইংরেজীতে ব্যাপ্তি হচ্ছে Range

৬৪ ও ৬৫টির মাঝখানের নম্বরটি হচ্ছে মধ্যবর্তী নম্বর। অর্থাৎ ৬৪·৫। এই মধ্যবর্তী নম্বরটিকে মধ্যনম্বর বা মধ্যবিন্দু* বলা হয়।

কোঠার সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা বাদ দিয়ে, বিয়োগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করে, ভাগফল কোঠার সর্বনিম্ন সংখ্যার সঙ্গে যোগ করলে মধ্যনম্বর বা মধ্যবিন্দুটি পাওয়া যায়। উপরের ক্ষেত্রে ঃ

$$\text{মধ্যবিন্দু} = ৬০ + \frac{৬৯—৬০}{২} = ৬৪·৫।$$

কোঠার ব্যাপ্তিকে যে সব সময় ১০ হতে হবে এমন কথা নেই। সুবিধা-মত ৩, ৪, ৫—সবকিছুকেই ব্যাপ্তি ধরা যেতে পারে।

সাধারণতঃ কোঠার ব্যাপ্তিটি এমন ধরতে হয়—যাতে কোঠার সংখ্যা ৭'র কম না হয়। ১০ থেকে ১৪'র মধ্যে কোঠার সংখ্যা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

একটি সারির গরিষ্ঠ নম্বর থেকে লঘিষ্ঠ নম্বর বাদ দিলে যে বিয়োগফলটি পাওয়া যায় নম্বরগুলির সেটি হল মোট ব্যাপ্তি। গরিষ্ঠ থেকে লঘিষ্ঠ পর্যন্ত কতগুলি নম্বর আছে তা জানতে হলে ব্যাপ্তির সঙ্গে ১ যোগ করতে হয়। যতগুলি কোঠা আমাদের দরকার—কোঠার সেই সংখ্যা দিয়ে মোট ব্যাপ্তি + ১ কে ভাগ করলে প্রত্যেকটি কোঠার ব্যাপ্তি পাওয়া যাবে।

পূর্বে উল্লিখিত ১০টি নম্বরকে কোঠাবদ্ধভাবে প্রকাশ করা যাক। কোঠার ব্যাপ্তি কত ধরব? কতগুলি কোঠা হবে? সব চেয়ে বেশী নম্বর হচ্ছে ৬৯, আর সব চেয়ে কম নম্বর হচ্ছে ৪২। ৬৯ − ৪২ = ২৭। ৪২ থেকে ৬৯ পর্যন্ত ২৭ + ১ = ২৮টি মোট সংখ্যা আছে। ৫ যদি ঘরের ব্যাপ্তি ধরা যায়—তবে আমাদের গরিষ্ঠ থেকে লঘিষ্ঠ পর্যন্ত ৩০ ব্যাপ্তি দরকার। ৪২'র স্থলে ৪১ এবং ৬৯'র স্থলে ৭০ পর্যন্ত নিলেই ৩০টি সংখ্যা আমরা পাব। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা মাত্র ১০ জন হওয়ায় আমরা ৬টি ঘরের বেশী নিলাম না।

শ্রেণীবদ্ধ নম্বরগুলির সমক কিভাবে নির্ধারণ করতে হয়—পরের পৃষ্ঠায় তা দেওয়া হল ঃ

* ইংরেজিতে Midpoint.

কোঠাবদ্ধ নম্বর	মধ্যবিন্দু (X)	নম্বরের পৌনঃপুনিকতা (f)	fX
৬৬—৭০	৬৮	১	৬৮
৬১—৬৫	৬৩	২	১২৬
৫৬—৬০	৫৮	৩	১৭৪
৫১—৫৫	৫৩	২	১০৬
৪৬—৫০	৪৮	১	৪৮
৪১—৪৫	৪৩	১	৪৩
		১০ (ছাত্র সংখ্যা)	৫৬৫ (নম্বরের সমষ্টি)

$$\text{সমক} = \frac{\text{মধ্যবিন্দু ও নম্বরের পৌনঃপুনিকতার গুণফলের সমষ্টি}}{\text{ছাত্র সংখ্যা}}$$

$$= \frac{৫৬৫}{১০} = ৫৬\cdot৫$$

সাঙ্কেতিকে ঃ

$$M = \frac{\Sigma fX}{N}$$

M অর্থ সমক, f Frequency অথবা নম্বরের পৌনঃপুনিকতা এবং X প্রত্যেকটি সারির মধ্যবিন্দু।

সাধারণ পদ্ধতিতে কোঠাবদ্ধ নম্বগুরলির সমক নির্ণয়

৬৬—৭০'র মধ্যে একটি নম্বর আছে। ঐ কোঠার মধ্যবিন্দু হচ্ছে ৬৮। অতএব ধরা যেতে পারে ঐ কোঠার মোট নম্বর হচ্ছে ৬৮ × ১ = ৬৮। ৬১ – ৬৫'র ঘরে আছে ২টি নম্বর এবং ঐ ঘরের মধ্যবিন্দু—৬৩। সুতরাং ঐ ঘরের নম্বরের পরিমাণ ধরা গেল—৬৩ × ২ = ১২৬। বিভিন্ন ঘরে যত নম্বর পাওয়া গেল—সেগুলিকে যোগ করে ছাত্র-সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সমক পাওয়া যাবে।

$$\text{সমক} = \frac{৫৬৫}{১০} = ৫৬\cdot৫$$

কোঠাবদ্ধ নম্বরগুলির বেলাতে মধ্যক নির্ণয়ের পদ্ধতি কিছুটা অন্যরকম। পরের পৃষ্ঠায় তা দেওয়া হল।

$$\text{মধ্যক} = \text{ন্যূ} + \left(\frac{\frac{\text{মোট সংখ্যা}}{২} - \text{ন্যূর নীচের নম্বরগুলির মোট সংখ্যা}}{\text{প্রাসঙ্গিক কোঠায় নম্বরের পৌনঃপুনিকতা}} \right) \text{কোঠার ব্যাপ্তি}$$

ন্যূ—যে কোঠায় মধ্যক পাওয়া যাবে সে কোঠার ন্যূনতম নম্বর।

প্রাসঙ্গিক কোঠায় নম্বরের পৌনঃপুনিকতা—যে কোঠায় মধ্যক পাওয়া যাবে সে কোঠার নম্বরের পৌনঃপুনিকতা অর্থাৎ যে কয়টি নম্বর আছে তার সংখ্যা।

মোট নম্বরের সংখ্যা—১০। সুতরাং পঞ্চম ও ষষ্ঠের মধ্যবর্তী সংখ্যাটি মধ্যক হবে। উপরের থেকে হিসেব করলে ৫৬—৬০'র কোঠায় মধ্যক হবে। কারণ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ নম্বর পর্যন্ত ঐ ঘরে রয়েছে। ঐ ঘরের ন্যূনতম সংখ্যা ৫৬ মনে করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে অসুবিধা এই যে ৫৫ ও ৫৬ এই নম্বর দুটির মাঝখানে একটি ব্যবধান থেকে যায়। নম্বর দুটির মাঝে যেন আর কিছুই নেই। কিন্তু নম্বর দুটির মধ্যে একটি ক্রমিকতা আছে ভাবাটাই ঠিক হবে। এজন্য মোটামুটি উপরের অর্ধেকটা ৫৬—৬০ এর কোঠায়, নীচের অর্ধেকটা ৫১—৫৫এর কোঠায় আছে ধরে নেওয়া হয়। ফলে ৫৬—৬০'এর ন্যূনতম নম্বর ধরা হয় ৫৫.৫কে।

$$\text{তাহলে মধ্যক} = ৫৫.৫ + \left(\frac{\frac{১০}{২} - ৪}{৩} \right) ৫$$

$$= ৫৭.১৭$$

কোঠাবদ্ধ নম্বর থেকে সমক ব্যত্যয় ও প্রমাণ ব্যত্যয় নির্ণয়

ক কোঠাবদ্ধ নম্বর সমূহ	খ মধ্যবিন্দু	গ (কোঠার নম্বরের) পৌনঃপুনিকতা	ঘ (সমক এবং মধ্যবিন্দুর ব্যত্যয়)	গ × ঘ পৌনঃপুনিকতা × ব্যত্যয়	গ × (ঘ)² পৌনঃপুনিকতা × বর্গ ব্যত্যয়
৬৬—৭০	৬৮	১	+১১.৫	+১১.৫	১৩২.২৫
৬১—৬৫	৬৩	২	+ ৬.৫	+১৩.০	৮৪.৫০
৫৬—৬০	৫৮	৩	+ ১.৫	+ ৪.৫	৬.৭৫
৫১—৫৫	৫৩	২	— ৩.৫	— ৭.০	২৪.৫০
৪৬—৫০	৪৮	১	— ৮.৫	— ৮.৫	৭২.২৫
৪১—৪৫	৪৩	১	—১৩.৫	—১৩.৫	১৮২.২৫
		১০		৫৮.০	৫০২.৫০

সমক = ৫৬·৫

$$\text{সমক ব্যত্যয়} = \frac{\text{পৌনঃপুনিকতা ও ব্যত্যয়ের গুণফলের সমষ্টি}}{\text{মোট নম্বরের সংখ্যা}}$$

$$= \frac{৫৮}{১০} = ৫·৮$$

$$\text{প্রমাণ ব্যত্যয়} = \sqrt{\frac{\text{পৌনঃপুনিকতা ও বর্গ ব্যত্যয়ের গুণফলের সমষ্টি}}{\text{মোট নম্বরের সংখ্যা}}}$$

$$= \sqrt{\frac{৫০২·৫০}{১০}} = \sqrt{৫০·২৫}$$

= ৭·০৯ (আনুমানিক)

কোঠাবদ্ধ নম্বরের সমক ও প্রমাণ ব্যত্যয় নির্ণয় করবার একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আছে। নীচে তা উল্লেখ করা হল।

সারণী

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ
কোঠাবদ্ধ নম্বর সমূহ	মধ্যবিন্দু X	পৌনঃপুনিকতা f	আনুমানিক সমকের ঘর থেকে বিভিন্ন ঘরের কম-বেশী কত ঘর দূরত্ব x'	fx'	fx'²
৬৬—৭০	৬৮	১	২	২	৪
৬১—৬৫	৬৩	২	১	২	২
৫৬—৬০	৫৮	৩	০	+৪	
৫১—৫৫	৫৩	২	—১	—২	২
৪৬—৫০	৪৮	১	—২	—২	৪
৪১—৪৫	৪৩	১	—৩	—৩	৯
			−৩	−৭	২১

আনুমানিক সমক = ৫৮

সংশোধন = $-\frac{৩}{১০}$ = −·৩ [বর্গ সংশোধন অথবা $C^2 = \frac{৯}{১০০}$]

কোঠার ব্যাপ্তি = ৫

সংশোধন × কোঠার ব্যাপ্তি = −১·৫

সমক = আনুমানিক সমক + সংশোধন × কোঠার ব্যাপ্তি

= ৫৮ − ১·৫ = ৫৬·৫

সাঙ্কেতিকে

$M = AM + Ci$

[M অর্থ সমক, AM আনুমানিক সমক, C-correction অথবা সংশোধন, i কোঠার ব্যাপ্তি]

পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা

প্রথমে কোন একটি নম্বরকে সমক বলে অনুমান করে নিতে হবে। সমক অনুমান করবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সারির মাঝামাঝি কোন নম্বর অথবা যে ঘরে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নম্বর রয়েছে—তারই মধ্যবিন্দুকে 'আনুমানিক সমক' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ৫৮ কে আনুমানিক সমক ধরা হল। এই ঘরটিতে সারির মাঝের নম্বরটি আছে। তদুপরি ঐ ঘরে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নম্বর রয়েছে।

এর পরে আনুমানিক সমকের ঘর থেকে বিভিন্ন ঘর কত কম বা কত বেশী ঘর দূরে—সারণী'র ঘ কলমে তা সন্নিবেশ করা হল। আনুমানিক সমকের ঘরটিকে o বলে ধরলে ৬১—৬৫'র ঘরের ব্যবধান হচ্ছে +১, ৬৬—৭০'র ঘরের ব্যবধান হচ্ছে +২। নীচের ঘরগুলি কম নম্বরসমূহের ঘর। সেজন্য ৫১—৫৫ ঘরের ব্যবধান −১, ৪৬—৫০ ঘরের ব্যবধান −২ এবং ৪১—৪৫ ঘরের ব্যবধান −৩। ঘ কলমে ঐ ব্যবধানগুলি লেখা হল। ঐ ব্যবধানকে আমরা সাঙ্কেতিকে x^1 বলব।

ঙ কলমে আনুমানিক সমক থেকে ঘরের ব্যবধানকে (x') নম্বরের পৌনঃপুনিকতা (f) দিয়ে গুণ করে গুণফলগুলি লেখা হল। পজিটিভ ও নেগেটিভ গুণফলগুলি আলাদা আলাদা যোগ করে দেখা গেল উপরের দিকে হচ্ছে +৪ ও নীচের দিকে −৭।

যেহেতু আনুমানিক সমকের নীচের দিকের (অর্থাৎ কম) নম্বরগুলিই বেশী —প্রকৃত সমক আনুমানিক সমক থেকে কিছু কম হবে। পজিটিভ ব্যবধান ৪ ও নেগেটিভ ব্যবধান ৭। অতএব পজিটিভ ব্যবধান থেকে নেগেটিভ ব্যবধান ৩ বেশী। এই −৩ কে মোট নম্বরের সংখ্যা অর্থাৎ ১০ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায়– তাকে বলা হয় 'সংশোধন'। প্রকৃত সমক বার করতে হলে আনুমানিক সমকের ঐ সংশোধন আবশ্যক। কিন্তু $-\frac{৩}{১০} = -\cdot৩$ হচ্ছে ঘর হিসাবে সংশোধন। অর্থাৎ, প্রকৃত সমক আনুমানিক সমক থেকে −·৩ ঘর নীচে হবে। ঘরের ব্যবধানকে নম্বরের ব্যবধানে পরিণত করতে হলে দেখা দরকার একটি ঘরের ব্যাপ্তি কতখানি। প্রত্যেকটি ঘরের ব্যাপ্তি হচ্ছে ৫। −·৩ কে ৫ দিয়ে গুণ করলে হয় −১·৫। −১·৫ হচ্ছে আনুমানিক সমকের নম্বর হিসাবে সংশোধন। আনুমানিক সমক ৫৮'র সঙ্গে −১·৫ যোগ করলে হয় ৫৬·৫।

এই ৫৬·৫ হচ্ছে প্রকৃত সমক।

σ বা প্রমাণ ব্যত্যয় নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

সূত্র $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - c^2} \times i$

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যত্যয় নির্ণয়ে আনুমানিক সমকের ঘর থেকে বিভিন্ন ঘরের ব্যবধান (x') বার করে সেই ঘরের বর্গফল (x'^2) বার করতে হবে। সেই প্রত্যেকটি বর্গফলকে সে ঘরের পৌনঃপুনিকতা (f) দিয়ে গুণ করে যে ফল পাওয়া যাবে সেগুলির সমষ্টি করতে হবে। সে সমষ্টিকে সাঙ্কেতিকে বলা হয়েছে $\Sigma fx'^2$। মোট নম্বরের সংখ্যা দিয়ে তাকে ভাগ করতে হয়। ভাগফল থেকে বর্গ-সংশোধন (c^2) বাদ দিতে হয়। সেই ফলটির বর্গমূল বার করে—তাকে কোঠার ব্যাপ্তি দিয়ে গুণ করলে প্রমাণ ব্যত্যয় বার হবে।

(৪১৬ পৃষ্ঠায় সারণী দেখুন)

$\Sigma fx'^2 = ২১$, $N = ১০$, $c^2 = \frac{৯}{১০০}$ এবং $i = ৫$

$$\sigma = \sqrt{\frac{২১}{১০} - \frac{৯}{১০০}} \times ৫$$

$$= \sqrt{\frac{২০১}{১০০}} \times ৫$$

$$= ১\cdot৪১৭ \times ৫$$

$$= ৭\cdot০৮৫$$

অথবা ৭·০৯ (আনুমানিক)

দৈহিক ও মানসিক অনেক গুণাবলী প্রাকৃতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত হয় একথা ১৩ অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি। প্রাকৃতিক বিন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নীচে আবার উল্লেখ করা হল।

প্রাকৃতিক বিন্যাস ও প্রমাণ ব্যত্যয়ের সম্বন্ধ

(ক) কোন একটি বিষয়ের নম্বরসমূহের প্রাকৃতিক বিন্যাসের সঙ্গে সেই নম্বরসমূহের গড় ও প্রমাণ ব্যত্যয়ের নিত্য সম্বন্ধ আছে। প্রাকৃতিক বিন্যাসে নম্বরসমূহের সমক, মধ্যক ও শীর্ষস্কোর একই নম্বর হয়।

(খ) গড় নম্বরের পৌনঃপুনিকতা সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ, কোন বিষয়ে গড় নম্বর যারা পেয়েছে—তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এদের আমরা সাধারণ বা মাঝারি সামর্থ্যের লোক বলি। মাঝারি ধরনের লোকদের সংখ্যাই সর্বাধিক।

(গ) গড় থেকে যতদূর যাওয়া যায়—অর্থাৎ, গড় থেকে ব্যত্যয়ের পরিমাণ যত বেশী বা কম হয়—ততই নম্বরের পৌনঃপুনিকতা হ্রাস পায়। বিষয়টিতে খুব ভালো বা খুব মন্দ এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

গড় থেকে ±৩ প্রমাণ ব্যত্যয়ের মধ্যে মোট নম্বরগুলির ৯৯·৭% সংখ্যা পাওয়া যায়। গড় থেকে +৩ প্রমাণ ব্যত্যয়ের মধ্যে আছে ৪৯·৮৬% এবং গড় থেকে −৩ প্রমাণ ব্যত্যয়ের মধ্যে বাকি ৪৯·৮৬%। নম্বরগুলির পৌনঃপুনিকতা গড় থেকে বেশীর দিকে এবং কমের দিকে সমভাবে হ্রাস পায়। গড় থেকে ±১ প্রমাণ ব্যত্যয়ের মধ্যেই নম্বরগুলির ভীড় সবচেয়ে বেশী। ৬৮% নম্বর ঐ স্কোরগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।

প্রাকৃতিক বিন্যাসে গড় থেকে বিভিন্ন পরিমাণ প্রমাণ ব্যত্যয়ের মধ্যে শতকরা কতজন বা কতগুলি নম্বর থাকে—নীচে তা উল্লেখ করা হল :

গড়	থেকে	±	·৫	প্রনাণ	ব্যত্যয়	—৩৮·৩০%
”	”	±	১·০	”	”	—৬৮·২৬%
”	”	±	১·৫	”	”	—-৮৬·৬৪%
”	”	±	২·০	”	”	—৯৫·৪৪%
”	”	±	২·৫	”	”	—৯৮·৭৬%
”	”	±	৩·০	”	”	—৯৯·৭২%

প্রচলিত পরীক্ষার ফলাফল সব সময়ে কিন্তু প্রাকৃতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত হয় না। সময় সময় দেখা যায় নীচের দিকেই ভীড় সবচেয়ে বেশী। মাঝামাঝি নম্বর যারা পেয়েছে তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বেশী নম্বর খুবই কম। এ সব ক্ষেত্রে লেখে-র গভীরতাটা মাঝামাঝি না হয়ে এক পাশে (সাধারণতঃ বাঁদিকে—যে অংশ দিয়ে কম নম্বরগুলির পৌনঃপুনিকতা সূচিত হয়) বেশী হয়। এই জাতীয় লেখ-কে প্রাকৃতিক না বলে 'স্কুড' (Skewed) বলা হয়।

এ ধরনের বিন্যাসের প্রধানতঃ দুটি কারণ হতে পারে। এক বলা যেতে পারে, প্রশ্নপত্রটি ছাত্রদের উপযোগী নয়। যদু, মধু, শ্যাম যাদের সবাইকে আমরা গাদা করে—কম নম্বর পাওয়ার দলে ফেলেছি। তাদের মধ্যে পার্থক্য করবার জন্য যে সূক্ষ্ম মাপক দরকার সেটা আমাদের প্রশ্নাবলীতে নেই। প্রশ্ন-পত্রের সব কিম্বা অধিকাংশ প্রশ্ন অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর সাধ্যাতীত। ফলে বেশীর ভাগ পড়ে গেল 'না পারার' দলে। তাদের সামর্থ্যের সঠিক ও সূক্ষ্ম পরিমাপ হল না। একটি ভৌতিক উপমার সাহায্যে ব্যাপারটিকে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক—১০০টি বয়স্ক লোকের দৈর্ঘ্য আমরা মাপব। মাপের জন্য যে ফিতাটি সংগ্রহ করা গেল তার ৬৮" পর্যন্ত দাগগুলি সব মুছে গেছে। ফলে ৬৮"র নীচে যাদের উচ্চতা তাদের আমরা শুধু বললাম—৬৮"র নীচে। তারপর থেকে আমাদের সঠিক মাপ আরম্ভ হল। সংক্ষেপে, ৬৮" নীচে যাদের উচ্চতা তাদের আর মাপাই হল না। এ জাতীয় মাপ কিম্বা পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের উপযোগী নয়। সেইজন্য বিন্যাসটি প্রাকৃতিক হল না।

পরীক্ষাটি খুব সহজ হলে বেশী-নম্বর-পাওয়াদের সংখ্যাই হবে সব চেয়ে বেশী। মাঝারি কয়েকজন। অল্প নম্বর পেয়েছে—এমন প্রায় থাকেই না। সময় সময় নীচের ক্লাশের অঙ্ক পরীক্ষায় এ জাতীয় ফল দেখা যায়। এই ধরনের নম্বরকে লেখে-র সাহায্যে প্রকাশ করলে—লেখে-র গভীরতা ডানদিকে সবচেয়ে বেশী হয়, বাঁদিকে সবচেয়ে কম। কেবলমাত্র পড়াশোনার খুব ভালো (কিম্বা খুব অল্প সামর্থ্য যাদের) ছাত্রদের যদি পরীক্ষা করা হয়—তবে পরীক্ষার ফল অমন 'স্কুড' হয়।

বুদ্ধি ও বিদ্যা পরীক্ষার নম্বরগুলির বিন্যাসটি প্রাকৃতিক বিন্যাস হওয়া উচিত —এই কথা মনে রেখে আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিদেরা তাদের পরীক্ষাপত্র রচনা করেন। নম্বরগুলি সাজিয়ে প্রাথমিক বিন্যাস পাওয়া গেলে পরীক্ষা-

পত্রটি পরীক্ষার্থীদলের উপযোগী হয়েছে—একথা সাধারণতঃ মনে করা যায়।

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার নম্বরকে প্রাথমিক স্কোর বলা যেতে পারে। প্রাথমিক স্কোরগুলিকে প্রমাণ স্কোরে রূপান্তরিত করেই তাদের সঠিক তাৎপর্য বোঝা যায় একথা আমরা ১৩ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এ রূপান্তরণে গড়-কে প্রাথমিক স্কোর থেকে প্রথম বাদ দিতে হয়। সেই ব্যবধানকে প্রমাণ ব্যত্যয় দিয়ে ভাগ করে প্রমাণ স্কোর নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ, প্রমাণ ব্যত্যয়কে একক করে—তারই অনুপাতে আমরা প্রমাণ স্কোরের পরিমাণ নির্ণয় করি। প্রমাণ স্কোরকে অনেক সময় Z স্কোরও বলা হয়। সূত্রটি হবে এই ঃ

প্রমাণ স্কোর

$$\text{প্রমাণ স্কোর অথবা Z স্কোর} = \frac{(\text{প্রাথমিক স্কোর}) - (\text{সমক})}{\text{প্রমাণ ব্যত্যয়}}$$

প্রমাণ স্কোরের মান বা এককটি সবসময়েই সমান করা হয়। অর্থাৎ ৩ থেকে ২ প্রমাণ স্কোরের পার্থক্য যতখানি, ২ থেকে ১ প্রমাণ স্কোরের পার্থক্য ঠিক ততখানি। সঠিক পরিমাপে এককটি সমান হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোন কিছুর দৈর্ঘ্য মাপতে আমরা ফুট, ইঞ্চির সাহায্য নিই। ইঞ্চি বা ফুটের পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই এক—এটা আমরা মনে করি। নইলে মাপের অর্থ থাকে না। মনের শক্তি, সামর্থ্য পরিমাপে একক হচ্ছে প্রমাণ ব্যত্যয় বা প্রমাণ স্কোর—যার মানটি মাপকের বিভিন্ন অংশে সমান।

প্রমাণ স্কোর প্রকাশের আরেকটি পদ্ধতি

ধরা যাক, যদু সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। সে বাংলায় পেয়েছে ৩৫। শ্রেণীর গড় স্কোর ও প্রমাণ ব্যত্যয় যথাক্রমে ৪০ ও ৫। যদুর প্রাথমিক স্কোরটিকে প্রমাণ স্কোরে রূপান্তরিত করলে কত হবে?

$$\text{প্রমাণ স্কোর} = \frac{৩৫—৪০}{৫} = —১$$

অতএব দেখা যাচ্ছে প্রমাণ স্কোর পজিটিভ কিম্বা নেগেটিভ দুইই হতে পারে।

* পরীক্ষা অধ্যায় দ্রষ্টব্য

ঠিক সমকের সমান যার প্রাথমিক নম্বর—তার প্রমাণ স্কোর হবে ০। প্রাকৃতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত হলে±৩'র মধ্যে অধিকাংশ স্কোরগুলি পাওয়া যায়। সুবিধার জন্য বিস্তারটিকে +৫ থেকে—৫ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। প্রমাণ স্কোরের সবগুলিকেই পজিটিভরূপে প্রকাশ করবার জন্যে অনেক সময় ঐ স্কোরগুলির সঙ্গে ৫ যোগ করা হয়। ফলে সমক শূন্য না হয়ে হয় ৫। ০ থেকে ১০ পর্যন্ত থাকে প্রমাণ স্কোরগুলির ব্যাপ্তি। এই প্রমাণ স্কোরগুলিকে আবার ১০ দিয়ে গুণ করলে—০ থেকে ১০০ অবধি নম্বরের একটি সারি পাওয়া যায়। এই সারির সমক হয় ৫০ এবং প্রমাণ ব্যত্যয় হয় ১০।

প্রমাণ স্কোরকে এইভাবে প্রকাশ করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। স্কুলের পরীক্ষাতে ০ থেকে ১০০ পর্যন্ত নম্বরের দেবার রীতি থাকার ফলে ঐ ধরনের নম্বর সহজেই আমরা চিনতে ও বুঝতে পারি। বিশেষ বলবার কথা এই যে এইভাবে ৫ যোগ ও ১০ দিয়ে গুণ করায় প্রমাণ স্কোরের স্বরূপটি কোনরকম বদলায় না। এ ধরণের প্রমাণ স্কোরের সারিকেই অনেক সময় Z স্কোর বলা হয়।

প্রাথমিক স্কোরগুলি T স্কোরে পরিবর্তিত করে প্রকাশ করবার একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি ম্যাকল্ (১) উদ্ভাবন করেন। সব সময়ে পরীক্ষার ফলের বিন্যাসটি প্রাকৃতিক বিন্যাস হয় না। নম্বরগুলিকে প্রাকৃতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত করে নিয়ে, প্রমাণ স্কোরগুলিকে ১০ দিয়ে গুণ করে মোটামুটি প্রকাশ করে T স্কোর বার করা হয়। T নম্বরের মান প্রায় প্রমাণ স্কোরের সমান। নির্ধারণের পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য আছে।

প্রাথমিক নম্বরের তাৎপর্য বোঝবার জন্য তাকে পার্সেণ্টাইল বা সেণ্টাইলে পরিবর্তনের কথা আমরা পূর্বে বলেছি। মধ্যক হচ্ছে ৫০ পার্সেণ্টাইল। মধ্যক নির্ণয়ের পদ্ধতিতে পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করিতে হয়। কোঠাবদ্ধ নম্বরগুলির বেলাতে—পার্সেণ্টাইল নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচে উল্লেখ করা হল।

সেণ্টাইল বা পার্সেণ্টাইল

ধরা যাক আমরা একটি কোঠাবদ্ধ নম্বরের সারির ৮০ সেণ্টাইল বা পার্সেণ্টাইল নম্বরটি বার করতে চাই। অর্থাৎ, যে নম্বরটির নীচে শ্রেণী ছাত্রদের ৮০% নম্বর রয়েছে—সে নম্বরটি কত আমাদের নির্ধারণ করতে হবে।

$$\text{পার্সেণ্টাইল}_{৮০} = \text{ন্যূ} + \left(\frac{\frac{\text{ঐ পার্সেণ্টাইলের হিসাবে}}{\text{মোট নম্বরের সংখ্যা}} - \frac{\text{ন্যূর নীচের নম্বরের}}{\text{মোট সংখ্যা}}}{\text{কোঠায় নম্বরের পৌনঃপুনিকতা}} \right) \text{কোঠার ব্যাপ্তি}$$

ন্যূ—যে কোঠায় প্রাসঙ্গিক পার্সেণ্টাইল পাওয়া যাবে সে কোঠার ন্যূনতম নম্বর।

কোঠায় নম্বরের পৌনঃপুনিকতা—যে কোঠায় প্রাসঙ্গিক পার্সেণ্টাইল পাওয়া যাবে সে কোঠায় নম্বরের পৌনঃপুনিকতা।

ঐ পার্সেণ্টাইলের হিসাবে মোট নম্বরের সংখ্যা = ১০'র ৮০% = ৮।

আবার পূর্বেকার ১০টি নম্বর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উল্লেখ করা যাক। কেমন করে পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করতে হয়—ঐ নম্বরের সাহায্যে আমরা দেখব।

কোঠাবদ্ধ নম্বর	(কোঠায়) মধ্যবিন্দু	নম্বরের পৌনঃপুনিকতা	কোঠা পর্যন্ত মোট নম্বরের পৌনঃপুনিকতা
৬৬—৭০	৬৮	১	১০
৬১—৬৫	৬৩	২	৯
৫৬—৬০	৫৮	৩	৭
৫১—৫৫	৫৩	২	৪
৪৬—৫০	৪৮	১	২
৪১—৪৫	৪৩	১	১
		১০	

মোট নম্বরের সংখ্যা = ১০

সুতরাং ১০এর ৮০% = ৮ অর্থাৎ, সেণ্টাইলের নীচে থাকবে মাত্র ৮টি নম্বর। অতএব ৬১ – ৬৫'র ঘরে ঐ নম্বরটি পাওয়া যাবে।

$$\text{পা}_{৮০} = ৬০\cdot৫ + \left(\frac{৮-৭}{২}\right) \times ৫$$

$$= ৬০\cdot৫ + ২\cdot৫$$

$$= ৬৩$$

অর্থাৎ ৬৩ হচ্ছে সেই নম্বর—যার নীচে ৮০% ছেলেদের নম্বর রয়েছে।

এবার ৬০ সেণ্টাইল বার করবার চেষ্টা করা যাক।

পা ৬০ এর নীচে ৬টি নম্বর থাকবে।

পা ৬০ $= ৫৫\cdot৫ + \left(\frac{৬-৪}{৩}\right) \times ৫$

$= ৫৫\cdot৫ + ৩\ ৩$

$= ৫৮\cdot৮$

সেণ্টাইল বা পার্সেণ্টাইল স্কোর নির্ণয় করবার পদ্ধতিটি জানা গেল। কিন্তু সাধারণতঃ যে প্রশ্নটির উত্তর দিতে হয়—সেটি অন্য রকমের। রাম পরীক্ষায় ৫৩ পেয়েছে। ঐ নম্বরটির পার্সেণ্টাইল মান, মূল্য বা মর্যাদা কত?

প্রথমতঃ দেখা দরকার ৫৩ নম্বরটির কোন ঘরে হবে? ৫১ – ৫৫'র ঘরে। ঐ ঐ ঘরটির ন্যূনতম নম্বর হচ্ছে—৫০·৫। ঘরটির ব্যাপ্তি ৫। ঐ ঘরে দুজনের নম্বর (পৌনঃপুনিকতা) আছে। অর্থাৎ ঘরের ৫টি অংশে দুজনের নম্বর ছড়িয়ে আছে। অতএব ঐ প্রত্যেকটি অংশের প্রকৃত রাশিগত মূল্য $\frac{২}{৫} = \cdot৪$। অন্য কথায় ঘরটির মাপকের একক হচ্ছে ·৪। রাম পেয়েছে ৫৩। ঘরের ন্যূনতম নম্বর হচ্ছে ৫০·৫। রাম ন্যূনতম নম্বর থেকে ২·৫ বেশী পেয়েছে। ঘরের একক হচ্ছে ·৪। ঐ এককের মাপে ২·৫'র অর্থ হচ্ছে ২·৫ × ·৪ = ১·০০। ন্যূনতম নম্বর থেকে এককের মাপে রামের নম্বরের দূরত্ব হচ্ছে ১·০০। যে ঘরে রামের নম্বর—তার নীচে রয়েছে আরও দুটি নম্বর। সুতরাং রামের নম্বরের নীচে আছে ২ + ১ = ৩টি নম্বর। ১০টি নম্বরের মধ্যে ৩টি নম্বর অর্থাৎ ৩০% নম্বর। অর্থাৎ, রামের ৫৩ নম্বরের সেণ্টাইল মান বা মর্যাদা হচ্ছে ৩০ অর্থাৎ, ৩০% ছেলের নম্বর রামের নম্বরের নীচে।

সেণ্টাইল মানটি মাপকের সব অংশে সমান নয়। ৫০ ও ৫৫ সেণ্টাইলের মধ্যে ব্যবধান খুব কম। এখানে নম্বরের (অর্থাৎ নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের) ভীড় বেশী। ৮০ ও ৮৫'র ব্যবধান অপেক্ষাকৃত বেশী। পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেওয়ার সময় মাঝামাঝি জায়গাতে ৫ নম্বর কম বা ৫ নম্বর বেশী দিতে পরীক্ষকদের বেশী ভাবতে হয় না। কিন্তু ৮০ ও ৮৫'র মধ্যে পারদর্শিতার সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকবে—এমন দাবী করা হয়।

একটি শ্রেণীতে ১০টি ছেলে পড়ে। তাদের বাঙলা এবং ভূগোল পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে দেখা গেল রামের বাংলা ফল যতটা ভাল, ভূগোলের ফলও ঠিক ততটা ভালো। শ্যামের বেলাতেও ঐ কথা সত্য।

এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছেলের বেলাতে ঐ উক্তি সত্য। কে কতখানি ভালো এটা দুই ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এক, পরীক্ষায় কে কোন স্থান অধিকার করেছে। দুই, কার প্রমাণ নম্বর কত? পরের পন্থাটি দ্বারা ভালো মন্দ সঠিকরূপে নির্ণয় করা যায় সেটা বোঝা কঠিন নয়। পরীক্ষায় কে কোন স্থান অধিকার করেছে বা কার কোন ক্রম—এই দিয়েই তাদের ভালোমন্দ প্রথমে আমরা বিচার করব। শ্যাম বাঙলায় প্রথম, ভূগোলেও সে প্রথম; ঐ দুটি বিষয়ে রামের ক্রম হচ্ছে দ্বিতীয়। বাঙলায় যে ছেলের যে স্থান, ভূগোলেও ঠিক তার সেই স্থান।

পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক

দুটি বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের সম্বন্ধকে পরিসংখ্যানের ভাষার পারম্পর্য* বলা হয়। ছেলেদের উল্লিখিত ভূগোল ও বাংলা পরীক্ষার ফলাফলের পারম্পর্যটি পরিপূর্ণ ও পজিটিভ। পারম্পর্যের পরিমাণ সঠিক রূপে নির্ণয় করার জন্য গাণিতিক সূত্র আছে। আমরা পরে তা উল্লেখ করছি। এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে পরিপূর্ণ ও পজিটিভ পারম্পর্যের মান হচ্ছে +১। এই মানকে আমরা ঐক্যাঙ্ক** বলব। দুটি বিষয়ের মধ্যে, সঠিকরূপে বলতে গেলে, সাফল্যের বা সামর্থ্যের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য থাকলে পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা +১।

পরীক্ষার ফলাফল এমন হতে পারত যে বাঙলায় যে ভালো, ভূগোলে সে ঠিক অনুরূপ ভাবে খারাপ। বাঙলায় যে প্রথম ভূগোলে সে সর্বনিম্ন, বাঙলায় যে দ্বিতীয় ভূগোলে তার স্থান সর্বনিম্নের ঠিক একধাপ উপরে ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে পারম্পর্য পরিপূর্ণ, কিন্তু নেগেটিভ। ঐ পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ককে –১ বলে ধরা হয়।

উপরোক্ত পারম্পর্য দ্বারা বিষয় দুটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হয়। সে সম্বন্ধ বৈপরীত্যেরই হোক আর মিলেরই হোক। দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ বা পারম্পর্য নেই—কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে বাঙলায় পরীক্ষার ফল থেকে একজনের দেহের শক্তি কি হতে পারে অনুমান করা যায় না। সে ক্ষেত্রে বাঙলা ও দেহের শক্তির পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ =০ বলা হয়।

পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক +১ থেকে –১'র মধ্যে যে কোন পরিমাণ হতে পারে।

* পারম্পর্যকে ইংরেজিতে বলা হয় Correlation

** ঐক্যাঙ্ককে ইংরেজিতে বলা হয় Coefficient

দেখা গেছে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও সামর্থ্যের পরস্পরের মধ্যে সাধারণতঃ ঐক্যাঙ্কটি পজিটিভ। কোন দুটি বিষয়ের সাফল্যের মধ্যে হয়ত ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ বেশী; আবার অন্য কোন দুটি বিষয়ের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক হয়ত কম।

২১৮ পৃষ্ঠায় সারণী থেকে দেখা যায়—রচনা ও বুদ্ধির পারম্পর্যের পরিমাণ বেশী; ড্রয়িং ও বুদ্ধির পারম্পর্যের পরিমাণ কম।

নীচের কয়েকটি পারম্পর্য বা সঠিকরূপে বলতে গেলে ঐগুলির ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ উল্লেখ করা হল। (২)

মানুষের উচ্চতা ও ওজন	·৫৯	ইংরেজি ও গণিত	·৪৯
শব্দার্থ ও পংক্তির অর্থ	·৮০	ইংরেজি ও ড্রইং	·২৫
বীজগণিত ও জ্যামিতি	·৬৫	গণিত ও পদার্থবিদ্যা	·৭৮
ইংরেজি ও ইতিহাস	·৬৮	গণিত ও ইতিহাস	·৪৪
ইংরেজি ও পদার্থ বিদ্যা	·৪৮	গণিত ও ড্রইং	·৪৮

পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি

ক্রম পারম্পর্য

সপ্তম শ্রেণীর ১০টি মেয়ের ইতিহাস ও ভূগোল পরীক্ষার ফল নীচে সন্নিবিষ্ট হল:

ছাত্র	(১) ইতিহাসের নম্বর	(২) ভূগোলের নম্বর	(৩) ইতিহাসে ক্রম	(৪) ভূগোলে ক্রম	(৫) ক্রমের মধ্যে পার্থক্য	(৬) পার্থক্যের বর্গ
ক	৭১	৫৯	১	৩	২	৪
খ	৪১	৫০	৯	৭	২	৪
গ	৪৩	৫৬	৮	৪	৪	১৬
ঘ	৩৬	৩৭	১০	১০	০	০
ঙ	৫০	৪৮	৭	৮	১	১
চ	৫৬	৫১	৪	৬	২	৪
ছ	৫৩	৫৩	৬	৫	১	১
জ	৫৪	৪০	৫	৯	৪	১৬
ঝ	৬২	৬৩	২	১	১	১
ঞ	৬১	৬০	৩	২	১	১
সংখ্যা = ১০						৪৮

$$\text{ক্রমপারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক } ১ - \frac{৬ \times \text{বর্গ পার্থক্য সমূহের সমষ্টি}}{\text{সংখ্যা (বর্গ সংখ্যা} - ১)}$$

$$= ১ - \frac{৬ \times ৪৮}{১০ \times ৯৯} = ১ - ·২৯ = ·৭১$$

ρ চিহ্ন নম্বর অনুসারে ক্রমের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ককে বোঝায়।

(১) ও (২) কলম ইতিহাস ও ভূগোলের নম্বরগুলি দেওয়া হয়েছে। (৩) ও (৪) নম্বর অনুযায়ী ছাত্রদের ক্রম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। (৫) কলমে ঐ ক্রমগুলির পার্থক্য ও (৬) কলমের সেই পার্থক্যের প্রত্যেকটির বর্গ করা হয়েছে। (৬) কলমের নীচে বর্গ পার্থক্যসমূহকে যোগ করা হয়েছে।

অতঃপর কেমন করে ক্রম পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রম পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্কের চিহ্ন হোল ρ। নম্বরের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্কের চিহ্ন r। ρ ও r'র পরিমাণে কিছু পার্থক্য থাকলেও তা সামান্য। বেশীর ভাগ সময়েই ঐ পার্থক্যকে উপেক্ষা করা হয়।

নম্বরের পারম্পর্য নির্ণয়

ইতিহাস ও ভূগোলের নম্বরগুলির কথা ধরা যাক। প্রত্যেকটি প্রাথমিক নম্বরের প্রমাণ স্কোর কি হবে—প্রথমে তাই নির্ণয় করতে হবে। এভাবে ক'র দুটি প্রমাণ স্কোর—একটি ইতিহাসের, অপরটি ভূগোলের, খ'র দুটি প্রমাণ স্কোর, গ'র দুটি অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রের দুটি করে প্রমাণ স্কোর পাওয়া যাবে। প্রত্যেকের প্রমাণ স্কোর ২টিকে গুণ করে, সে সব গুণফলগুলিকে যোগ করতে হবে। গুণফলের সমষ্টিকে ছাত্র সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে নম্বরের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক পাওয়া যায়। একে 'Product moment' ঐক্যাঙ্ক বা r বলা হয়।

প্রমাণ ভ্রমাঙ্ক বা প্রমাণ বিক্ষেপ

দুশো ছেলের বাঙলা ও অঙ্ক পরীক্ষার ফলাফলের একটি পারম্পর্য পাওয়া গেল। এক হাজার বয়স্ক বাঙ্গালী পুরুষকে মেপে তাদের উচ্চতার গড় নিরূপণ করা হল। প্রশ্ন হল ঐ ঐক্যাঙ্ক বা সমক—এসব একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে নিরূপিত হয়েছে। সমস্ত লোককে পরীক্ষা করলে যে ফল কিম্বা পরিমাপ পাওয়া যাবে—তার সঙ্গে যা আমরা পেয়েছি তার সম্ভাব্য পার্থক্য কি — প্রমাণ ভ্রমাঙ্ক নির্ণয়ের দ্বারা সেটা জানা যায়। ভ্রম শব্দটি অনেকে ব্যবহারের

পক্ষপাতী নন। কারণ এই সম্ভাব্য পার্থক্যকে ঠিক ভ্রম বলা যায় না। ভ্রমের পরিবর্তে বিক্ষেপ শব্দটি এঁরা ব্যবহার করতে চান।

ধরা যাক আমরা বাঙলা ভাষাভাষী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের গড় দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব। মোট সংখ্যা তাদের দেড় কোটিরও অধিক হবে। দেড় কোটি লোকের দৈর্ঘ্য মেপে—তার গড় নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আমরা ১০ জন নিয়ে একটি দল করে এমন ৫০টি দলের দৈর্ঘ্য মেপে প্রত্যেকটি দলের গড় নির্ণয় করলাম। ৫০টি গড় মাপ পাওয়া গেল। এই ৫০টি গড়কে সাজালে, দেখা যাবে সেগুলি প্রাকৃতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত। ঐ ৫০টি গড়ের যদি গড় নেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে গড়গুলি সাধারণতঃ প্রাপ্ত গড়ের (অর্থাৎ ৫০টি গড়ের গড়-এর) দু পাশে ভীড় করছে। এই ৫০টি গড়ের যে গড়—তাকে 'সত্য গড়' বা তার খুব কাছাকাছি একটি মাপ মনে করলে ভুল করা হবে না। দেড় কোটি লোককে মাপলে পরিমাপের যে গড় পাওয়া যেত তা প্রকৃত 'সত্য গড়' হতো বটে, কিন্তু দেখা যাবে—এই ৫০টির গড়ও 'সত্য গড়ের' অত্যন্ত কাছাকাছি। কতগুলি সত্য গড় থেকে কিছু বেশী, কতগুলি বা সত্য গড় থেকে কিছু কম। সত্য গড় থেকে এসব গড়ের পার্থক্য কতখানি অর্থাৎ বিক্ষেপের পরিমাণ কতখানি এটা নির্ণয় করবার একটি পদ্ধতি আছে। প্রমাণ ব্যত্যয়ের সাহায্যে বিক্ষেপের পরিমাণ নির্ণীত হয় বলে একে প্রমাণ বিক্ষেপ বলা হয়।

গড় বা সমকের প্রমাণ বিক্ষেপ

ধরা যাক N সংখ্যক ১০ বছরের ছেলেদের বুদ্ধি পরীক্ষার গড় M। প্রমাণ ব্যত্যয় হচ্ছে σ। ঐ ক্ষেত্রে গড়ের প্রমাণ বিক্ষেপের পরিমাণ $= \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$।

প্রাকৃতিক বিন্যাসে গড় থেকে $\pm$৩ σ মধ্যে সমস্ত নম্বরগুলি থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বলা যায় যে অনুরূপ আরও ১০ বছর ছেলেদের বুদ্ধি পরীক্ষা করে, তাদের গড় যদি নির্ণয় করা যায় তবে সব গড়গুলিই $M \pm \frac{৩\sigma}{\sqrt{N}}$ র মধ্যে পড়বে।

শতকরা ৯৫টি গড় কিসের মধ্যে পড়বে? $M \pm \frac{১.৯৬\ \sigma}{\sqrt{N}}$-র মধ্যে। অতএব এও বলা যায় শতকরা ৯৫ ভাগ সম্ভাবনা যে ১০ বছরের ছেলেদের সত্য গড়

$M \pm \frac{১\cdot৯৬\sigma}{\sqrt{N}}$'র মধ্যে পড়বে ; তেমনি শতকরা ·৯৯ ভাগ সম্ভাবনা যে প্রকৃত গড় $M \pm \frac{২\cdot৫৮\sigma}{\sqrt{N}}$ 'র মধ্যে পাওয়া যাবে।

এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। গড় ও প্রমাণ-ব্যত্যয় নির্ণয়ে ১০ বছরের ছেলেদের একটি প্রকৃত নমুনা পাওয়া দরকার। ছেলের সংখ্যা যত বেশী হবে, প্রমাণ বিক্ষেপের পরিমাণ তত কম হবে। আরেকটি প্রশ্ন। সত্য গড় খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে কতখানি ভুলের ঝুঁকি আমরা নিতে পারি? সত্য গড় নির্ণয়ে ১০০ বারের মধ্যে ৫ বার ভুল করতে যদি আমাদের আপত্তি না থাকে, তবে আমাদের নির্ণীত গড় $\pm \frac{১\cdot৯৬\sigma}{\sqrt{\text{ছাত্র সংখ্যা}}}$ তেই আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি। কিন্তু যদি আমরা আরও নিশ্চিত হতে চাই, শতকরা ১ বারের বেশী ভুলের ঝুঁকি না নিতে চাই, তবে আমাদের সত্য গড় খুঁজতে হবে নির্ণীত গড় $\pm \frac{২\cdot৫৮\sigma}{\sqrt{\text{ছাত্র সংখ্যা}}}$ সূত্রে।

ঐক্যাঙ্ক কি পরিমাণ বিশ্বাসযোগ্য—টেকনিক্যাল ভাষায়, তাৎপর্যপূর্ণ—সেটা বুঝতে হলে ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ এবং প্রমাণ বিক্ষেপের পরিমাণ দুইই জানা দরকার। প্রমাণ বিক্ষেপের পরিমাণ কম হলে ও ঐক্যাঙ্কের পরিমাণ বেশী হলে, ঐক্যাঙ্কটি বিশ্বাসযোগ্য, দৈবাৎ পাওয়া নয়—এমন আমরা মনে করতে পারি। পারম্পর্যের প্রমাণ বিক্ষেপের সূত্র নীচে দেওয়া হল :

$$r\text{'র প্রমাণ বিক্ষেপ} = \frac{১ - r^2}{\sqrt{N}}$$

$$\rho\text{'র প্রমাণ বিক্ষেপ} = \frac{১\cdot৫\,(১ - \rho^2)}{\sqrt{N}}$$

প্রমাণ বিক্ষেপের সাহায্যে ঐক্যাঙ্কের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ বলতে আমরা কি বুঝি? ধরা যাক চতুর্থ শ্রেণীর ১০০টি ছেলেমেয়ের বাঙলা ও অঙ্ক পরীক্ষার ফলাফলের পারম্পর্যের ঐক্যাঙ্ক পাওয়া গেল ·৬। অন্যান্য ছেলেমেয়ের বেলাতেও অনুরূপ ঐক্যাঙ্ক পাওয়া যাবে কিনা!

r'র প্রমাণ বিক্ষেপের মূল্য হল—

$$\frac{১ - ৩৬}{১০} = \frac{\cdot৬৪}{১০} = \cdot০৬৪$$

ঐক্যাঙ্ক ·৬ ও প্রমাণ বিক্ষেপ ·০৬৪।

পরিসংখ্যান শাস্ত্রানুসারে এমন আমরা আশা করব যে অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা করলে ১০০ বারের মধ্যে ৯৫ বার যে ঐক্যাঙ্ক পাওয়া যাবে তা হবে প্রাপ্ত ঐক্যাঙ্ক ± ১·৯৬ প্রমাণ বিক্ষেপের মধ্যে; অর্থাৎ, ·৬ ± ১·৯৬ × ·০৬৪'র মধ্যে।

হয়ত আমরা আরো নিশ্চিত হতে চাইব। ১০০ বারের মধ্যে ৯৯ বার ঐক্যাঙ্ক কত'র মধ্যে হবে বলে মনে করা যেতে পারে? উত্তর—প্রাপ্ত ঐক্যাঙ্ক ±২·৫৮ প্রমাণ বিক্ষেপের মধ্যে ঐক্যাঙ্ক থাকবে বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ, ·৬ ± ২·৫৮ × ·০৬৪'র মধ্যে।

ঐক্যাঙ্কের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণে প্রমাণ বিক্ষেপের সাহায্য নেওয়ার কেউ কেউ পক্ষপাতী নন—তাও অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

(গ্রন্থকারের নামের পদবী প্রথমে)

অধ্যায় ১

(1) Ross J.—Ground-work of Education Psychology, New Edition, 1935.

(2) Drever James—Introduction to Psychology of Education, 1931, p. 21.

(3) Prince Morton—The Unconscious, Second Edition, 1921, pp. 247-54.

অধ্যায় ২

(1) McDougall William—Introduction to Social Psychology, 29th Edition, p. 25.

(2) McDougall William—Energies of Men, New Edition, 1950.

(3) Drever James—Instinct in Man, Second Edition, 1921.

(4) Ibid.

(5) Freud Sigmund—Beyond the Pleasure Principle, Tr., 1920.

(6) Ibid.

(7) Warden C. J. & Others—Animal Motivation, 1931.

(8) Lund H. Frederick—Psychology, 1933, pp. 236-7.

(9) Freud Sigmund—New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Tr., 1946, pp. 171-72.

(10) Drever J.—Ibid.

(11) Bovet Pierre—The Fighting Instinct, 1923.

(12) Quoted by Jung. C in Contributions to Analytical Psychology Tr., 1928, Pp. 6-7.

(13) Quoted by Baudouin Charles in The Power within Us, 1923.

(14) Nietzche—Jenesits III, Tr. p. 229.

(15) Jones Ernest—'War & Individual Psychology', 1915—in Essays in Applied Psycho-Analysis.

(16) cf. FREUD SIGMUND—Collected Papers Vol. II, p. 83.
(17) Ibid.
(18) WOODWORTH R. S. & MARQUIS D. G.—Psychology Twentieth Edition, 1949, pp. 308-20.
(19) MURRAY H. A.—Exploration in Personality, 1938, pp. 123-24.

অধ্যায় ৩

(1) McDOUGALL WILLIAM—Outline of Psychology, 1923, p. 143.
(2) WARR E. B.—The New Era in the Junior School, 1937, p. 31.
(3) Mentioned in Valentine C. W.—Psychology and its bearing on Education, 1950, p. 206.
(4) Ibid.
(5) Pritchard R. A. in Br. Journal of Education Psychology, Vol. V, 1935.
(6) LEWIS E. O. mentioned in Valentine—Ibid.

অধ্যায় ৪

(1) Mentioned in Valentine C. W.—Psychology.
(2) BURT CYRIL in the Report on Primary Education by Board of Education, 1931, Appendix III.
(3) SHAKESPEARE J. J. in Br. Journal of Ed. Psychology, Vol. VI, 1936.
(4) Lamb Hector in the Br. Journal of Ed. Psychology, Vol. XII, 1942.
(5) NUNN T. P.—Education, its Data and First Principles, Third Edition, 1945.

অধ্যায় ৫

(1) ADLER ALFRED—Individual Psychology, Tr. Revised Edition, 1929.
(2) BURT CYRIL—The Young Delinquent, New Edition, 1944.

অধ্যায় ৬

(1) NUNN T. P.—Education, its Data and First Principles, 1945.
(2) MATHEW—Psychology & Principles of Education, 1936, p. 238.
(3) FREUD SIGMUND—Beyond the Pleasure Principle (মন ও শিক্ষা—৬১ পৃঃ)
(4) BURT CYRIL—The Young Delinquent, 1944, p. 522.

অধ্যায় ৭

(1) BURT CYRIL—The Young Delinquent, 1944, p. 101.
(2) Aveling & Hargreaves Mentioned in Valentine C. W.—Psychology and its bearing on Education—1950, pp. 97-98.
(3) Ibid, pp. 103-4.

অধ্যায় ৮

(1) (a) FREUD SIGMUND—Introductory Lectures on Psycho-Analysis 1920.
(b) General Selections from the works of Freud by John Rickman, 1941, pp. 40-3.
(2) ELLIS HAVELOCK—Psychology of Sex, 1933, pp. 85-6.
(3) Mentioned by Hoffer W. in 'Psycho-Analytic Education' in Psycho-Analytic Study of Children, Vol. I, 1945.
(4) HOFFER W.—Ibid.

অধ্যায় ৯

(1) SHAND ALEXANDER—Foundations of Character, 1914.
(2) A General Selection from the works of Sigmund Freud Edited by John Rickman 1941, p. 31.
(3) Cf. HART BERNARD—The Psychology of Insanity, 1930 and Glossary in Jones Ernest's Papers on Psycho-Analysis, Fifth edition.

(4) PRINCE W. F.—The Doris case of Multiple Personality, 1915-17.
(5) ALLPORT G. W.—Personality, 1937.
(6) KRETSCHMER ERNEST—Physique & Character Tr. by Sprott W, J. H. Second Edition, 1936.
(7) McDOUGALL WILLIAM—Social Psychology, 1917, p. 120.
(8) ALLPORT—Ibid.
(9) DAS GUPTA J.—Behaviour Problems of School Children
(মন ও শিক্ষা, ১০৫ পৃঃ)
(10) MURRAY H. A.—The Thematic Apperception Test, 1943.
(11) See Klopfer B. & Kelley D. M.—The Rorschach Technique.
(12) Mentioned in Woodworth & Marquis—Psychology.
(13) CATTELL R. B.—Description & Measurement of Personality, 1946.
(14) WEBB E.—'Character & Intelligence' in Br. Journal of Psychology, Monog. Supplement I, No. 3, 1918.
(15) BURT CYRIL in Character and Personality, Vol. 7, 1938-39.

অধ্যায় ১০

—ক—

বিকাশের বিভিন্ন দিক

(1) Mentioned in Lovell K.—Education Psychology & Children, 1958.
(2) Mentioned in Woodworth & Marquis in Psychology, p. 284.
(3) Ibid, p. 289.
(4) Ibid, p. 289.
(5) JERSILD ARTHUR—Child Psychology, 1955, p. 125.
(6) Mentioned in JERSILD—Ibid., p. 123. (মন ও শিক্ষা ১১৬পৃঃ)
(7) LEVY D. M.—'Thumb or Finger sucking from the Psychiatric Angle in Child Development, 8, 1937.

(8) ISAACS SUSAN—Social Development in Young Children, Students' Abridged Edition 1951, p. 215.

(9) FENICHEL O.—The Psycho-Analytic Theory of Neurosis, 1945.

(10) JONES ERNEST—'Anal Erotic Character Traits', 1918 in Papers on Psycho-Analysis.

(11) MCFARLANE M.—'A Study of Practical Ability' in British Journal of Psychology. Mon. Supplement, 1923, 3 No. 8. (মন ও শিক্ষা ১১৬ পৃঃ)

(12) JERSILD ARTHUR—Ibid.

(13) JOHNSON H. M.—The Art of Block Building, 1933.

(14) SHIRLEY M. M.—The First Two Years : A Study of Twentyfive Babies, 1933.

(15) SMITH M. K. mentioned in Jersild A—Ibid.

(16) Mentioned in Jersild A—Ibid, p. 413.

(17) WOODWORTH & MARQUIS—Ibid, p. 336.

(18) GESELL A.—Infancy & Human Growth, 1928.

(19) WATSON J. B.—Psychology from the standpoint of a Behaviorist, Second Edition, 1924.

(20) HOLMES F. B. mentioned in Jersild—Ibid, p. 345.

(21) JERSLID A. T. & HOLMES F. B.—'Children's Fears' in Child Development, Mon. 1935.

(22) Mentioned in Ibid.

(23) Ibid.

(24) Mentioned in Lovell K.—Education Psychology & Children, 1958.

(25) GILLESPIE R. D.—'Psycho-Neurosis & Criminal Behaviour' in Mental Abnormality & Crime, p. 85.

(26) DAS GUPTA J. C.—'The Nature of Tender Impulses in Orphans' in Indian Journal of Psychology, Jan.-Dec., 1952.

(27) Ibid.

(28) SHIRLEY M. M.—The First Two Years : A Study of Twenty Five Babies V & II. Institute of Child Welfare Monograph Series No. 6, Minneopolis.

(29) ISAACS SUSAN—Social Development of Young Children. Students' Abridged Edition, 1951, p. 70.

(30) JERSILD A.—Ibid, p. 274.

(31) HARROWER M. R.—'Social Status & Moral Development of the Child' in British Journal of Educational Psychology, 1934.

(32) FREUD SIGMUND—New Introductory Lectures on Psycho-Analysis Tr. by Sporott W.J.H. Third Edition, 1946, pp. 137-138.

(33) McDOUGALL WILLIAM—An Introduction to Social Psychology, Nineteenth Edition, 1924, p. 156.

অধ্যায় ১০

—খ—

বয়ঃসন্ধিকাল

(1A) HALL STANLEY—Adolescence: its Psychology, 1908.

(1) JONES ERNEST—'Some Problems of Adolescence' 1922 in Papers on Psycho-Analysis, Fifth Edition, p. 391f.

(3) GATES A. I., JERSILD A. T., etc.—Educational Psychology, Third Edition, 1948, p. 50.

(4) VALENTINE C. W.—Psychology and its bearing on Education, 1950, p. 565.

(5) Ibid, p. 118.

(6) Ibid, p. 572.

(7) FRANK L. K. in the 43rd Year book of the National Society for the Study of Education, Part I: Adolescence, Chicago, 1944.

(8) BERTRAM M. BECK—"Youthful offenders" in Social Work Year book, New York, 1951.

(9) BLAIR G. M., JONES R. S. & SIMPSON R. H.—Educational Psychology, 1954, pp. 67-9.

অধ্যায় ১১

(1) FREUD SIGMUND—Introductory Lectures on Psycho-Analysis.

(2) Mentioned in Valentine C. W.—Psychology, 1950, p. 298

(3) Mentioned in LOVELL K.—Educational Psychology & Children p. 96.
(4) PIAGET JEAN—The Language & Thought of the child., Tr. M. GABIIN, Second Edition, 1932.

অধ্যায় ১২

(1) WOODWORTH & MARQUIS—Psychology p. 417.
(2) Ibid., p. 418.
(3) Mentioned in Ibid., pp. 418-419.

অধ্যায় ১৩

(1) SYMPOSIUM : Intelligence & Its Measurement in Journal of Educational Psychology—XII, 1921.
(2) BURT CYRIL—Mental & Scholastic Tests, 1921.
(3) LOVELL K.—Educational Psychology & Children, 1958, p. 31.
(4) SPEARMAN C.—The Abilities of Man, 1927.
(5) THURSTONE L. L.—Primary Mental Abilities, 1938.
& ,, —Multiple Factor Analysis, 1947.
(6) WOODWORTH & MARQUIS—Psychology, 1949, p. 73.
(7) An investigation by Schiller B Mentioned in Woood-worth and Marquis—Psychology.
(8) CRONBACK L. J.—Essentials of Psychological Testing, 1949.
(9) DUNCAN JOHN—The Education of the ordinary child, 1942, p. 38.
(10) ALEXANDER W. B.—The Educational Needs of Democracy, 1940.
(11) LOVELL K—Ibid., p. 56.
(12) Presidential Address of Shri Tarak Ch. Roy Choudhury at the Section of Anthropology & Archaeology, Indian Science Congress, 1952.
(13) MERRILL MAUD—'The Significance of the Revised Standford Binet Scales' in Journal of Educational Psychology, 1938.
(14) DEARBORN WALTER E—Intelligence Tests, 1923.

(15) CRONBACK—Ibid., p. 124.

(16) BURT CYRIL—Ibid.

(17) CRAWFORD, A. B. & BURNHAM, P. S.—Forecasting College Achievement: A Survey of aptitude tests for Higher Education, 1946.

(18) BURT CYRIL—Ibid

(19) VERNON P. E.—'Recent Investigations of Intelligence & its Measurement' in Eugenics Rev., 1951, pp. 125-37.

(20 WECHSLER D.—The Measurement of Adult Intelligence, New Edition, 1944.

(21) THORNDIKE E. L.—Adult Learning, 1927.

(22) TERMAN L. M. & MERRILL, M.A.—Measuring Ingelligance, 1937.

(23) Data from Bingham W. B. in Military Data Science, 1946, p. 37.

(24) MACMEEKEN A. M.—The Intelligence of a representative group of Scottish Children, 1939.

(25) WOODWORTH & MARQUIS—Ibid, p. 179

(26) Ibid, p. 186

অধ্যায় ১৪

(1) BURT CYRIL—'General Abilities and Special Aptitudes' in Educational Research, Vol. I, No. 2 Feb. 1959.

(2) WOODWORTH & MARQUIS—Psychology, 1949, p. 538.

(3) Ibid., p. 541.

(4) Gates mentioned in Ibid, p. 545.

(5) Gates, Jersild etc. Educational Psychology, 3rd Edition, 1948, p. 380.

(6) WOODWORTH & MARQUIS—Ibid., p. 548.

অধ্যায় ১৫

(1) VALENTINE C. W.—Psychology and its bearing on Education, 1950 pp. 430—431.

(2) Mentioned in Ibid, p. 440.

(3) WILLIAMS E. D. & WINTER L. & WOODS J. M.—'Tests of Literary Appreciation' in Br. Journal of Educational Psychology, 1938, Vol. 8, p. 282.

(4) VALENTINE C. W.—Experimental Psychology of Beauty, 1919, p. 89.

(5) VALENTINE C. W.—Psychology, p. 434.

(6) BULLOUGH EDWARD—'The Perceptive Problem in the Aesthetic Appreciation of Single Colours' in Br. Journal of Psychology, Vol. II.

(7) Do —In Section dealing with Art in How the Mind Works edited by Burt Cyril.

(8) Mentioned by Valentine C. W.—Psychology, p. 440.

(9) BURT CYRIL—Board of Education Report on the Primary School, Appendix III, p. 260.

(10) WALL W. D.—The Adolescent Child, 1948, p. 102.

অধ্যায় ১৬

(1) SANDIFORD PETER—Education Psychology, 1928, p. 190.

(2) WOODWORTH & MARQUIS—Psychology, 1949, p. 499.

(3) Ibid.

(4) BORING, LANGFELD & WELD—Foundations of Psychology, 1948, p. 150.

(5) BURT CYRIL—The Young Delinquent, 1927, p. 527.

(6) DUNLIP KNIGHT—Habits, their making and unmaking, 1949.

(7) THORNDIKE E. L.—Man and His works 1943, p. 150.

(8) HULL C. L.—Principles of Behaviour, 1943.

(9) WOODWORTH & MARQUIS—Ibid.

(10) HULL C. L.—A behaviour system, 1952.

(11) RIVERS W. H. R.—Mentioned in McDougall William—Outline of Abnormal Psychology. 1948 Sixth Edition Pp. 304-305.

(12) Mentioned in Boring, Langfeld etc.—Ibid., pp. 159-60.

(13) HURLOCK E. B.—'An Evaluation of certain Incentives used in School Work' in J. of Ed. Psychology, 1925.

(14) SIMS V. M.—Mentioned in Boring, Langfeld etc.—Ibid, p. 149.

অধ্যায় ১৭

(1) BORING, LANGFELD & WELD—Foundations of Psychology, 1948, p. 79.

(2) Mentioned in Ibid, p. 179.

(3) Mentioned in SORENSEN H.—Psychology in Education, Third Edition, 1954, Pp. 475-476.

(4) Mentioned in LOVELL K.—Educational Psychology, Pp. 128.

(5) WOODWORTH & MARQUIS—Psychology

(6) BURT CYRIL Mentioned in Hamley—Educating for Democracy.

অধ্যায় ১৮

(1) VALENTINE C. W.—Psychology, 1950, p. 240.

(2) MCDOUGALL WILLIAM—Outline of Abnormal Psychology, 1948, p. 76.

(3) VALENTINE C. W.—Ibid, p. 239.

অধ্যায় ১৯

(1) COLLINGS ELLSWORTH—An experiment with a Project Curriculum, 1926.

(2) Mentioned in SORENSEN H—Psychology in Education 1954, pp. 529-30.

(3) Ibid., pp. 535-36.

(4) GARDNER D. E. M.—Testing Results in the Infant School, Second Edition, 1948.

অধ্যায় ২০

(1) WOODWORTH & MARQUIS—Psychology, 1949, pp. 154-5.

(2) Ibid, 171.

(3) NEWMAN H. H. & FREEMAN F. N. & HOLZINGER K. J.—Twins : A Study of Heredity and Environment, 1937.

(4) Sorensen H.—Psychology in Education, 1954, pp. 356-7.

(5) Woodworth & Marquis—Ibid.

(6) Terman L & Merrill M.—Measuring Intelligence.

(7) Mentioned in Woodworth & Marquis—Ibid.

(8) Burt Cyril—'General Ability and Special Ability' in Educational Research, Vol. I No. 2, Feb.. 1959.

(9) Burt C.—The Subnormal Mind, Second Edition, 1937, pp. 50-4.

অধ্যায় ২১

(1) Sherrington C. S.—The Integrative Action of the Nervous System, Second Edition, 1952.

অধ্যায় ২২

(1) Freeman F. N.—Mental Tests, 1939, pp. 379-80.

(2) Burt Cyril—The Backward Child, 1937, pp. 78-9.

(3) Burt Cyril—The Subnormal Mind, Second Edition, 1937, pp. 47-8.

(4) Burt Cyril—The Young Deliquent, 1945, pp. 296-7.

(5) Gillespie R. D.—'Psycho-Neurosis & Criminal Behaviour' in Mental Abnormality and Crime, p. 85.

অধ্যায় ২৩

(1) Washbourne & Morpett mentioned in Kennedy-Fraser David—Education of the Backward Child, 1932.

(2) Ibid.

(3) Chapter on Educational Selection and Allocation by MacMohon D in Current Trends of British Psychology edited by Mace, C. A. & Vernon, Philip 1953.

(4) McLelland W.—Selection for Secondary Education—1945, p. 67.

(5) Examiner's Manual for the Army General Classification Test Published by Research Association.

(6) Rodger A.—The Juvenile Employment Service in Occupational Psychology, Vol. 20, 1946, p. 76.
(7) Gray J. C.—Psychology in Human Affairs, 1946, p. 17.
(8) Mentioned in Valentine C. W.—Psychology and its bearing on Education, 1946, p. 424.

অধ্যায় ২৪

(1) Jones Ernest—'The concept of a Normal Mind', 1931, in Papers on Psycho-Analysis.
(2) Abraham Karl—'Character- Formation on the Genital Level of Libido-Development', 1925, in Selected Papers (Tr.), p. 416.
(3) Farrow E. Pickworth—A Practical Method of Self-Analysis, Second Edition, 1943.

অধ্যায় ২৫

(1) Hartog Philip & Rhodes E. C.—An Examination of Examinations, 1936.
(2) Vernon P. E.—The Measurement of Abilities, Second Edition, 1956, p. 203.
(3) Ballard P. B.—The New Examiner 1923 p. 124.
(4) Anastasi Anne—Psychological Testing, 1954, p. 193.
(5) Ballard—Ibid., pp. 67-7.
(6) Ibid., p. 84.
(7) Ibid., pp. 82-8.
(8) Ray D. N.—'The Construction & Validation of a Group Test of Intelligence for English Children of 13 years of age upward'. Unpublished Thesis for M.A. examination of London University, 1948.
(9) Sorensen Herbert—Psychology in Education, 1954, p. 30.
(10) Mahanta D.—'Interrelationship between Different Subjects of the Matriculation Syllabus, in Education Today, Golden Jubilee Number of David Hare Training College Magazine, 1958 p. 59.

অধ্যায় ২৬

(1) McCall W. A.—How to Measure in Education, 1922. p. 416.
(2) Woodworth & Marquis—Psychology, p. 68.

পরিভাষা

অধিঅহম্	...	Super-ego
অর্ধবিভক্তি পদ্ধতি	...	Split-half Method
অনগ্রসর শিশু	...	Backward Child
অনুকরণ	...	Imitation
অনুমান, অনুমিতি	...	Inference
অনুভূতি	...	Feeling, Affect
অনুষঙ্গ	...	Association
অনুস্মরণ	...	Recollection
অবিলম্ব অনুস্মরণ	...	Immediate Recall
অন্তর্দর্শন	...	Introspection
অন্তর্দ্বন্দ্ব	...	Conflict
অন্তর্মুখ	...	Afferent
অন্তর্মুখী	...	Introvert
অন্তঃক্ষেপ	...	Introjection
অন্বয় দৃষ্টি (সমগ্র দৃষ্টি)	...	Insight
অপরাধবোধ	...	Guilt Feeling, Guilt Sense
অবদমন	...	Repression
অবাচনিক পরীক্ষা	...	Non-verbal Test
অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি	...	Free Association Method
অবরোহ বিচার	...	Deduction
অভিজ্ঞতা	...	Experience
অভিভাবন	...	Suggestion
অভীক্ষা	...	Test
অমূল প্রত্যয় (ভ্রান্তি)	...	Delusion
অমূল প্রত্যক্ষ	...	Hallucination
অসমঞ্জস শিশু	...	Maladjusted Child
অসাধারণ	...	Superior, Supernormal
অসামান্য	...	Gifted, Talented

অস্বাভাবিক	...	Abnormal (Supernormal & Subnormal)
অহম্	...	Ego
আইডেটিক প্রতিরূপ	...	Eidetic Image
আকস্মিক মানসিক আঘাত	...	Trauma
আক্রম	...	Aggression
আঙ্কিক সামর্থ্য	...	Number Ability
আচরণ	...	Behaviour, Response
আতঙ্ক	...	Phobia
আত্মআবৃত (মানস প্রকৃতি)	...	Schizothyme (Temperament)
আত্ম-নতি	...	Self-Submission
আত্ম-প্রদর্শন	...	Self-exhibition
আত্ম-প্রতিষ্ঠা	...	Self-assertion
আত্ম-বিষয়ক ভাবগ্রন্থি	...	Self-regarding Sentiment
আত্ম-সঙ্গতি	...	Self-consistency
আরোহ বিচার	...	Induction
আবর্তিত (মানস প্রকৃতি)	...	Cyclothyme (Temperament)
আসংজ্ঞান	...	Pre-conscious
ইচ্ছা	...	Conation, Wish
ইদম	...	Id
উত্তর প্রতিরূপ	...	After-image
উদ্দীপক	...	Stimulus
উদ্দেশ্য	...	Purpose, Motive
উদ্যম	...	Active or Released Energy
উন্মাদরোগ	...	Psychosis, Insanity
উদ্বেগ	...	Worry
উৎকণ্ঠা	...	Anxiety
উপঅহম	...	Sub-self
ঊর্ধ্বায়ন	...	Sublimation
ঊনমানসতা	...	Mental deficiency, Feeble-mindedness
একাত্মতা, একাত্মীকরণ	...	Identification
এক্সপেরিমেণ্ট (পরীক্ষা)	...	Experiment
এন্‌ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড	...	Endocrine Gland
এ্যাড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড	...	Adrenal Gland

এ্যাড্রেনিন	...	Adrenin
ঐক্যাঙ্ক (পারম্পর্যের)	...	Co-efficient (of Correlation)
কনভার্সন হিস্টিরিয়া	...	Conversion hysteria
কম্‌প্লেক্স	...	Complex
কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়	...	Activity School
কর্মশক্তির বিকাশ	...	Motor Developm
করণ অভীক্ষা	...	Performance Test
কল্পনা	...	Imagination
কারণ-সন্ধানী অভীক্ষা	...	Diagnostic Test
কার্য-কারণ সম্বন্ধ	...	Causal relation
কোরটিন	...	Cortin
কোরটেকস	...	Cortex
ক্লান্তি	...	Fatigue
ক্রেটিনিজম	...	Cretinism
ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক	...	Cerebellum
খেদোন্মত্ত বাতুলতা (ম্যানিক্ ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্)	...	Manic-Drepressive Psychosis
গড়	...	Average, Mean
গোনাড্‌স্	...	Gonads
গ্ল্যাণ্ড	...	Gland
গ্রুপ	...	Group
ঘৃণা (দ্বেষ)	...	Hatred
চঞ্চল বিক্ষেপ	...	Variable Error
চিন্তা	...	Thinking
চেনা (চিনতে পারা)	...	Recognition
জড়ধী	...	Idiot
জ্ঞান	...	Cognition
তত্ত্ব (থিয়োরি)	...	Theory
থাইরয়েড গ্লাণ্ড	...	Thyroid Gland
দ্রুতি	...	Speed
দুষ্ক্রিয়া (সামাজিক অপরাধ)	...	Delinquency
দ্বিমুখী মনোভাব (এ্যামবিভ্যালেন্স)	...	Ambivalence
দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ	...	Axon
ধারণা	...	Idea, Concept
ধৃতি (মনে রাখা)	...	Retention

ধ্রুব বিক্ষেপ	...	Constant error
নঞবৃত্তি	...	Negativism
নর্ম্	...	Norm
নিউরসিস্ (বায়ুরোগ)	...	Neurosis
নির্ভরাঙ্ক	...	Reliabilty Coefficient
নিয়ন্ত্রণ দল	...	Control group
নির্জ্ঞান	...	Unconscious
নির্ভরযোগ্যতা	...	Reliability
নিষ্ক্রিয়	...	Passive
নিষ্কাশন (রেচন)	...	Catharsis
নেগেটিভ	...	Negative
নৈতিক	...	Moral
পজিটিভ	...	Positive
পরানুভূতি (পর+অনুভূতি)	...	Empathy
পরিণত	...	Mature
পরীক্ষা	...	Examination, Experiment
পাত্রান্তরণ	...	Transference
পারম্পর্য	...	Correlation
পারসেণ্টাইল	...	Percentile
পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড	...	Pituitary Gland
প্যারানইয়া	...	Paranoia
প্রকল্প	...	Hypothesis
প্রক্ষেপ	...	Projection
প্রজেক্ট পদ্ধতি	...	Project Method
প্রতিজ্ঞা	...	Proposition
প্রতিক্রিয়া	...	Reaction, Response
প্রতিরূপ	...	Image
প্রতিসাম্য	...	Symmetry
প্রতীক	...	Symbol
প্রত্যক্ষ	...	Perception
প্রত্যাবৃত্তি	...	Regression
প্রমাণ ব্যত্যয়	...	Standard Deviation
প্রমাণ ভ্রমাঙ্ক, প্রমাণ বিক্ষেপ	...	Standard Error
প্রমাণ বিধান	...	Standardisation
প্রশ্নাবলী	...	Questionnaire

প্রহরী	...	Censor
প্রাথমিক সহায়ক	...	Primary Reinforcing Agent
প্রান্তিক	...	Borderline
প্রান্তিক স্কোর (ক্রিটিক্যাল স্কোর)	...	Critical Score
বহির্নিরূপক	....	External Criterion
বর্হিমুখ	....	Efferent
বর্হিমুখী	....	Extrovert
বংশগতি	....	Heredity
বস্তুকাম	....	Object-love, Object-libido
বস্তুসঙ্গতি (সত্যতা)	....	Validity
বাচনিক অভীক্ষা	....	Verbal Test
বাচনিক সামর্থ্য	..	Verbal Ability
বাতিক	....	Obsession
বাতুলতা (উন্মাদরোগ)	...	Insanity, Psychosis
মানসিক বাধা	..	Resistance
বামনত্ব	....	Cretinism
বিপরীত কাম	....	Heterosexuality
বিবেক	....	Conscience
বিমূর্ত		Abstract
বিরেচন (নিষ্কাশন)	....	Catharsis
বিশ্লেষণ		Analysis
বিষয়মুখী পরীক্ষা	....	Objective Test
বিষয়ান্তরণ (আবেগের)	...	Displacement (of affect)
বিয়োজন (বিলুপ্তিসাধন)	....	Unconditioning
বুদ্ধ্যঙ্ক	...	Intelligence Quotient
বুদ্ধি অভীক্ষা বা পরীক্ষা	....	Intelligence Test
বৃত্তি	....	Vocation
বৃত্তি নির্বাচন পরামর্শ		Vocational Guidance
বৃহৎ মস্তিষ্ক	....	Cerebrum
ব্যক্তিত্ব	....	Personality
ব্যত্যয়	....	Deviation
ভাব	....	Emotion, Idea
ভাবগ্রন্থি (সেন্টিমেণ্ট)	....	Sentiment
ভাবানুষঙ্গ	....	Association of Ideas
ভ্রম (আরোপ ভ্রম)	....	Illusion

ভ্রান্তি (অমূল প্রত্যয়)	....	Delusion
মধ্যক	...	Median
মন্দিত (শিশু)	...	Retarded (child)
মরণ-প্রবৃত্তি	...	Death Instinct
মাধ্যমিক সহায়ক	....	Secondary Reinforcing Agent
মানস প্রকৃতি	....	Temperament
মানসিক অবসাদ	....	Depression
মানসিক বিভক্তি অথবা বিভক্তি	....	Dissociation
মাপক (স্কেল)	....	Scale
মালভূমি	...	Plateau
মনোভাব	...	Attitude
মনোযোগের পরিধি	...	Range of Attention
মূর্ত	....	Concrete
মেডুলা	...	Medulla
যদৃচ্ছ নমুনা	....	Random Sample
যান্ত্রিক সামর্থ্য	...	Mechanical Aptitude
যুক্তি উদ্ভাবন	...	Rationalisation
যূথ প্রবৃত্তি	....	Herd Instinct
শব্দজ্ঞান (শব্দসম্পদ)	..	Vocabulary
শব্দস্ফূর্তি (অভীক্ষা)	....	Verbal Fluency (Test)
শক্তি	...	Energy
শিক্ষা	....	Education, Learning
—বারংবার চেষ্টা ও ভুল	...	—By Trial and Error
—সমগ্র দৃষ্টি (অন্বয় দৃষ্টি)	....	—By Insight
শিক্ষা নির্বাচন পরামর্শ	....	Educational Guidance
শিক্ষাঙ্ক	....	Educational Quotient
শীর্ষস্কোর	....	Mode
শেখা	....	Learning
সক্রিয় ইচ্ছা	...	Active Wish
সচেতন	...	Conscious
সত্যতা (বস্তুসঙ্গতি)	...	Validity
সঞ্চারণ (বিষয়ান্তরণ)	....	Transfer
সবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ	....	Positive After-image
সমক (সংকীর্ণ অর্থে গড়)	...	Mean
সমক ব্যত্যয়	....	Mean Deviation

সমকাম	Homosexuality
সমগ্র দৃষ্টি (অন্বয় দৃষ্টি)	Insight
—পশ্চাৎদৃষ্টি	—Hindsight
—সম্মুখ দৃষ্টি	—Foresight
সম্মোহন	Hypnosis
সহজ্ঞ	Co-conscious
সহজাত	Innate, Inborn
সহজাত প্রবৃত্তি (ইনষ্টিংট্)	Instinct
সহানুভূতি	Sympathy
সংগ্রাহক (অঙ্গ)	Receptors
সংযোজন	Conditioning
সংযোজিত প্রতিক্রিয়া অথবা আচরণ	Conditioned Response
সংশ্লেষণ	Synthesis
সংবন্ধন	Fixation
সংসাধক (অঙ্গ)	Effectors
সাফল্যাঙ্ক	Achievement Quctient
সামঞ্জস্য সাধন	Adjustment
সামর্থ্য	Ability, Aptitude
সামাজিক অপরাধ (দুষ্ক্রিয়া)	Delinquency
সামান্যীকরণ (বা সাধারণীকরণ)	Generalisation
সারণী	Table
সিদ্ধান্ত	Conclusion
সুখ	Pleasure
সুখনীতি	Pleasure Principle
সুখিত্ব	Happiness
সুসঙ্গতি	Harmony
স্কোর	Score
স্নায়ু	Nerve
—কোষ	Nerve-cell
—সন্ধি	Synapse
স্নেহ	Affection
স্বকাম	Narcissism
স্বতঃকাম (স্বতঃরতি)	Auto-erotic
স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুতন্ত্র	Automatic Nervous System
স্বৈচ্ছিক	Voluntary

স্মরণ	...	Remembering
স্মৃতি	...	Memory
স্মৃতি-প্রসর	...	Memory-span
স্মৃতিরূপ প্রশ্ন	...	Recall Type Test
স্থানিক সামর্থ্য	...	Spatial Ability
হস্তমৈথুন	...	Masturbation
হীনতা কম্‌প্লেক্স	...	Inferiority Complex
হীনতাবোধ	...	Inferiority Feeling
হ্রস্বপ্রত্যঙ্গ	...	Dendrites

নির্ঘণ্ট—নাম

(পদবীর বর্ণানুক্রমে)

নির্ঘণ্ট—বিষয়

Date.	Issued to	Returned on